বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস

বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস

॥ প্রথম খণ্ড ॥

আদি যুগ : ১৬৬৭-১৮৩৪

ডঃ বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৮৫

Bāṁlā Mudrita Granther Itihās
by
Dr. Barun Kumar Mukhopadhyay, M.A., Ph.D., Dip.Lib

॥ প্রথম প্রকাশ ॥
বৈশাখ, ১৩৯২
মে, ১৯৮৫

॥ প্রকাশক ॥
প্রেস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৮ হাজরা রোড। কলিকাতা ৭০০ ০১৯

॥ মুদ্রক ॥
শ্রীসিদ্ধার্থ মিত্র
বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৭০০ ০০৬

॥ ব্লক নির্মাণ ও মুদ্রণ ॥
দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী। ১৫ মহেন্দ্রলাল সরকার রোড। কলিকাতা ৭০০ ০১২
মূল্য : ১২৫.০০ টাকা

উৎসর্গ

আমার স্বর্গত পিতৃদেব
অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়-এর
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

সবিনয় নিবেদন

বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গবেষণা হিসাবে যে কাজ শুরু করেছিলাম, আজ তা মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হোল। ইতিমধ্যে প্রায় দুই দশক কাল কেটে গেছে, গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলে বদল হয়েছে অনেক, যাঁদের সান্নিধ্য-প্রেরণায় কাজ শুরু করেছিলাম তাঁদের অনেকে বিদায় নিয়েছেন, এসেছেন অনেক নতুন মুখ। গবেষণার বিষয় হিসাবে শুরুতে যা ছিল অপ্রচলিত বা unconventional, এখন তা বিদগ্ধ মহলে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। আমার প্রাক্-গবেষণা পর্বে যে বিষয়ে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য, এখন সে ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে বেশ কয়েকটি প্রকাশনের সাক্ষাত মেলে। নতুন তথ্য ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে, কিছু কিছু বিষয়ের নব মূল্যায়নও শুরু হয়েছে। আজ গ্রন্থপ্রকাশকালে আমার গবেষণা-বিষয়ের এই কৌলীন্যলাভে আমি আনন্দ বোধ করছি। তবে দুঃখবোধেরও কারণ আছে। যাঁদের বিদগ্ধ বিচারে আমার এই গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাফল্যের ছাড়পত্র পেয়েছিলো তাঁদের মধ্যে দু'জন—আচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ নীহাররঞ্জন রায়—ইতিমধ্যে লোকান্তরিত হয়েছেন। এবং আমার আবাল্য সারস্বত চর্চার সকল প্রেরণার উৎস ছিলেন যিনি—আমার পিতৃদেব ছান্দসিক অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—তিনিও সম্প্রতি মর্ত্যলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। এঁদের হাতে আমার প্রকাশিত গ্রন্থটি তুলে দিতে পারলাম না বলে চিরকালের মতো আক্ষেপ রয়ে গেলো।

আসলে সমস্যাটি ঘটেছে গ্রন্থ-সমাপন ও গ্রন্থ-প্রকাশনের মধ্যে প্রায় দশ বছরের ব্যবধান ঘটে যাওয়ায়। এই কালক্ষেপের অন্যতম বড় কারণ অবশ্যই যোগ্য প্রকাশক-সন্ধানের সমস্যা ও মুদ্রণের বিলম্বিত শ্লথ গতি। মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস ছাপতে গিয়ে যে মুদ্রণ-প্রকাশনের এই বিপাকে পড়তে হলো তা নিতান্তই ভাগ্যের পরিহাস। তবে এটিকেও আমাদের বর্তমান বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন ধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে জেনে রাখা ভাল।

গবেষণা শুরু করেছিলাম বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের একটিমাত্র যুগ, অর্থাৎ এর আদি যুগকে কেন্দ্র করে। তা যখন শেষ হলো, মনে হলো এখানেই থামা যায় না। কাজটিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তখন থেকেই বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের সমগ্র ইতিহাস রচনার কাজে উদ্যোগী হলাম। ফলে আগের কাজের কিছু কিছু অদল-বদল করতে হলো, বিষয়-বিন্যাসের কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এবং কিছু নতুন তথ্যাদি সংযোজন করে ইতিহাসের

প্রথম খণ্ড (১৬৬৭—১৮৩৪ খ্রী.) বর্তমান গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো। ইচ্ছা রইলো ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের—যার পরিধি ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। বহু প্রথিতযশা পণ্ডিত গবেষক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করেছেন। তারই পরিপূরক হিসাবে বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থেরও একটি পূর্ণ ইতিহাস রচনার তাগিদে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এই বিষয়ে যাতে একটি প্রামাণ্য রেফারেন্স বই রচিত হতে পারে সে বিষয়ে আমি বরাবরই আগ্রহী ছিলাম। সেদিক থেকে বর্তমান গ্রন্থের কোনরূপ মূল্য বা সাফল্য বিদগ্ধ মহলে স্বীকৃত হলে আমার এই প্রয়াস সার্থক বলে মনে করবো।

এই কাজের প্রয়োজনীয়তার প্রতি প্রথম স্বীকৃতি ও তৎসহ উৎসাহ পেয়েছি আমার গবেষণা-নির্দেশক অধ্যাপক ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের কাছে। এছাড়া প্রথমাবধি আমাকে সর্ববিধ সাহায্য, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন আমার অগ্রজ অধ্যাপক ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন প্রখ্যাত গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, লণ্ডনস্থ স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল এণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজের অধ্যাপক ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ। লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স এণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স-এ গবেষণাকালীন আমার অনুজ অধ্যাপক ডঃ অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ব্রিটিশ লাইব্রেরি ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে বহু দুষ্প্রাপ্য বাংলা মুদ্রণের প্রতিলিপি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এ ছাড়া বহু গ্রন্থাগারের দায়িত্বশীল পদস্থ সহৃদয় কর্মী-বন্ধু, যেমন জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রী এম. এন. নাগরাজ, শ্রীসরোজ ব্যানার্জী, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত শ্রীবিজয় সেনগুপ্ত ও শ্রীনচিকেতা মুখোপাধ্যায় এবং প্রয়াত অজিত ঘোষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শ্রীশান্তিপদ ভট্টাচার্য (অবসরপ্রাপ্ত), ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের শ্রীপঙ্কজ দত্ত, শ্রীরামপুর কলেজ কেরী লাইব্রেরির শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই প্রয়োজনীয় বইপত্র সংগ্রহ করে দিয়ে আমার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, এশিয়াটিক সোসাইটি ও উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরির সংগ্রহ ভাণ্ডারও আমাকে বহু তথ্যাদি সংগ্রহে সাহায্য করেছে। আমার এই গ্রন্থপ্রকাশনায় যাঁদের কাছ থেকে সহৃদয় উৎসাহ, শুভেচ্ছা ও সাহায্য পেয়েছি তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ডঃ নিশীথরঞ্জন রায়, ডঃ বরুণ দে, শ্রীনিখিল সরকার, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, অধ্যাপক নির্মল বসু ও বন্ধুবর ডঃ নীরদপ্রসাদ নাথ। এছাড়া প্রতিলিপি প্রস্তুত ও গ্রন্থ-অলংকরণের কাজে সাহায্য করেছেন শিল্পপ্রাণ বন্ধু শ্রীঅমিতাভ দত্ত ও শ্রীরণেন্দ্রকুমার চ্যাটার্জী। এঁদের সবায়ের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থপ্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগের শ্রীদেবীপ্রসাদ ঘোষ ও

বোধি প্রেসের শ্রীসিদ্ধার্থ মিত্র-র যত্ন ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই গ্রন্থমুদ্রণের কাজ সুসম্পন্ন হোত না। এঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি সেই সব অসংখ্য নিষ্ঠাবান গুণী শিল্পী-কর্মীদের যাঁরা দুই শতাধিক বর্ষের অক্লান্ত সাধনায় বাংলা মুদ্রণ প্রকাশনের ধারাকে ক্রমিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস এঁদের শিল্পমাধুরীতে সমৃদ্ধ। অলমতি-বিস্তরেণেতি—

'ত্রিপর্ণ' : সি/৭/৩
৩৯-এ গোবিন্দ আঢ্য রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৭
২৫শে বৈশাখ ১৩৯২

বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

Discourse was deemed man's noblest attribute,
And written words the glory of his hand.
Then followed printing with enlarged command
For thought—dominion vast and absolute
For spreading truth and making love expand.

William Wordsworth

সাহিত্যের প্রথম পর্বে ছন্দ মানুষের শুধু খেয়ালের নয়, প্রয়োজনের একটা বড় সৃষ্টি ; আধুনিক কালে যেমন সৃষ্টি তার ছাপাখানা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচী

বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাসের আদিযুগ পর্যালোচনা করতে গিয়ে মোটামুটি তিনটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। বিষয়গুলি হল বাংলা মুদ্রণের ইতিহাস অর্থাৎ এর জন্ম ও বিকাশের ধারা, বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থ ও তার লেখক-প্রকাশক-মুদ্রাকর পরিচয় এবং সংশ্লিষ্ট যুগ বা কালের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য -নির্ণয়। অন্যভাবে বলা যায়, সংশ্লিষ্ট যুগের পটভূমিকায় বাংলা মুদ্রণের জন্ম ও বিকাশের মূল সূত্রগুলিকে এখানে নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের চিন্তা-ভাবনার ফসল হিসাবে যে মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থগুলি আমাদের হাতে এসেছে সেগুলির সার্বিক মূল্যায়নের প্রয়াস করা হয়েছে। সুতরাং বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়, বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের তিনটি মৌল উপাদান— মুদ্রণ, গ্রন্থ ও যুগ। এই তিনের সমাহারে গড়ে উঠেছে বক্ষ্যমান বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাসের আদিযুগের বিষয়বস্তু। এটি নিছক সাহিত্যের ইতিহাস নয়, বা কেবলমাত্র তৎকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাস নয়। বরং মুদ্রণের ইতিহাস নিয়েই এর সূত্রপাত, তার টানেই এসেছে সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি। সর্বোপরি, এটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অঙ্গ। বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে এর মুদ্রণের ইতিহাস অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত।

সভ্যতার ইতিহাসে মুদ্রণের স্থান অতি উচ্চে। কারণ মুদ্রণকে আশ্রয় করেই মানুষের ভাবনা-চিন্তা রূপলাভ করেছে এবং সেই রূপকে অবলম্বন করেই সভ্যতা ও সাহিত্যের ইতিহাস গড়ে উঠেছে। বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসে বাংলা মুদ্রণের ভূমিকাও তাই যথোচিত গুরুত্ব ও মর্যাদালাভের অধিকারী। অথচ আক্ষেপের কথা, বাংলা মুদ্রণের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও রচিত হয়নি। ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর পূর্ণ হলেও তার সুসম্বদ্ধ ইতিহাস রচনার কাজ আজও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, এ নিতান্ত আক্ষেপের কথা। বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসের এই অপূর্ণতাজনিত আক্ষেপ থেকেই আমি বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গ আলোচনার প্রেরণা পেয়েছি। বিশেষ করে বাংলা মুদ্রণের আদি ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, কোথাও বা ভ্রান্ত। এই যুগের মর্যাদা বা গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা যেমন কম, এবিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে আমাদের আগ্রহও তেমনি কম। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আমরা লিখেছি, অথচ সেই ইতিহাসের মৌল উপাদানগুলিকে একত্র সংগ্রহের কোনোরূপ চেষ্টা আমরা করিনি। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, আলোচ্য যুগের অর্থাৎ বাংলা মুদ্রণের আদিযুগের কোনো পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী আমরা সংকলন করার আগ্রহ বোধ করিনি। অথচ সেই যুগের ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ করেছি বলে আমরা আত্মতুষ্টি বোধ করি। শ্রীরামপুরে কেরী সাহেবের ছাপাখানা, মথি লিখিত সুসমাচার, পঞ্চানন নামধেয় জনৈক কর্মকারের বাংলা হরফ খোদাই ইত্যাদি দু-একটি বিষয়ে ভাসা ভাসা কিছু খবর রেখেই আমরা সন্তুষ্ট

থেকেছি, তার বাইরেও যে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের আদিযুগের জটিল বিপুল রহস্য ছড়িয়ে রয়েছে সে খবর আমরা রাখি না। ইতিহাসের এই অপূর্ণতাই আমাকে ইতিহাস সন্ধানের প্রেরণা দিয়েছে। বাংলা মুদ্রণের প্রথম যুগের একটি সম্পূর্ণ বাংলা গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের কথা ভাবতে গিয়েই শেষ পর্যন্ত আমি বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনায় আগ্রহ বোধ করি। সেই আগ্রহ থেকেই বর্তমান গবেষণা-নিবন্ধের জন্ম।

এই আগ্রহবোধের পিছনে হয়ত আরো কিছু ব্যক্তিগত কৈফিয়ত ছিল। সংশ্লিষ্ট 'বিশেষ' বিষয়ে আমার শিক্ষা ও জীবিকাসূত্রে আহৃত সামান্য কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এই গবেষণা কাজে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বাংলা ভাষা-সাহিত্যে পাঠ ও পরে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ লাভের ফলে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্য-সমস্যা আমাকে ভাবিত করে। পরবর্তীকালে জীবিকাসূত্রে গ্রন্থাগারিকতাবৃত্তি গ্রহণ করে ও মুদ্রণ সংক্রান্ত একটি বৃহৎ সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আমার পূর্বোক্ত ভাবনাগুলো বাংলা মুদ্রণের সমস্যায় কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। পরিণতিতে সেই ভাবনাই আমাকে বাংলা মুদ্রণের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত করে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি যখন আমি এই কাজ শুরু করি তার পূর্বে বক্ষ্যমান বিষয়ের বিভিন্ন প্রসঙ্গে অবশ্য কেউ কেউ আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুশীলকুমার দে, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত অন্যান্য কয়েকজনের দু-একটি বইও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। যেমন, A. K. Priolkar রচিত *The Printing Press in India : Its Beginnings and Early Development* (Bombay, 1958), Katharine S. Diehl রচিত *Early Indian Imprints* (New York, 1964), মুহম্মদ সিদ্দিক খান রচিত 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা' (ঢাকা, ১৩৭১), যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য রচিত 'বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়' (কলকাতা, ১৯৭০), সবিতা চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক' (কলকাতা, ১৯৭২), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য' (কলকাতা, ১৯৭২), ইত্যাদি। কিন্তু এই সব বইয়ের কোনোটিতেই বা পূর্বোক্ত লেখকবৃন্দের কোনো রচনাতেই বাংলা মুদ্রণের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আলোচিত হয়নি। এই ইতিহাসের বিষয়বস্তু আংশিকভাবে নানা জায়গায় ঐ সব বইয়ে ছড়িয়ে আছে। তা ছাড়া বক্ষ্যমান ইতিহাসের উপজীব্য এমন বহু অংশ রয়েছে যা আদৌ কোনো বইয়ে আলোচিত হয়নি। সর্বোপরি, এক সামগ্রিক পরিকল্পনাধীন বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয়নি। এই অপূর্ণতার কথা মনে রেখেই আমার বর্তমান আলোচনার সূত্রপাত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি আমার এই গ্রন্থ রচনার কাজ শেষ হবার

পর এবিষয়ে আরো কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, শ্রীপান্থ রচিত 'যখন ছাপাখানা এলো' (১৯৭৭), অতুল সুর রচিত 'বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর' (১৩৮৫) ইত্যাদি। সাময়িকপত্রাদিতে আলোচনা করেছেন সুকুমার সেন, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল সরকার প্রভৃতি। এ ছাড়াও বাংলা মুদ্রণের দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৭৮-৭৯ সালে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনা, প্রবন্ধ-সংকলন, বেতার-কথিকা, আলোচনাসভা, প্রদর্শনী প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এবিষয়ে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন ১৯৮১ সালে প্রকাশিত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন'। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ Graham Shaw রচিত *Printing in Calcutta to 1800* (১৯৮১)। এ সবই বাংলা মুদ্রণ প্রসঙ্গে ক্রমবর্ধমান জনচেতনার সাক্ষ্য বহন করে। মুদ্রণ-প্রেমী বাঙালীমাত্রই এতে পরম আনন্দিত।

জন্মলগ্নের পর থেকে বাংলা মুদ্রণের রূপ ও শক্তি বিবর্তনের ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই বিবর্তনের সঠিক মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় বাংলা মুদ্রণের জন্ম ও বিকাশের মূল সূত্রগুলিকে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ কথা স্মরণ রেখে, ঐতিহাসিক বিবর্তনের অমোঘ সূত্রানুসারে বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাসকে আমি কয়েকটি যুক্তিগ্রাহ্য যুগ ও পর্বে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছি। যেমন :

১. বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদিযুগ : ১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দ।
   এর আবার পর্ব-বিভাগ করা চলে এইভাবে :
   - ক. প্রস্তুতি পর্ব : ১৬৬৭-১৭৭৭
   - খ. সূচনা পর্ব : ১৭৭৮-১৭৯৯
   - গ. বিকাশ পর্ব : ১৮০০-১৮১৬
   - ঘ. বিস্তার পর্ব : ১৮১৭-১৮৩৪

২. আদিযুগের পর, বাংলা মুদ্রণের মধ্যযুগ বা প্রাগাধুনিক যুগ :
   ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ।

৩. এর পরই বাংলা মুদ্রণের আধুনিক যুগের সূত্রপাত : ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে।

এই যুগ ও পর্ব -বিভাগ মূলত ঘটনাকেন্দ্রিক।

বর্তমান নিবন্ধের মূল উপজীব্য বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাসের প্রথম পর্যায়, অর্থাৎ এর আদিযুগ। স্বভাবত প্রথমেই সেই আদিযুগের সংজ্ঞা ও তার কালপরিধি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। আদিযুগ বলার তাৎপর্যই বা কী ও সেই যুগের যে সীমারেখা নির্দিষ্ট করা গেছে তার যৌক্তিকতাই বা কী তাও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ধাতু নির্মিত সঞ্চালনযোগ্য বাংলা হরফে (Bengali movable metal type) ছাপা প্রথম বই প্রকাশের মধ্য দিয়েই নিঃসন্দেহে বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাসের সূত্রপাত। সে আজ থেকে দু'শো বছরেরও আগের কথা— ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হালহেডের ব্যাকরণে প্রথম বাংলা মুদ্রণের সূচনা।

তারপর থেকে শুরু হয়েছে বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসের বিবর্তন। এই বিবর্তনের প্রথম পর্যায়কে আমি আখ্যা দিয়েছি 'আদিযুগ'। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এর সীমানা বিস্তৃত বলে নির্দিষ্ট করা গেছে। এই যুগের শেষে পৌঁছে লক্ষ্য করা যায় আদিযুগের হস্তাক্ষরের ধাঁচে কাটা বাংলা হরফগুলি তখন লুপ্ত হয়েছে, ছাপাখানার প্রয়োজনে বাংলা হরফ ও অলংকরণের জন্য নানাবিধ ব্লকের (decorative/design blocks) স্বতন্ত্র বাজার তখন গড়ে উঠেছে, মুষ্টিমেয় মুদ্রাযন্ত্রের সীমিত গণ্ডী পেরিয়ে বাঙালী গ্রন্থকার তখন স্বাধীনভাবে নিজ প্রয়োজন বা সামর্থ্য অনুযায়ী ছাপাখানা নির্বাচন করে নিতে পারছেন অর্থাৎ বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের সুযোগ তখন লেখক-প্রকাশকের কাছে সহজলভ্য হয়ে এসেছে, বাংলা মুদ্রণের ব্যয় কমেছে, সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে অর্থাৎ মুদ্রণের গতি বেড়েছে, বাংলা মুদ্রণ কলা-কৌশল উন্নত হয়েছে, amateurism-এর পর্ব অতিক্রম করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন শিল্প তখন দৃঢ়মূল স্থিতিলাভ করেছে ও সঙ্গে সঙ্গে নতুন যুগের চিন্তা-ভাবনার স্পর্শে বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের বিষয়বস্তুর পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। সাময়িক পত্র, বিশেষ করে বাংলা সংবাদপত্র প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে তখন সাধারণ মানুষ মুদ্রণ জগতের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। তা ছাড়া বাংলা মুদ্রিত সাহিত্যে মানবতাবোধের জয়ধ্বনিও তখন ক্রমশ সোচ্চার হতে শুরু করেছে। সুতরাং বিবর্তনের এই পর্যায়ে পৌঁছে অগ্রগতির ঐ সব লক্ষণ বিচার করে ধরে নেওয়া গেছে বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদিযুগের তখন পরিসমাপ্তি ঘটেছে। শুরু হয়েছে পরবর্তী যুগ।

তবে বিশেষ করে ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে কেন আদিযুগের সীমারেখা টানা হয়েছে তার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এ কথা স্বীকার্য, ঐতিহাসিক বিবর্তনধারায় কোনো একটি বিশেষ বছরকে চিহ্নিত করে এক যুগ থেকে অপর যুগের মধ্যে জলরোধক (water-tight) সীমারেখা টানা সবসময় সম্ভব বা সার্থক হয় না। একটির সঙ্গে অপরটির কিছু কিছু সম্পর্ক থেকেই যায়। তবে ইতিহাসের চলমান স্রোতের এক-একটি সন্ধিক্ষণে মাঝে মাঝে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যার ফলে প্রচলিত ধারার সমাপ্তি ঘটে বা ইতিহাসের নতুন যুগের নতুন পথ-পরিক্রমা শুরু হয়। সুতরাং বহুলাংশে এই যুগ-বিভাগ ঘটনা-কেন্দ্রিক। ঐ ঘটনাগুলিকেই আমরা পর্যায়ের বা যুগান্তরের সীমারেখা হিসাবে চিহ্নিত করি। বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদিযুগের সমাপ্তি-রেখাটিও আমি এইভাবে টেনেছি একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ঘটনাটি উইলিয়ম কেরীর মৃত্যু— ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই একটি যুগের সমাপ্তি— বাংলা মুদ্রণের আদিযুগের সমাপ্তি। কেরী ছিলেন ঐ যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী গতিশীল ব্যক্তিত্ব (dynamic personality)। ঐ সময়ে তাঁর মতো এমন কোনো একক ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না যিনি একাদিক্রমে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে (১৭৯৩ থেকে ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত) ঐ যুগের বাংলা মুদ্রণের বিকাশের ধারায় প্রধানতম শক্তি হিসাবে কাজ করেছেন। উইলিয়ম কেরীকে কেন্দ্র করেই যেন একটা যুগ গড়ে উঠেছে, একাধিক প্রতিষ্ঠান কাজ করেছে, বহু শিল্পী-কর্মী-লেখক অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এ কথা

সত্য, ঐ যুগে মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়েছেন আরো অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, যাঁদের অবদানে বাংলা মুদ্রণের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সেদিনের কর্মযজ্ঞের ঐকতানে গানের মূল ধুয়া গেয়েছেন উইলিয়ম কেরী। তিনি যেন বাংলা মুদ্রণের আদিযুগের প্রতীক। তাঁর মৃত্যুতে তাই একটি যুগের পরিসমাপ্তি। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দকে তাই আমি বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদিযুগের প্রান্ত সীমা হিসাবে চিহ্নিত করেছি।

১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ৫৭ বছর কালসীমায় বাংলা মুদ্রণের আদিযুগের ইতিহাস বিবর্তিত হয়েছে। তবে 'আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো'। তাই বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের জয়যাত্রা শুরু হবার পূর্বে তার প্রস্তুতির ইতিহাস রয়ে গেছে। সেই ইতিহাস আমি আলোচনা করেছি 'প্রস্তুতি' পর্বে।

কিন্তু 'প্রস্তুতি'-র পূর্বেও 'পূর্বাভাস'। 'পূর্বাভাস : প্রথম অধ্যায়ে' আমি আলোচনা করেছি ভারতে মুদ্রণশিল্প প্রবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বা ভারতীয় মুদ্রণের আদিযুগ। সেই যুগের ইতিহাসের সামগ্রিক পটভূমিতে আমি বাংলা মুদ্রণশিল্পের আদিযুগের পর্যালোচনা করতে চেয়েছি। ভারতের মাটিতে মুদ্রণশিল্পের প্রথম আবির্ভাব ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে —গোয়ায়। কিন্তু সেখানে প্রথম বইটি ছাপা হয় পর্তুগীজ ভাষায় রোমান অক্ষরে। সত্যিকারের ভারতীয় মুদ্রণের সূত্রপাত ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে। ঐ বছরেই সর্বপ্রথম ভারতের বুকে একটি ভারতীয় ভাষায়, অর্থাৎ কুইলনে তামিল ভাষায় প্রথম বই ছাপা হয়। সে তুলনায় বাংলা মুদ্রণের আবির্ভাব ঘটেছে আরো অনেক পরে, ঠিক দু'শো বছর পরে। বাংলা মুদ্রণের এই বিলম্বিত আবির্ভাবের তাৎপর্য আমি ব্যাখ্যা করেছি— 'পূর্বাভাস : দ্বিতীয় অধ্যায়ে'।

বাংলা মুদ্রণের 'প্রস্তুতি' পর্বের সূত্রপাত ধরা গেছে ১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দে। ঐ বছর আমস্টারডাম থেকে প্রকাশিত 'চায়না ইলাস্ট্রাটা' নামক গ্রন্থে বাংলা অক্ষরের প্রাচীনতম মুদ্রিত প্রতিলিপি পাওয়া যায়। ১৬৬৭ থেকে শুরু করে ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত এইরূপ কয়েকটি অ-বাংলাভাষী বইয়ে বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। ১১১ বৎসর ব্যাপী এই সময়কালকে আমি বাংলা মুদ্রণের 'প্রস্তুতি' পর্ব আখ্যা দিয়েছি। এই পর্বের প্রথম অধ্যায়ে বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপির যে দুর্লভ নিদর্শনগুলির সন্ধান করা গেছে আলোকচিত্র-সহ তার বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই মুদ্রিত প্রতিলিপির সবগুলিই ব্লকে ছাপা, বাংলা সঞ্চালনযোগ্য হরফের সূত্রপাত তখনো হয়নি। তাই এই পর্বকে (১৬৬৭-১৭৭৭) আমি বাংলা ব্লক-মুদ্রণের যুগ (Age of Block Printing) বা আধুনিক বাংলা মুদ্রণের প্রস্তুতি পর্ব বলে অভিহিত করেছি।

প্রস্তুতি পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলা মুদ্রণে পর্তুগীজ প্রভাবের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রভাবে মুদ্রিত গ্রন্থে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সূত্রপাত হয়। দেখা গেছে

অষ্টাদশ শতকে প্রকাশিত কিছু বইয়ে প্রথম বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হতে শুরু করে, কিন্তু সেই বাংলা ছিল রোমান হরফে মুদ্রিত। সঞ্চালনযোগ্য বাংলা হরফের উদ্ভব তখনো হয়নি।

লক্ষ্য করা গেছে, এর পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত বইগুলিতে কেবল প্রসঙ্গক্রমে বাংলা বর্ণমালার নমুনাই ছাপা হয়েছিল, কিন্তু মূল বইয়ের ভাষা ছিল ভিন্ন। অপরপক্ষে, বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত বইগুলিতে গ্রন্থকারের বক্তব্যের বাহন হয়েছিল বাংলা ভাষা কিন্তু মুদ্রাক্ষর ছিল ভিন্ন। তাই বলা যায় পরবর্তী বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ঐতিহাসিক পর্ব গড়ে তোলার কাজে এও এক ধরনের প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতিপর্বে মূল অবদান পর্তুগীজদের। তাঁরাই প্রথম রোমান অক্ষরে মুদ্রিত বাংলা বই প্রকাশের পথ দেখালেন।

এর পরেই বাংলা সঞ্চালনযোগ্য মুদ্রাক্ষরের সূত্রপাত ও সঙ্গে সঙ্গে বাংলা মুদ্রিতগ্রন্থের আদিযুগের সূচনা। আগেই বলেছি, বাংলা মুদ্রণশিল্পের বিবর্তনের ধারা ও তার আদিযুগের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের সূত্রগুলিকে অনুধাবন করার চেষ্টায় আমি বক্ষ্যমান 'আদিযুগকে' আরো তিনটি পর্বে বিভক্ত করেছি : 'সূচনা' পর্ব (১৭৭৮-১৭৯৯), 'বিকাশ' পর্ব (১৮০০-১৮১৬) ও 'বিস্তার' পর্ব (১৮১৭-১৮৩৪)।

কোনো দেশ বা জাতির ইতিহাসের গতি, বিশেষ করে তার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারাকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইতিহাসের এক-একটি সন্ধিক্ষণে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি, বা কোনো নবঘোষিত সরকারী নীতি, বা কোনো জাতীয় আদর্শ, চিন্তা বা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এক-একটি যুগ বা পর্ব গড়ে ওঠে— প্রচলিত অভ্যাস বা ভাবাদর্শ তখন নতুন পথে মোড় নেয়। বাংলা মুদ্রণের ইতিহাস এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে এর মুদ্রণের ইতিহাস অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। একের অপরের উপরে অবশ্যম্ভাবী প্রভাব লক্ষণীয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আমি বাংলা মুদ্রণের আদিযুগকে পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করেছি।

ঐতিহাসিক বিবর্তনের অমোঘ সূত্রানুসারেই আদিযুগের পূর্বোক্ত বিভিন্ন পর্ব-বিভাগ করা সম্ভব হয়েছে। সমসাময়িক জাতীয় ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি বিচার, নানা তথ্য ও ঘটনার বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাবের তাৎপর্য বিচার করে আমি বাংলা মুদ্রণের আদি ইতিহাসের পূর্বোক্ত যুক্তিগ্রাহ্য পর্ব-বিভাগ করতে সমর্থ হয়েছি। আগেই উল্লেখ করেছি, এই পর্ব-বিভাগ মূলত ঘটনা-কেন্দ্রিক। ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারায় মাঝে মাঝে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটতে দেখা যায় যার ফলে প্রচলিত ধারাটি যেন হঠাৎ, সময়-বিশেষে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত বা আবর্তিত হয়ে ওঠে, ধাক্কা খেয়ে নতুন পথে মোড় নেয়। প্রচলিত ইতিহাসের তখন নতুন চেহারা, নতুন চরিত্র। অন্য কথায়, নতুন পর্ব। সুতরাং ঐ পর্ব-বিভাগ ঘটনা-কেন্দ্রিক। ঐ ঘটনাগুলিকেই আমরা পর্বান্তরের সীমারেখা হিসাবে চিহ্নিত করি। বাংলা মুদ্রণের আদিযুগের 'সূচনা' হয়েছে যে যুগান্তকারী ঘটনার মধ্য দিয়ে তা হল ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে হালহেডের ব্যাকরণ প্রকাশ। বাংলা মুদ্রণের আদিযুগের

'সূচনা' পর্বের পরিসমাপ্তি ও 'বিকাশ' পর্বের সূচনার সন্ধিক্ষণেও অনুরূপ ছুটি যুগান্তকারী ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। ঘটনা ছুটি উল্লেখযোগ্য ছুটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম। একটি শ্রীরামপুর মিশন, অপরটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। ছুটিই ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এবং এদের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই 'বিকাশ' পর্বের সূচনা। মূলত এই ছুটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ, উৎসাহ, প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই বাংলা মুদ্রণের প্রায় অকর্ষিত শুষ্ক খাতে প্রথম জোয়ার আসে এবং এরই ফলশ্রুতি হিসাবে আমাদের মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডার বিকশিত লাবণ্যে নিত্য নতুন ফসলে ভরে ওঠে। বিকাশ পর্বে বাংলা মুদ্রণের এই দ্বিমুখী ধারার সঙ্গে তৃতীয় আরেকটি ধারা যুক্ত হয়ে ব্যবসায়-ভিত্তিক ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ছাপাখানাকে আশ্রয় করে বাংলা মুদ্রণের বিকাশের পথকে সুগম করে তুলেছিল। বিকাশ পর্বের উপসংহারে রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় ঘটে এবং তার প্রভাবে বাংলা মুদ্রণে পর্বান্তরের সূচনা ঘটতে থাকে। ঐ সময়ে 'বিকাশ' পর্বের শেষ সীমা চিহ্নিত করা হয়েছে ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে, কারণ তারপরেই ছুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা— ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা এবং ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে লর্ড হেস্টিংস কর্তৃক সংবাদ পত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠোরতা হ্রাস ও প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশনার সূত্রপাত— এর মধ্য দিয়েই বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে আর এক নতুন পর্বের সূচনা হয়। এই নতুন পর্ব অজস্র মুদ্রিত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার দানে ভরে ওঠে এবং বাংলা মুদ্রণজগৎ এক নতুন উজ্জ্বল দিগন্তের পথে প্রসারিত হয়। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই যে নতুন পর্বের সূচনা তাকে আমি তাই 'বিস্তার' পর্ব আখ্যা দিয়েছি এবং এই নব পর্ব-সূচনার প্রাকমুহূর্ত পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের শেষ পর্যন্ত আমি পূর্বোক্ত 'বিকাশ' পর্বের প্রান্তসীমানা নির্দিষ্ট করেছি। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে যে 'বিস্তার' পর্বের শুরু, ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়ম কেরীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই পর্ব তথা সমগ্র আদিযুগের পরিসমাপ্তি।

প্রসঙ্গত আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য। বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদিযুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনেই, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্বার্থে, বাংলা মুদ্রণের সূচনা— ধর্মপ্রচারের প্রেরণায় এর জন্ম নয়। অন্যান্য প্রচলিত মুদ্রণধারা থেকে এখানেই বাংলা মুদ্রণের ব্যতিক্রম ও বৈশিষ্ট্য। ধর্মপ্রচারার্থে বাংলা মুদ্রণের বিকাশ শুরু হয়েছে পরবর্তী পর্বে— উনবিংশ শতাব্দীর চৌহদ্দিতে পৌঁছে। আরো লক্ষণীয়, বাংলা মুদ্রণের 'সূচনা' পর্বে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন বিদেশীরাই। গ্রন্থরচয়িতা, মুদ্রাকর বা মুদ্রণ-উদ্যোক্তা সবাই বিদেশী। উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম, একমাত্র বাঙালী মুদ্রণ-শিল্পী পঞ্চানন কর্মকার। তবে উইলিয়ম কেরীর প্রত্যক্ষ প্রভাব তখনো শুরু হয়নি। ইংরেজ রাজপুরুষ ও কিছু মুদ্রণ-ব্যবসায়ীই তখন সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। বাংলাদেশের মাটিতে কেরী তখন পদার্পণ করেছেন, কিন্তু ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুর পর্ব শুরু হবার পূর্বে সাত বছর ধরে কেরীকে বাংলা মুদ্রণের উপকরণ সন্ধানে অশান্ত পদচারণায় রত

দেখা যায়। 'বিকাশ' পর্বে পৌঁছেও বাংলা মুদ্রণ-প্রয়াসে বিদেশী প্রাধান্য বজায় থেকেছে। তবে উল্লেখ্য, এই পর্বে এসে বিদেশী প্রভাব ও শক্তির সঙ্গে দেশীয় প্রতিভা ও ঐতিহ্য সম্মিলিত হয়েছিল। ফলত বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির চেহারা ও চরিত্রের যেমন মৌল পরিবর্তনের রূপটি ধরা পড়ে, পর্বান্তরের নানা লক্ষণও তেমনি সেখানে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শেষ পর্ব অর্থাৎ 'বিস্তার' পর্বে পৌঁছে প্রথম বাংলা মুদ্রণে বাঙালীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ঐ সময় দেশীয় মালিকানায় বাংলা ভাষার ছাপাখানা যেমন বিস্তার লাভ করে, বাঙালী গ্রন্থকার-সম্পাদক, মুদ্রাকর-প্রকাশক, মুদ্রণশিল্পী ও ব্যবসায়ীদের প্রচেষ্টায় বিস্তার পর্বের সামগ্রিক মুদ্রণ-প্রকাশন ধারাও প্রভাবিত হতে দেখা যায়। তবে কতিপয় বাংলা-ভাষাভিজ্ঞ বিদ্যোৎসাহী বিদেশী, বিশেষ করে মিশনারীদের প্রভাব তখনো অক্ষুণ্ণ ছিল।

এই প্রসঙ্গে সমকালীন সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির কথাও আমি বিশেষভাবে আলোচনা করেছি। কারণ তার উপরে তৎকালীন বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের গতি অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল। হেষ্টিংসের সাংস্কৃতিক কর্মনীতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারী মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণ-বিধি বা সরকারের সঙ্গে মিশনারীদের ঘনিষ্ঠতা ও বৈরিতার প্রসঙ্গগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদিযুগের ইতিবৃত্ত রচনায় সর্বদাই আমি যেমন নতুন নতুন তথ্যানুসন্ধানে প্রয়াসী হয়েছি, তেমনি ঐ সকল নবাবিষ্কৃত বা পূর্ব প্রচলিত তথ্য ও ঘটনাবলীকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক বিবর্তনের মূলসূত্র ও তার পটভূমি ও তাৎপর্যকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। এই সঙ্গে অনালোচিত বা স্বল্পালোচিত বহু প্রসঙ্গও বিস্তারিত তথ্যের আলোকে পর্যালোচনা করেছি। বিভিন্ন পর্বের তথ্য ও ঘটনার বিবৃতি, গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সূচী, মুদ্রাযন্ত্র ও প্রকাশন সংস্থার বিবরণ ইত্যাদি যেমন আলোচ্য ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, তেমনি এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ঐ সকল বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত তথ্যাবলীকে আমি এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা করেছি। মূল কথা, বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদিযুগের একটি অখণ্ড সামগ্রিক পরিচয় আমি এখানে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি।

এই পরিচয় দানের স্বার্থে এবং আমার বক্তব্য বিষয়ের সমর্থনে ঐ যুগের বাংলা মুদ্রণের দুর্লভ নিদর্শনের কতকগুলি প্রতিলিপি (photostat copy) এখানে সংযোজিত করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই প্রতিলিপিগুলি বাংলা মুদ্রণের বিবর্তন ধারাটি অনুধাবন করার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

বাংলা মুদ্রণের আদিযুগের সামগ্রিক পরিচয়, অর্থাৎ এর প্রস্তুতি পর্ব থেকে শুরু করে বিস্তার পর্বের প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ১৬৮ বছরের ইতিহাস (১৬৬৭-১৮৩৫) বক্ষ্যমান বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস-এর প্রথম খণ্ডে বিধৃত হল। ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়, অর্থাৎ এর মধ্য বা প্রাগাধুনিক যুগ ও আধুনিক যুগের ইতিবৃত্ত বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস-এর

প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনার ইচ্ছা রইল। এই পর্যায়ের সূত্রপাত ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে। ঐ বছর স্যার চার্লস মেটকাফ কর্তৃক সংবাদপত্র ও মুদ্রণের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে যে নতুন যুগের সূচনা তাকে বাংলা মুদ্রণের মধ্যযুগ বা প্রাগাধুনিক যুগ হিসাবে আখ্যাত করা যায়। এই সময়ে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনে আধুনিকত্বের লক্ষণগুলি ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে থাকে। মুদ্রণ-প্রকাশন প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর ছিলেন এই যুগের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। এই প্রাগাধুনিক যুগের একশো বছর শেষ হয়েছে বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে আরেকটি যুগান্তকারী ঘটনার মধ্য দিয়ে। ঘটনাটি হল বাংলায় লাইনোটাইপের প্রবর্তন— ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে। সমসাময়িককালে বাংলায় মনোটাইপেরও সূত্রপাত হয়েছে। ফলে বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে শুরু হয় আর এক নতুন যুগ, যাকে বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আধুনিক যুগ হিসাবে আখ্যাত করা যায়। সেদিনকার ঐ যুগান্তকারী ঘটনাগুলির মূল কথা ছিল— মুদ্রণের সুবিধার্থে বাংলা অক্ষরের সংস্কারসাধন, বাংলা হরফ তৈরির কাজে যান্ত্রিকতার প্রয়োগ ও সর্বোপরি বাংলা মুদ্রণে প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চার। ১৯৩৫-পরবর্তী এই আধুনিক যুগে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে।

এই অগ্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের নানাবিধ সমস্যার কথাও জড়িয়ে রয়েছে। বিভিন্ন কাজের উপযোগী শিল্পসুষমামণ্ডিত নতুন নতুন ফেসের বাংলা হরফ যথেষ্ট তৈরি হচ্ছে কিনা, বিষয় বৈচিত্র্য ও গভীরতায় বাংলা প্রকাশনা আধুনিক বিদ্যাচর্চা এবং উচ্চতর চিন্তা ও গবেষণার উপযোগী হতে পারছে কিনা এবং সর্বভারতীয় প্রকাশনার ক্ষেত্রে মান ও সংখ্যার বিচারে বাংলা বইয়ের যে স্থান তা উৎসাহব্যঞ্জক কিনা, ইত্যাদি নানা বিষয়ে আরো চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। সেই চিন্তার আলোকে বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড, অর্থাৎ এর মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনা অচিরে সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা রইল।

পূর্বাভাস

প্রথম অধ্যায়

ভারতে মুদ্রণশিল্পের প্রবর্তন ও আদিযুগ

বাংলা মুদ্রণশিল্পের জন্মরহস্য ও তাৎপর্য, তার ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবর্তনের ধারা এবং তার আদিযুগের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের সূত্রগুলি অনুধাবন করার আগে ভারতীয় মুদ্রণের আদিযুগের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে নেওয়া প্রয়োজন। ভারতে মুদ্রণ প্রবর্তনের ইতিহাসের সামগ্রিক পটভূমিতে বাংলা মুদ্রণশিল্পের আদিযুগের পর্যালোচনা করা অধিকতর সমীচীন হবে।

ভারতবর্ষে মুদ্রণশিল্পের প্রথম আবির্ভাব গোয়ায়, ৬ই সেপ্টেম্বর ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে। এই যুগান্তকারী ইতিহাসের সূত্রপাত হয়েছিল নিছক একটি ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগে। তখনকার যুগে ধর্মপ্রচারের সুবিধার্থে ইউরোপ থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে মুদ্রণযন্ত্র পাঠানো হত। এইভাবেই একদিন, ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে, পর্তুগাল থেকে আবিসিনিয়ার পথে যাত্রা করেছিল একটি জাহাজ; তাতে ছিলেন আবিসিনিয়ার রোমান্ ক্যাথলিক চার্চের প্রধান বিশপ (Patriarch) ও আরো কয়েকজন জেসুইট ধর্মযাজক, সঙ্গে একটি মুদ্রণযন্ত্র ও জনাকয়েক ছাপার কাজে দক্ষ কারিগর। (৩০শে এপ্রিল ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে Fr. Gaspar Calaza কর্তৃক St. Ignatius-কে লিখিত একটি চিঠি থেকে এই তথ্যটি জানা যায়।)[১] উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আবিসিনিয়া যাওয়ার পথে ভারতের উপকূলে গোয়ায় এসে জাহাজটি সাময়িক বিশ্রামের জন্য থামে। কিন্তু তারপরে নানা কারণে, সম্ভবত আবিসিনিয়ার সম্রাটের সঙ্গে ওখানকার মিশনারীদের সম্পর্কের অবনতি ঘটায়, Patriarch ও তাঁর সঙ্গী জেসুইট ধর্মযাজকের দল ও অন্যেরা আবিসিনিয়ার পথে আর অগ্রসর হননি এবং ঐ মুদ্রণযন্ত্রটিকে জাহাজ থেকে নামিয়ে পাকাপাকিভাবে গোয়াতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ভারতের মাটিতে এটিই প্রথম মুদ্রণযন্ত্র এবং এখান থেকেই ভারতে মুদ্রণের সূত্রপাত। এর প্রধান উদ্যোগী ছিলেন পর্তুগীজ জেসুইট ধর্মযাজক সম্প্রদায়। গোয়া ছিল তাঁদের একটি বড়ো ঘাঁটি।

অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে যাওয়া এই মুদ্রণযন্ত্রটিকে কেন্দ্র করেই গোয়ার জেসুইট ধর্মযাজকগণ অত্যুৎসাহে ছাপার কাজে লেগে যান। ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে ছাপা হয় তাঁদের

---

১ Fr. C. G. Rodeles, 'Early Jesuit Printing in India' : *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, April, 1913, pp. 151-55.

প্রথম বই '*Conclusœs*'। পর্তুগীজ ভাষায় রচিত ও রোমান অক্ষরে মুদ্রিত গোয়ার এই বইটিই ভারতের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।[১] দুঃখের বিষয়, গোয়ার এই প্রথম বইটির সন্ধান আজ আর কোথাও পাওয়া যায় না। জন দ্য বুস্টামান্টে (João de Bustamante) ছিলেন বইটির মুদ্রাকর। স্পেনদেশীয় এই মুদ্রাকর-ধর্মযাজক পূর্বোক্ত পর্তুগাল জাহাজটি থেকে মুদ্রণ-যন্ত্রটির সঙ্গেই গোয়ায় প্রথম পদার্পণ করেছিলেন। তিনি আরো তিনটি বই ছাপেন। ১৫৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর ছাপা দ্বিতীয় বই— St. Francis Xavier -রচিত '*Doutrina Christã*' ; এটিও পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত। এই বইটিও এখন আর কোথাও পাওয়া যায় না। বুস্টামান্টেকে ভারতে মুদ্রণশিল্পের প্রথম প্রবর্তক বলা চলে। সমসাময়িক-কালে গোয়ায় আরো কয়েকজন মুদ্রাকরের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে গোয়া থেকে প্রকাশিত হয় Gasper de Leão-রচিত গ্রন্থ '*Compendio Spiritual da Vida Christõa*' ; খ্রীস্টান ধর্মজীবনের সারাংশ সংবলিত এই বইটি Archbishop's Goa Press থেকে মুদ্রিত। এর মুদ্রাকর ছিলেন জন কুইনকোয়েন্সিও (João Quinquencio) ও জন দ্য এনডেম্ (João de Endem)। New York Public Library-তে ছোটো আকারের মোটা বারোপেজি (Small fat duodecimo) এই বইটির একটি কপি আছে।[২] উল্লেখযোগ্য এইটিই ভারতে মুদ্রিত প্রাচীনতম গ্রন্থ যার সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে। ১৫৬৩ খ্রীস্টাব্দে গোয়া থেকে আরেকটি বই প্রকাশিত হয় : Garcia da Orta-রচিত '*Coloquios dos simples e drogas*'— ভারতের ঔষধ ও তার গাছগাছড়া সম্বন্ধে আলোচনা ; জন দ্য এনডেম্ ছিলেন এর মুদ্রাকর। ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে এর একটি কপি রক্ষিত আছে।

গোয়ায় প্রথম মুদ্রণ প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পর্তুগাল থেকে আগত পূর্বোক্ত জাহাজটিতে একজন ভারতীয়ও ছিলেন ; তিনি পর্তুগালে মুদ্রণশিল্পে প্রশিক্ষণ অর্জন করেন এবং বুস্টামান্টেকে ছাপার কাজে সহায়তা করার জন্য তাঁকে পাঠানো হয়। গোয়ায় বুস্টামান্টের ছাপার কাজে প্রধান সহায়ক ছিলেন মুদ্রণশিল্পে দক্ষ এই ভারতীয়টি। কিন্তু দুঃখের বিষয় জেসুইট লেখকগণ তাঁকে একজন দক্ষ মুদ্রাকর বা 'able printer' (Habil Impressor) হিসাবে বর্ণনা করলেও, কোথাও তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি। হয়ত আশঙ্কা ছিল তাঁর পরিচয় বুস্টামান্টের কৃতিত্বকে ম্লান করে দিতে পারে। ফলে ভারতীয় মুদ্রণশিল্পের প্রথম প্রবর্তক হিসাবে একজন বিদেশীর সঙ্গে যে-ভারতীয়টিরও নাম উল্লিখিত

১ লক্ষণীয়, জার্মানীতে জোয়ান গুটেনবার্গ কর্তৃক ১৪৫৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 42-line *Bible* গ্রন্থে প্রথম সঞ্চালনযোগ্য ধাতব হরফে মুদ্রণ প্রবর্তনের ঠিক একশো বছর পরে ভারতে মুদ্রণের সূত্রপাত। পরবর্তী অনুসন্ধানে অবশ্য জানা যায়, মুদ্রণের সূত্রপাত চীনে। সেখানে এক পর্বত গুহায় আবিষ্কৃত হয়েছে, ৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে কাঠের ব্লক দিয়ে ছাপা প্রথম বই ডায়মণ্ড বা হীরক সূত্র। দাবি করা হয়, সঞ্চালনযোগ্য হরফের ব্যবহারও প্রথম শুরু হয় চীনে। খ্রীস্টীয় একাদশ শতকের মাঝামাঝি পোড়া মাটি দিয়ে তৈরি ঐ হরফ মুদ্রণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

২ K. S. Diehl রচিত প্রবন্ধ : *Statesman*, Calcutta, 20th July, 1968.

হওয়া উচিত, সেই ভারতীয় শিল্পীর পরিচয় আমাদের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল। জাহাজে আসার সময় তাঁর বর্ণনা প্রসঙ্গে আবিসিনিয়ার Patriarch ৬ই নভেম্বর ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে গোয়া থেকে একটি চিঠিতে লেখেন যে ঐ ভারতীয়টি ছিলেন ব্যবহারে ভদ্র এবং মাঝে মাঝে পাপ স্বীকারের কাজে তিনি বিশেষ উৎসাহ বোধ করতেন; সমুদ্রযাত্রাকালে তিনি রান্নার কাজে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন এবং গোয়ায় ছাপাখানার কাজে তাঁর দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন :

'The Indian is well behaved and is fond of going for confessions often ; at sea he helped us a lot in the Kitchen and has proved here to be competent in press-work.'[১]

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ভারতীয় মুদ্রণের আদি পর্বের যে-সব বইয়ের কথা এতক্ষণ উল্লেখ করা হল তা সবই পর্তুগীজ ভাষায় রচিত ও গোয়ায় রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। এইসব বই ছাপার মূল উদ্দেশ্যই ছিল খ্রীস্টধর্মপ্রচার। কিন্তু এ কাজে ভারতীয় ভাষাকে ব্যবহার করলে যে অধিক কার্যকরী ফল পাওয়া যেতে পারে, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ তা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। ফলে তখন পর্যন্ত কোনো ভারতীয় বর্ণমালাকে মুদ্রণে ব্যবহারের চেষ্টা শুরু হয়নি। এইজন্যই ভারতে মুদ্রণের আদি প্রবর্তক হলেও ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণের ক্ষেত্রে গোয়া কোনো অগ্রণী ভূমিকা অর্জন করতে পারেনি। সারা ভারতে কোনো সুদূরপ্রসারী প্রভাবও বিস্তার করতে পারেনি। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই গোয়ার গৌরবময় ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। সেখানকার মুদ্রণকার্য ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে থাকে। আর ভারতীয় মুদ্রণের বিবর্তনের ধারাতেও মাঝে মাঝে ছেদ পড়তে দেখা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোয়ায় ভারতীয় মুদ্রণের সূত্রপাতের পূর্বেও যে ভারতে মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন ছিল এমন অভিমত কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এইরূপ অভিমতের সপক্ষে যে ধরনের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তথ্য-প্রমাণের সাহায্যে তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের 'নববার্ষিকী' পত্রিকায় 'মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র' নামক নিবন্ধে (পৃ ১৪৪) এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে :

'বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে যে মুদ্রাযন্ত্র ছিল তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালীন তিনি দেখিতে পান যে, বারাণসী জেলার একস্থলে মৃত্তিকার কিছু নীচে পশমের ন্যায় আঁশাল একরূপ পদার্থের একটি স্তর রহিয়াছে। মেজর রুবেক ইহার সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং সে স্থান খনন করিয়া একটি খিলান দেখিতে

১ Josephus Wicki, *'Documenta Indica'*, Vol. IV, Rome, 1956, p. 514 : A. K. Priolkar, *'The Printing Press in India, its beginnings and early developments'*, p. 7.

পান। পরিশেষে খিলানের অভ্যন্তরদেশে প্রবেশ করিয়া দর্শন করেন যে, তথায় একটি মুদ্রাযন্ত্র ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত হয়, সে সকল একালের নয়, অন্যূন এক সহস্র বৎসর এই অবস্থাতে রহিয়াছে।' ১২৮৪ সালের আশ্বিন মাসের বঙ্গদর্শনে ***Gentleman's Magazine*** থেকে বিনা প্রমাণে গৃহীত উপরোক্ত অদ্ভুত উক্তির জন্য 'নববার্ষিকী'র নামহীন সম্পাদককে যথেষ্ট উপহাস করা হয়েছে।[১]

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ***Asiatic Journal*** পত্রিকায় অনুরূপ আরেকটি ঘটনার কথা বিবৃত করা হয়েছে ; ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত '***The Good Old Days of Honorable John Company***' নামক গ্রন্থে ঘটনাটি পুনরুল্লিখিত হয়েছে। ভারতীয় মুদ্রণের প্রাচীনত্বের প্রমাণ এতে থাকলেও, পরবর্তীকালে সুস্পষ্ট তথ্য-প্রমাণাদির দ্বারা এর সত্যাসত্য যাচাই করা যায়নি। ঘটনাটির বর্ণনা এইভাবে দেওয়া হয়েছে :

'On the surrender of the fortress of Agra to the British Army, under the command of Lord Lake, in the year 1803, the magazines and vaults were pointed out by some of the old residents of the place, and the massive and iron bound doors were soon made to give way to the efforts of the soldiery, who very soon emptied them of every thing which was portable.

'In the evening of the day which saw this scene of confusion, Lieutenant Mathews of the Artillery went to view the interior of the fortress. Passing one of the vaults which had shortly before been plundered, he entered and the first object which attracted his eye was a machine which to him appeared to be a European mangle. On closer inspection, however, he discovered it to be a printing press, and what was the more extraordinary, having the types ready set for some oriental production.

'Major Yule of the Bengal Army, hearing of this, was anxious to know what the work was, which was most probably the very first that had been attempted to be printed in Hindustan, and that too under the auspices of the head of the empire. Means were at once attempted to pull a proof sheet of the form ; this was done under manifold disadvantages, and the sheet disclosed six pages of the Koran. The face of the type was excellent, and it is a pity that the press with its type were not preserved ; but the

১ সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস' (পরি. সং ১৩৮৯), পৃ ২৬।

ruthless soldiers pulled the whole machine to pieces and destroyed the types'.[১]

যাই হোক, এখন পর্যন্ত গোয়ার মুদ্রণ প্রচেষ্টাকেই ভারতের প্রাচীনতম প্রমাণসিদ্ধ নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

গোয়ায় মুদ্রণের সূত্রপাত হওয়ার পরেও দীর্ঘকাল কোনো ভারতীয় ভাষা ছাপার হরফে রূপায়িত হতে পারেনি। ভারতের বুকে কেবল পর্তুগীজ ভাষায় বই ছাপা চলেছিল। সত্যিকারের ভারতীয় মুদ্রণের সূত্রপাত ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে। অর্থাৎ এই বছরেই সর্বপ্রথম ভারতের বুকে একটি ভারতীয় ভাষায় বই ছাপা হয়। তামিল ভাষা এই নবযুগসৃষ্টির গৌরবের অধিকারী। ইতিপূর্বে উল্লিখিত St. Francis Xavier রচিত *Doutrina Christā* নামক পর্তুগীজ ভাষার যে বইটি ১৫৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, তারই তামিল অনুবাদ ('*Christya Vannakanam*') ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[২] এই বইটি ছাপার জন্য তামিল মুদ্রাক্ষরগুলি প্রথম তৈরি করেন জন গোন্‌সাল্‌ভেস্ (Joannes Gonsalves) নামে একজন জেসুইট সম্প্রদায়ের পাদ্রি, ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দে।[৩] ভারতীয় মুদ্রাক্ষর শিল্পের পথিকৃৎ হিসাবে ভারতীয় মুদ্রণের ইতিহাসে গোন্‌সাল্‌ভেসের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বুস্টামান্টের মতো গোন্‌সাল্‌ভেস্‌ও ছিলেন স্পেনদেশের অধিবাসী। পেশায় কর্মকার, ঘড়ি নির্মাণের কাজে ছিল তাঁর বিশেষ দক্ষতা। বুস্টামান্টের সঙ্গে একই জাহাজে তিনি গোয়ায় আসেন। সেখানেই তিনি ভারতীয় ভাষায় ধাতুনির্মিত ছাপার হরফ কাটার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[৪] পেরো লুইস (Pero Luis) নামক এক ব্রাহ্মণ খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হবার পর কুইলন থেকে গোয়ায় প্রেরিত হন। গোন্‌সাল্‌ভেস্‌কে তামিল অক্ষরে পরিচিত করানো ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই প্রচেষ্টার পরিণতিতেই তামিল মুদ্রাক্ষরের জন্ম।[৫]

---

১ W. H. Carey, '*The Good Old Days of Honorable John Company*', 1882. (Cal., Quins Book Co., 1964.)

২ A. K. Priolkar, '*The Printing Press in India, its beginnings and early developments*', p. 9.

৩ G. A. Grierson, '*Linguistic Survey of India*', Vol. IV, p. 301; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মানোএল-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ, প্রবেশক, পৃ. ৶০।

৪ জাতীয় গ্রন্থাগার প্রকাশিত '*Carey Exhibition of Early Printing and Fine Printing*' (Calcutta, 1955) নামক পুস্তিকায় উল্লেখ আছে, ত্রিচুরের নিকটবর্তী আম্বালাক্কাড়ুতে (Ambalakkadu) বসে ১৫৭৭ খ্রীঃ গোন্‌সাল্‌ভেস তাঁর তামিল অক্ষরগুলি তৈরি করেন।

W. H. Warren, 'Early Tamil Printing' (*Memoirs of the Madras Library Association*, 1941) নিবন্ধে এই একই তথ্য সমর্থিত হয়।

৫ Georg Schurhammer & G. W. Cottrell, 'The First Printing in Indic Characters', *Harvard Library Bulletin*, Vol. VI, No. 2, Spring 1952 : A. K. Priolkar, *op. cit*, pp. 10-11.

ষোল পৃষ্ঠার এই প্রথম মুদ্রিত তামিল বইটির একটি কপি (১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত) প্যারিসে Bibliotheque Nationale গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গোন্‌সাল্‌ভেস যে মুদ্রাক্ষরগুলি তৈরি করেন, তাকে Malabar-types বলে উল্লেখ করা হয়। তখনকার কালে মালয়ালাম ও তামিল— উভয় বর্ণমালাকেই সাধারণভাবে 'মালাবার' নামে অভিহিত করা হত। আলোচ্য বইটিকে পরবর্তীকালে পর্যালোচনা করে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে এটি তামিল অক্ষরেই ছাপা।

যুগান্তকারী এই প্রথম তামিল বইটি ছাপা হয়েছিল কুইলনে। তাই ভারতীয় মুদ্রণের জন্মস্থান হিসাবে কুইলন একটি বিশেষ মর্যাদার আসন দাবি করতে পারে।[১] Schurhammer ও Cottrell তাঁদের একটি নিবন্ধে[২] বলেছেন, ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে যে মুদ্রণযন্ত্রে প্রথম তামিল বইটি ছাপা হয়, তার পরের বছরেই সেটি কুইলন থেকে কোচিনে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দে *Doutrina Christā* অবলম্বনে ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত আর-একটি তামিল অনুবাদগ্রন্থ ছাপা হয়। ভিন্ন মতানুযায়ী, ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় ছাপাখানাটি তিনেভেলী (Tinnevelly) জেলার পুনিকাইল (Punikael) গ্রামে (কন্যাকুমারী থেকে ২০ মাইল দূরে) স্থাপিত হয়। Fr. John de Faria ছিলেন এর আবিষ্কর্তা ও নির্মাতা। ইনিই গোয়ার সেন্ট পল কলেজের স্থপতি ছিলেন।[৩]

ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতের পশ্চিম উপকূলে মুদ্রিত এইসব বইগুলিকেই সাধারণভাবে ভারতীয় 'Incunabulæ' বা শৈশবযুগের মুদ্রিত গ্রন্থ বলে অভিহিত করা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মোটামুটি ভারতীয় মুদ্রণের শৈশব যুগ, এবং তার কর্মক্ষেত্র ছিল পশ্চিম উপকূলেই।

এই সময়কালের মুদ্রণপ্রচেষ্টায় বোম্বাইয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক কিছু কিছু ঐতিহাসিক দলিল থেকে জানা যায় যে ভীমজী পারেখ নামক জনৈক গুজরাটী ব্যবসায়ী (Kapol Bania) উদ্যোগী হয়ে ১৬৭৪-৭৫ খ্রীস্টাব্দে একটি মুদ্রণযন্ত্র আমদানী করেন। ভীমজীর অনুরোধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঐ মুদ্রণযন্ত্রের সঙ্গে ছাপার অন্যান্য সরঞ্জামও পাঠিয়েছিল। লণ্ডন থেকে একজন মুদ্রাকরও এসেছিলেন। এর প্রমাণ স্বরূপ '*English Records on Shivagy*, Vol. I, Poona, 1931' (Doc. 450 -p. 327) নামক গ্রন্থে ৩রা এপ্রিল ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন থেকে সুরাটে লেখা একটি চিঠির উদ্ধৃতি পাওয়া যায় :

---

১ A. K. Priolkar, *op. cit*, p. 10.

২ G. Schurhammer & G. W. Cottrell, *op. cit.*, *Harvard Library Bulletin*, Vol. VI, No. 2, Spring 1952.

৩ Leo Proserpio, 'The First Printing Presses in India' : *The New Review*, Vol. II, July-Dec. 1935.

'We have also entertained Mr. Henry Hills a printer for our Island of Bombay at the salary of £ 50 per annum and ordered a printing press with letters and other necessaries as also a convenient quantity of paper to be sent along with him, as you will perceive per the Invoice all which is to be charged upon Bhimjee from whom you are to receive it.'[১] ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রেরিত ঐ মুদ্রাকর ছাপার কাজে দক্ষ হলেও ভীমজীর ইচ্ছানুযায়ী স্থানীয় ভাষায় ('Banyan script') মুদ্রাক্ষর নির্মাণে সমর্থ হয়নি। ফলে ভীমজীর অনুরোধে কোম্পানী ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে আর-একজন হরফ ঢালাইয়ের কাজে দক্ষ কারিগরকে প্রেরণ করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ভীমজীর ভারতীয় ভাষায় বই ছাপার প্রচেষ্টা কার্যকর হয়নি।

ভারতীয় মুদ্রণের ইতিহাসে পরবর্তী যে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি দেখা যায় তার জন্মকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে। শৈশবকাল অতিক্রান্ত হয়ে ভারতীয় মুদ্রণের তখন কৈশোর পর্বের সূচনা। এই পর্বের যবনিকা উত্তোলিত হলে দেখা যায়, ভারতীয় মুদ্রণ তখন ভারতের পশ্চিম উপকূল অতিক্রম করে পূর্ব উপকূলের প্রান্তসীমায় এসে পৌঁচেছে। রোমান ক্যাথলিক পর্তুগীজ জেসুইট মিশনারীদের প্রভাব তখন অস্তাচলে, প্রোটেস্টান্ট দিনেমার মিশনারীদের কার্যকলাপ তখন নব উদ্যমে শুরু হয়েছে ভারতীয় মুদ্রণের জয়যাত্রাকে আর-এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে। মাদ্রাজ প্রদেশের ত্রাঙ্কুইবারে (Tranquebar) যার সূচনা, বাংলাদেশের শ্রীরামপুরে এসে তার পরিণতি। অষ্টাদশ শতকে যার শুরু, ঊনবিংশ শতকে তার পরিণতি। পথপ্রদর্শক জিগেন্‌বাল্‌গ্‌ (Ziegenbalg) যার একপ্রান্তে, পরিচালক উইলিয়ম কেরী তার অপর প্রান্তে। ত্রাঙ্কুইবারের বিশপ যথার্থই বলেছিলেন: 'Without Ziegenbalg there could be no Carey; without Tranquebar no Serampore.'[২]

ভারতীয় মুদ্রণের আদি যুগের বিভিন্ন প্রচেষ্টার সন্ধান করতে গিয়ে লক্ষ্য করা গেছে যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদেশাগত মিশনারীদের ধর্মীয় প্রচারের প্রয়োজনে ও সুবিধার্থেই ছাপাখানাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং সাধারণ ভাবে বলা যায় মিশনারী প্রচারকার্যের পরোক্ষ ফল হিসাবেই এদেশে মুদ্রণের প্রচলন ও অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। গোয়ায় যেমন পর্তুগীজ মিশনের উদ্যোগে ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারের সূত্রপাত, ত্রাঙ্কুইবারে তেমনি দিনেমার মিশনারীদের আগমনে ভারতে প্রোটেস্টান্ট ধর্মপ্রচারের সূচনা। এই প্রোটেস্টান্ট মতাবলম্বীরাই শেষ পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রণকে উন্নতির একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সর্বাধিক সাহায্য করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতেই দিনেমার ধর্ম-

১ A. K. Priolkar, *op. cit.*, p. 30.

২ A. K. Priolkar, *op. cit.*, p. 50.

যাজক বারথোলেমিউ জিগেন্‌বাল্‌গ্‌ (Bartholemew Ziegenbalg) ভারতের পূর্ব উপকূলে ত্রাঙ্কুইবারে এসে উপস্থিত হন ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে প্রভুর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে স্থানীয় ভাষায় মুদ্রণের সর্বব্যাপী আয়োজন শুরু করে দেন। ১৭০৬ থেকে ১৭১৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জিগেন্‌বাল্‌গের বহুমুখী অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে *New Testament* তামিল ভাষায় অনূদিত হয়ে তাঁর নিজের হাতে তৈরি তামিল হরফের সাহায্যে মুদ্রিত ও প্রচারিত হতে পেরেছিল। এমন-কি এই উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের প্রথম কাগজ তৈরির কারখানাও স্থাপন করেছিলেন। ভারতীয় মুদ্রণের আদি যুগে অন্যতম বিশিষ্ট প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্ব হিসাবে জিগেন্‌বাল্‌গের নাম তাই চিরস্মরণীয়। ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে শুরু করে ১৭১১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি *New Testament*-এর তামিল অনুবাদ '*Biblia Damulica*' সম্পূর্ণ করেন। স্বভাবতই তাঁর পরবর্তী প্রচেষ্টা ছিল এটিকে মুদ্রিত করা। এই উদ্দেশ্যে জার্মানীর Halle থেকে তিনি এক সাট তামিল মুদ্রাক্ষর তৈরি করে আনান। কিন্তু আকারে অত্যন্ত বড়ো হওয়ায় তা সুষ্ঠু মুদ্রণের উপযোগী ছিল না। সুতরাং জিগেন্‌বাল্‌গ্‌ নিজের নিরলস প্রয়াসে এক সাট নতুন ছোটো আকারের তামিল হরফ তৈরি করে ফেলেন এবং তা দিয়েই ইংলণ্ডে সংস্থাপিত 'Society for Promoting Christian Knowledge'-এর সহযোগে সদ্য আমদানী করা (১৭১২ খ্রীস্টাব্দে) মুদ্রণযন্ত্রে তাঁর *New Testament*-এর তামিল অনুবাদটির মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয় ১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে। *Old Testament*-এর অনুবাদও তিনি সম্পূর্ণ করেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এর মুদ্রণ শেষ করা যায়নি।[১]

'*Propagation of the Gospel in the East* (3rd ed., London, 1718) নামক গ্রন্থে ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭১৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লেখা জিগেন্‌বাল্‌গের যে সমস্ত চিঠি সংকলিত হয়েছে তা থেকে তাঁর ভারতের পথে সমুদ্রযাত্রা, দিনেমার মিশনের কার্যকলাপ, ক্যাথলিকদের বিরোধিতা, সমসাময়িক ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষা এবং তাঁর মুদ্রণপ্রচেষ্টা প্রভৃতি বিষয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ১৪ই জুন, ১৭০৯ খ্রীস্টাব্দে একটি চিঠিতে জিগেন্‌বাল্‌গ্‌ লিখেছেন: 'Our present efforts are chiefly bent upon Translating the *New Testament* into Malabarick···A Malabarick and Portuguese Printing Press···would be highly serviceable for the whole design···'। আগেই বলা হয়েছে, ঐ সময়ে তামিল ভাষাকে সাধারণভাবে 'মালাবার' নামে উল্লেখ করা হত। তাঁর অন্যান্য চিঠি থেকে জানা যায়, এক শত রীম কাগজ সহ মুদ্রণযন্ত্রটি

---

১ W. H. Warren, 'Early Tamil Printing' : *Memoirs of the Madras Library Association*, 1941, pp. 39-43.

'*Carey Exhibition of Early Printing and Fine Printing*', Calcutta, National Library, 1955.

ভারতে পৌঁছয় ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে এবং ভারতস্থিত দিনেমার কোম্পানীর কর্মী এক জার্মান মুদ্রাকরের সহায়তায় এটি চালু করা হয়। প্রথমে পর্তুগীজ ভাষাতেই মুদ্রণ কাজ শুরু হয়। তামিল হরফ নির্মাণ ও মুদ্রণ তার পরবর্তী ধাপ। ত্রাঙ্কুইবারের প্রাচীনতম তামিল গ্রন্থ '*The Four Evangelists and the Acts of Apostles*' ১৭১৪ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এটি Ziegenbalg ও Grundler কর্তৃক অনূদিত। শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে এর এক খণ্ড রক্ষিত আছে। এটিই ঐ কলেজ লাইব্রেরির প্রাচীনতম ভারতীয় গ্রন্থ। এর পরেই মুদ্রিত হয় নিউ টেস্টামেন্টের তামিল অনুবাদ। (J. E. Grundler-এর চিঠি, ২৮শে আগস্ট, ১৭১৫ খ্রীস্টাব্দ : তদেব।) তামিল মুদ্রণের ধারা এর পর থেকেই অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলে।

জিগেন্‌বাল্‌গ্‌ তাঁর মুদ্রণপ্রচেষ্টাকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রসারিত করতে সচেতন ছিলেন। পরবর্তী যুগে তাঁর প্রভাবকে তাই অস্বীকারও করা চলে না। প্রসঙ্গত ৯ই জানুয়ারি ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে লিখিত Ziegenbalg ও Grundler-এর একটি চিঠির কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে : 'The Great Scarcity of Almanacks in this part of the world, moved us to print a sheet Almanack, which will not be vended on the coast of Coromondel but also on that of Malabar and in Bengall. By this means, we hope, our Printing Press, will come to be known to other Nations and Countries hereabouts.' (তদেব)[১]

ত্রাঙ্কুইবারের পর খাস মাদ্রাজ শহর ; একটি মজার ঘটনা এখানে মুদ্রণের গোড়াপত্তন করতে সাহায্য করে। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে Sir Eyre Coote ফরাসীদের কাছ থেকে পণ্ডিচেরী দখল করার পর সেখানকার রাজভবনে (Governor House) অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে কিছু মুদ্রাক্ষর সহ একটি মুদ্রণযন্ত্রও খুঁজে পান। দখল করা সম্পত্তি বা লুঠের মাল হিসাবে তিনি ওটিকেও মাদ্রাজে নিয়ে আসেন। কিন্তু সেখানে St. George দুর্গে কোনো মুদ্রাকর না থাকায় ওটি কাজে লাগান যায়নি। উপায়ান্তর না দেখে তখন তাঁরা মাদ্রাজের Vepery-তে বসবাসকারী বিখ্যাত তামিল পণ্ডিত Fabricius-এর তত্ত্বাবধানে মুদ্রণযন্ত্রটিকে ছেড়ে দেন। এটির সহায়তায় Fabricius তাঁর প্রার্থনা সংগীত (*Hymn Books*), ইংরেজি-তামিল অভিধান (১৭৮৬ খ্রী), তামিল-ইংরেজি অভিধান (১৭৯৯ খ্রী) প্রভৃতি ছাপেন। তামিল মুদ্রাক্ষরও তৈরি হতে থাকে। এই মুদ্রণযন্ত্রটিই মাদ্রাজে তামিল মুদ্রণের সূত্রপাত করে।

ভারতীয় মুদ্রণের বিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করতে গিয়ে মাদ্রাজের পরেই আমরা এসে পৌঁছই পূর্ব উপকূলের আর-এক সীমানা কলকাতা ও শ্রীরামপুরে। প্রসঙ্গত লক্ষ্য করা

---

১ **A. K. Priolkar**, *op. cit.*, p. 46.

যায়, ভারতীয় মুদ্রণের ধারাটি তার উৎসভূমি গোয়া থেকে শুরু করে বরাবর উপকূলভাগের তটরেখাকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে। মুদ্রণের আদি কেন্দ্রগুলি প্রথমে পশ্চিম উপকূল ধরে দক্ষিণদিকে এগিয়ে গিয়েছিল— যেমন, বোম্বাই, গোয়া, কুইলন, আম্বালাক্কাড় (ত্রিচুরের ২০ মাইল দক্ষিণে), কোচিন ও পুনিকাইল (কন্যাকুমারীর নিকটবর্তী)। দক্ষিণতম প্রান্তে পৌছনোর পর যাত্রাপথ আবার পূর্ব উপকূলের তটরেখা ধরে উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে গিয়েছিল— যেমন, ত্রাঙ্কুইবার, মাদ্রাজ হয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতা ও শ্রীরামপুর। মুদ্রণকেন্দ্রগুলি যেন ভারতের দুই উপকূল ছুঁয়ে মালার মতো গড়ে উঠেছিল। বিদেশ থেকে মুদ্রণের তরঙ্গাভিঘাত প্রথম গোয়ার তটভূমিতে এসে আছড়ে পড়েছিল। তারপর ভারতের কূলে কূলে ঢেউয়ের মতো দুলতে দুলতে ভারতীয় মুদ্রণের আদি ধারাটি শেষ পর্যন্ত কলকাতা শ্রীরামপুরের তটরেখায় গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। এই শেষ সীমানায় পৌছে যেমন বাংলা মুদ্রণের সূত্রপাত হল, তেমনি বলা যায় সামগ্রিকভাবে ভারতীয় মুদ্রণও একটা নতুন পথে মোড় নিল। স্বর্ণাক্ষরে লেখা হল মুদ্রণের নতুন ইতিহাস; অজস্রের সহস্রবিধ চরিতার্থতায় বাংলাদেশে মুদ্রণের যে জয়যাত্রা শুরু হল তারই পরিণতিতে এল বাংলার নবজাগরণ বা রেনেসাঁস। এই রেনেসাঁসের ঢেউ ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতবর্ষে। তাই ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বাংলাদেশের গৌরবময় অবদান অনস্বীকার্য; এবং এই অবদানের মূলে বাংলা মুদ্রণের ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা মুদ্রণের বিলম্বিত আবির্ভাব

ভারতীয় মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে বাংলা মুদ্রণের আবির্ভাব অনেক বিলম্বে ঘটেছে নিঃসন্দেহে। ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতে মুদ্রণশিল্পের সূত্রপাত হলেও, ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম একটি ভারতীয় ভাষায় বই ছাপা শুরু হয়। প্রথম বইটি ছাপা হয় তামিল ভাষায়। আর বাংলাদেশে বাংলা মুদ্রণের সূত্রপাত ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে; অর্থাৎ প্রথম ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণের আবির্ভাবের ঠিক দু'শো বছর পরে বাংলা মুদ্রণের জন্ম। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এত বিলম্বিত আবির্ভাব সত্ত্বেও, বাংলা মুদ্রণই অচিরে ভারতীয় মুদ্রণ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল। জন্মলগ্নের পর থেকেই বাংলাদেশে মুদ্রণের ধারা এমন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছিল যে পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাংলা ভাষা মুদ্রিত পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ও উৎকর্ষের বিচারে সমকালীন অন্যান্য সমস্ত ভারতীয় ভাষাকে বহুদূর পিছিয়ে ফেলে অবিসংবাদী নেতৃত্বের গৌরব অর্জন করেছিল। সেইজন্য এক হিসাবে বলা যায়, বাংলাদেশই ছিল ভারতে মুদ্রণশিল্পের পীঠস্থান, বাংলা মুদ্রণই ভারতীয় মুদ্রণের পথিকৃৎ। প্রসঙ্গত, একজন ভারতীয় মুদ্রণের ইতিহাস-রচয়িতার অনুরূপ মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে: '...although printing activity had started in India earlier at Goa and Tranquebar, when one takes into account the volume and variety of the achievements of the Serampore Mission in that field, printing in India could be said to have had its origin at Serampore.'[১]

বিলম্বিত আবির্ভাব সত্ত্বেও বাংলা মুদ্রণের এই বিস্ময়কর অগ্রগতি তার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে নিঃসন্দেহে। তবু এর মূল কারণ নিহিত ছিল অন্যত্র। তদানীন্তন ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিকায় এর জন্ম। রাজনীতির দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জটিল আবর্তে এর গতিপথ নির্ধারিত, বিদেশী শাসকের বাণিজ্য-বুদ্ধির স্বার্থে ও তাগিদে এর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। এখানেই বাংলা মুদ্রণের বৈশিষ্ট্য। সাধারণত প্রায় সর্বত্রই ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনেই মুদ্রণের জন্ম। ভারতীয় মুদ্রণের আদিযুগেও ধর্মেরই প্রাধান্য। কিন্তু বাংলাদেশে এর ব্যতিক্রম। এখানে রাজনীতির তাগিদে ও স্বার্থে মুদ্রণের জন্ম ও প্রসার। ১৭৭২

---

১ A. K. Priolkar, '*The Printing Press in India, its beginnings and early developments*', p. 70.

খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশে শাসনভার গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই উপলব্ধি করেছিল, শাসক ও শাসিতের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর ভাষার সম্পর্ক অপরিহার্য। বাংলাদেশে তাদের বাণিজ্য ও রাজত্বকে কায়েম রাখতে হলে বাংলা ভাষাকে আয়ত্ত করা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদেই ইংরেজ শাসকেরা বাংলাভাষা চর্চায় উদ্যোগী হন এবং সেই সূত্রেই বাংলা মুদ্রণের সূত্রপাত। বাংলাদেশে সদ্য আগত ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে হালহেডের যুগান্তকারী ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে। এই বইয়েই প্রথম ব্যবহৃত হয় সঞ্চালনযোগ্য বাংলা মুদ্রাক্ষর। সেখান থেকেই বাংলা মুদ্রণের জয়যাত্রা শুরু।

উদ্দেশ্যগত এই মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও একটি বিষয়ে ভারতীয় মুদ্রণের অন্যান্য শাখার সঙ্গে বাংলার মিল দেখা যায়। মিল এইজন্য যে ভারতে সর্বত্র বিদেশীরাই মুদ্রণের প্রবর্তক। গোয়ায় পর্তুগীজ, ত্রাঙ্কুইবারে দিনেমার ও বাংলায় ইংরেজরা মুদ্রণের প্রবর্তন করেছেন। তবে অন্যদের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রণে ইংরেজদের অবদানই সর্বাধিক। অপরদিকে ক্ষমতা, আধিপত্য ও প্রভাবের কথা বিচার করলে দেখা যায়, ভারতীয় রাজনীতিতে বিদেশাগত শক্তিগুলির মধ্যে ইংরেজদের প্রাধান্যই ছিল সর্বাধিক। সুতরাং এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া অযৌক্তিক নয় যে, রাজনৈতিক ক্ষমতাই শেষ পর্যন্ত সমসাময়িককালের মুদ্রণপ্রচেষ্টার উৎকর্ষ ও অগ্রগতি নিয়ন্ত্রিত করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইংরেজরাই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী, আর ভারতের মধ্যে বাংলাদেশেই ছিল তাদের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধানতম কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ। তাই ইংরেজরা যখন বাংলা মুদ্রণের প্রবর্তন করল, তখন তার মূল কর্মকেন্দ্র বাংলাদেশেই হল মুদ্রণের সর্বাধিক বিস্তার এবং এইটাই ভারতবর্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রণধারা হিসাবে ছড়িয়ে পড়ল। অপর পক্ষে পর্তুগীজ দিনেমারদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাসের ফলে তাঁদের প্রবর্তিত মুদ্রণধারাটিও হীনবল হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ে ইংরেজদের প্রধানতম রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকেন্দ্র ছিল যেমন বাংলাদেশ, তাদের উদ্যোগ, উৎসাহ ও সহায়তায় গড়ে ওঠা মুদ্রণশিল্পের কর্মভূমিও ছিল তেমনি বাংলাদেশেই। তাই বলা যায়, বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তির আনুকূল্যের ফলেই বাংলা মুদ্রণ, বিলম্বিত আবির্ভাব সত্ত্বেও, ভারতীয় মুদ্রণের নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়েছিল। তার এত দ্রুত চমকপ্রদ অগ্রগতিও সম্ভব হয়েছিল একই কারণে।

বিলম্বিত আবির্ভাবের ফলে অবশ্য বাংলা মুদ্রণের একটি বিশেষ সুবিধাও হয়েছিল। প্রথম প্রচেষ্টাতেই বাংলা মুদ্রণশিল্প শোভন সুন্দর পরিপূর্ণ আধুনিক রূপ নিয়ে প্রস্ফুটিত হতে পেরেছিল। ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তর ধাপে ধাপে পেরিয়ে তাকে এগোতে হয়নি। ব্লক তৈরি করে বা সঞ্চালনযোগ্য (movable) কাঠের হরফের সাহায্যে ছাপার পরীক্ষা নিরীক্ষা বাংলাদেশের মাটিতে চালাতে হয়নি। সেই সময় পর্যন্ত নানা দেশে ধাপে ধাপে মুদ্রণশিল্পের

যত কিছু উন্নতি সাধিত হয়েছিল তার সবটুকু সুযোগ সুবিধা নিয়েছিলেন বাংলাদেশের মুদ্রণ প্রবর্তকেরা। ফলে বাংলা মুদ্রণের প্রথম প্রচেষ্টায় আধুনিক মুদ্রণযন্ত্র, ইংলণ্ড থেকে আমদানী করা কাগজ-কালি, ধাতুনির্মিত সঞ্চালনযোগ্য মুদ্রাক্ষর (movable metal types) প্রভৃতি সব সরঞ্জামই ব্যবহৃত হয়েছিল। অবশ্য সঞ্চালনযোগ্য বাংলা হরফ নির্মাণ এই প্রথম। সঞ্চালনযোগ্য মুদ্রাক্ষরশিল্পের মূল কলাকৌশলগুলিই শুধু জানা ছিল। তার সঙ্গে এসে যুক্ত হল পথিকৃতের প্রতিভা, উৎসাহ ও অনলস পরিশ্রম। তার ফলেই সৃষ্টি হল উইলকিন্স ও পঞ্চাননের হাতে গড়া প্রথম বাংলা মুদ্রাক্ষর। এর নয়নশোভন রূপ প্রথম দর্শনেই সকলের মন এমন গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল যে সেই রূপমুগ্ধ বিস্ময়-চেতনা যেন আজও সজীব ও সতেজ হয়ে রয়েছে। তাই বলা যায়, বিলম্বিত আবির্ভাব সত্ত্বেও এক বিশেষ রাজনৈতিক পটভূমিকা ও তার চাহিদা এবং ইউরোপীয় মুদ্রণশিল্পনৈপুণ্যের সহায়তার ফলে বাংলা মুদ্রণ জন্মের অল্পকাল মধ্যেই এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পেরেছিল।

প্রস্তুতি পর্ব

(১৬৬৭-১৭৭৭)

প্রথম অধ্যায়

বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপির আদি নিদর্শন

'আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো।'

বাংলাদেশের মাটিতে বাংলা ছাপার হরফের জন্মের অনেক আগে থেকেই তার সৃষ্টি-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল এখানে ওখানে— বাংলা ও ভারতের বাইরে নানা জায়গায়। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের আগে পর্যন্ত বাংলা অক্ষরে ছাপা কোনো বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিন্তু বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে তার অনেক আগে, ১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দে। ১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত কয়েকটি অ-বাংলাভাষী বইয়ে বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। ১১১ বৎসর ব্যাপী এই সময়কালকে বাংলা মুদ্রণের প্রস্তুতি পর্ব বলা যায়। বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে এই প্রস্তুতি পর্বের সম্যক পরিচয় নির্ধারণ বাংলা মুদ্রণেতিহাসের পারম্পর্যনির্ণয়ের জন্য বিশেষ মূল্যবান।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এই প্রস্তুতি পর্বে বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপির যে কয়টি নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে তা সবই বিদেশীর দ্বারা বিদেশে অর্থাৎ ভারতের বাইরে মুদ্রিত হয়েছে। বাংলা মুদ্রণের পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশীদের কাছে আমাদের ঋণ অনস্বীকার্য। এই প্রতিলিপিগুলির অপর বৈশিষ্ট্য এই যে এগুলি সবই ধাতুনির্মিত খোদাই করা পাত বা প্লেট বা ব্লক থেকে মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা অথবা কাঠের পাটায় খোদাই করে ছাপা, অর্থাৎ এগুলি সবই ছিল ব্লক-মুদ্রণ (Block Printing)-এর নিদর্শন। তখন পর্যন্ত বাংলা ধাতুনির্মিত সঞ্চালনযোগ্য ছাপার হরফের (movable metal types) জন্ম হয়নি। তাই এই পর্বকে সাধারণ ভাবে বলা যায় বাংলা ব্লক মুদ্রণের যুগ (Age of Block Printing) বা আধুনিক বাংলা মুদ্রণের প্রস্তুতি পর্ব।

এখন পর্যন্ত এই প্রস্তুতি পর্বে যে কয়টি বাংলা ব্লক মুদ্রণের সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে সাত-আটটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইগুলিই বাংলা অক্ষরের আদি মুদ্রিত প্রতিলিপির নিদর্শন। প্রধানত ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের সঙ্গে এই ব্লকগুলি মুদ্রিত হয়েছিল। বাংলা অক্ষরের বিবর্তনধারা পর্যালোচনা করার কাজে বাংলা বর্ণমালার এই মুদ্রিত প্রতিলিপিগুলির গুরুত্ব অনেকখানি।

বাংলা মুদ্রাক্ষরের প্রাচীনতম নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় ১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত '*China Illustrata*' নামক গ্রন্থে। কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে ও এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে এই বইটি রক্ষিত আছে। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে প্রথম এই বইটি সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করেন।[1] অবশ্য ইতিপূর্বে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস এই বইটির নাম উল্লেখ করে লিখেছিলেন, এতে সর্বপ্রথম দেবনাগরী অক্ষরের প্রতিলিপি পাওয়া যায়।[2] কিন্তু দেখা যায় বইটিতে দেবনাগরী নয়, বাংলা বর্ণমালাই সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়েছে। অবশ্য এখানে মুদ্রিত অক্ষরগুলি আধুনিক বাংলা বর্ণমালা থেকে অনেকাংশে পৃথক, কতকগুলি একেবারেই অপরিচিত। তথাপি বহু ক্ষেত্রে সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। তিন শতাধিক বছরে অক্ষরের রূপান্তর ঘটা অস্বাভাবিক নয়। অক্ষম লিপিকরের হাতে পড়ে অক্ষরের বিকৃতি ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। তবে এর অনেকগুলি অক্ষর যে আধুনিক বাংলা অক্ষরেরই আদিতম রূপ সে কথা অনস্বীকার্য।

আতানাসিউই কির্খেরি (Athanasü Kircheri) কর্তৃক লাটিন ভাষায় রচিত এই বইটির সংক্ষিপ্ত নাম— চায়না ইলাস্ট্রাটা, *China Illustrata* ; ১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দে আমস্টারডাম থেকে প্রকাশিত। এর আখ্যাপত্রে আছে : ATHANASÜ KIRCHERI/CHINA/MONUMENTIS,/QUA/Sacris qua Profanis,/Nee non variis/Naturee & Artis/Specṭaculis,/Aliarumque rerum memorabilium/Argumentis/ILLUSTRATA,/Auspiciis/LEOPOLDI PRIMI,/Roman, Imper, Semper Augusti,/Munificentisimi Mecaenatis,/AMSTELODAMI,/Anno. M.DC.LXVII.

আখ্যাপত্রের পিছনে লেখা আছে— রোম, ১৪ নভেম্বর, ১৬৬৪ ; সম্ভবত এটি গ্রন্থ-রচনার স্থান ও সময় নির্দেশক। বেশ বড়ো আকারের (folio) বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৩৭-এর কিছু বেশি। কয়েকটি মানচিত্র, তালিকা, প্লেট, প্রভৃতি এতে সংযোজিত আছে। চীনের সৌধ, মন্দির, গীর্জা, স্থাপত্য, কলাশিল্প প্রভৃতির বর্ণনা বইটিতে আছে।

বইটির ৪২ পৃষ্ঠার পরে সংযোজিত একটি প্লেটে— 'Alphabetum Bengalicum'— এই শিরোনামায় বাংলা বর্ণমালা মুদ্রিত আছে, সঙ্গে রোমান অক্ষরে উচ্চারণ নির্দেশিত হয়েছে। অক্ষরগুলি বর্তমান প্রচলিত ক্রম অনুসারে সাজানো নয়। আধুনিক বাংলা অক্ষরের সঙ্গে এর অনেকগুলি অক্ষরের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় ; যেমন : গ, ঘ, ঞ, দ, ধ, ড, প, ফ, ব, ম, ল, ন, প্রভৃতি।

বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপির দ্বিতীয় নিদর্শন পাওয়া যায় ১৬৯২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত একটি বইয়ে। বইটির প্রথম উল্লেখ করেন ফাদার এইচ. হস্টেন (Fr. H. Hosten) তাঁর

---

১ শারদীয় যুগান্তর, ১০৭৭ সাল।

২ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মানোএল রচিত বাঙালা ব্যাকরণ : প্রবেশক, পৃ. ।০ (কলি. বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩১)। সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস' (পরি, সং, ১৩৬৯), পৃ. ২৫।

'The Three First Type-printed Bengali Books' নামক প্রবন্ধে।[১] অবশ্য হস্টেন তখন এটিকেই বাংলা ছাপার হরফের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং অনেককাল পর্যন্ত সেই ধারণাই সত্য বলে চলে আসছিল। পূর্বোক্ত '*China Illustrata*' গ্রন্থের বিস্তারিত তথ্য উদ্ধার করে এখন ঐ ধারণা ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করা গেল।

১৬৯২ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস শহর থেকে প্রকাশিত এই বইটিতে ভারত-চীন-শ্যামদেশে পরিভ্রমণকারী চারজন জেস্যুইট ধর্মযাজক জিন দ্য ফনটিনে (Jean de Fontenay), গাই টাচার্ড (Guy Tachard), এটিএনে নোয়েল (Etienne Noel) ও ক্লডে দ্য বেজে (Claude de Beze) প্রদত্ত বিবরণী ও অভিমত সংকলিত হয়েছে। ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাকৃতিক ইতিহাস, ভূপ্রকৃতি, গণিত, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি এর বিষয়বস্তু। সম্রাট চতুর্দশ লুই (Louis XIV) কর্তৃক শ্যামদেশে প্রেরিত একটি বৈজ্ঞানিক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এর গ্রন্থকারেরা। বইটি ফরাসী ভাষায় রচিত। এর আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 'Observations Physiques et Mathematiques pour servir á l'histoire naturelle, et a' la perfection de l' Astronomie et de la Geographie : Envoyées des Indes et de la Chine a' l'Académie Royale des Sciences a' Paris, par les Peres Jesuites. Avec les reflexions de Mrs. de l'Académie, et les Notes du P. Goiiye, de la Compagnie de Jesus.' A Paris, de l' Imprimerie Royale, M.DC. XCII.

বইয়ের মধ্যে এর সংক্ষিপ্ত শিরোনাম (running title) দেওয়া আছে : 'Observations'। চারপেজী (Quarto) বড়ো আকারের এই বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১৩ ; এতে দুটি মানচিত্র ও ৭৪ পৃষ্ঠার বিপরীতে একটি প্লেট সংযোজিত আছে। প্লেটটিতে বাংলা বর্ণমালা ('Caracteres des lettres des peuples de Bengale') ও ১ থেকে ১০ পর্যন্ত বাংলা সংখ্যা (numerals) এবং তৎসহ বর্মী ('Baramas') বর্ণমালা ও সংখ্যার (১ থেকে ১০) প্রতিলিপি মুদ্রিত আছে। এখানে বাংলা অক্ষরগুলি সাজাবার ব্যবস্থা লক্ষণীয়। ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে তাদের উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাংলা অক্ষরগুলিকে পাশাপাশি লেখা হয়েছে। ফলে বাংলা বর্ণমালার ধারাবাহিক ক্রম এখানে বজায় থাকেনি। আধুনিক বাংলা অক্ষরের সঙ্গে এর মিল ও অমিল দুইই লক্ষ্য করা যায়। তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে লণ্ডন থেকে সংগৃহীত এই পৃষ্ঠাটির একটি প্রতিলিপি এখানে সংযোজিত হল। এর আগে এটি আর কোনো বাংলা সমালোচনা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি।

এর পরে অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলা মুদ্রণের একটি অক্ষম প্রয়াসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৭১৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বার্লিনে La Croze-কে লেখা একটি চিঠিতে David Wilkins বলেছেন, তিনি John Chamberlayne-এর সহযোগিতায় প্রভুর প্রার্থনাবাণী (Lord's Prayer) বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করতে চান ; সিংহল ও জাভার

১ *Bengal : Past & Present*, Vol. IX, July-Dec. 1914, pp. 40-63.

ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষাতেও অনুবাদ করতে তাঁরা উদ্যোগী হন।[১] এরই ফলে, ১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে Chamberlayne সম্পাদিত '*Sylloge*' প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে সংযোজিত একটি প্লেটে 'Bengalica' শিরোনামে প্রভুর বাণীর একটি তথাকথিত বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হয়।[২] কিন্তু এই বাংলা ছিল সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। এর ভূমিকায় Wilkins নিজেই স্বীকার করেছেন যে বাংলা অনুবাদে অসমর্থ হওয়ায় তিনি মালয় (Malay) ভাষায় অনুবাদ করে তা বাংলা অক্ষরে লিপিবদ্ধ করেছেন। (তাঁর ধারণা হয়েছিল বাংলা ভাষা মৃতপ্রায়!) তাঁর বাংলা অক্ষরের নমুনা প্রমাণ করে যে বাংলা ভাষা ও বর্ণমালা সম্বন্ধে আদৌ তাঁর কোনো জ্ঞান ছিল না।

বাংলা মুদ্রিত অক্ষরের পরবর্তী নিদর্শন, যাকে প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় নিদর্শন বলাই উচিত, পাওয়া যায় গেওর্গ যাকোব্ কের (Georg Jacob Kehr) নামে একজন জার্মান পণ্ডিত রচিত 'Aurenck Szeb' সম্বন্ধীয় একটি বইয়ে। বইটি লাটিন ভাষায় রচিত ও ১৭২৫ খ্রীস্টাব্দে জার্মানীর লাইপ্‌ৎসিক (Leipzig) নগরে মুদ্রিত। জি. এ. গ্রিয়ারসন এটির উল্লেখ করলেও, তিনি নিজে এর সন্ধান পাননি। পরে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন।[৩] ঔরঙ্গজেব বাদশাহের দিল্লী (Dehli) বা জাহানাবাদ (Dshihanabad)-এর টাকশাল থেকে প্রচারিত রৌপ্যমুদ্রার আলোচনা ও তদ্‌ব্যপদেশে প্রাচ্যখণ্ডের ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা এই বইটিতে পাওয়া যায়। বইটির ৪৮ পৃষ্ঠায় ১ থেকে ১১ পর্যন্ত বাংলা সংখ্যা (numerals) এবং ৫১ পৃষ্ঠার সামনের প্লেটে বা চিত্রপটে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ ('Alphabetum Bangalicum' শিরোনামায়) ও একটি জার্মান নাম— Sergeant Wolfgang Meyer 'শ্রীসরজান্ত বলপকাং মাএর'-রূপে বাংলা অক্ষরে ছাপা আছে। ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে এই বইটি পাওয়া যায়।

উপরোক্ত বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের এই প্রতিলিপিটিই ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে লাইপ্‌ৎসিক (Leipzig) নগর থেকে প্রকাশিত যোহান ফ্রিদ্‌রিখ্ ফ্রিৎস (Johann Friedrich Fritz) রচিত '*Orientalischer Und Occidentalischer Sprachmeister*' (অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষা শিক্ষক) নামক জার্মান গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়। বাংলা ছাপার হরফের নমুনার এটি চতুর্থ প্রকাশন। গ্রিয়ারসন তাঁর 'Specimens of the Bengali and Assamese Languages' আলোচনায় প্রথম এই বইটির উল্লেখ করেন।[৪] বইটিতে পৃথিবীর

---

১ G. A. Grierson, '*Linguistic Survey of India*', Vol. V, Pt. 1, p. 23

২ G. A. Grierson, '*Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*', 1895, p. 89; Sushil Kumar De, '*Bengali Literature in the 19th Century*' (2nd ed., 1962), p. 57.

৩ মানোএল-এর বাংলা ব্যাকরণ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩১ খ্রীঃ), প্রবেশক।

৪ G. A. Grierson, '*Linguistic Survey of India*' (1903), Vol. V, Pt. 1.

বিভিন্ন ভাষার শতাধিক বর্ণমালা ও প্রায় দুশো খ্রীস্টোপাসনার অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছে। এর ৮৪ পৃষ্ঠায় বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিলিপিটি মুদ্রিত আছে।

মুদ্রিত বাংলা অক্ষরের পরবর্তী অর্থাৎ পঞ্চম নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে। ডেভিড মিল (Davidi Millio) ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে হল্যাণ্ডের লীডেন (Leiden) শহরে লাটিন ভাষায় '*Dissertationes Selectae*' নামক একখানি বই প্রকাশ করেন। এর একটি অধ্যায়ে মুসলমান ধর্মমতের সমালোচনা করা হয়েছে। (Dissertatio I. De Mohammedismo ante Mohammedem)। এ ছাড়া ফারসী, হিন্দুস্থানী, আরবী প্রভৃতি প্রাচ্যভাষার আলোচনাও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বইটির শেষভাগে (৪৫৫-৪৮৮ পৃ.) Miscellanea Orientalia নামক অধ্যায়ে (Dssertatio XV) হিন্দুস্থানী ভাষার আলোচনা ('De Lingua Hindustanica') আছে। এই অংশে কেটেলের (Joannes Josua Ketelaer) প্রণীত হিন্দুস্থানী ভাষার একটি ব্যাকরণ ('Grammatica Hindustanica') অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কেটেলের ছিলেন ওলন্দাজ এবং তিনি ওলন্দাজ ভাষাতেই তাঁর ব্যাকরণ রচনা করেন। ডেভিড মিল লাটিন ভাষায় এটি অনুবাদ করে তাঁর বইয়ে প্রকাশ করেছেন। কেটেলের প্রণীত মূল ব্যাকরণ পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই আছে, ছাপা হয়নি।

বইটির এই হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ অংশে রোমান অক্ষরে উচ্চারণ সহ অতি সুন্দর ছাঁদে লেখা বাংলা ও দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতিলিপি তাম্রফলকে খোদাই করে দুটি পৃথক চিত্রপটে ছাপা আছে। ৪৫৭ পৃষ্ঠায় 'Alphabetum Brahm. III. A'— এই শিরোনামায় যে হিন্দুস্থানী বর্ণমালা মুদ্রিত আছে তাকে বেনারস ('Banares') অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের ('Brahmanicos') বর্ণমালা ('characters') হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর পরেই 'Alphabetum Brahm. III.B' এই শিরোনামায় বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয়, এই প্রতিলিপিতে আগে ব্যঞ্জনবর্ণ ও পরে স্বরবর্ণ— বাংলা অক্ষরগুলি এইভাবে সাজানো। আমাদের আলোচ্য প্রস্তুতিপর্বে বাংলা হরফের যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যে ডেভিড মিলের বইয়ের অন্তর্ভুক্ত এই নমুনাই সবচেয়ে সুন্দর এবং আধুনিক বাংলা অক্ষরের নিকটতম।

বইটির শেষের দিকে (৫১০ পৃষ্ঠা থেকে) 'Etymologicum Orientale Harmonicum' নামক অধ্যায়ে রোমান অক্ষরে হিন্দুস্থানী শব্দ ও তার লাটিন প্রতিশব্দ দেওয়া আছে।

ডেভিড মিল বাংলা বর্ণমালাকে ব্রাহ্মণ বর্ণমালা বলেছেন। তাঁর ধারণা, ভারতের সর্বত্র, বিশেষ করে বাংলা বিহার উড়িষ্যায় এই বর্ণমালার প্রচলন ছিল। বইটির লাটিন ভূমিকায় তিনি এ কথা লিখেছেন: …'in Tab. III. B exhibitos, in usu esse, to to in regno Hindustan, in primis in Bengala, Bahaar, atque Orixa'…

৬০১ + ১১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত আটপেজী (8vo) এই বইটি ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এখানকার কপিটির কিছু কিছু অংশ ছিঁড়ে গেছে।

মুদ্রিত বাংলা অক্ষরের ষষ্ঠ নিদর্শনটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে *Encylopedie Francoise*' (Folio ; Livourne) নামক গ্রন্থে। এই বইয়ের ১৮ সংখ্যক প্লেটে মুদ্রিত বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপিটি ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত অপর একটি বইয়ে পুনর্মুদ্রিত হয়। Edmond Fry রচিত শেষোক্ত বইটির আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 'PANTOGRAPHIA;/Containing/Accurate copies of all the known/Alphabets in the world ; /Together with/An English Explanation of the peculiar/ Force or Power of each letter/To which are added,/Specimens of all well-authenticated/Oral Languages ; / Forming/A Comprehensive Digest of/Phonology/By Edmund Fry,/Letter-Founder, Type-street./London./ Printed by Cooper and Wilson,/For John and Arthur Arch, Gracechurch-street ; /John white, Fleet-street ; /John Edwards, Pall-Mall ; and/John Debrett, Piccadilly. /MDCCXCIX." পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালার নমুনা ব্লকে খোদাই করে এতে ছাপা আছে। সমগ্র বইটি সাধারণ কাগজের পরিবর্তে vellum-এ (ছাগল বা বাছুরের চামড়া থেকে তৈরি) ছাপা। অক্টেভো আকারের এই দুর্লভ বইটি কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এর ১৮ সংখ্যক পৃষ্ঠায় 'BENGALLEE'-এই শিরোনামে বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি একটি ছোটো ব্লকে (৪" × ২.৫") ছাপা আছে।

ডঃ এডমণ্ড ফ্রাই নিজেই একজন প্রখ্যাত হরফ-নির্মাতা ছিলেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত। ষোল বছর ধরে গবেষণার পর তিনি এই গ্রন্থে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালা উদ্ধার করে তাদের ধ্বনিবৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন ও সঙ্গে তাদের নমুনা বিভিন্ন প্লেটে খোদাই করে ছাপেন।

বইটির ১৯ পৃষ্ঠায় 'BENGALLEE' বর্ণমালা প্রসঙ্গে লেখা আছে : 'This is the character used in the extensive country of Bengal, now subject to the English East-India Company'। এই বর্ণমালায় কেবল ব্যঞ্জনবর্ণই ছাপা আছে, স্বরবর্ণ নেই। প্রতিটি বর্ণের নীচে রোমান অক্ষরে তার উচ্চারণ নির্দেশ করা আছে। ব্যঞ্জনবর্ণের আধুনিক ক্রমটি এখানে অবশ্য বজায় রাখা হয়নি। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির মাঝখানে 'ক' থেকে শুরু হয়ে বর্ণগুলি বাঁ দিকে এগিয়েছে, পরে আবার প্রথম পঙ্‌ক্তির ডান দিক থেকে বাঁ দিকে অক্ষরগুলি পর পর সাজানো আছে। অনুরূপভাবে পরবর্তী অক্ষরগুলি তৃতীয় পঙ্‌ক্তির মাঝখান থেকে শুরু করে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে এগিয়েছে, পরে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। অক্ষরগুলির এই বিচিত্র বিন্যাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে অক্ষরগুলির অধিকাংশই প্রায় আধুনিক ধাঁচের।

বাংলা মুদ্রিত অক্ষরের পরবর্তী নিদর্শনগুলির সন্ধানে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে ইংলণ্ডের দিকে। এগুলির সঙ্গে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করেছে।

অষ্টাদশ শতকের তখন দ্বিতীয়ার্ধ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সাগর পাড়ি দিয়ে এসে বাংলার বুকে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। আর কেবল বাণিজ্য বিস্তার নয়, এবার সাম্রাজ্যের পত্তন। এর অল্পকাল মধ্যেই কোম্পানীর বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক স্বার্থে বাংলা মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিল ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে। তাঁদের সেই সচেতনতা থেকেই বাংলা হরফ নির্মাণ প্রচেষ্টার জন্ম। লণ্ডনে এই কাজের সূত্রপাত করেন উইলিয়ম বোল্‌টস (William Bolts) ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরীতে নিযুক্ত একজন দুঃসাহসী ওলন্দাজ কর্মচারী হিসাবে বোল্‌টসের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি কলকাতা মেয়র কোর্টের বিচারক বা অলডারম্যানও নিযুক্ত হয়েছিলেন।[১] ইংরেজ কর্মচারীদের শিক্ষার্থে তিনি একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনায় একবার উদ্যোগী হন। সেই সূত্রেই তাঁর বাংলা মুদ্রাক্ষর তৈরির উদ্যোগ। তাঁরই নির্দেশনায় জোসেফ জ্যাকসন (Joseph Jackson) নামে একজন হরফ ঢালাইয়ের কাজে দক্ষ ইংরেজ কারিগর লণ্ডনের অন্তর্গত ক্যাসলনের (Caslon) হরফ ঢালাই কারখানায় এক সাট বাংলা অক্ষর কেটে তৈরি করেন। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে জ্যাকসনের কারখানায় প্রাপ্ত বিভিন্ন ভাষার হরফের যে তালিকা প্রকাশিত হয় তাতে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের আধুনিক রূপ (Modern Sanskrit) বলে বর্ণনা করে বলা হয়েছে, সংস্কৃত ভেঙেই এর জন্ম—'a corruption of the older characters of the Hindoos, the ancient inhabitants of Bengal'।[২] বোল্‌টস তাঁর বাংলা অক্ষরের প্রতিলিপিও ছেপে প্রকাশ করেছিলেন। প্রচলিত ধারণা, তাঁর এই প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়, কারণ তাঁদের কাটা হরফগুলি বাংলা বর্ণমালার রূপকে একেবারেই ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। এর কয়েক বছর পরে হালহেড যখন তাঁর বাংলা ব্যাকরণ ছাপতে উদ্যোগী হন, তখন তাঁর বোল্‌টসের হরফগুলির কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু অমার্জিত বিকৃত কাঁচা রূপের জন্য এগুলি তাঁর কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। এবিষয়ে তিনি তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখেছেন : 'Mr. Bolts (who is supposed to be well versed in this language) attempted to fabricate a set of types for it, with the assistance of the ablest artists in London. But as he has egregiously failed in executing even the easiest part, or primary alphabet, of which he has published a specimen, there is no reason to suppose that his project when completed, would have advanced beyond the usual state of imperfection to which new inventions are constantly exposed.'[৩]

---

১ *Dictionary of National Biography*, Vol. II, p. 795.

২ T. B. Reed, '*A History of the Old English Letter Foundries.*' p. 313.

৩ N. B. Halhed, '*A Grammar of the Bengal Language*' : Preface.

বোল্‌টসের ব্যর্থতা সম্বন্ধে বহুকাল প্রচলিত এই মত সম্প্রতি খণ্ডন করেছেন চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, বোল্টসের এই হরফ ঢালাইয়ের প্রচেষ্টাই ছিল ধাতুর তৈরি সঞ্চালনযোগ্য বাংলা মুদ্রাক্ষর নির্মাণের প্রথম উদ্যোগ। আলাদা আলাদা হরফকে একসঙ্গে সাজিয়ে (compose) ছাপাই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। তাঁর এই অসম্পূর্ণ পরিকল্পনাকে পরবর্তী পর্বে উইলকিন্‌স প্রথম সার্থকতা দান করেছিলেন। সুতরাং বক্ষ্যমান অধ্যায়ে যখন আমরা কেবলমাত্র কাষ্ঠ বা ধাতু নির্মিত ফলকে খোদাই করা ব্লক মুদ্রণের নিদর্শনগুলিকেই আলোচ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছি, সেখানে বোল্টসের আলোচনা স্থানোচিত না হওয়াই স্বাভাবিক। তবু প্রসঙ্গক্রমে বোল্টসের প্রচেষ্টা এখানে উল্লেখ করা হল কেবলমাত্র ঘটনা ও সমকালের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে। বোল্টস তাঁর হরফ তৈরি করিয়েছিলেন ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে। এরও পরে, ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনেই মুদ্রিত বাংলা হরফের আরেকটি প্রতিলিপির সন্ধান পাওয়া যায় যেটি ছিল ব্লক মুদ্রণের অন্যতম আদি নিদর্শন। এটিই আলোচ্য পর্বের শেষ উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।[১] ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড (Nathaniel Brassey Halhed) কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত '*A Code of Gentoo Laws*' নামক বইয়ে উল্লিখিত বাংলা বর্ণমালা একটি প্লেটে মুদ্রিত হয়।

উল্লেখযোগ্য, বইটি লণ্ডনে ছাপা হলেও কোম্পানী-রাজত্বের প্রশাসনিক স্বার্থে বাংলাদেশেই রচিত ও অনূদিত হয়। বাংলাদেশে মুসলমান রাজত্বে সমগ্র বিচার ব্যবস্থা ও সামাজিক অনুশাসন মুসলমান ধর্ম ও রীতিনীতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হত, ফলে হিন্দুদের প্রতি প্রায়ই সুবিচার করা হত না বলে অভিযোগ ও আশঙ্কা দেখা দেয়। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস তাই কোম্পানী-রাজত্বে ন্যায়নীতি প্রবর্তন ও বিচার বিভাগীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি ও অনুশাসনগুলি লিপিবদ্ধ করার কাজে উদ্যোগী হন। হেস্টিংসের আমন্ত্রণে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা (কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র সার্বভৌম, গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ, শ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত প্রভৃতি) ফোর্ট উইলিয়মে সমবেত হয়ে হিন্দু শাস্ত্রাদি আলোচনা করে হিন্দু রীতিনীতি সম্বন্ধীয় এক সংস্কৃত সংকলন প্রস্তুত করেন, যেটি সাধারণ্যে প্রচারের জন্য আবার ফারসীতে অনূদিত

[দ্র. 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন,' পৃ. ৩৬৭-৩৭৫] বোল্টসের উদ্যোগে কাটা বাংলা হরফের একটি প্রতিলিপি তাঁর নিবন্ধে প্রকাশ করে তিনি বলেছেন ঐ হরফ ছিল সুগঠিত, এমন-কি অনেক ক্ষেত্রে উইলকিন্সের বাংলা হরফের চেয়েও উন্নত মানের। প্রসঙ্গত বোল্টসের কর্ম ও জীবন সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্যও তিনি পরিবেশন করেছেন। তাঁর মতে, বোল্টস জাতিতে ছিলেন জার্মান।

১ সম্প্রতি আরেকটি বইয়ে বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। ফ্রান্সিস গ্লাডউইন অনূদিত 'আইন-ই-আকবরী' (লণ্ডন, ১৭৭৭) গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'অ্যান এশিয়াটিক ভোকাবুলারি' নামক আরেকটি বইয়ের যে বিজ্ঞপ্তি সংযোজিত হয়েছে তাতে চার পৃষ্ঠাব্যাপী বাংলা শব্দের নমুনা ছাপা আছে। [দ্র. শ্রীপান্থ, 'যখন ছাপাখানা এল,' ১৯৭৭]

হয়। মে, ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে শুরু হয়ে ফেব্রুয়ারি, ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়। অতঃপর হেস্টিংসের অনুরোধেই কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারী হালহেড ঐ হিন্দু আইনের সংকলনটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদের কাজ সম্পূর্ণ করেন মার্চ, ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে। এইটি '*A Code of Gentoo Laws or, Ordinations of the Pundits*' নামে ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। (১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১]) বইটির ভূমিকায় অনুবাদক হালহেড প্রসঙ্গক্রমে বাংলাভাষাকে দেবনাগরী ভাষার অপভ্রংশ বলে উল্লেখ করেন এবং তুলনামূলক বিচারের সুবিধার্থে পর পর দুটি চিত্রপটে মুদ্রিত দেবনাগরী ও বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি বইটিতে সংযোজন করেন। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন : ··· 'The Shanscrit chaıacter, used in Upper Hindostan, is said to be the same original Letter that was first delivered to the people by Brihmā, and is now called Diewnāgur, or the language of Angels ; whereas the character used by the Bramins of Bengal is by no means so ancient, and though somewhat different is evidently a corruption of the former, as will better appear upon comparison, for which Reason the Alphabets of both are here inserted···'

বইটিতে মোট আটটি প্লেট সংযোজিত হয়েছে, প্রথমটিতে দেবনাগরী ও দ্বিতীয়টিতে বাংলা বর্ণমালা ('Bengal Alphabet') ছাপা আছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সংস্কৃত উদ্ধৃতি, সংস্কৃত কবিতার অংশ ইত্যাদি অন্যান্য প্লেটগুলিতে ছাপা আছে। বাংলা বর্ণমালার চিত্রপটটি আকারে ৬" × ৭১/২"। এতে বাংলা অক্ষরগুলির পাশে পাশে রোমান অক্ষরে তাদের উচ্চারণ নির্দেশ করা আছে। প্রথমে স্বরবর্ণ, তারপরে ব্যঞ্জনবর্ণ ও পরিশেষে 'connected vowels' হিসাবে 'ক, কা, কি, কী, কু,'··· প্রভৃতি লিখিত আছে। আলোচ্য যুগের বাংলা অক্ষরের এটি অন্যতম সুন্দর নিদর্শন। কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও জাতীয় গ্রন্থাগারে বইটি আছে।

হালহেডের গ্রন্থান্তর্গত এই চিত্রপটটি অনেকে সঞ্চালনযোগ্য বাংলা মুদ্রাক্ষরে ছাপা বলে ভুল করে থাকেন। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেই বোঝা যাবে যে একটি সম্পূর্ণ ফলকে অক্ষরগুলি খোদাই করে এটি ছাপা, ছাপা অংশের চারধার ঘিরে ভারী ব্লকের ছাপ সুস্পষ্ট। তা ছাড়া সঞ্চালনযোগ্য মুদ্রাক্ষর এতে ব্যবহৃত হলে, বইতে তার অবশ্যই উল্লেখ থাকত এবং দু বছর পরে ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে হালহেড তাঁর বাংলা ব্যাকরণ ছাপার কাজে এগুলিকেই লণ্ডন থেকে আনিয়ে ব্যবহার করতে পারতেন। বাংলা মুদ্রাক্ষরের যুগান্তকারী স্রষ্টা হিসাবে উইলকিন্সের ভূমিকার কথাও এত সাড়ম্বরে ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা দেখা

১ Sushil Kumar De, *op. cit.*, p. 71.

দিত না। তিন বছর আগে বোল্টসের নির্দেশনায় তৈরি সঞ্চালনযোগ্য হরফগুলি লণ্ডনেই পড়ে ছিল এবং সেগুলিই এখানে ছাপার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে— এমন অনুমান অনেকে করলেও তা যে যুক্তিগ্রাহ্য নয়, হালহেডের ব্যাকরণের ভূমিকাই তার প্রমাণ। এই ভূমিকা থেকে বোল্টসের প্রাসঙ্গিক অংশ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সেখানে বোল্টসের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে অন্তত হালহেডের বক্তব্য সুস্পষ্ট।

'*Code of Gentoo Laws*' বইটি আকারে (১১" × ৮½") চারপেজী (Quarto), মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৪ + ৬১ + ৩২২। এর প্রধান আলোচ্য বিষয়: ঋণদান ও গ্রহণ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও বণ্টন, বিচার, দান, ক্রয়-বিক্রয়, জমির চাষ ও অধিকার, শস্যহানির ক্ষতিপূরণ, নগর-শাসন, কুৎসা-কলহ, চুরি, হিংসা, নীতিবিগর্হিত কাজ, নারী, প্রভৃতি। ইংরেজি ও বাংলা মাসের বিবরণ এতে আছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সর্বপ্রথম এতে (৭ থেকে ২৩ পৃষ্ঠায়) রোমান অক্ষরে লিখিত বহু বাংলা শব্দ ও তার ইংরেজি অর্থ বর্ণানুক্রমে সাজিয়ে সংকলিত হয়েছে। বাংলা শব্দের সঙ্গে রোমান অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত ও ফার্সী শব্দও, তাদের ইংরেজি অর্থ সহ, এখানে সংকলিত হয়েছে। এই শব্দসংগ্রহ ঐ গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত শব্দ থেকেই সংকলিত। পরবর্তীকালে যেসব বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষ সংকলিত হয়েছে এখানেই তার সূচনা বলা চলে। রোমান অক্ষরে লিখিত হলেও '*Code of Gentoo Laws*' গ্রন্থেই আমরা সর্বপ্রথম বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষের একটি সংক্ষিপ্ত রূপের সন্ধান পাই। সেদিক থেকে এর মূল্য অনস্বীকার্য।

এই বাংলা শব্দসংগ্রহ থেকে কয়েকটি শব্দ নীচে উদ্‌ধৃত করা হল:

Bāzar, A Market. Haut, A Weekly Market for various goods.
Berhemchārry, A Man who has studied Divinity Twelve Years.
Cheyt, One of the Bengal Months, answering to Part of March and April.
Dān, A religious Ceremony. Ghee, Clarified Butter.
Grām, in the Bengal Language, it means a Village.
Leekhuk, A Secretary or Writer. Pāan, The Beetle Plant.
Nandee Mookheh, A Ceremony preparative to a Marriage.
Phāugoon, One of the Bengal Months, answering to part of February and March.
Poojeh, Worship. Pootee, A Book or Compilation.
Pundit, A learned Bramin. Sagh, Vegetables, Greens.
Seemul, A Species of cotton. Sumooder, The Sea or main Ocean.
Terkarree, The Species of Gourds.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা মুদ্রণে পর্তুগীজ প্রভাব : মুদ্রিত গ্রন্থে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সূত্রপাত

বাংলা অক্ষরের যেসব আদি মুদ্রিত প্রতিলিপির আলোচনা শেষ করা গেল, সেগুলিকেই আমরা পরবর্তী বাংলা মুদ্রণের প্রস্তুতি পর্বের পরিচায়ক বলে গ্রহণ করেছি। কিন্তু প্রস্তুতির আরো একটা দিক ছিল। অষ্টাদশ শতকে এমন কিছু কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলিতে প্রথম বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে, কিন্তু সেই বাংলা ছিল রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। সঞ্চালনযোগ্য বাংলা হরফের উদ্ভব তখনো হয়নি। তাই বাংলা ভাষাকে মুদ্রিত বইয়ের আকারে প্রকাশ করার তাগিদ রোমান অক্ষরের সাহায্যেই মেটাতে হয়েছিল। তথাপি এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আগের অধ্যায়ে আলোচিত বইগুলিতে কেবল প্রসঙ্গক্রমে বাংলা বর্ণমালার নমুনাই ছাপা হয়েছিল, কিন্তু মূল বইয়ের ভাষা ছিল ভিন্ন। অপরপক্ষে, এগুলিতে গ্রন্থকারের বক্তব্যের বাহন হয়েছিল বাংলা ভাষা, কিন্তু মুদ্রাক্ষর ছিল ভিন্ন। তাই পরবর্তী বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ঐতিহাসিক পর্ব গড়ে তোলার কাজে এও এক ধরনের প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতিপর্বে মূল অবদান পর্তুগীজদের। তাঁরাই প্রথম রোমান অক্ষরে মুদ্রিত বাংলা বই প্রকাশের পথ দেখালেন। পরবর্তী যুগে তারই সূত্রে ইংরেজরা শুরু করেন বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বাংলা বইয়ের প্রকাশ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, পর্তুগীজ মিশনারী সম্প্রদায় প্রকাশিত এইসব বই আমাদের আলোচ্য বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। কারণ বাংলা মুদ্রাক্ষরে ছাপা বইই আমাদের প্রধান আলোচ্য। তাই রোমান অক্ষরে ছাপা এই বইগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসাবে তাদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করাই সমীচীন মনে করেছি। পূর্বসূরীদের আলোচনাই এ বিষয়ে আমাদের প্রধান অবলম্বন। জি. এ. গ্রিয়ারসন, ফাদার এইচ. হস্টেন, সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন, সজনীকান্ত দাস প্রভৃতি এই বইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা বা এগুলি সম্পাদনা করেছেন।[১] এই পর্যায়ের প্রধান দুটি বই : মানোএল্ দা আস্‌সুম্পসাম্

১ G. A. Grierson, '*Linguistic Survey of India*' (1903), Vol. V. pt. 1, p. 23.
Fr. H. Hosten, 'The Three First Type-Printed Bengali Books' : '*Bengal, Past & Present*', July-Dec. 1914, Vol. IX, pp. 40-63.

রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' এবং 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা-পর্তুগীজ শব্দ-সংগ্রহ'; রোমান অক্ষরে লিখিত বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত এই বই দুটি ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে লিসবন থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পাদ্রি মানোএল্ ছাড়াও দোম্ আন্তোনিও ও বেন্টো দ্য সিলভেস্রে রচিত বইও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পর্তুগীজ মিশনারী-রচিত এই বাংলা বইগুলি আলোচনার পটভূমি হিসাবে বাংলাদেশে পর্তুগীজ আগমনের প্রাথমিক ইতিহাসের সন্ধান নেওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে J. J. A. Campos রচিত '*History of the Portuguese in Bengal*' (Calcutta, 1919), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস', এবং মানোএলের দুটি বই সম্পাদনা প্রসঙ্গে ('প্রবেশক') সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনা বিশেষ নির্ভরযোগ্য।

বাংলাদেশে পর্তুগীজ আগমন ও পর্তুগীজ-বাংলা খ্রীস্টান সাহিত্যের উদ্ভব

১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামার নেতৃত্বে পর্তুগীজেরা প্রথম ভারতে পদার্পণ করে। তারা জলপথে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে কেরলের কালিকট বন্দরে এসে প্রথমে নামে। সেখান থেকে ক্রমশ পশ্চিম উপকূল ধরে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে গোয়া দখল করে ও সেখানেই তাদের শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলে। তারপর থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার, সাম্রাজ্য গঠন এবং খ্রীস্টধর্মপ্রচার— প্রধানত এই তিনটি উদ্দেশ্যে পর্তুগীজদের বহুমুখী কর্মধারা ভারতের নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে বাণিজ্য-ব্যপদেশে, বিশেষ করে ধনসম্পদের আকর্ষণে তারা প্রথম বাংলাদেশে উপনীত হয় এবং দেখা যায়, সেখানে কিছুকালের মধ্যে মুসলমান শাসনকর্তাদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে; ফলতঃ ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তারা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ঐ সময়ে গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তা নুনো-দা-কুঞা (Nuno da Cunha) পাঁচখানি জাহাজে দু'শ পর্তুগীজ সৈন্য রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। পরে আরো সৈন্য প্রেরিত হয় এবং তারা স্থানীয় রাজনৈতিক সংঘর্ষের অংশীদার হয়ে ওঠে। এখানে তারা ব্যাপক সাম্রাজ্য স্থাপন করতে না পারলেও, ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশে, বিশেষ করে

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুশীলকুমার দে প্রণীত প্রবন্ধ: সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৩ সাল (১৯১৬)। কেদারনাথ মজুমদার, 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' (ময়মনসিংহ, ১৯১৭) গ্রন্থে মানোএলের 'শব্দসংগ্রহে'র আখ্যাপত্রের চিত্র প্রকাশিত হয়।

Sushil Kr. De, '*Bengali Literature in The Nineteenth Century*' 1919. Suniti Kr. Chatterji, '*Origin and Development of Bengali Language*', 1926.

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত, মানোএল-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩১)।

সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'প্রবেশক' ও টীকা সহ), ১৯৩৯ খ্রীঃ।

নিম্নবঙ্গ ও বঙ্গোপসাগরে ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে অবাধ লুঠতরাজ ও দুর্ধর্ষ জলদস্যুতা চালিয়ে যায়। 'হরমাদে'র (পর্তুগীজ রণতরী) ভয়ে তখন অন্য কারো জলপথে যাতায়াত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। [ষোড়শ শতকের শেষ পাদে লেখা কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়:

'ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হরমাদের ডরে।']

কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষ পাদ থেকেই তাদের এই রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং শক্তিমদমত্ততা খর্ব হতে থাকে; এবং এর কিছুকালের মধ্যেই তা অত্যন্ত দুর্বল, কোথাও বা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশের মোগল শাসকেরা পর্তুগীজদের হুগলী বন্দর কেড়ে নেওয়ায় এবং ১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে মোগল প্রতিনিধি শায়েস্তা খাঁ তাদের চট্টগ্রাম থেকে উচ্ছেদ করায় পশ্চিম ও পূর্ব বাংলায় পর্তুগীজ শক্তি হীনবল হয়ে পড়ে।

কিন্তু পর্তুগীজ-ইতিহাসের অপর যে ধারা— খ্রীস্টধর্মপ্রচার, তা আরো দীর্ঘকাল বাংলা দেশে সক্রিয় হয়ে থাকে এবং বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারাকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে তুলতে সাহায্য করে। খ্রীস্টধর্মের সূত্রে অষ্টাদশ শতক ও তারপরেও পর্তুগীজদের (মিশনারীদের) প্রভাব জীবন্ত ছিল। পর্তুগীজেরা অনেক নতুন বিদেশীবস্তু, নতুন গাছ-গাছড়া এবং অনেক নতুন রীতিনীতি ও অনুষ্ঠান (যেমন, নীলাম, স্তুতি) এদেশে নিয়ে আসে ও প্রচলন করে।[1] সেইসব বস্তু ও রীতিনীতির পরিচায়ক শব্দ পর্তুগীজ ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে এবং এখনো তা প্রচলিত আছে।

সপ্তদশ শতকে বাংলাদেশে পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা দেখা দেয়। এই শতকের প্রারম্ভে হুগলী ও ঢাকায় পর্তুগীজ পাদ্রিদের বড়ো বড়ো কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলে বহু দেশী ও মিশ্র খ্রীস্টান বসতি স্থাপন করেন। যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন পর্তুগীজ মিশনারীরা বড়ো বড়ো গীর্জা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। ফরাসী পর্যটক তাভেয়ার-নিয়ে (Tavernier) অনুমানিক ১৬২০ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশে এসে ঢাকার বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখেন যে সেখানকার অগস্তীনীয় সম্প্রদায়ের গির্জাটি ছিল খুব বড়ো ও সুন্দর। ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়ালে পর্তুগীজ-মিশনারীদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এ ছাড়া হুগলীতেও তাঁদের গির্জা ও আস্তানা ছিল। ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ আর-একজন বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক বেয়ারনিয়ে (Bernier) লিখেছেন যে, বাংলাদেশে আট-নয় হাজার ঘর 'ফিরাঙ্গী' বা

---

১ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মানোএলের 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', প্রবেশক।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়', '*Origin and Development of Bengali Language*'.
অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮ সাল, ১ম সংখ্যা।

পর্তুগীজের[১] বাস ছিল এবং এখানে পর্তুগীজ জেসুইট ও অগস্তীনীয় উভয় সম্প্রদায়ের মিশনারীই ছিল।

ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে পর্তুগীজ-মিশনারীরা যে কবে প্রথম বাংলাদেশে পদার্পণ করেছিলেন— তা বলা যায় না। অনুমান, ষোড়শ শতকের শেষ পাদে কোনো এক সময়ে তাঁরা বাংলাদেশে প্রবেশ করে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। এই প্রচারকার্যের জন্য বাংলাভাষা চর্চা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই পর্তুগীজ পাদ্রিরা বাংলা শিখে পর্তুগীজ ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় রোমান-ক্যাথলিক ধর্ম-সংক্রান্ত বই অনুবাদ করতে প্রয়াসী হন। এই অনুবাদ-গ্রন্থগুলিকে বাংলা ভাষায় খ্রীস্টান সাহিত্যের ভিত্তি স্বরূপ বলা যায়। এই সাহিত্য রচনায় পর্তুগীজরা ছিলেন ইংরেজদের পথিকৃৎ। কিন্তু এই গ্রন্থগুলির অধিকাংশই আজ আর পাওয়া যায় না।

ঢাকা অঞ্চলেই প্রথম এই ফিরিঙ্গি-বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব। জেসুইট পাদ্রি মার্কস আন্তনিও সাতুচি (Marcos Antonio Satuchi) ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে পর্তুগীজ মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে লেখা তাঁর বিবরণী থেকে পাদ্রিদের বাংলা ভাষা চর্চার প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। তিনি লেখেন: 'The fathers have not failed in their duty; they have learned the language well, have composed vocabularies, a grammar, a confessionary and prayers; they have translated the Christian doctrine, etc. nothing of which existed till now.'[২] ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মপ্রচারক ফ্রান্সিস্কো ফের্নান্দেস্ (Francisco Fernandes) পূর্ববঙ্গে সোনারগাঁর নিকটবর্তী শ্রীপুর থেকে গোয়ায় উক্ত সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ নিকোলাস পিমেন্তার (Nicolas Pimenta) কাছে একটি চিঠি লেখেন। এতে উল্লেখ আছে যে, ফেরনান্দেস্ খ্রীস্টধর্মের মূল কথাগুলির ব্যাখ্যা ও হিন্দুধর্মের কুসংস্কার খণ্ডন প্রসঙ্গে ছোটো একটি বই ও একটি প্রশ্নোত্তরমালা লেখেন। ফেরনান্দেসের সহকর্মী পাদ্রি দোমিনিক দে-সুজা (Father Dominic De Souza) এই দুটি বই বাংলা ভাষায় ('Bengalla') অনুবাদ করেন।[৩] ধর্মপ্রচারক পাদ্রি বারবিয়ে (Barbier)-র

---

১ 'Franguis, Portugals' বলেও উল্লিখিত হয়: '*Travels*', p. 27. S. K. De, '*Bengali Literature in the Nineteenth Century*', p. 58.

২ '*O Chronista de Tissuary*', Goa, Vol. ii, 1867, p. 12 : quoted by H. Hosten, '*Bengal, Past & Present*', Vol. IX, July-Dec. 1914.

৩ H. Hosten, '*Bengal, Past & Present*', Vol. VI, July-Dec. 1910, p. 220, quoting 'Extrait de Lettres du p. Nicolas Pimenta'...Anvers, Trognese, 1601.

S. K. De, *op. cit.*, p. 59.

S. K. Chatterjee, *op. cit.*, p. 233.

লেখা চিঠি (Lettres Edifiantes et Curieuses) থেকে জানা যায় যে ১৭২৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বারবিয়ে বাংলায় খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে ছোটো একটি বই রচনা করেন।[১] এইসব বিক্ষিপ্ত তথ্য থেকে অনুমান করা যায় যে ষোড়শ শতকের শেষ পাদ থেকেই পর্তুগীজ মিশনারী সম্প্রদায় বাংলাদেশে খ্রীস্টধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাভাষা চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং বাংলায় ধর্মগ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও প্রচারে ব্রতী হন। তাঁদের এই প্রচেষ্টার ফলেই বাংলা-ভাষায় পর্তুগীজ-বাংলা খ্রীস্টান সাহিত্যের একটি নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়, যা প্রায় দুশো বছর ধরে বাংলাদেশের খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবন্ত ছিল। পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে এটি আর-এক নতুন ইংরেজি-বাংলা খ্রীস্টান সাহিত্যের পত্তন করে।

উপরোক্ত পর্তুগীজ-বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশই আজ বিলুপ্ত, সেগুলি আদৌ মুদ্রিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। কেবলমাত্র পাদ্রি মানোএল্ দ্য আস্সুম্পসাম্ রচিত দুটি বই মুদ্রিত আকারে পাওয়া গেছে। বই দুটি ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে লিসবন থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ; একটি 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' ও অপরটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ। মানোএলের নামের সঙ্গে জড়িত আরেকটি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দোম্ আন্তোনিও দ রোজারিও (Dom Antonio do Rozaria) নামে একজন দেশী বাঙালী খ্রীস্টান 'ব্রাহ্মন-রোমান ক্যাথলিক-সংবাদ' নামে একখানি বই রচনা করেন। এই দোম্ আন্তোনিও ভূষণার রাজকুমার ছিলেন। ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে মগেরা তাঁকে বন্দী করে আরাকানে নিয়ে যায়, কিন্তু মানোএল্ দ্য রোজারিও নামে জনৈক পর্তুগীজ পাদ্রি টাকা দিয়ে তাঁকে খালাস করে আনেন, ও পরে তাঁকে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষা দেন। দোম্ আন্তোনিও সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষপাদে খ্রীস্টান ধর্মগুরুদের নির্দেশ অনুসারে বইখানি লেখেন। তাঁর বই বাংলা দেশে পর্তুগীজ পাদ্রিদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয়। ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে ভূষণার অন্তঃপাতী কোষাভাঙ্গা থেকে ঢাকার ভাওয়াল পরগণার নাগরী গ্রামে পর্তুগীজ পাদ্রিদের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। মনে হয় ঐ সময় দোম্ আন্তোনিওর বইও ভাওয়ালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সম্ভবত ১৭২৬ খ্রীস্টাব্দের পরে দোম্ আন্তোনিওর বই মুদ্রণ ও প্রকাশনের উদ্দেশ্যে পর্তুগালে পাঠানো হয়েছিল। মুদ্রণের উদ্দেশ্যে রোমান লিপিতে ঐ বইয়ের অক্ষরান্তর করা হয়েছিল, পাদ্রি মানোএল্ পর্তুগীজ ভাষায় এর অনুবাদও করেছিলেন। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক বইটি শেষ পর্যন্ত আর মুদ্রিত হয়নি, পাণ্ডুলিপি আকারেই পর্তুগালের এভোরো নগরীর গ্রন্থাগারে পড়ে ছিল। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় এই বইয়ের মূল বাংলার অধিকাংশ রোমান অক্ষরে বাংলা অক্ষরান্তরীকরণ সমেত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।[২]

১ S. K. De, *op. cit.*, p. 59.

২ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবেশক : 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' (সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত)।

মানোএল্-রচিত প্রথম মুদ্রিত বাংলা বই

পর্তুগীজ-বাংলা খ্রীস্টান সাহিত্য পরম্পরায় দোম্ আন্তোনিওর বইয়ের পরেই পাওয়া যায় মানোএলের দুটি বই। পূর্বোক্ত বইগুলির মধ্যে কেবলমাত্র এই দুটিই ছিল মুদ্রিত, যা আজ পর্যন্ত সন্ধান করা গেছে। সুতরাং মানোএলের বই দুটি প্রাচীনতম মুদ্রিত বাংলা বই হিসাবে এক বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। তবে এগুলিতে বাংলাভাষা ব্যবহৃত হলেও রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল। এর একটি খ্রীস্টান ধর্মের ব্যাখ্যাসম্বলিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' ও অপরটি বাংলাভাষার ব্যাকরণ সমেত বাংলা-পর্তুগীজ ও পর্তুগীজ-বাংলা শব্দ-সংগ্রহ।

পাদ্রি মানোএল্ দা আস্‌সুম্পসাম্ খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পর্তুগাল থেকে বাংলাদেশে আসেন। তাঁর বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দ-সংগ্রহ গ্রন্থের প্রারম্ভে ভাই জর্জ-দা-আপ্রেজেন্তাসাউ কর্তৃক ভাই মিগেল-দে-তাভোরো মহাশয়ের উদ্দেশ্যে লিখিত ভূমিকা থেকে (p. ii) জানা যায়,…'গ্রন্থকারের জন্ম এভোরো নগরে…মহাশয়ই তাঁহাকে ভারতীয় প্রচার মণ্ডলীর জন্ম পাঠাইয়া ছিলেন।' এ দেশে এসেই মানোএল্ বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেন এবং ধর্মপ্রচারার্থে ('for the easier instruction of his neophytes': Hosten) গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়াল পরগণার নাগরীতে বসে তিনি তাঁর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' রচনা করেন। এই সময় তিনি অপর একটি গ্রন্থ— বাংলা-পর্তুগীজ ও পর্তুগীজ-বাংলা শব্দ-সংগ্রহ সহ বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা সমাপ্ত করেন। ঐ সময়ে তিনি পূর্বভারতের মণ্ডলীভুক্ত অগস্তীনীয় সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন। [তাঁর ব্যাকরণ ও শব্দকোষের আখ্যাপত্র থেকে এ তথ্য জানা যায়।] ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ বাংলা দেশে সিদ্ধ নিকোলাস-দে-তোলেন্তিনোর নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রচার-কেন্দ্রের তিনি পরিচালকও হয়েছিলেন। ['Rector of the Mission of St Nicolas of Tolentino in the Kingdom of Bengalla': Hosten] ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেলে অবস্থিত অগস্তীনীয় মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁর নাম পাওয়া যায়।[১] মানোএল্ সম্বন্ধে ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দ ও ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ— এই দুই তারিখের আগের ও পরের আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না।

১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ রচিত মানোএলের বই দুটি পরে মুদ্রণের জন্য পর্তুগালে প্রেরিত হয়। পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে 'রাজকীয় পুস্তকালয় ও মন্ত্রণাসভার পুস্তকাধ্যক্ষ' ফ্রান্সিস্কো দা সিলভা ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে বই দুটি রোমান অক্ষরে মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' বইটির দুটি মাত্র কপির অস্তিত্বের কথা জানা গেছে। একটি পর্তুগালে লিসবন শহরের জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে, আরেকটি খণ্ডিত কপি পাওয়া গেছে

১ J. J. A. Campos তাঁর *'Bandel : History of the Augustinian Convent of the Church of Our Lady'* নামক বইয়ের ৮৪-৮৯ পৃষ্ঠায় পর্তুগীজ মঠাধ্যক্ষদের যে আনুমানিক পরম্পরা দিয়েছেন তা থেকেই এটি জানা যায়।

কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে। মানোএলের ব্যাকরণ ও শব্দ-সংগ্রহ-এরও দুটি কপি পাওয়া যায়— একটি লণ্ডনে বৃটিশ লাইব্রেরিতে, অপরটি লিসবনের জাতীয় গ্রন্থাগারে।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ'— খ্রীস্টান গুরু ও শিষ্যের কথোপকথন সম্বলিত। মূল বইটি আকারে ছোটো, পৃষ্ঠাগুলির মুদ্রিত অংশের পরিমাপ ৫"×৩"। পর্তুগীজ ও বাংলা ভাষায় রচিত ৩৮৪ পৃষ্ঠার মূল বইটির অর্ধেক অর্থাৎ ১৯২ পৃষ্ঠা ব্যাপী বাংলা অংশ ; বইটির বিজোড় সংখ্যার পৃষ্ঠায় আছে পর্তুগীজ ও জোড় সংখ্যার পৃষ্ঠায় বাংলা। বইখানি দুই 'পুথি' বা খণ্ডে বিভক্ত, প্রত্যেক 'পুথি' আবার কতকগুলি 'তাজেল' বা অধ্যায়ে বিভক্ত। বইটিতে মোটামুটি রোমান-কাথলিক ধর্মের ধর্মবীজ, মূল বিশ্বাসসমূহ এবং অনুষ্ঠানসমূহের ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যাকে বিশদ করে দেবার জন্য কতকগুলি (৬১ টি) ধর্মমূলক উপাখ্যানও এতে দেওয়া হয়েছে। এখন আমাদের কাছে এই বইটি বাংলা ভাষার প্রাচীন গদ্যের নিদর্শন হিসাবে এবং রোমান অক্ষরে লিখিত বলে পুরনো বাংলার উচ্চারণ-নির্দেশক বই হিসাবে বিশেষ মূল্যবান।[১]

ভাষার নমুনা হিসাবে বইটির রোমান অক্ষরে লিখিত বাংলা আখ্যাপত্রটি নীচে উদ্ধৃত হল :

CREPAR/XAXTRER/ORTH, BHED/XIXIO GURUR/BICHAR/ Fr. MANOEL/DA ASSUMPCAM,/Leqhiassen, o buzhaiassen Bengallate/ Baoal dexe ; xon hazar xat xoho pointix bossor/christor zormo bade,/ BHETTON/Coril o boro tthacurque/D. Fr. MIGUEL/de Tavora/Evorar Xoborer Arcebispo/—/LISBOATE/FRANCISCO DA SYLVAR XAZE/ Patxaer Quitaber xap corinia/Xpor zormo bossore 1743/Xocol uchiter hucume.

এটি বাংলায় অক্ষরান্তরিত করলে দাঁড়ায় :

কৃপার/শাস্ত্রের/অর্থ-ভেদ শিষ্য গুরুর/বিচার/ফ্র. মানোএল/দা আসুম্পসাম/লিখিয়াছেন, ও বুঝাইয়াছেন বেঙ্গালাতে / ভাওয়াল দেশে ; সন হাজার সাত শহ পঁয়তিশ বছর / খ্রিস্তর জর্ম বাদে। / ভেটন / করিল বড়-ঠাকুরকে / দ. ফ্র. মিগেল / দে তাভোরা / এভোরার সহরের আর্সেবিস্পো / লিসবোয়াতে / ফ্রান্সিস্কো দা সিলভার সাজে / পাতসায়ের কিতাবের ছাপ করিনিয়া / খ্রির জর্ম বচ্ছরে ১৭৪৩/ সকল উচিতের হুকুমে।[২]

বইটির পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত নাম (title) : CATHECISMO/DA/DOUTRINA/ CHRISTAA.

---

১ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবেশক : 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' (সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত)।

২ সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ১৩৪৬ সাল।

মানোএলের মূল ব্যাকরণ ও শব্দ-সংগ্রহটিও একখানি ছোটো আকারের বই— মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা xi, 592 ; প্রথম এগারো পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা, তারপরে ১-৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যাকরণ। পরিশেষে ৪১-৫৯২ পৃ. পর্যন্ত শব্দ-সংগ্রহ ; ৪১-৩০৬ পৃ. পর্যন্ত বাংলা-পর্তুগীজ ও ৩০৭-৫৭০ পৃ. পর্যন্ত পর্তুগীজ-বাংলা, এবং ৫৭১-৫৯২ পৃ. পর্যন্ত বাকি অংশে নানারূপ শব্দ শ্রেণী হিসাবে সংগৃহীত হয়েছে— যেমন, তিথির নাম, সংখ্যাবাচক নাম, সপ্তগ্রহের নাম, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের নাম, ব্রাহ্মণের গায়ত্রী মন্ত্র (সংস্কৃতে), ঈশ্বরের গুণাবলী এবং সর্বশেষে সমোচ্চার্য বাংলা শব্দাবলী।[১]

কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ গ্রন্থে যে বাংলা ব্যবহৃত হয়েছে তা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পূর্ববঙ্গের ভাওয়াল অঞ্চলে ব্যবহৃত বাংলা। মানোএল তাঁর ব্যাকরণে ঐ ভাষাই ব্যবহার করেছেন।

তাঁর ব্যাকরণ ও শব্দ-সংগ্রহ বইটির আখ্যাপত্র পর্তুগীজ ভাষায় এইভাবে লিখিত আছে : VOCABULARIO/EM IDIOMA/BENGALLA,E/PORTUGUEZ./Dividido em duas partes/DEDICA DO/AO EXCELLENT. REVER. SENHOR./ D. FR. MIGUEL/DE TAVORA/Arcebispo de Evora do Concelho de Sua Magestade./Foy deligencia do padre/FR. MANOEL/DA ASSUMPC, AM/ Religioso ,Eremita de Santo Agostinho da Congrega-/cao da India Oriental./LISBOA ; /Na Offic, de FRANCISCO DA SYLVA./ Livreiro da Academia Real, e do Senado./ Anno M.DCCXLIII/Comtodas as Licencas necessarias.

প্রিয়রঞ্জন সেন এর বাংলা অনুবাদ করেছেন :

বাঙ্গালা / ও / পোর্তুগীস / ভাষার / শব্দকোষ / দুই ভাগে বিভক্ত / রাজকীয় মন্ত্রণা-সভার সদস্য, এভোরার মুখ্য-ধর্মযাজক / অশেষ-গুণ-নিধান পরম-ভক্তি-ভাজন-মহাদাশয় / শ্রীযুক্ত ভাই মিগেল-দে-তাভোরো মহাশয়ের উদ্দেশ্যে / পূর্ব-ভারতীয় মঠের সাধু আউগুস্তীনীয়-সম্প্রদায়-ভুক্ত সন্ন্যাসব্রতধারী / পাদ্রি মানোএল-দা আস্সুম্প্সাঁউ-এর-পরিশ্রম-ফল / উৎসৃষ্ট-হইল / লিসবোআ / রাজকায় পুস্তকালয় ও মন্ত্রণাসভার পুস্তকাধ্যক্ষ / ফ্রান্সিস্কো-দা-সিল্ভার দপ্তরে / ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দ / যাবতীয় প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র সমেত।

মূল পুস্তকান্তর্গত ব্যাকরণ অংশে পর্তুগীজ ও বাংলা ভাষা একই পৃষ্ঠায় পাশাপাশি রোমান অক্ষরে লিখিত হয়েছে। নীচে কিছুটা নমুনা উদ্ধার করা হল :

BREVE COMPENDIO/DA/GRAMMATICA/BENGALA/NOMINATIVOS/PRIMEIRA/DECLINACAM/Todos os nomes da Primeira

---

১ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবেশক : 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ'।

declinacao acabao em be/tra/vogal ; aqual se acrecenta no Genitivo a/letra R.v.g.

Numero	Singular.
Nominativo	Lohā, farro.
Genitivo	Lohār.
Dativo	Lohāré.
Accusativo	Lohāré, vel lohāque.
Vocativo	O Lohā.
Ablativo	Lohāte.
Numero plural. N.	Lohārā.

প্রিয়রঞ্জন সেন এর বাংলা অনুবাদ করেছেন :

বাঙ্গলা ব্যাকরণের / সংক্ষিপ্তসার / কর্তৃপদ / প্রথম গণ / প্রথম গণের সকল শব্দ স্বরবর্ণ দিয়া শেষ হয় ; ষষ্ঠীতে -র অক্ষর যুক্ত হয়। যথা—

	একবচন
কর্তৃকারক	লোহা-লৌহ
সম্বন্ধ	লোহার
সম্প্রদান	লোহারে
কর্ম	লোহারে বা লোহাকে
সম্বোধন	অ (ও) লোহা
অপাদান	লোহাতে
বহুবচন, কর্তৃকারক	লোহারা

...

মানোএল-এর বইগুলির পরেই বেন্টো দ্য সিল্‌ভেস্ত্রে (Bento de Silvestre) ওরফে দ্য সুজা (de Souza) রচিত দুটি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। রোমান ক্যাথলিক মিশনারীদের পর বেন্টোই ছিলেন প্রথম প্রোটেস্টান্ট পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারক যিনি বাংলা গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হন। বেন্টো দিনেমার মিশনারী John Zacharia Kiernander -কর্তৃক প্রোটেস্টান্ট মতে দীক্ষিত হন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রোটেস্টান্ট মিশনারী ছিলেন উইলিয়ম কেরী। কথিত আছে, বেন্টো ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে গোয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে প্রায় পনেরো বছর তিনি বাংলাদেশে, বিশেষ করে কলকাতা ও ব্যাণ্ডেল অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের কাজে কাটান।[১] ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে, মতান্তরে

১ W. H. Carey, '*Oriental Christian Biography*', Calcutta, 1850. Vol. II, p. 182,
S. K. De, *op. cit.*, p. 69,

১৭৬৮ বা ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে, তিনি প্রোটেস্টান্ট মিশনে বার্ষিক ২০ পাউণ্ডের বিনিময়ে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ধর্মশিক্ষাদানের কাজে নিযুক্ত হন।[১] বেন্টো ফরাসী, পর্তুগীজ, বাংলা ও হিন্দুস্থানী ভাষা জানতেন। সম্ভবত ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ধর্ম-প্রচারের সুবিধার্থে বেন্টো ***'Book of common Prayer'*** ও ***'Catechism'*** থেকে কিছু কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁর অনূদিত 'প্রশ্নোত্তরমালা' ও 'প্রার্থনামালা' নামে প্রচলিত দুটি বই রোমান অক্ষরে লণ্ডনে মুদ্রিত হয় ও 'Society for the Promotion of Christian Knowledge' নামক সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[২] নগেন্দ্রনাথ বসু 'প্রশ্নোত্তর মালা'র প্রকাশকাল ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দ বলে উল্লেখ করলেও, সুশীলকুমার দের মতে তা ১৭৬৬ বা ১৭৬৮–৬৯ খ্রীস্টাব্দের পরে, অর্থাৎ বেন্টোর ধর্মশিক্ষকের পদে নিয়োগের পরে, প্রকাশিত। কিন্তু এই দুটি বইয়ের অস্তিত্বের সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি।

বাংলা ভাষা-সাহিত্যে পর্তুগীজ অবদানের এই যেসব নিদর্শনের উল্লেখ এতক্ষণ করা হল, দোম আন্তোনিও ও মানোএল-এর বইগুলি ছাড়া তাদের আর কোনোটিরও অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়নি, এবং বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে তাদের কোনো উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। আলোচ্য প্রস্তুতি পর্বে মুদ্রণের এটি একটি ধারা মাত্র, যা উল্লিখিত না হলে এই পর্বের সম্যক পরিচয় নির্ধারণ সম্ভব হত না। পরবর্তী বাংলা মুদ্রণের যুগান্তকারী অধ্যায়কে ত্বরান্বিত করতে এগুলি কিছুটা সহায়ক হয়েছিল বলা চলে।

---

১ *Ibid.*

২ S. K. De, *op. cit*, p. 69,

সূচনা পর্ব

(১৭৭৮-১৭৯৯)

প্রথম অধ্যায়

বিবর্তনের পথে বাংলা মুদ্রণ

১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু করে ঐ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত অর্থাৎ ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময়কালকে আমি বাংলা মুদ্রণের স্থচনা পর্ব বলে চিহ্নিত করেছি। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলা সঞ্চালনযোগ্য মুদ্রাক্ষরের (movable types) জন্ম ও তার সহায়তায় হালহেডের ব্যাকরণ প্রকাশনের সঙ্গে সঙ্গে এই পর্বের স্থচনা। তারপর থেকেই শুরু বাংলা মুদ্রণের পথ চলা— স্থচনা পর্বের অনভ্যস্ত দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে থেমে থেমে এগিয়ে চলা। এ যেন ভগীরথের সাধনায় তুষ্ট গঙ্গার মর্ত্যভূমি স্পর্শ করার পর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উপলখণ্ড সমাকীর্ণ বন্ধুর প্রান্তর ভেঙে আপন গতিপথ খুঁজে নেবার জন্য বিসর্পিল মন্থর গতিতে এগিয়ে চলার সঙ্গে তুলনীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বাংলা মুদ্রাক্ষরশিল্পকে একটা সীমিত উদ্দেশ্যসহায়ক পাশ্চাত্য রীতিসম্মত নির্দিষ্ট রূপ দেবার প্রয়াস চলেছিল, আর অন্ধকার রাজ্যে বিদ্যুচ্চমকের মতো এরই মাঝে মাঝে কিছু কিছু বাংলা বইয়ের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে দেশজোড়া কোনো অখণ্ড মুদ্রণ-পরিমণ্ডল গড়ে উঠতে পারেনি। একটানা ছেদবিহীন মুদ্রণপ্রচেষ্টা তখনো অনারব্ধ। সারা বছর ধরে বা আলোচ্য পর্বের প্রতিটি বছরেই যে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য বাংলা ছাপার কাজ চলেছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বর্তমান নিবন্ধ রচনার সময় পর্যন্ত (১৯৭৫ সালের মধ্যে) এই পর্বের যে কটি বাংলায় ছাপা বইয়ের সন্ধান করা গেছে তার সংখ্যা প্রায় ষোল এবং বাংলা মুদ্রণের নিদর্শন সম্বলিত ইংরেজি পত্রিকার সংখ্যা দুই। অনুমান করা যায়, ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে দেশে ও বিদেশে, বিশেষ করে লণ্ডনের গ্রন্থাগারাদিতে, হয়তো আরো কিছু অনুরূপ বাংলা বই বা সাময়িকপত্র আবিষ্কার করা সম্ভব।[১] এইসব বই বা পত্রিকা প্রধানত বিদেশাগত বণিক ও শাসক সম্প্রদায়ের কিছু কিছু জরুরী প্রয়োজন মেটাবার তাগিদেই ছাপা হয়। এই পর্বের প্রথম ছাপা বই (হালহেডের ব্যাকরণ, ১৭৭৮ খ্রীঃ) ও শেষ ছাপা বইয়ের (ফরস্টারের ইংরেজি-বাংলা শব্দকোষ, ১৭৯৯ খ্রীঃ) হরফে যে খুব একটা গুণগত মৌলিক পার্থক্য বা উন্নতি দেখা গেছে তা বলা যায় না। প্রাথমিক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য বা দৌর্বল্য, অসম্পূর্ণতা

---

১ সাম্প্রতিকতম প্রকাশন Graham Shaw রচিত '*Printing in Calcutta to 1800*' (লণ্ডন, ১৯৮১) গ্রন্থে বাংলা মুদ্রণের নিদর্শন সম্বলিত ৩১টি বইয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। লণ্ডনের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত ঐ সব নবাবিষ্কৃত বইয়ের অধিকাংশই (১৮টি) সমসাময়িক আইনের বঙ্গানুবাদ।

বা অনভিজ্ঞতাপ্রসূত ত্রুটি-বিচ্যুতি, পুঁথির আদর্শে প্রভাবিত মুদ্রাক্ষরের জটিলতা বা অক্ষর -সাজানোর (composing) অসম বঙ্কিম ভঙ্গি বা মাত্রামিলের অভাব এই পর্বের মুদ্রাক্ষর বিন্যাসে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। তাই এই সময়ের সব প্রচেষ্টাকেই আমরা সূচনা পর্বের লক্ষণাক্রান্ত বলে অভিহিত করেছি। নতুন ভাবের প্রেরণা ও বিপুল কর্মের জোয়ার এসেছিল এর পরবর্তী পর্বে— ঊনবিংশ শতাব্দীর চৌহদ্দিতে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে। সেই হিসাবে বলা যায়, ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাংলা মুদ্রণের সূচনা পর্ব অতিক্রান্ত ও বিকাশ পর্বের শুরু।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সূচনা পর্বে যা কিছু প্রকাশিত, তা প্রায় সবই তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের তাগিদে। এগুলির বাহন হিসাবে গড়ে উঠেছিল গদ্য, যা পরোক্ষভাবে বাংলা-সাহিত্যের সমৃদ্ধির পথ প্রসারিত করেছিল। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম, এই পর্বে প্রকাশিত একমাত্র কাব্যগ্রন্থ— বাংলায় মুদ্রিত প্রথম সংস্কৃত কাব্য, কালিদাসের ঋতুসংহার। এ ছাড়া আর সবই ছিল গদ্য— বিশেষ প্রয়োজনে যার সৃষ্টি। প্রশাসনিক প্রয়োজনে কিছু আইনের তর্জমা এবং কোম্পানীর বিদেশী কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষার্থে ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সংকলন। কখনো বা সাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচারার্থে ইংরেজি সংবাদপত্রে কিছু কিছু বাংলা মুদ্রণ। এইসব মুদ্রিত নিদর্শনগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনেই বাংলা মুদ্রণের সূচনা, ধর্মপ্রচারের প্রেরণায় এর জন্ম নয়। অন্যান্য প্রচলিত মুদ্রণধারা থেকে এখানেই বাংলা মুদ্রণের ব্যতিক্রম ও বৈশিষ্ট্য।

সূচনাপর্বের মুদ্রণপ্রচেষ্টায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ উভয়ই যুক্ত হয়েছিল। সরকার বা কোম্পানীর ছাপাখানার সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনটি ব্যক্তিগত মালিকানায় উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানও বাংলা মুদ্রণের কাজে এগিয়ে এসেছিল। অবশ্য এগুলির মালিক ছিলেন বিদেশীরাই। সম্পূর্ণ দেশীয় উদ্যোগে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা তখনো পর্যন্ত শুরু হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুদ্রণের জোয়ার যখন এল তখনই দেশীয়দের মধ্য থেকেও কেউ কেউ নতুন প্রাণস্পর্শে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে শুরু করেছিলেন। সে ইতিহাস পরবর্তী পর্বে। বক্ষ্যমান পর্বে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন বিদেশীরাই। গ্রন্থরচয়িতা, মুদ্রাকর বা মুদ্রণ-উদ্যোক্তা সবাই বিদেশী। কেবল উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম, একমাত্র বাঙালী মুদ্রণ শিল্পী পঞ্চানন কর্মকার।

১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দ : যুগান্তকারী সৃষ্টির লগ্ন

১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দ বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে স্মরণীয় বছর। এই বছরেই প্রথম সঞ্চালনযোগ্য বাংলা মুদ্রাক্ষরের জন্ম। জনৈক এণ্ড্রুসের হুগলীস্থিত ছাপাখানা থেকে ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড রচিত '*A Grammar of the Bengal Language*' গ্রন্থে সর্বপ্রথম ঐ সঞ্চালনযোগ্য বাংলা হরফ ব্যবহৃত হয়। সেদিন থেকেই বাংলা

সাহিত্য ও মুদ্রণের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা। মুদ্রণ-অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকসমাজ সেদিন হয়ত খবরই রাখেননি তাঁদের অলক্ষ্যে হুগলীর ঐ ছাপাখানাটির মধ্য দিয়ে কতবড়ো নিঃশব্দ বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেল, যার সুদূর-প্রসারী প্রভাবে উন্মোচিত হল বঙ্গসংস্কৃতির এক নতুন দিগন্ত।

যাঁদের যৌথ উদ্যোগে এই যুগান্তকারী ঘটনা সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে প্রধানতম: নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড, চার্লস উইলকিন্স, পঞ্চানন কর্মকার ও হুগলীর ছাপাখানার মালিক এণ্ড্রুস। সর্বোপরি ছিলেন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস। তাঁর আনুকূল্য, সহায়তা ও উৎসাহ না পেলে হালহেডের ব্যাকরণ প্রকাশ আদৌ সম্ভব হত না। হালহেড ও উইলকিন্স উভয়কেই তিনি এই কাজে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং এর প্রকাশনের আংশিক ব্যয় নির্বাহের জন্য পনেরো হাজার টাকা সাহায্য করেছিলেন।[১]

হেস্টিংসের সাংস্কৃতিক কর্মনীতি ও তার অবদান

হালহেডের ব্যাকরণ প্রকাশনায় হেষ্টিংসের এই সক্রিয় ভূমিকা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়। নব প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক স্বার্থে তিনি দেশব্যাপী যে সাংস্কৃতিক কর্মনীতি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এটি ছিল তারই অঙ্গ। প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা ও গ্রন্থপ্রকাশনায় হেষ্টিংসের আনুকূল্যের আরেকটি প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়— হেষ্টিংসের উৎসাহে কোম্পানীর কর্মচারী ফ্রান্সিস গ্লাডউইন '*A Compendious Vocabulary, English and Persian, compiled for the East India Company*' নামে একটি শব্দ-সংগ্রহ সংকলন করেছিলেন। এই শব্দকোষটি ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে মালদহ থেকে প্রকাশিত হয়। এতে কিছু কিছু বাংলা শব্দের উদাহরণ সংকলিত হয়েছে, গ্লাডউইনের ভাষায়, যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের মূল অনুসন্ধান করা ('to endeavour to discover some Traces of the Shanskrit Language in the Bengal Dialect' ; Gladwin)।[২]

প্রাচ্যসংস্কৃতির প্রতি হেষ্টিংসের অনুরাগের আরেকটি প্রমাণ, তাঁরই সুপারিশে উইলকিন্স অনূদিত '*The Bhagvat-Geeta, or Dialogues of Kreeshna and Arjoon*' কোম্পানীর ব্যয়ে বিলেতে মুদ্রিত হয়ে ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। হেষ্টিংসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এই গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে উইলকিন্স লিখেছেন:

'The World, Sir, is so well acquainted with your boundless patronage in general, and···of the personal encouragement you have constantly given to my fellow servants in particular, to render themselves more capable of

---

১ '*Bengal Revenue Proceedings,*' No. 1, dt. 21st January, 1785 ; Amitabha Mukherjee, '*Reform and Regeneration in Bengal,*' p. 346.

২ সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস', পৃ. ২৮।

performing their duty in the various branches of commerce, revenue, and policy, by the study of the languages, with the laws and customs of the natives, that it must deem the first fruit of every genius you have raised a tribute justly due to the source from which it sprang.'

বিদেশী বণিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিভূ হিসাবেই ভারতীয় ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে ওয়ারেন হেস্টিংসের আবির্ভাব। এ দেশের মাটিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতকে সুদৃঢ় করে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর সকল কাজের মূল লক্ষ্য। তাঁর এইসব কাজের প্রতি ভারতীয়-দের সশ্রদ্ধ আকর্ষণ থাকার কোনো কারণ নেই। কিন্তু হেস্টিংস তাঁর সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে যে সাংস্কৃতিক কর্মনীতি অবলম্বন করেছিলেন, পরোক্ষভাবে তা আমাদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছিল। তাঁর এই নীতি বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও বিদ্যা-চর্চা এবং সর্বোপরি বাংলার নব জাগরণের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। তাই বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ওয়ারেন হেস্টিংসের নাম সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণীয়।

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতে কোম্পানী-রাজত্বের শাসন কর্তৃত্বের ভার গ্রহণ করেন ও ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল (১৭৭৪-১৭৮৫) নিযুক্ত হন। তারপর থেকেই খুব দ্রুত তালে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হতে থাকে। বণিকের মানদণ্ড রূপান্তরিত হয় রাজদণ্ডে, এবং হেস্টিংস নিজেই ছিলেন এই রূপান্তরের প্রতিভূ। ['Hastings himself represented the transformation from merchant to empire-builder'][১] রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির ফলেই তিনি এমন একটি সাংস্কৃতিক কর্মনীতি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন যার ফলে এই রূপান্তরের কাজ সুগম হয়েছিল। এদেশের মানুষ ও তার ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে তিনি উপেক্ষা করতে চাননি। জনৈক ঐতিহাসিকের মতে, একটি সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবেই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতিকে বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন। [He sought 'to understand Indian culture as a basis for sound Indian administration.'][২]

হেস্টিংসের সাংস্কৃতিক কর্মনীতির মূল লক্ষ্য ছিল শাসক ও শাসিতের মধ্যে মানসিক সেতুবন্ধন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন শাসক হিসাবে তিনি বুঝেছিলেন, উভয়ের মধ্যে এই মানসিক যোগসূত্র বা ভাবগত আদান-প্রদানের একটি সহজ স্বচ্ছন্দ মাধ্যম গড়ে তুলতে না পারলে কেবলমাত্র ক্ষাত্রশক্তির আস্ফালন ও বলপ্রয়োগে সাম্রাজ্যকে দৃঢ়মূল ও স্থায়ী করা সম্ভব নয়। তাঁর এই অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌঁছনোর অন্যতম উপায় ছিল দেশীয় ভাষাচর্চা। বিদেশী রাজকর্মচারীদের পক্ষে দেশীয় ভাষা শিক্ষা ও চর্চা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে তিনি মনে

---

১ David Kopf, '*British Orientalism and the Bengal Renaissance*', p. 14.

২ P. Spear, ed, '*Oxford History of India*', p. 513.

করতেন। ['Because of Hastings's background and inclinations, he was predisposed toward a new cultural policy in which he aimed at creating an Orientalized service elite competent in Indian languages and responsive to Indian traditions.'][১]

দেশীয় ভাষায় জ্ঞান শাসনকার্য পরিচালনায় অপরিহার্য। এদেশের লোকদের ভাষা না জানলে তাদের অন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি বাংলাভাষাচর্চায় এত উৎসাহী। বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা, বাংলায় আইনের তর্জমা প্রভৃতিতে তিনি যেমন উৎসাহ দিতেন, এগুলি মুদ্রণের জন্যও তিনি তেমনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। মূলত তাঁরই উৎসাহ, প্রেরণা ও সহায়তায় বাংলা মুদ্রণের উৎপত্তি ও প্রসার ঘটেছিল। বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে হেষ্টিংসের কর্মনীতির এটিই শ্রেষ্ঠ অবদান।

দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ অবশ্য হেষ্টিংসের আমলের আগে থেকেই দেখা দিয়েছিল। ইংরেজ বণিকেরা বুঝেছিল কোম্পানীর বাণিজ্যিক স্বার্থেই দেশীয় ভাষাকে আয়ত্ত করা ও স্থানীয় লোকদের জীবনধারা সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করা একান্ত প্রয়োজন। পলাশীর যুদ্ধের পর এই প্রয়োজনীয়তার কথা ক্লাইভ আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই মর্মে তিনি তাঁর কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নির্দেশ কঠোরভাবে পালিত হত। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে কটকের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ব্রিস্টোকে চাকরী থেকে অপসারিত করা হয়, কারণ তিনি স্থানীয় ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করতে পারেননি।[২] এর আগে থেকেই স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রভাব বিস্তারের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকেই শহরের বাজারে বাজারে বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় লিখিত ঘোষণাপত্র টাঙাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৩]

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ক্লাইভ ইংলণ্ডের কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের কাছে লেখা চিঠিতে দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি অনুকূল মত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, 'Mr. Watts still accompanies me in this campaign, and I can not omit the opportunity of remarking of what great service he is to your officers by his thorough knowledge of the language and people of this country.'[৪]

১ David Kopf, *op. cit.*, p. 17.

২ J. Long, ed., '*Selections from Unpublished Records of Government for the years 1748 to 1769*,' Vol. I, p. 146.

৩ সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস', পৃ. ২৮।

৪ সজনীকান্ত দাস, তদেব।

কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার তাগিদে ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে মাসিক তিনশো টাকা মাহিনায় একজন অনুবাদক নিয়োগ করা হয়। ইংলণ্ডের ডিরেক্টরবর্গ অবশ্য ঐ কাজের জন্য এত মোটা মাইনে অনুমোদন না করলেও তাঁরা একথা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁদের কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য তাঁরা সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য ও উৎসাহ ('all due encouragement') দিতে প্রস্তুত।[১]

দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি এই উৎসাহদান কোম্পানী রাজত্বের প্রথম যুগে বরাবরই বজায় ছিল। প্রধানত বণিজিক সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখেই ক্লাইভ দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। কিন্তু হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিসের আমলে বিষয়টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হত। তখনকার ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। দিনে দিনে এই ব্যাবস্থা কঠোরতর করে তোলা হয়েছিল। ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে জুন (Sir John Macpherson-এর আমলে) বড়োলাটের কাউন্সিল সভায় স্থির হয়, কোম্পানীর কেরানীদের (Writers) মাহিনা ছাড়াও অন্যূন মাসিক একশ টাকা ব্যক্তিগত ভাতা হিসাবে দেওয়া হবে। এর থেকেই তারা ইচ্ছামতো পণ্ডিত মুন্সীদের সাহায্যে দেশীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করে নিতেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় যথেষ্ট শৈথিল্য ছিল। তা দূর করার জন্য পরে কর্নওয়ালিসের আমলে এই ব্যবস্থা রদ করে স্থির হয়, বাধ্যতামূলকভাবে কেবলমাত্র দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য প্রত্যেক কেরানীকে শিক্ষানবিসকালে শিক্ষকের মাহিনা বাবদ মাসিক তিরিশ টাকা করে দেওয়া হবে; মাঝে মাঝে তাঁদের ভাষা শিক্ষায় অগ্রগতি পরীক্ষা করা হবে, এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য প্রার্থীদের ঐ ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হবে। [Extracts from the Proceedings of the Governor-General in council, in the Public Department, on the 10th September 1790.][২]

এর ফলে দেশীয় ভাষাশিক্ষায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেখা দেয়। পরবর্তীকালে উনিশ শতকের প্রারম্ভে, ওয়েলেসলির আমলে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে এই শিক্ষা ব্যবস্থার বনিয়াদকে আরো পাকা করে তোলা হয়। সুতরাং এক কথায় বলা যায়, দেশীয় ভাষাজ্ঞান ছিল তখনকার ইংরেজ কর্মচারীদের কাছে অপরিহার্য, তাই এই ভাষাজ্ঞান অর্জনের জন্য এত নিরবচ্ছিন্ন ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। হেস্টিংসের সাংস্কৃতিক কর্মনীতি ছিল এই প্রচেষ্টারই একটি অঙ্গ। বাংলা মুদ্রণের প্রবর্তন করে তিনিই প্রথম এই প্রচেষ্টাকে বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ও ইংরেজ কর্মচারীদের ভাষা শিক্ষার পথকে সুগম করে তুলতে পেরেছিলেন। আর এর পরোক্ষ ফল হিসাবে বাংলা সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছিল।

---

১ J. Long, ed., *op. cit.*, pp. 283-284 ;
Amitabha Mukherjee, *op. cit.*, p. 345.

২ W. S. Seton-Karr, '*Selections from Calcutta Gazettes*,' Vol. II, p. 28.

হেস্টিংস তাঁর সাংস্কৃতিক কর্মনীতি রূপায়ণের কাজে, বিশেষ করে বাংলা ভাষাচর্চা ও মুদ্রণের প্রসারের কাজে সহায়ক হিসাবে কলকাতায় সদ্য আগত কয়েকজন উৎসাহী ইংরেজ কর্মচারীকে বেছে নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চার্লস উইলকিন্স, নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড ও জোনাথান ডানকান। এঁরা সবাই হেস্টিংসের রাজত্বের গোড়া থেকেই বাংলাদেশে কোম্পানীর কাজে যুক্ত। উইলকিন্স কলকাতায় এসেছিলেন ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে এবং হালহেড ও ডানকান এসেছিলেন ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে। বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে এঁদের সকলের অবদানই উল্লেখযোগ্য।

হালহেড ও তাঁর বাংলা ব্যাকরণ

প্রথম বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের লেখক হিসাবে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড (Nathaniel Brassey Halhed : 1751-1830) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে যে ক'জন বিদেশী রাজকর্মচারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী নিয়ে এদেশে এসে বাংলা ভাষাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, হালহেড ছিলেন তাঁদের অগ্রগণ্য। কেবলমাত্র সরকারী কাজের তাগিদেই যে তিনি বাংলাভাষাচর্চায় উৎসাহী ছিলেন এমন নয়। বাংলা-ভাষার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগ ও একনিষ্ঠ সাধনার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এই ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। প্রবাদ আছে, তিনি এত সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে বাংলা বলতে শিখেছিলেন যে তাঁকে বাঙালীর ছদ্মবেশে কোনো বাঙালী জনসমাবেশের মধ্যে অবাঙালী বলে চেনাই যেত না। ['Halhed was so remarkable for his proficiency in colloquial Bengalee, that he was known when disguised in a native dress to pass as a Bengalee in assemblies of Hindoos.'][১] তবে সুশীলকুমার দে এই কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, বাংলাভাষায় পারদর্শী উপরোক্ত ব্যক্তি আমাদের ব্যাকরণকার হালহেড নন, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দেওয়ানি আদালতের বিচারক নাথানিয়েল জন হালহেড (১৭৮৭-১৮৩৮)।[২] *Friend of India* পত্রিকার আগস্ট ১৮৩৮ সংখ্যায় এরূপ উল্লেখ আছে যে, জন হালহেড বাংলাভাষায় এত পারদর্শী ছিলেন যে একবার বর্ধমানে একটি যাত্রায় অভিনয়কালে সকলে তাঁকে বাঙালী বলেই মনে করেছিলেন।

পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে বাংলাভাষায় কার বেশি দখল এই কূটতর্কের মূলে হয়ত নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেডের বাংলা উচ্চারণের টান বাঙালীজনোচিত ছিল কিনা, এই প্রশ্নটাই প্রাধান্য পেয়েছিল, তবে বাংলাভাষায় তাঁর প্রাথমিক জ্ঞান সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করার কোনো কারণ নেই। বিদেশীদের, বিশেষ করে কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা-

---

১ W. H. Carey, '*The Good Old Days of Honorable John Company*', 1882, (1964 ed.) p. 123.

২ S. K. De, '*Bengali Literature in the Nineteenth Century*,' pp. 70-71.

ভাষা শিক্ষার সহায়ক হিসাবে তিনি তাঁর বইয়ে বাংলা ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলি উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তবে এ কাজে তিনি সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করেছিলেন এমন কথা হয়ত বলা যায় না। কিন্তু তখন পর্যন্ত এটি ছিল অনালোচিত বিষয়, হালহেডের নিজের ভাষায় 'unhandled topic'; সুতরাং ইংরেজি ভাষায় প্রথম আধুনিক রীতিসম্মত বাংলা ব্যাকরণ রচনা করে হালহেড পথিকৃতের সম্মান দাবি করতে পারেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে writer-এর চাকরি নিয়ে হালহেড প্রথম ভারতে পদার্পণ করেন। ইংলণ্ডে Westminster-এ এক সম্রান্ত বংশে ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে মে তাঁর জন্ম।[১] তাঁর পিতা William Halhed ছিলেন অক্‌সফোর্ডশায়ারের এক বনেদী বংশের সন্তান, তিনি একটানা আঠারো বছর ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডের ডিরেক্‌টর ছিলেন। নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড লেখাপড়া করেন হ্যারোতে (Harrow), সেখানেই রিচার্ড ব্রিন্সলে শেরিডানের (Richard Brinsley Sheridan) সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। পরবর্তীকালে শেরিডানের সহযোগে হালহেড Aristaenetus-এর কাব্যানুবাদ প্রকাশ করেন। ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি অক্‌সফোর্ডের Christ Church-এ প্রবেশ করেন, সেখানে উইলিয়ম জোন্সের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও তাঁরই প্রেরণায় তিনি আরবী-ফারসী শেখেন। এই সময় কুমারী লিন্‌লের (Miss Linley) প্রতি হালহেড প্রণয়াসক্ত হন, কিন্তু লিন্‌লে শেষ পর্যন্ত তাঁকে পরিত্যাগ করে শেরিডানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় ভগ্নহৃদয়ে হালহেড ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি নিয়ে ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে সুদূর ভারতবর্ষে চলে আসেন। এখানে এসে তিনি পূর্ণোদ্যমে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় মনোযোগ দেন ও সহজেই ওয়ারেন হেস্টিংসের নজরে পড়েন। হেস্টিংসের অনুরোধে তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সহায়তায় হিন্দুরীতিনীতি সম্বন্ধীয় এক ফার্সী সংকলন প্রস্তুত করান ও তারপর নিজেই তার ইংরেজি অনুবাদ করে প্রকাশ করেন '*A Code of Gentoo Laws*' —১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে। হেস্টিংসের অনুপ্রেরণায় তাঁর পরবর্তী অবিস্মরণীয় কীর্তি ইংরেজিতে রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এজন্য অনেকে তাঁকে আধুনিক ভাষাচর্চায় পথিকৃতের সম্মান দিয়ে বলেছেন— 'a pioneer of modern philology'।[২] প্রায় তেরো বছর কাল বাংলাদেশে কাটিয়ে ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন ও স্বদেশের মাটিতে আরো ৪৫ বছর কাল জীবিত ছিলেন। তাঁর কর্মময় জীবনের এই শেষ পর্ব অবশ্য আমাদের বক্ষ্যমান বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। হ্যাম্পশায়ারে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি রূপে তিনি ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কাজ করেন। পরে কিছুকাল ভারতীয় mysticism বা রহস্যবাদের প্রচ্ছন্ন প্রভাবে Richard Brothers প্রচারিত অধ্যাত্মচর্চায় অনুরক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি এই সংস্রব ত্যাগ করেন। এরপরে এক লগ্নীকারবারে তাঁর প্রচুর সম্পত্তি হানি হয়। শেষ পর্যন্ত পুনরায় ১৮০৯

---

১ *'Dictionary of National Biography,'* vol. VIII, p. 925.

২ *Ibid.*

খ্রীস্টাব্দে East India House-এর অধীনে একটি ভালো চাকরিতে তিনি যোগদান করেন। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে তাঁর মৃত্যু হয়।

তীক্ষ্ণ সংবেদনশীলতার জন্য বন্ধুদের প্রতি হালহেডের ব্যবহার মাঝে মাঝে বিচিত্র মনে হত, তথাপি তাঁর বন্ধুর সংখ্যা কম ছিল না এবং সবার কাছেই তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। বাংলাদেশে কোম্পানীর চাকরিতে থাকাকালীন চুঁচুড়ার দিনেমার গর্ভনরের কন্যা Helena Ribaut-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, কিন্তু তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। বাংলাদেশে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে হালহেড দম্পতি যোগ দিতেন বলে শোনা যায়। W. K. Firminger রচিত '*Marriages in Calcutta*, 1780-1785' নামক প্রবন্ধে উল্লিখিত আছে যে, ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় John Addison নামক জনৈক কোম্পানীর নিম্নপদস্থ ব্যবসায়ী যুবকের সঙ্গে কুমারী Lucy Clark-এর বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রধান সাক্ষীরূপে হালহেড সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন।[১]

হালহেডের প্রাচ্যবিদ্যাপ্রীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলাদেশে থাকাকালীন অনেক পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ব্রিটিশ মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ এগুলি তাঁর কাছ থেকে কিনে নেন। তাঁর আরো কিছু পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারক, নাথনিয়েল জন হালহেডের হস্তগত হয়। এইসব পাণ্ডুলিপির মধ্যে হেস্টিংসকে লেখা তাঁর যেসব চিঠিপত্র পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় যে ১৮০০ থেকে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে হালহেড একটি ফারসী সংস্করণ থেকে মহাভারতের ইংরেজি অনুবাদের কাজে অনেকদূর এগিয়েছিলেন। অবশ্য এ কাজ তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি।[২] হালহেড ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত 'বারমাস্যা'র ইংরেজি অনুবাদও করেছিলেন। ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রক্ষিত হালহেডের কাগজপত্রের মধ্যে মূল বাংলা অংশ সহ তাঁর নিজের হাতের লেখা এই ইংরেজি অনুবাদের পাণ্ডুলিপিটি আছে। তারাপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধে এটিকে বাংলা কবিতার প্রাচীনতম ইংরেজি অনুবাদ বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ রচনার মতো ইংরেজিতে বাংলা কবিতার অনুবাদের ক্ষেত্রেও হালহেড পথিকৃতের সম্মান দাবি করতে পারেন। এই ইংরেজি অনুবাদের কয়েকটি ছত্র সামান্য পরিবর্তন করে হালহেডের বাংলা ব্যাকরণে ছাপা হয়েছিল। তারাপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধের সঙ্গে 'বারমাস্যা'র মূল বাংলা সহ হালহেডের সম্পূর্ণ অনুবাদটি প্রথম প্রকাশ করেন।[৩]

হেস্টিংস তাঁর সাংস্কৃতিক কর্মনীতিকে রূপায়ণের কাজে অন্যতম সহযোগী হিসাবে

---

১ *Bengal, Past & Present* : Vol. 7, Jan-June 1911, p. 169.

২ '*Dictionary of National Biography*', Vol VIII-এ উল্লিখিত আছে যে তাঁর এই অসম্পূর্ণ ইংরেজি পাণ্ডুলিপি এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে।

৩ 'দেশ' : ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৬৯।

হালহেডের উপর বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন। এদেশের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সম্বন্ধে হালহেডের জ্ঞান হেস্টিংসের অজানা ছিল না। তাই তাঁর আনুকূল্য হালহেড সর্বদাই পেয়েছিলেন।

হালহেডের ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্য হিসাবে এর আখ্যাপত্রে লিখিত আছে :

বোধপ্রকাশ° শব্দশাস্ত্র°
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থ°
ক্রিয়তে হালেদঙ্গে্জী

এই বই ফিরিঙ্গিদের উপকার করেছিল ঠিকই, কিন্তু বোধ করি তার চেয়েও বড়ো উপকার হয়েছিল বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যের ; এই বই ছাপার কাজেই বাংলা মুদ্রণের প্রবর্তন ও তার ফলেই বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা।

প্রধানত সমসাময়িককালে প্রচলিত বাংলা কাব্য থেকে হালহেড তাঁর উদাহরণগুলি আহরণ করেছিলেন, সেইজন্য এটিকে 'বাংলা কাব্যভাষার ব্যাকরণ' বলা হয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে বইয়ের মুখবন্ধে হালহেডের নিজের উক্তি : 'The following work presents the Bengal language merely as derived from its parent the Shanscrit. In the course of my design I have avoided, with some care, the admission of such words as are not natives of the country, and for that reason have selected all my instances from the most authentic and ancient compositions.' (Preface) স্বভাবতই এখানে হালহেড প্রাচীন বাংলা কাব্যের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

এই ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্যে হালহেড কতকগুলি বাংলা পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। পুঁথিগুলি পাঠ করে বাংলা কাব্যভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ধারণা তিনি লাভ করেছিলেন তাই তাঁর ব্যাকরণে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর ব্যাকরণের পরিধি সংকীর্ণ, উপাদানও অপ্রচুর। ব্রিটিশ মিউজিয়মের কাগজপত্রের মধ্যে হালহেডের নিজের হাতে বাংলা অক্ষরে লেখা বাংলা কাব্যের একটি তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকায় ছ'টি মাত্র কাব্যের উল্লেখ আছে : কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের 'জৈমিনী ভারত', মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল।[১] এই তালিকার সব বইগুলি হালহেড পড়েছিলেন কিনা অথবা তালিকার বাইরে আর কোনো কবির রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল কিনা সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁর ব্যাকরণ থেকে পাওয়া যায় না। তবে ব্যাকরণের অধিকাংশ উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল থেকে। তাই মনে হয় এই তিনখানি কাব্যের অংশবিশেষ বাংলা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তিনি বেশ যত্ন নিয়েই পড়েছিলেন ও তাঁর ব্যাকরণে তার ব্যবহার করেছিলেন।

---

১ তারাপদ মুখোপাধ্যায়, বাংলা কবিতার প্রাচীনতম ইংরেজি অনুবাদ : দেশ, ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৬৯।

হালহেডের ব্যাকরণে যে বাংলা উদাহরণগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি বাংলা হরফেই ছাপা। এই ছাপার কাজের জন্যই প্রথম ধাতুনির্মিত বাংলা সঞ্চালনযোগ্য মুদ্রাক্ষরের (movable Bengali metal types) জন্ম। এইজন্যই বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে বইটির এত গুরুত্ব। প্রসঙ্গত হালহেডের নিজের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে: The public curiosity must be strongly excited by the beautiful characters which are displayed in the following work; and although my attempt may be deemed incompleat and unworthy of notice, the book itself will always bear an intrinsic value from its containing as extraordinary an instance of mechanic abilities as has perhaps ever appeared. (Preface, pp. xxii-xxiii) বড়ো বড়ো সুন্দর পরিষ্কার হরফে এর বাংলা অংশগুলি ছাপা। প্রথম সৃষ্টির চমক নিয়ে যে মুদ্রাক্ষরের আবির্ভাব, তার সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বহুকাল পর্যন্ত অম্লান হয়ে রইল। বস্তুতপক্ষে হালহেডের ব্যাকরণে ব্যবহৃত বাংলা হরফ বাংলা মুদ্রণের আদিযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হরফ হিসাবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। এগুলি আকারে বেশ বড়ো ছিল, উচ্চতা ৪'৫ মি. মি.। মুদ্রাক্ষরের বিবর্তন ধারায় হরফের আকার বা উচ্চতা ক্রমশ ছোটো হয়ে এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ব্যবহৃত সাধারণ ছোটো বাংলা হরফের চেয়ে হালহেডের ব্যাকরণে ব্যবহৃত এই প্রথম বাংলা হরফ চারগুণ বড়ো ছিল।[১] পরবর্তীকালে সৃষ্ট অন্যান্য হরফের তুলনায় এর বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করা হল। [সূচনাপর্ব : দ্বিতীয় অধ্যায়]

প্রয়োজনের তাগিদেই হালহেডের ব্যাকরণ রচিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। সুতরাং প্রকাশিত হবার পর বাজারে এর বিশেষ চাহিদা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় খণ্ড নিঃশেষিত হয়ে গেলেও বইটির কোনো দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা নেই। সমসাময়িককালে 'ক্যালকাটা গেজেট'-এর বিভিন্ন সংখ্যায় বই বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হত। সেখানে অবিক্রীত বইয়ের ('available books') যেসব তালিকা ছাপা হয় তার মধ্যে হালহেডের ব্যাকরণ-এর উল্লেখ কখনো পাওয়া যায়নি। অথচ হালহেডের আগের বইটি, অর্থাৎ ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত '*A Code of Gentoo Laws*'-এর নাম এই পত্রিকায় প্রায়ই দেখা যেত। [উদাহরণ হিসাবে দু-একটি সংখ্যার উল্লেখ করা যেতে পারে: *Calcutta Gazette* dt. 7th October 1784, 18th November 1784] অবশ্য এমনও হতে পারে '*A Code of Gentoo Laws*' লণ্ডন থেকে 'আমদানী' করা বই, সুতরাং 'বিদেশী' বইয়ের তালিকায় এর স্থান ছিল এবং যেহেতু হালহেডের ব্যাকরণটি 'স্থানীয়' বই, তাই ঐ তালিকায় এর উল্লেখ ছিল না। হালহেডের ব্যাকরণের দুষ্প্রাপ্যতার সমর্থন অবশ্য অন্য সূত্রেও পাওয়া যেতে পারে। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে ক্যালকাটা গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়, যাতে দেখা

১ '*Friend of India*' Feb. 26, 1835.

যায় কিছু ইংরেজি শিক্ষিত দেশীয় ব্যক্তি পণ্ডিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের উপকারার্থে বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান রচনার আবেদন জানাচ্ছেন, কারণ ঐ ধরনের কোনো বই তখন বাজারে ছিল না।[১] হালহেডের ব্যাকরণটি প্রকাশিত হবার কয়েক বছরের মধ্যেই সাধারণের কাছে এরূপ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলেও, আমাদের সৌভাগ্য দু'শো বছরের ব্যবধান অতিক্রম করে ঐ প্রথম মুদ্রিত বাংলা বইটির বেশ কয়েকটি কপি বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সযত্ন তত্ত্বাবধানে আজও আমাদের জন্য অক্ষত রয়েছে। লণ্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরি ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ছাড়াও কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, শ্রীরামপুর কলেজ প্রভৃতির গ্রন্থাগারে এই বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। [১৯৮০ সালে নিখিল সরকারের সম্পাদনায় এই ব্যাকরণ বইটির একটি ফ্যাকসিমিলি সংস্করণ বা অবিকল প্রতিরূপ প্রকাশিত হয়েছে।]

আটপেজী আকারের এই ব্যাকরণটির মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৯ + ২১৬। এটি মূলত ইংরেজিতে লেখা হলেও, সারা বইটি জুড়ে নানা অংশে যেসব মূল বাংলা উদ্ধৃতি ছাপা আছে, সেগুলিকে একত্র করলে বইটির প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভরে যাবে। ৩৭ থেকে ৪২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত একটানা বাংলা উদ্ধৃতি ছাপা হয়েছে। এই অংশে 'মহাভারতের দ্রোণপর্ব মধ্যে এক অধ্যায়' থেকে ৭২টি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

'যদি মোরে বর দিবা দেব পশুপতি।
মহা ধনুর্দ্ধর হউক আমার সন্ততি ॥
তার পুত্রে মোর পুত্র জিনুক সমরে।
রাজাগণ মধ্যে জেন অপমান করে ॥
ইহা বিনু অন্য বর নাহি চাহি আমি।
এই বর মোরে দেব আজ্ঞা কর তুমি ॥
হর বলে বর দিলু সুনহ রাজন।
তোর পুত্র জিনিবেক সেনীর নন্দন ॥
প্রাণেতে মারিতে তারে না হবে সকতি।
এত বলি অন্ত ধ্যান হইল পশুপতি ॥
স্থির স্থানে সোমদত্ত পাইয়া এই বর।
আনন্দিত হইয়া গেল আপনার ঘর ॥
শিব বরে ভুরিশ্রবা সাত্যকি জিনিল।
তার উপক্ষণ এই তোমারে কহিল ॥' [পৃ. ৪১-৪২]

---

১ W. S. Seton-Karr, '*Selections from Calcutta Gazettes*', Vol. II, p. 497.

এ ছাড়াও এর অনেকগুলি পৃষ্ঠায় পাঁচ, চার, দুই বা এক চরণ বিশিষ্ট বহু কাব্যাংশ মুদ্রিত আছে। যেমন :

'মল্লিকা ফুলে মালা অগুরু মাখিয়া।
নিদাঘে বাতাস দিব কাম জাগাইয়া ॥' (পৃ. ১৮৭)

'টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়।
রাজহংস রাজহংসী খেলিয়া বেড়ায় ॥' (পৃ. ৫০)

'সীতা গো পরম সতী তার শুন দুর্গতি' (পৃ. ১৮২)

'সিউতিতে পদ মাতা রাখিতে ২।
সিউতি হইল সোনা দেখিতে ২ ॥
সোনার সিউতি দেখি পাটনীর ভয়।
এত মেয়্যা মানুষ নয় দেবতা নিশ্চয় ॥' (পৃ. ১৮১)

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাসীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান ॥' (পৃ. ১৫৩)

'রাবণেরে বধি রাম সীতা আনে নিজ ধাম
করাইল পরীক্ষা দাহনে' (পৃ. ১২৫)

'বিদ্যা সুন্দরেরে লইয়া কালিকা কৌতুকি হইয়া
কৈলাস সিখরে উত্তরিল' (পৃ. ৫৮)

বইটিতে বাংলা মুদ্রণের এই ব্যাপক আয়োজন দেখে মনে হয়, এর জন্য পুরো এক সাট বাংলা মুদ্রাক্ষরই তৈরি করা হয়েছিল। প্রথম প্রচেষ্টাতেই এরূপ বিস্ময়কর সাফল্য অর্জনের নজীর একান্ত বিরল।

বাংলা হরফ তৈরি ও ছাপার কাজ পুরোপুরি হুগলীতে হয়েছিল। তবে এর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ বিলেত থেকে আমদানী করা। এখনো পর্যন্ত এর কাগজ ও ছাপার ঔজ্জ্বল্য অটুট রয়েছে। বইটির মুদ্রণ ও গঠন-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধীয় খুঁটিনাটি বিচার করতে গিয়ে একটি কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় লক্ষ্য করা গেছে। এর শুরুতে দপ্তরীর উদ্দেশ্যে বই-বাঁধাইয়ের নির্দেশ দিয়ে একটি বিজ্ঞাপন ('Advertisement') ছাপা আছে। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ : 'It is recommended not to bind this book till setting in of the dry season,

as the greatest part has been printed during the rains.' এই বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, বইটির বেশির ভাগ অংশই বর্ষাকালে ছাপা, তাই আর্দ্রতা কমার আগে এটি না বাঁধাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাঁধাইয়ের নির্দেশ দিয়ে বইয়ের মধ্যে এ ধরনের বিজ্ঞাপন ছাপার দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে অভিনব ও বিরল। তবে এ থেকে অন্তত একটি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। হুগলীতে বইটি ছাপা হলেও, সেখানে বা তখনই এটি বাঁধানো হয়নি। তাই দপ্তরীর ভবিষ্যৎ কাজের নির্দেশ প্রেস থেকেই ছেপে দেওয়া হয়েছে। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। ছাপার কাজ শেষ হবার পর কিছু সংখ্যক বই (হয়ত বা খোলা অবস্থায়) বিলেতে পাঠানো হলে সেখানে নতুন করে কিছু ভুল আবিষ্কৃত হয়। [এর প্রমাণ, বইটির পরিশিষ্টে ERRATA-পত্রেই ছাপা আছে : Errata discovered since the Bengal Language came to England.] এগুলি সংশোধন করে তখন আরেকটি শুদ্ধিপত্র ছাপানো হয় ও বইয়ের শেষে সংযোজিত করে এক সঙ্গে বাঁধানো হয়। সব মিলিয়ে বাঁধানোর কাজ শেষ হতে নিঃসন্দেহে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। মূল বইটি ছাপা হয়েছিল প্রধানত ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের বর্ষাকালে ('during the rains') অর্থাৎ জুলাই-আগস্ট মাসে; শুদ্ধিপত্রটি ছাপা তার পরে।

এখন প্রশ্ন, শুদ্ধিপত্রটি কোথায় ছাপা? ইংলণ্ডে, না হুগলীতেই বা বাংলাদেশের অন্য কোথাও? যেখানেই ছাপা হোক, এর বাংলা হরফগুলি (যদিও অল্প কয়েকটি শব্দ মাত্র) কিন্তু মূল বইয়ের বাংলা হরফগুলি থেকে স্বতন্ত্র, আকারে অনেকটা ছোটো। দেখতেও অতটা সুন্দর নয়। নিঃসন্দেহে এগুলি নতুন কাটা হরফ এবং অপেক্ষাকৃত অপটু হাতের কাজ। উদাহরণ স্বরূপ : ৩৯ পৃষ্ঠার 'নাজাহো'-কে শুদ্ধ করা হয়েছে— 'না জাহ'। 'জ' হরফটির উচ্চতা (type-height) মূলতঃ ৩৯ পৃষ্ঠায় ছিল ৪.৫ মি. মি., কিন্তু শুদ্ধিপত্রে ৩ মি. মি.।

পরিশেষে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। বইটির শেষভাগে একমাত্র গদ্য উদ্ধৃতি হিসাবে জগতধির রায়ের যে চিঠিটি ছাপা হয়েছে, তার তারিখ ছিল 'শন ১১৮৫ শাল ১১ শ্রাবণ' অর্থাৎ ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে জুলাই। বইটিও ঠিক একই সময়ে ছাপা। দেখা যাচ্ছে, একটি সদ্য লেখা চিঠি হালহেড তাঁর বইয়ে ব্যবহার করেছেন। চিঠিটি সংগ্রহ করার পর মূল হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি তাম্রফলকে খোদাই করে হুবহু ছাপা হয়েছে। আরেকটি পৃষ্ঠায় অপেক্ষাকৃত ছোটো বাংলা হরফ নতুন করে কেটে যথারীতি সাজিয়ে (compose) এই চিঠিটি ছাপা হয়েছে। সুতরাং জুলাই-আগস্ট মাস শেষ হবার আগে বই ছাপা সম্পূর্ণ হয়নি। কেবলমাত্র এই চিঠিটি ছাপার জন্যই উইলকিন্স (বা তাঁর সহযোগী) আর এক সাট (পুরো বা এর প্রয়োজনীয় অংশ) ছোটো আকারের পরিষ্কার সুন্দর সঞ্চালনযোগ্য বাংলা মুদ্রাক্ষর তৈরি করেছিলেন বলে মনে হয়। এই হরফগুলির উচ্চতা (type-height) ২.৫ মি. মি., যদিও বইয়ের মূল বাংলা হরফগুলির উচ্চতা ৪.৫ মি.মি.। বাংলা সঞ্চালনযোগ্য

মুদ্রাক্ষরশিল্পের জন্মলগ্নে এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। আমরা অনেকেই তা লক্ষ্য করিনি।

বাংলা মুদ্রণের স্রষ্টা : চার্লস উইলকিন্স

বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে হালহেডের ব্যাকরণের যে যুগান্তকারী ভূমিকা তার একটি বড়ো অংশ চার্লস উইলকিন্সের অবদানের ফলেই সম্ভব হয়েছে। ঐ ব্যাকরণের বাংলা অংশগুলি ছাপার জন্য উইলকিন্স সর্বপ্রথম শক্ত ইস্পাতের উপর ছেনি কেটে অনলস পরিশ্রম ও আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে বাংলা হরফগুলি খোদাই করেন এবং এইভাবে তৈরি ছাঁচের সাহায্যে ধাতু-নির্মিত সঞ্চালনযোগ্য মুদ্রাক্ষর ঢালাই করে গড়ে তোলেন।[১] এই সঞ্চালনযোগ্য বাংলা মুদ্রাক্ষর প্রবর্তনের মধ্য দিয়েই আধুনিক বাংলা মুদ্রণের জন্ম এবং চার্লস উইলকিন্স তাই বাংলা মুদ্রণের স্রষ্টা (Founder) হিসাবে আমাদের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হয়ে রইলেন। তাঁর এই অবিস্মরণীয় কীর্তির জন্য চার্লস উইলকিন্সকে ইংরেজ লেখকেরা ইংরেজি মুদ্রণের জনক ক্যাক্সটনের সঙ্গে তুলনা করে তাঁকে বাংলার বা ভারতের ক্যাক্সটন বলে অভিহিত করেছেন।[২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ক্যাক্সটন ইংলেণ্ডে আধুনিক মুদ্রণের প্রবর্তন করেন ১৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে, অর্থাৎ উইলকিন্সের প্রচেষ্টার কিঞ্চিদধিক তিনশো বছর আগে। কিন্তু তারও আগে, ১৪৫৬ খ্রীস্টাব্দে জার্মানীতে প্রথম সঞ্চালনযোগ্য মুদ্রাক্ষর প্রবর্তন করেন গুটেন-বার্গ। ঐ বছর তিনি প্রথম লাটিন ভাষায় বিখ্যাত ৪২-পঙ্‌ক্তির বাইবেল (42-line *Bible*) ছেপে প্রকাশ করেন। পৃথিবীতে যিনি প্রথম সঞ্চালনযোগ্য মুদ্রাক্ষর প্রবর্তন করে মুদ্রণের জগতে যুগান্তর নিয়ে এলেন সেই গুটেনবার্গের কথা স্মরণ করে তাই উইলকিন্সকে 'বাংলার গুটেনবার্গ' নামেও অভিহিত করা চলে। সঞ্চালনযোগ্য বাংলা মুদ্রাক্ষর সৃষ্টিই যখন উইলকিন্সের প্রধানতম কৃতিত্ব, সেই সূত্রে মুদ্রাক্ষর শিল্পের আদি গুরু গুটেনবার্গের নামের সঙ্গেই তাঁর নামকে সংযুক্ত করা অধিকতর সঙ্গত হবে। আত্মাভিমানকে প্রশ্রয় না দিলে, এই একই সূত্রে ইংরেজরাও ক্যাক্সটনকে 'ইংলণ্ডের গুটেনবার্গ' (Gutenberg of England) বলে অভিহিত করতে পারেন।

ইংলণ্ডের সমারসেটের অন্তর্গত ফ্রোম নামক শহরে ১৭৪৯ খ্রীস্টাব্দে (মতান্তরে ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দে) এই প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ ও ভাষাবিদ চার্লস উইলকিন্সের জন্ম।[৩]

১ Wilkins 'instructed himself in the art of punch cutting, and cut a set of Bengali punches with his own hands' : J. C. Marshman, '*The Life and Times of Carey, Marshman & Ward*' Vol. I, p. 70.

২ W. H. Carey বলেছেন—'Caxton of Bengal' : '*The Good Old Days of Honorable John Company*,' p. 123 ; S. Pearce Carey বলেছেন—'India's Caxton' : '*William Carey*', p. 198.

৩ '*Dictionary of National Biography*', Vol. XXI, p. 259.

তাঁর বাবা ওয়ালটার উইলকিন্স ছিলেন ঐ শহরেরই স্থায়ী বাসিন্দা ও তাঁর মা মার্থা রে (Martha Wray) ছিলেন বিখ্যাত খোদাইকর (engraver) রবার্ট বেটম্যান রে (Robert Bateman Wray)-র সঙ্গে সম্পর্কিতা, সম্ভবত ভাগ্নী (niece)। মুদ্রণশিল্পে পারিবারিক ঐতিহ্যময় এই সম্পর্কই পরোক্ষভাবে চার্লস উইলকিন্সের জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে একজন রাইটার বা কেরানীর চাকরি নিয়ে উইলকিন্স ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করেন এবং কিছুকালের মধ্যেই মালদহে কোম্পানীর কুঠির সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বা প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন। কোম্পানীর আমলের প্রথম যুগের অল্প যে কয়জন সরকারী কর্মচারীর সহায়তায় হেষ্টিংস তাঁর সাংস্কৃতিক কর্মনীতিকে রূপায়িত করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, উইলকিন্স তাঁদের অন্যতম। কোম্পানীর একজন কুঠিয়াল হওয়ার চেয়ে ভাষাশিল্প চর্চার প্রতিই উইলকিন্স অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি নিজেই বলেছেন, ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ বন্ধু হালহেডের অনুপ্রেরণায় তিনি সংস্কৃত ভাষা চর্চায় বিশেষভাবে মনোযোগ দেন। অবশ্য এর আগে থেকেই তিনি বাংলা ভাষা চর্চা শুরু করেছিলেন, তাঁর ফার্সী শিক্ষাও এই সময় থেকে শুরু হয়। মুদ্রণশিল্পে তাঁর সহজাত আগ্রহ ও নৈপুণ্য এবং ভাষাচর্চার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের প্রথম ফসল হিসাবেই ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলা ছাপার হরফের জন্ম। হরফ খোদাইয়ের কাজ এর আগেও উইলকিন্স কিছু কিছু করেছিলেন। তাঁর এই পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে হালহেডের প্রয়োজনে হেষ্টিংস তাঁকে বাংলা হরফ তৈরির যে দুরূহ দায়িত্ব দিয়েছিলেন উইলকিন্স তাতে সানন্দে স্বীকৃত হন ও প্রথম প্রচেষ্টাতেই অত্যাশ্চর্য সাফল্য লাভ করেন। হালহেড তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় একথা অকপটে স্বীকার করেন : 'The advice and even sollicitation of the Governor General prevailed upon Mr. Wilkins, a gentleman who has been some years in the India Company's civil service in Bengal, to undertake a set of Bengal types. He did, and his success has exceeded every expectation.'[১] বাংলা ভাষা চর্চার প্রসারে উইলকিন্সের এই অবদানের স্বীকৃতি ক্লার্ক মার্শম্যানের বিবরণীতেও পাওয়া যায় : 'Mr. Wilkins was a member of the civil service of the East India Company, but so great was his anxiety to promote the interests of Oriental literature that he instructed himself in the art of punch cutting, and cut a set of Bengalee punches with his own hands, after he had been six or seven years in the country.'[২]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উইলকিন্সের তৈরি বাংলা ছাপার হরফগুলি ছিল ধাতুনির্মিত।

---

১ N. B. Halhed, '*A Grammar of the Bengal Language*' : Preface.

২ John Clark Marshman, '*The Life and Times of Carey, Marshman and Ward,*' Vol. I. p. 70.

প্রথম যুগের বাংলা বই কাঠের তৈরি হরফে ছাপা হত সাধারণ্যে প্রচলিত এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হওয়া উচিত। হালহেডের ব্যাকরণটি যে আদৌ কাঠের তৈরি হরফে ছাপা হয়নি, তাঁর বইয়ের ভূমিকায় প্রথম সঞ্চালনযোগ্য বাংলা মুদ্রাক্ষর সৃষ্টির যে কাহিনী তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই বোঝা যায়। বাংলা অক্ষরের নানাবিধ জটিল টান, অসম আকার ও যুক্তাক্ষরের বঙ্কিম বিন্যাসের ফলে ইস্পাত কেটে পুরো সাট বাংলা মুদ্রাক্ষর তৈরি যে অত্যন্ত কঠিন কাজ তা হালহেড তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন : 'That the Bengal letter is very difficult to be imitated in steel will readily be allowed by every person who shall examine the intricacies of the strokes, the unequal length and size of the characters and the variety of their positions and combinations.' [Preface] কাঠের হরফ তৈরির সহজতর পথে না গিয়ে উইলকিন্স ইস্পাত কেটে হরফ তৈরির দুরূহ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন বলেই হালহেড প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন। পথপ্রদর্শক হিসাবে এই কাজের পুরো দায়িত্ব নিতে হওয়ায় উইলকিন্সকে একাধারে ধাতুবিদ্যাবিশারদ, খোদাইকর, ঢালাইকর ও মুদ্রাকরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। এ সম্বন্ধে পুনশ্চ হালহেডের উক্তি স্মরণীয় : 'In a country so remote from all connexion with European artists, he has been obliged to charge himself with all the various occupations of the Metallurgist, the Engraver, the Founder, and the Printer. To the merit of invention he was compelled to add the application of personal labour. With a rapidity unknown in Europe, he surmounted all the obstacles which necessarily clog the first rudiments of a difficult art, as well as the disadvantages of solitary experiment ; and has thus singly on the first effort exhibited his work in a state of perfection which in every part of the world has appeared to require the united improvements of different projectors, and the gradual polish of successive ages.' [Preface]

বাংলা মুদ্রাক্ষর সৃষ্টি ও প্রথম বাংলা গ্রন্থ মুদ্রণের অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও উইলকিন্স অবশ্য নিজে কোনো বাংলা গ্রন্থ রচনা করেননি। সংস্কৃত ভাষাচর্চার প্রতিই বরং তিনি অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। এর ফলে সমসাময়িককালের ইংরেজ পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে মর্যাদালাভ করেন। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ উইলিয়ম জোন্স বলেছিলেন, উইলকিন্সের সহায়তা না পেলে তাঁর পক্ষে কোনোদিনই সংস্কৃত ভাষা শেখা সম্ভব হত না। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠার কাজেও উইলিয়ম জোন্সকে তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যেতে হলেও ভারতীয় ভাষা-বিদ্যা-

শাস্ত্রের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ অক্ষুণ্ণ ছিল। কলকাতা ত্যাগ করার পর প্রথমে তিনি কিছুকাল বাথ (Bath)-এ গিয়ে বাস করেন। সেই সময় তিনি সংস্কৃত থেকে অনুবাদের কাজে বিশেষভাবে ব্যাপৃত ছিলেন। বাথ থেকে তিনি চলে যান হক্হার্স্ট (Hawkhurst)-এ এবং সেখানেই তিনি সংস্কৃতভাষা মুদ্রণের জন্য এক সাট নাগরী হরফ তৈরির কাজ শুরু করেন। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে কেন্টে তাঁর নিজস্ব বাড়িটি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় তাঁর বই ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের আংশিক ক্ষতি হয় কিন্তু তাঁর নিজের তৈরি হরফ ও তার ছাঁচ—পাঞ্চ ও ম্যাট্রিক্সগুলি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাজে লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারিক হিসাবে ভারতীয় পুঁথিপত্রের তত্ত্বাবধায়কের কাজে যোগ দেন। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে হেইলিবারি (Haileybury)-তে কোম্পানীর নতুন কলেজ হলে সেখানে তিনি পরীক্ষক ও পরিদর্শকের (visitor) পদে নিযুক্ত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐ কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই মে লণ্ডনে তাঁর মৃত্যু হয়। উইলকিন্স দুবার বিবাহ করেছিলেন, মৃত্যুকালে তিনি তিন কন্যাকে রেখে যান।

সাহিত্যসেবার স্বীকৃতি স্বরূপ উইলকিন্স স্বদেশে বহুবার সম্মানিত হয়েছেন। বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি বহু বিদ্বজ্জনসভার (Royal Society of Literature, Institut de France, প্রভৃতি) সভ্য নির্বাচিত হন। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের অন্যতম 'ভাগবদ্গীতা'র ইংরেজি অনুবাদ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। 'হিতোপদেশ' (১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দ), 'মহাভারতের শকুন্তলা কাহিনী' (১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ) প্রভৃতি তিনি সংস্কৃত থেকে অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। তাঁর বিখ্যাত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ—'Grammar of the Sanskrit Language' ভারতবর্ষে থাকতেই লেখা শুরু করেন, পরিশেষে ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও ভাষা সংক্রান্ত আরো কিছু বই তিনি রচনা করেন।

হালহেডের ব্যাকরণ মুদ্রণ প্রসঙ্গে বাংলা মুদ্রণের স্রষ্টা উইলকিন্সের অবদানের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা হল। এই সূত্রে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সমগ্র জীবনকাহিনী আমাদের অনুসন্ধিৎসাকে জাগ্রত করেছে। কিন্তু এই প্রথম বাংলা গ্রন্থ মুদ্রণ প্রসঙ্গে আরো একজন স্বদেশীয় শিল্পীর অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি পঞ্চানন কর্মকার। উইলকিন্সের বাংলা হরফ তৈরির কাজে তিনি ছিলেন প্রধান সহযোগী। সুতরাং প্রথম মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের জন্মলগ্নে পঞ্চানন কর্মকারের ঐতিহাসিক ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বাংলা মুদ্রণের প্রথম সার্থক শিল্পী ও প্রবক্তা : পঞ্চানন কর্মকার

যদিও উইলকিন্সই ছিলেন বাংলা মুদ্রণের স্রষ্টা, তাঁর প্রথম সৃষ্টির কাজে প্রধান সহায়ক

ছিলেন বাঙালী শিল্পী পঞ্চানন কর্মকার। পরবর্তীকালে পঞ্চাননের সাধনা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলেই বাংলা মুদ্রণের প্রসার, প্রচার ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। বাংলাদেশে পঞ্চানন কর্মকারই মুদ্রণশিল্পকে সাধারণ্যে পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন এবং বাংলাদেশের নিজস্ব শিল্পধারার অঙ্গীভূত করে তোলেন। মিশনারী জীবনীকার ইংরেজ লেখক জন ক্লার্ক মার্শম্যান অকপটে একথা স্বীকার করেছেন : 'He (Wilkins) likewise gave instruction in the art which he had acquired, to an expert native blacksmith of the name of Punchanon, through whose labour it became domesticated in Bengal.'[১] তাই বলা যায়, পঞ্চানন কর্মকারই বাংলা মুদ্রণের প্রথম সার্থক শিল্পী ও প্রবক্তা। অথচ আমাদের জাতীয় জীবনে ও আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে পঞ্চানন কর্মকারের যথোচিত মর্যাদার আসন আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাঁর ব্যক্তি ও কর্মজীবনের বিস্তৃত তথ্য আজও আবিষ্কৃত হয়নি, হয়ত বা তার অধিকাংশই বিলুপ্ত। এই লুপ্তপ্রায় অনাবিষ্কৃত তথ্যকে উদ্ধারের জন্য একনিষ্ঠ গবেষণার তাই একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চানন কর্মকারের ঐতিহাসিক অবদানের কথা বাদ দিয়ে বাংলা মুদ্রণের ইতিহাস বা ব্যাপক অর্থে বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। বাংলা মুদ্রণ প্রচলনের জন্য পথিকৃৎ ইংরেজদের আগ্রহ, অধ্যবসায় ও গৌরবময় ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেও প্রথম বাঙালী শিল্পী পঞ্চানন কর্মকারের ঐতিহাসিক অবদানের গুরুত্ব ও মর্যাদা অবশ্যস্বীকার্য। প্রথম বাংলা হরফ তৈরির কারিগরী বিদ্যা উইলকিন্সের দান, কিন্তু তাকে ব্যাপকভাবে কর্মে রূপায়িত করা ছিল পঞ্চাননের দায়িত্ব। পঞ্চানন ও তাঁর সান্নিধ্যে অনুপ্রাণিত আরো অনেক বাঙালী কারিগর ও শিল্পীর সহায়তা ব্যতিরেকে বাংলা মুদ্রণকে জনপ্রিয় ও বাংলা দেশের নিজস্ব শিল্পধারার অঙ্গীভূত করে তোলা সম্ভব হত না। এইখানেই পঞ্চাননের সর্বাধিক কৃতিত্ব।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নোটবই[২] থেকে জানা যায় পঞ্চানন কর্মকারের (ও তাঁর শিষ্য ও জামাতা মনোহর কর্মকারের) আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীতে। পরবর্তী অনুসন্ধানে জানা যায়, আসলে পঞ্চানন ছিলেন ত্রিবেণীর পার্শ্ববর্তী জনপদ বাঁশবেড়িয়ার অধিবাসী। [পঞ্চাননের জামাতা মনোহর ছিলেন ত্রিবেণীর অধিবাসী।] এখানকার কামারদের শিল্প বহুকালের প্রসিদ্ধ। পিতল-কাঁসার বাসন তৈরির জন্য তো এককালে বাঁশবেড়িয়া ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। সেই সূত্রে বহু ঘর কর্মকার-পরিবারের বাস ছিল এখানে, আজও যাঁদের বংশধরেরা সেখানে রয়েছেন। বাঁশবেড়িয়াতেও নীলকুঠির ঘাঁটি ছিল। এরই নিকটবর্তী হুগলীতেও ইংরেজদের কুঠি ছিল। সেখানে যখন হালহেড-

---

১ *Ibid.*

২ 'The Secretary's Notes,' by S. C. Sanial : *Bengal, Past & Present* : July-Dec. 1916, p. 140.

উইলকিন্স-এণ্ডরুসের উদ্যোগে বাংলা বই ছাপার তোড়জোড় শুরু হয়, তখন সহজেই উইলকিন্স তদানীন্তনকালের সুপ্রসিদ্ধ প্রতিবেশী কর্মকার পঞ্চাননের সন্ধান পেয়ে তাঁকেই প্রধান সহকারী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। [দ্রষ্টব্য : বিকাশপর্ব, চতুর্থ অধ্যায়] পঞ্চানন কর্মকারের জীবনের মোড় ঘুরে গেল সেদিন থেকেই, বাংলা হরফ খোদাই ও ঢালাইয়ের সাধনায় মনপ্রাণ-সমর্পিত পঞ্চানন বাংলা মুদ্রণ তথা সংস্কৃতির নতুন ইতিহাস রচনার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হুগলী থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে শ্রীরামপুর— এই চক্রাবর্তনের পথে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, ১৭৭৭-৭৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮০৩-০৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত একাদিক্রমে প্রায় পঁচিশ বছর কাল তিনি বাংলা মুদ্রাক্ষরশিল্পের সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ কালব্যাপী এই সাধনায় নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা হরফের মানকে ক্রমোন্নতির পথে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। প্রয়োজনের তাগিদে আকারে ক্রমশ ক্ষুদ্রতর করে একাধিক সাটের বাংলা হরফই যে তিনি তৈরি করেছিলেন তা নয়, শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানার জন্য দেবনাগরী সহ আরো কয়েকটি ভারতীয় প্রদেশিক ভাষার হরফও তিনি তৈরি করে যান। তাঁর প্রধান শিষ্য ও জামাতা মনোহর কর্মকার সহ বহু বাঙালী শিল্পীকেই তিনি এই কাজে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। প্রসঙ্গান্তরে তাঁর জীবনের এই পরবর্তী অধ্যায়ের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হল। আপাতত ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বাংলা হরফ তৈরির ঐতিহাসিক লগ্নে পঞ্চাননের ভূমিকার কথা আরো একটু তলিয়ে বিচার করা যেতে পারে। পঞ্চাননের নামোল্লেখ প্রথম কোথায় পাওয়া গেল এ বিষয়েও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

আশ্চর্যের কথা, হালহেড তাঁর ব্যাকরণের বিস্তৃত ভূমিকায় কোথাও পঞ্চাননের নামোল্লেখ করেননি। এই ব্যাকরণটি ছাপার জন্য প্রথম বাংলা হরফ তৈরির পটভূমি ও নেপথ্য কাহিনী তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই আশা করা চলে, এ কাজের নানা সমস্যা, বোল্টসের ভূমিকা এবং উইলকিন্সের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সাফল্যের সঙ্গে পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তার কথাও হালহেড তাঁর বইয়ের ভূমিকায় উল্লেখ করবেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি আমাদের সম্পূর্ণ নিরাশ করেছেন। ফলে পঞ্চাননের ভূমিকার যিনি সবচেয়ে উপযোগী প্রত্যক্ষ সাক্ষী হতে পারতেন তাঁর বিবরণী থেকেই আমরা বঞ্চিত হলাম। [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হালহেড জনৈক এ দেশীয় পণ্ডিতের কাছে বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন, কিন্তু তাঁর নামও কোথাও তিনি উল্লেখ করেননি। কেবল তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় এক জায়গায় লিখেছেন, 'The pundit who imparted a small portion of his language to me ...' ইত্যাদি, কিন্তু তাঁর নাম প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করেননি।] ঘটনার অপর নায়ক উইকিন্স নিজেও কোথাও পঞ্চাননের নামোল্লেখ করেছেন বলে শোনা যায়নি। সমসাময়িক-কালের অনুরূপ আরো কিছু ঘটনার কথা মনে রেখে বলা যায় সেই সময়কার ইংরেজ শাসকসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের এইটাই ছিল বৈশিষ্ট্য। বহুক্ষেত্রেই, বিশেষ করে ভাষাচর্চা,

অনুবাদ, গ্রন্থরচনা, ভাব-বিনিময়, জনসংযোগ প্রভৃতি কাজে তখন তাঁদের দেশীয় পণ্ডিত, শিল্পী বা কর্মচারীদের সহায়তা গ্রহণ করতে হত, কিন্তু তাঁদের বিবরণীতে কোথাও এইসব দেশীয় প্রতিভার অবদানের স্বীকৃতি পাওয়া যেত না। বড়ো জোর দু-এক জায়গায় 'native assistant' বলে উল্লেখমাত্র করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসল ব্যক্তিদের নামোল্লেখ করেননি। বিদেশী শাসকদের প্রভুত্বের অভিমান নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের স্বচ্ছ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। প্রসঙ্গত একটি বাইবেল অনুবাদের কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার হিন্দুস্থানী প্রেস থেকে বাইবেলের একটি হিন্দুস্থানী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর কলেজের 'কেরী লাইব্রেরী'তে এই বইয়ের কয়েকটি খণ্ডের (copy) সন্ধান পাওয়া যায়, যার মধ্যে কেবলমাত্র একটির আখ্যা-পত্রটি এইরূপ—

The *New Testament* of Our Lord and Saviour Jesus Christ, translated into the Hindoostanee Language, by Mirza Mohummád Fitrut, and other Learned Natives of the College of Fort William ; revised and compared with the original Greek by William Hunter, Esq.

ঐ লাইব্রেরিতে রক্ষিত এই একই বইয়ের অন্যান্য খণ্ডগুলির আখ্যাপত্র কিন্তু প্রথমোক্ত আখ্যাপত্রটি থেকে একটু ভিন্ন। এগুলিতে আছে :

The *New Testament* of Our Lord and Saviour Jesus Christ, translated into the Hindoostanee Language, by Learned Natives of the College of Fort William ; revised and compared with the original Greek by William Hunter, Esq.[১]

লক্ষণীয়, পরিবর্তনটি ঘটেছে একটিমাত্র ক্ষেত্রে, অর্থাৎ শেষোক্ত আখ্যাপত্রে মূল অনুবাদক Learned Native-এর আসল নামটিই কেবল বর্জন করা হয়েছে! অসাবধানতাবশত যে ভুল হয়ে গেছে, অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে একই সংস্করণের বেশিরভাগ খণ্ডের আখ্যাপত্রটি নতুন করে ছেপে তা সংশোধন করে নেওয়া হয়েছে!

যাই হোক, আমরা পুনশ্চ পঞ্চানন প্রসঙ্গে ফিরে যেতে পারি। হালহেডের ব্যাকরণ ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় বাংলা হরফ তৈরির কাজে পঞ্চাননের ভূমিকার সমর্থনে যখন স্বয়ং হালহেড বা উইলকিন্সের সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে না, তখন অন্যান্য পরোক্ষ সাক্ষ্য, অর্থাৎ পরবর্তী লেখকদের বিবরণীতে এর কোনো প্রমাণ আছে কিনা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। বাংলা মুদ্রণের তথ্যনির্ভর বৈজ্ঞানিক ইতিহাস রচনার কাজে পঞ্চাননের নামের এই উৎস সন্ধান একান্ত প্রয়োজন।

---

১ K. S. Diehl, '*Early Indian Imprints*' : Introduction, Ch. I, p. 19.

তা হলে আমাদের মূল প্রশ্ন, পঞ্চানন কর্মকারের নামোল্লেখ প্রথম কে করেন? ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই যে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে পঞ্চাননের আবির্ভাব ঘটেছে তার সমর্থন কোথায়?

ইংরেজ শাসকসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা যদিও জাত্যভিমানের তাড়নায় দেশীয়দের যথোচিত মর্যাদা দিতে কুন্ঠিত হতেন, তথাপি আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়, তদানীন্তনকালের ইংরেজ মিশনারীরা প্রায়শই এর ব্যতিক্রম ছিলেন। কেরী ও তাঁর সহযোগী ব্যাপটিস্ট মিশনারী সম্প্রদায় এদেশে ধর্মপ্রচারে এসে বহু দেশীয় ব্যক্তির অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে আসেন এবং এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওঁদের কথা মিশনারীরা তাঁদের লেখা নানা বই ও চিঠিপত্রে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হবার পর পঞ্চানন কর্মকার তাঁদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। এর আগেই অবশ্য কেরী পঞ্চাননের কথা শুনেছেন। মুদ্রাক্ষরশিল্পে তাঁর দক্ষতার কাহিনী শুনে কেরী তাঁর সম্বন্ধে বহু তথ্যই সংগ্রহ করেন এবং নিজস্ব মুদ্রণ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে তাঁর সাহায্য গ্রহণে উদ্যোগী হন। ভারতের মাটিতে পদার্পণের পর থেকেই কেরী তাঁর নানা সমস্যা, পরিকল্পনা, প্রচেষ্টা, সাফল্য ও ব্যর্থতার কাহিনী ও ভবিষ্যতের চিন্তা ও রূপরেখা তাঁর নানা লেখা, বিশেষ করে ইংলণ্ডের ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটির সভ্যদের কাছে লেখা তাঁর চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি তাই এইসব চিঠিপত্রে পঞ্চাননের কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি। শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর নানা খুঁটিনাটি ইতিহাসও মিশনারীদের অনেকেই নানাভাবে লিখে গেছেন। মিশনারীদের এইসব অজস্র লেখার ফাঁকে ফাঁকে পঞ্চাননের ভাবমূর্তিটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। তাঁদেরই কোনো কোনো বিবরণী, চিঠিপত্র, ইতিহাস বা স্মৃতিকথায় (Memoirs) প্রথম পঞ্চাননের নামোল্লেখ বা প্রথম বাংলা হরফ তৈরির কাজে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে পঞ্চাননের আবির্ভাবলগ্নের সন্ধান করতে গিয়ে এমন আরেকটি তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে যার ফলে সমস্যার জটিলতায় আরো একটি নতুন গ্রন্থি সংযোজিত হয়েছে। তথাপি এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বহুকাল এটি অনেকেরই দৃষ্টিতে পড়েনি, কারণ এর আকর এমন একটি দুর্লভ গ্রন্থ, বোধ করি যার একটি মাত্র খণ্ডই আছে শ্রীরামপুর কলেজের কেরী লাইব্রেরীতে। সেখানে এটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বইটি— '*The East Indian Chronologist*', কলকাতার 'Hircarrah Press' থেকে ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত।[১] বইটিতে ঐতিহাসিক ঘটনার কালানুক্রমে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮০১ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুন পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলিত হয়েছে। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে বইটিতে J. B. Gilchrist-এর উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে—

'Mr. Wilkins, the celebrated Sanscrit Scholar, aided by an ingenious

১ K. S. Diehl তাঁর '*Early Indian Imprints*' গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন।

artist by the name of Shepherd, completed under the patronage of Governor Hastings, two elegant founts of Persian and Bengalese types, and the first specimen of Oriental Typography of this description appeared this year, viz. Halhed's Bengal Grammar, printed at Hooghly, and Balfour's Formes of Herkeru.' উক্ত উদ্ধৃতি থেকে প্রথমত একটি কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় : ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে হালহেডের ব্যাকরণ ছাপার জন্য উইলকিন্স প্রথম যে বাংলা হরফ তৈরি করেন তা তাঁর একক প্রচেষ্টার ফল নয়, এ কাজে তিনি একজন উদ্ভাবনপটু শিল্পীর সহায়তা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ত লক্ষণীয়, তাঁর এই সহকারী কেবলমাত্র একজন কর্মচারী বা assistant নন, তিনি মূলত একজন 'শিল্পী', বিশেষ করে 'উদ্ভাবনপটু শিল্পী' ('ingenious artist') যিনি শিল্পকর্মের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনে নিপুণ। সুতরাং প্রথম বাংলা হরফ তৈরির কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে এই সহকারী শিল্পীরও প্রাপ্য। তৃতীয়ত, এই শিল্পীর নাম বলা হয়েছে Shepherd। K. S. Diehl এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে পঞ্চানন কর্মকার ছাড়াও আর একজন Mr. Shepherd-এর অস্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত না দিয়ে পরিশেষে মন্তব্য করেছেন : 'All we can do is offer the information in the words of the book. It is not for us to pass the judgment.'[১] সমসাময়িক পত্রপত্রিকায়ও ঐ সময়ে কলকাতায় শেফার্ড নামক জনৈক খোদাইশিল্পীর অস্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] সুতরাং পূর্বোক্ত তথ্যটির পটভূমি বিশ্লেষণ করে আমাদের মনে হয়, উইলকিন্স তাঁর হরফ তৈরির কাজে সম্ভবত পঞ্চানন কর্মকারের সঙ্গে শেফার্ডেরও সাহায্য নিয়েছিলেন।

পরবর্তী কালে শ্রীরামপুর মিশনারীদের লেখা '*Memoir Relative to the Translations, 1807*'-নামক স্মৃতিকথায় পঞ্চানন প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। এখানে তাঁকে মহৎ শিল্পী ('great artist') বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে তিনি উইলকিন্সের সঙ্গে হরফ খোদাই ও ঢালাইয়ের কাজ করেছেন ও তাঁর বিদ্যাকে প্রায় পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করেছেন; পরবর্তীকালে তিনিই শ্রীরামপুর মিশনে যোগদান করে সেখানে হরফ ঢালাইয়ের কারখানা গড়ে তোলেন ও একাজে বহু লোককে শিক্ষিত করে তোলেন। এখানে অবশ্য সোজাসুজি পঞ্চাননের নামোল্লেখ করা না হলেও অত্যন্ত স্পষ্ট ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে উইলকিন্সের সহকর্মী উক্ত মহৎ শিল্পী পঞ্চানন কর্মকার ব্যতীত অন্য কেউ নন। তাঁরা লিখেছেন :

---

১ K. S. Diehl, *ibid* : Introduction, p. 38.

২ রাধাবাজার বা ৪০নং লালবিবি লেনের সোনা-রুপো-পাথরের খোদাইশিল্পী Joseph Shepherd-এর উল্লেখ পাওয়া যায় *India Gazette* পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় : ১৪ সেপ্টেম্বর ১৭৮২, ১৫ মার্চ ১৭৮৪, ৩০ আগস্ট ১৭৮৪, ১ মে ১৭৮৬ ইত্যাদি। ১৭৮৭ সালের মার্চে কলকাতায় শেফার্ডের মৃত্যু হয়। দ্র. Graham Shaw, '*Printing in Calcutta to 1800*', পৃ. ৬৯-৭০।

...'Soon after our settling at Serampore the providence of God brought to us the very great artist who had wrought with Wilkins in that work, and in a great measure imbibed his ideas. By his assistance we erected a letter foundry, and although he is now dead, he had so fully communicated his art to a number of others, that they carry forwad the work of type-casting, and even of cutting the matrices, with a degree of accuracy which would not disgrace European artists.' [১]

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে Joshua Marshman লিখিত '*Memoir relative to the translation of the sacre l Scriptures into the languages of the East at Serampore*' নামক গ্রন্থেও হালহেডের ব্যাকরণ ছাপার কাজে উইলকিন্স ও পঞ্চাননের যৌথ উদ্যোগের কথা উল্লিখিত আছে।[২]

ঐ সময়কার অন্য একটি রচনায় পঞ্চানন কর্মকার সম্বন্ধে স্পষ্টতর উল্লেখ পাওয়া যায়। সমসাময়িক কেরী যুগের সবচেয়ে প্রামাণ্য ধারাবাহিক ইতিহাস লিখেছেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান, ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে দু'খণ্ডে প্রকাশিত '*The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*' গ্রন্থে। মার্শম্যানের মতে [Vol. I, p. 70], উইলকিন্সের সহকারী হিসাবে ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই যে বাংলা মুদ্রণের রঙ্গমঞ্চে পঞ্চানন কর্মকার আবির্ভূত হয়েছেন ও সাধারণ্যে এই শিল্পকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজে ব্রতী হয়েছেন সে কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। একই গ্রন্থে পঞ্চাননের কথা পুনশ্চ উল্লিখিত হয়েছে : 'Soon after the establishment of the press at Serampore, the native blacksmith Punchanon, who had been instructed in the art of punch-cutting by Sir Charles Wilkins, to whom allusion has been made in a former chapter, came to the missionaries in search of employment. Mr. Carey was then contemplating a Sanscrit Grammar for which it was necessary to obtain Nagree types, and Punchanon was immediately engaged for the work.'[৩]

আরো কিছুকাল পরে অপর একটি গ্রন্থে পুনশ্চ পঞ্চানন কর্মকার সম্বন্ধে উল্লেখ পাই : 'He (Wilkins) instructed a native blacksmith, named Panchanan (a very

---

১ George Smith তাঁর '*The Life of William Carey*' (Everyman ed. 1913) গ্রন্থে ১৮১ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত অংশটি উদ্ধৃত করেছেন।

২ S. K. De, '*Bengali Literature in the Nineteenth Century*,' p. 76.

৩ J. C. Marshman, '*The Life & Times of Carey, Marshman & Ward*', Vol. I, p. 179.

illustrative name) in type-cutting, and all the native knowledge of type-cutting was derived from him.'[১]

স্যামুয়েল পীয়ার্স কেরীও তাঁর '*William Carey*' (1923) গ্রন্থে ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের ঐতিহাসিক লগ্নে হুগলীর মাটিতে উইলকিন্সের সঙ্গে পঞ্চাননের মিলনের ঘটনার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন : ...'He (Carey) counted himself most fortunate within two months of reaching Serampore, in getting into communication with Punchanon, the skilled old Indian smith, who had learned punch-cutting and type-making in Hugli under Sir Charles Wilkins himself, India's Caxton.'[২]

একটি শুভ যোগাযোগ ও ঐতিহাসিক সৃষ্টি

সতেরোশো আটাত্তরের ঐতিহাসিক লগ্নে আধুনিক বাংলা মুদ্রণের প্রবর্তন ও তার পটভূমি পর্যালোচনা করতে গিয়ে লক্ষ্য করা গেছে, পূর্ব-পরিকল্পনাবিহীন নিছক একটি যোগাযোগের ফলে কেমন করে ইতিহাসের এক নতুন পর্ব ও এক নতুন শিল্প একটি গ্রন্থপ্রকাশের মধ্য দিয়ে জন্ম নিল। যোগাযোগটি ঘটেছিল হুগলীর মাটিতে। কোম্পানীর চাকরিতে উইলকিন্স ও হালহেড উভয়েই তখন নিযুক্ত ছিলেন হুগলীতে,[৩] আর তারই অদূরে বাঁশ-বেড়িয়া অঞ্চল থেকে খুঁজে আনা হয়েছিল পঞ্চানন কর্মকারকে। প্রথমোক্ত দুজনের প্রাচ্যভাষাপ্রীতি ও সৃষ্টির আবেগ এবং শেষোক্ত জনের কর্ম ও শিল্পের তাড়না— এই ত্রিবেণী সঙ্গমের ফলেই একটি মহতী ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত হতে পেরেছিল এবং তার প্রকাশ দ্রুত সম্ভব হয়েছিল ঐ একই স্থানে জন এণ্ডরুসের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ফলে। ঐ সময়ে একটি বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশের প্রয়োজন, তাগিদ ও ইচ্ছা ছিল ঠিকই, কিন্তু হুগলীর মাটিতে এঁদের শুভ যোগাযোগ ও একত্র সমাবেশ না ঘটলে ঐ প্রকাশনা এত ত্বরান্বিত হত কিনা সন্দেহ।

বাংলাদেশের প্রথম ছাপাখানার মালিক : জন এণ্ডরুস

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে বাংলা মুদ্রণের রঙ্গমঞ্চে যে কয়জন ঐতিহাসিক নায়কের আবির্ভাবের ফলে এই ব্যাকরণ প্রকাশনা সম্ভব হয়েছিল তাঁদের কথা ইতিপূর্বেই বিশেষভাবে স্মরণ করেছি। ওয়ারেন হেস্টিংস, নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড, চার্লস উইলকিন্স, শেফার্ড ও পঞ্চানন

---

১ W. H. Carey '*The Good Old Days of Honorable John Company*', 1882 (1964 ed.), p. 123

২ S. P. Carey, '*William Carey*', p. 198.

৩ সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস', পৃ. ২৯-৩০

কর্মকারের যৌথ উদ্যোগে— একটি উদ্দেশ্যগত সামগ্রিক পরিকল্পনা, সরকারী আনুকূল্য, ব্যক্তিগত সাধনা ও আগ্রহ এবং সর্বোপরি নিরলস পরিশ্রম, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও কারিগরি নৈপুণ্যের ফলেই এই ঐতিহাসিক গ্রন্থের প্রকাশনা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু উপরোক্ত চার-পাঁচজনের অবদানের সঙ্গে আরো একজনের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি হুগলীর সেই ঐতিহাসিক ছাপাখানার মালিক— জন এণ্ড্রুস। তাঁর ছাপাখানাটিই শেষ পর্যন্ত সকলের সমবেত প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলেছিল। তাই বাংলাদেশের প্রথম ছাপাখানা ও তার মালিক জন এণ্ড্রুস আমাদের ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন।

আক্ষেপের কথা, এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ছাপাখানাটি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য আজো জানা যায় নি। 'The first Bengalee types ever used in India were those employed in 1778, in printing Halhed's Grammar at a press in Hooghly of which no record now remains.'[১] কেবলমাত্র জানা যায় এটি ছিল হুগলীতে, যেখান থেকে ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে হালহেডের ব্যাকরণটি ছাপা হয়। বইটির মুদ্রণ-পারিপাট্য দেখে সহজেই অনুমান করা চলে, ছাপাখানাটি উন্নতধরনের সরঞ্জামে সুসজ্জিত ছিল। কিন্তু এর পরে ছাপাখানাটির আর কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। এমন একটি উন্নতধরনের মুদ্রাযন্ত্রের আয়ু কেবলমাত্র একটি বই ছেপেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। হয়ত-বা এখান থেকে আরো কিছু ছাপার কাজ হয়েছে যার সন্ধান আমরা পাইনি, নয়ত-বা ছাপাখানাটি স্থানান্তরিত ও হস্তান্তরিত হয়েছে এমনভাবে যার ফলে নতুন চেহারায় তার পুরনো পরিচয়টি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই ছাপাখানাটিই মালদহ-কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়ে কেম্পানীর প্রেস বা হিকীর প্রেসে রূপান্তরিত হয়েছে কিনা অনুমানসাপেক্ষ।

ছাপাখানাটির মতো এর মালিকের পরিচয়ও আমাদের কাছে অনুদ্‌ঘাটিত। এতদিন পর্যন্ত একটিমাত্র সূত্রে এইটুকুই জানা গেছে যে এর মালিক ছিলেন এণ্ড্রুস নামক জনৈক 'পুস্তকবিক্রেতা'। [···'The first book in which Bengalee types were used was Halhed's *Bengalee Grammar*, printed at Hoghly at the press established by Mr. Andrews, a bookseller, in 1778.'[২]] কিন্তু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার অন্যতম নায়ক সম্বন্ধে বিস্তৃততর তথ্য সন্ধানের আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। সেই আগ্রহবশতই সমসাময়িককালের ঘটনার বিভিন্ন প্রামাণ্য দলিল পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমি এণ্ড্রুস সম্বন্ধে আরো কিছু অজ্ঞাতপূর্ব নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছি। এইসব বিচ্ছিন্ন তথ্যের সমাহারে এণ্ড্রুস সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা গড়ে তোলা যেতে পারে।

---

১ J. C. Marshman, '*The Life and Times of Carey, Marshman & Ward*', Vol. I, p. 70.

২ J. C. Marshman, *ibid*, p. 159.

আলোচ্য ছাপাখানাটির মালিকের পুরো নাম ছিল জন এণ্ড্রুস (John Andrews)। মূলত তিনি ছিলেন পুস্তক-ব্যবসায়ী বা পুস্তক-বিক্রেতা ('Book-seller')। তবে ভ্রাম্যমান বিক্রেতা ('chapman') হিসাবেও তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে মনে হয় অন্তত কিছুকাল তিনি কাঁধে বইয়ের বোঝা নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বই ফিরি করতেন বা তাঁর বইয়ের ব্যবসা চালাতেন। তাই কখনো হুগলী-চুঁচুড়া অঞ্চলে, কখনো বা কলকাতায় তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। এই ভ্রাম্যমান বইয়ের ব্যবসায়ের সূত্রেই বোধ হয় তিনি ১৭৭৭-৭৮ খ্রীস্টাব্দে হুগলীতে তাঁর ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এইটিই ছিল প্রথম বাংলা ছাপাখানা। তা থেকে অন্তত এটুকু অনুমান করা চলে যে, ছাপাখানায় তাঁর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা ঝোঁক যাই থাকুক না কেন তা তিনি বাংলাদেশের মাটিতে অর্জন করেননি ; সম্ভবত ইংলণ্ডে এ বিষয়ে তাঁর হাতে খড়ি, পরবর্তীকালে ভাগ্যান্বেষণে বাংলাদেশে এসে তাঁর বইয়ের ব্যবসায়ের অঙ্গ হিসাবে হুগলীতে একটি ছাপাখানাও খুলে বসেন। এতে তাঁর নিজের ভাগ্য কতদূর খুলেছিল জানি না, কিন্তু বাংলা মুদ্রণ তথা সাহিত্যের ভাগ্যাকাশে তিনি নিঃসন্দেহে নতুন উষার আলো বহন করে এনেছিলেন। তবে ছাপাখানার মালিক হিসাবে হুগলীতে তিনি বসে থাকতে চাননি। কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় গিয়ে নিজস্ব পুস্তকালয় স্থাপন করে বসেছেন, আর বছর দুয়েকের মধ্যে সেখানে জমি-বাড়িও কিনেছেন। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই এণ্ড্রুস কলকাতায় তাঁর গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। হিকীর *Bengal Gazette*-এর চতুর্থ সংখ্যায়, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৭৮০ তারিখে, এণ্ড্রুস তাঁর Circulating Library-র গ্রাহক-গ্রাহিকা, কলকাতার ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াদের উদ্দেশে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। এতে তিনি তাঁর গ্রন্থাগারের বই লেনদেনের নিয়মাবলী, বই নিয়ে রাখার সময়সীমা, কার্যসময় ইত্যাদি বিষয় সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করেন।

তদানীন্তনকালে কলকাতার জমি-বাড়ি-বিষয়সম্পত্তি কেনা-বেচা বা ইজারা দেওয়ার হাজার হাজার পুরনো দলিল ভিত্তি করে Walter K. Firminger যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন তা থেকে জানা যায়, ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মার্চ-১লা এপ্রিল তারিখে জনৈক Thos. Hamilton ভ্রাম্যমান বিক্রেতা জন এণ্ড্রুসকে তেরো হাজার টাকায় ২ বিঘা ৭ কাঠা জমি সমেত একটি একতলা বাড়ি বিক্রয় করেন। ['No. 2209, 31st March & 1st April 1780 : Thos. Hamilton sells to John Andrews, chapman, for Sa. Rs. 13000 a lower-roomed house and ground (2 Bigas 7 cottahs)···' ; Walter K. Firminger, '*History of Calcutta Streets & Houses*', 1786-1835, No. II.][১]

অপর একটি সূত্রে জানা যায়, ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দের ২২শে জুন তারিখে পুস্তকবিক্রেতা জন এণ্ড্রুস Constantia Hamilton নাম্নী জনৈকা বিধবাকে বিবাহ করেন। ['1782. June 22— Mr. John Andrews, Bookseller, and Mrs. Constantia Hamilton,

১ *Bengal, Past & Present*, Vol. XIV, Pt. II, April-June, 1917, p. 192.

widow. William Johnson, chaplin'.: W. K. Firminger, '*Marriages in Calcutta*, 1780-1785.']১ এই Mrs. Hamilton কি এণ্ডরুসের বাড়ির পূর্বতন মালিক Mr. Hamilton-এর বিধবা স্ত্রী ? এই বিবাহসংবাদের সঙ্গে জন এণ্ডরুস সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মে তারিখের ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকায় লেখা হয়, গতকাল জনৈক এটর্নী মিঃ জি. ও পুস্তকভাণ্ডারের অন্যতম মালিক মিঃ এ.-র মধ্যে জুয়াখেলার দেনা নিয়ে এক পুরনো ঝগড়াকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হয় তাতে ঘটনাস্থলেই মিঃ জি. নিহত হন।২ এই ধরণের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ ও তার শোচনীয় পরিণতি পুরনো কলকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজে প্রায়ই দেখা যেত।

পরবর্তীকালে কলকাতায় পুস্তকবিক্রয় কেন্দ্রের পরিচালক হিসাবে এণ্ডরুসের বিজ্ঞপ্তি সমকালীন ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় দেখা যায়। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখের ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকায় Library শিরোনামায় এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে 'Mr. Andrews' লণ্ডন থেকে আমদানী করা পুস্তকাবলীর মধ্যে তখনো পর্যন্ত যেগুলি অবিক্রীত পড়ে ছিল তার এক তালিকা প্রকাশ করেন।৩ ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর তারিখের পত্রিকায় এণ্ডরুস পুনশ্চ অনুরূপ একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন।৪ প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, উপরোক্ত দুটি বিজ্ঞপ্তিতেই অবিক্রীত পুস্তক তালিকায় হালহেডের '*Gentoo Laws*' বইটির উল্লেখ আছে। অথচ এণ্ডরুস তাঁর বিজ্ঞপ্তিতে হালহেডের ব্যাকরণটির উল্লেখ করেননি। এর দুটি কারণ সম্ভব। হয় ঐ সময়ের মধ্যেই অর্থাৎ প্রকাশিত হবার ছয় বছরের মধ্যে ব্যাকরণটির সমুদয় খণ্ড নিঃশেষিত হয়ে গেছে, অথবা এটি এদেশেই ছাপা বলে 'বিদেশী' অবিক্রীত বইয়ের ঐ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। যাই হোক, উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তি-গুলো থেকে প্রমাণিত হয়, ঐ সময় এণ্ডরুস কলকাতায় তাঁর বই বিক্রয়ের স্থায়ী কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন, যেটিকে সাধারণভাবে 'Library' বলে উল্লেখ করা হত।

এরপরেও আরো বেশ কিছুকাল এণ্ডরুস জীবিত ছিলেন এবং অষ্টাদশ শতকের শেষ-দিকে কলকাতা ত্যাগ করে তিনি পুনরায় হুগলী-চুঁচুড়া অঞ্চলে গিয়ে বাস করতে থাকেন। ক্যালকাটা গেজেটের পৃষ্ঠা খুঁজতে খুঁজতে আরো কয়েকবার তাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যাটির কথা ধরা যেতে পারে। ঐ বছর ৭ই এপ্রিল ববি ওক্স (Bobby Oakes) নামক চার বছরের একটি ছোটো ছেলে হারিয়ে যাওয়ায় তার বাবা রিচার্ড ওক্স (Richard Oakes) ছেলের সন্ধান পাওয়ার আশায় পাঁচশো টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে পত্রিকার উক্ত সংখ্যায় যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার

১ *Bengal, Past & Present*, Vol. VII. Jan-June 1911, p. 167.

২ W. S. Seton-Karr, '*Selections from Calcutta Gazettes*,' Vol. I. p. 202.

৩ *Ibid*, Vol. I, p. 56.

৪ *Ibid*, Vol. I, p. 64.

করেন তাতে জানা যায় যে হুগলীর জন এণ্ডরুসের বাড়ি থেকেই ববি নিখোঁজ হয়। চুঁচুড়া-নিবাসী রিচার্ড ওল্ম তাঁর ছেলেকে নিয়ে এণ্ডরুসের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটে।[১] তিন সপ্তাহ পরে ২৬শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় নিখোঁজ বালকটির সন্ধান লাভের আশায় পুনশ্চ ছয় শত টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এখানে অবশ্য এণ্ডরুসকে চুঁচুড়া-বাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] এই বিজ্ঞপ্তি দুটির মূল ঘটনা আমাদের পক্ষে অবান্তর হলেও, এখান থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে ঐ সময় এণ্ডরুস হুগলীতে, অথবা দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী চুঁচড়ায় বাস করতেন। হুগলী চুঁচুড়া পাশাপাশি দুটি জনপদ, বর্তমানে একই পৌরসভার দুটি পাশাপাশি অংশ। তাই এই নাম বিভ্রাট তখন কেন, এখনো প্রায়ই ঘটে। যাই হোক, ভবঘুরে এণ্ডরুস জীবনের শেষভাগে পুনশ্চ তাঁর প্রথম ছাপাখানার স্মৃতি বিজড়িত হুগলী-চুঁচুড়া অঞ্চলে গিয়েই বাস করতে থাকেন। কলকাতায় তাঁর পূর্বতন বাড়ি জমিও তিনি এর কিছুদিন পরেই বিক্রি করেছেন। Walter K. Firminger লিখিত পূর্বোক্ত নিবন্ধ '*History of Calcutta Streets & Houses*, 1786-1835, No. II' থেকে জানা যায় যে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ১৪-১৫ই জুলাই তারিখে চুঁচুড়া-নিবাসী (পূর্বে কলকাতাবাসী) জন এণ্ডরুস তের হাজার টাকায় কেনা তাঁর পূর্বতন সম্পত্তি ১৬৫০০ টাকায় Joseph Barretto-কে বিক্রি করে দেন। ['No. 2210, 14th, 15th July 1800—J. Andrews, formerly of Calcutta and now of Chinsurah, sells the property defined in No. 2209, for Sa. Rs. 16500 to Joseph Barretto.'][৩]

জন এণ্ডরুসের জীবনের পরবর্তী আর কোনো ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় না। হুগলী-চুঁচুড়া থেকে কলকাতার পথে আবর্তিত পুস্তক ব্যবসায়ী এণ্ডরুসের জীবনের অধিকাংশ পর্বই ইতিহাসের স্রোতে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও একটি উজ্জ্বল বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো হুগলীর ছাপাখানাটি বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থ

হালহেডের ব্যাকরণের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা স্মরণ করে এই বই ও এর প্রকাশনার সামগ্রিক পটভূমি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হল। তবু এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, হালহেডের ব্যাকরণটি মূলত ইংরেজি বই, কেবলমাত্র এর বাংলা উদাহরণগুলি বাংলা হরফে ছাপা। সুতরাং এই বইয়ে প্রথম বাংলা ছাপার নমুনা পাওয়া গেলেও, এটিকে সম্পূর্ণ বাংলায় ছাপা বই বলা চলে না। 'সম্পূর্ণ' বাংলা বইয়ের জন্য আমাদের আরো ছয়-সাত বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। কলকাতায় কোম্পানীর প্রেস থেকে ছাপা জোনাথান ডানকান

---

১ *Ibid*, Vol. III, p. 537.

২ *Ibid*, Vol. III, p. 537.

৩ *Bengal, Past & Present*, Vol. XIV. Pt. II, April-June, 1917, p. 192.

কর্তৃক বাংলায় অনূদিত কয়েকটি আইনের বই প্রকাশিত হয় ১৭৮৪-১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে। এইগুলিই প্রথম দিকের সম্পূর্ণ বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের মর্যাদা পাবার অধিকারী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই আইনানুবাদগুলি গদ্যে রচিত। ছাপার অক্ষরে বাংলা গদ্যরচনার সূত্রপাত এখান থেকেই। বাংলা সাহিত্যে গদ্যের প্রবর্তন মুদ্রণযন্ত্রের অন্যতম মহৎ অবদান। বাংলা মুদ্রণের প্রবর্তনের ফলে বাংলা পদ্যের সর্বব্যাপী জলরাশির মধ্যে গদ্যের ডাঙা জাগতে শুরু করে। দিনে দিনে সেই গদ্যের ডাঙা উত্তরসাধকদের অনলস প্রচেষ্টায় কর্ষিত হয় ও ফুলে-ফলে-শস্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

ডানকানের উল্লিখিত আইনানুবাদগুলির মধ্যে ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত একটি অনুবাদই সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণভাবে ইম্পে কোডের বঙ্গানুবাদ বলে পরিচিত এই বইটিই এতকাল প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে এসেছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ডানকানের আরো দুটি আইনের বঙ্গানুবাদের সন্ধান পাওয়ায় সেগুলিকেই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত বইয়ের মধ্যে প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের মর্যাদা পাবার অধিকারী বলে মেনে নেওয়া যায়।[১] এই বই দুটিও ইম্পে কোডের বঙ্গানুবাদ, তবে এখানে কেবলমাত্র বাংলা তর্জমাটুকু স্থান পেয়েছে। অপরপক্ষে ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বইটিতে মূল ইংরেজি আইনটিও ছাপা আছে। বই দুটির ইংরেজি আখ্যাপত্র এইরূপ :

১ *Translation of the regulations for the administration of justice in the Courts of Dewanny Adawlut*, by Jonathan Duncan. Calcutta : at the Hon'ble Company's Press, 1784 [১৩১, ৭, ৪ পৃষ্ঠা]

২ *Abridgement of the regulations, for the administration of justice, in the Courts of Dewanny Adawlet* ; passed in Council the fifth day of July 1781. By Jonathan Duncan. Calcutta : printed, at the Hon. Company's Press, 1784. [৮২ পৃষ্ঠা]

দুটি বইই লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরিতে (Accession No. 161D ও 154A যথাক্রমে) রক্ষিত আছে।

১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদের ইংরেজি আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 'Regulations/for the/Administration/of/Justice,/in the/Courts of Dewannee Adaulut, /passed in Council, the 5th July, 1783./With a Bengal translation,/by Jonathan Duncan./Calcutta : /At the Honorable Companys' Press./M. DCCLXXXV.' ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে বইটির একটি কপি রক্ষিত আছে। [Accession

১ Graham Shaw, *op. cit.*, p. 74.

No. 26. e. 12.] বইটিতে মূল ইংরেজি Regulations ও তার সঙ্গে জোনাথান ডানকান কৃত বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত আছে। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি স্যর ইলাইজা ইম্পে কর্তৃক বিধিবদ্ধ ৯৫টি আইন এতে সংকলিত হয়েছে।[১] পরিশিষ্টে (Supplement) ১৭ই ডিসেম্বর ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিধিবদ্ধ আরো কিছু নতুন ধারার মূল ইংরেজি ও তার বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হয়েছে। ১০'৫" × ৮'৫" আকারের এই বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৫ + ৩১ ; এর ৩ থেকে ৫ পৃষ্ঠায় ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে Governor General and Council-কে লেখা ডানকানের একটি ইংরেজি চিঠি উদ্ধৃত আছে। ৬ পৃষ্ঠায় বাংলা অনুবাদ দিয়ে গ্রন্থারম্ভ ; বইটির বামদিকের পৃষ্ঠাগুলিতে বাংলা অনুবাদ ও ডানদিকের পৃষ্ঠাগুলিতে মূল ইংরেজি Regulations পাশাপাশি ছাপা আছে। বইটির মূল অংশে মোট ১০৫ পৃষ্ঠা বাংলায় ছাপা। এ ছাড়া, পরিশিষ্টে রয়েছে ৩১ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি অতিরিক্ত সংযোজন ('Supplement')। সেখানে মোট ১৫ পৃষ্ঠা বাংলায় ও ১৫ পৃষ্ঠা ইংরেজিতে ছাপা। সুতরাং বইটিতে মোট ১২০ পৃষ্ঠা বাংলায় ছাপা। বাংলা হরফগুলি উচ্চতায় ৩'৫ মি. মি. অর্থাৎ হালহেডের ব্যাকরণে ব্যবহৃত বাংলা হরফ (৪'৫ মি. মি.) অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। গঠনসৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যের বিচারে এগুলি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবি রাখে। ভাষার নমুনা স্বরূপ এর অনুবাদের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল : 'সন ১৭৮০ সালের ১৫ পন্দরঞি আগস্তে শ্রীযুত গবনর জেনরেল সাহেব ও কৌসলি সাহেবের দিগের আজ্ঞা ছিল যে আদালতের ব্যবস্থাপক সাহেবেরা তহসিলের সাহেবের দিগের সহিত আদালতের সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের লেখাপড়া না করিবেন পরে সন ১৭৮২ সালের ৩ তেসরা আপরিলে ও খালিসার কমিটের সাহেবের দিগের এবং তাঁহার দিগের সম্পর্কীয় যে ২ সাহেব কিম্বা এই দেশীয় লোক তাঁহার দিগের প্রতি ও আদালতের ব্যবস্থাপক সাহেবের দিগের সহিত আদালত সম্পর্কীয় বিষয়ের লেখাপড়ার জন্যে সেই মত নিষেধ আছে পরে সেই সন ১৭৮২ সালের ১৭ মাইতে ও ব্যবস্থাপক সাহেবের দিগকে আজ্ঞা হইয়াছে যে আপন ২ আদালত সম্পর্কীয় কোন বিষয় সরকারের অন্য কোন আমলা কিম্বা আর কাহকে কিছু নালিখেন এবং কাহার লিখন গ্রহণ না করেন কেবল সদর দেওয়ানি আদালতের ও শ্রীযুত গবনর জেনরেল সাহেব ও কৌসলি সাহেবের দিগের নিকটে লিখিবেন এবং তাঁহার দিগের লিখনানুসারে কার্য্য করিবেন।'

জোনাথান ডানকান কর্তৃক বাংলায় অনূদিত আরেকটি আইন গ্রন্থের সন্ধান আমি পেয়েছি। এটি বহুকাল অনাবিষ্কৃত পড়ে ছিল, আমার গবেষণাকালে ইংরেজি বা বাংলা কোনো সমালোচনা গ্রন্থেই এর অস্তিত্বের উল্লেখ দেখিনি। ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে এই দুর্লভ গ্রন্থের একটি কপি আছে [Accession no. 14125.a]। ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এই

১ *Friend of India*, Feb. 26, 1835 : 'First establishment of a Press in India'

বইটির আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 'Summary/of such of the/Clauses/of the/Act of Parliament, of the 18th of May 1784,/as relate to the/Natives of India./ Translated into the Bengal Language,/by/Jonathan Duncan,/Published by Order of the/Hon. the Governor General and Council/M, DCC, LXXXV.' ভাষার নমুনা স্বরূপ এর অনুবাদের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল : 'হিন্দুস্তানের মধ্যে ইঙ্গরেজের যে ২ দেশ অধিকার আছে তাহার সুন্দর রূপ কর্ম্ম চলন জন্যে ও রক্ষার কারণ ইঙ্গরেজের রাজ্যের শ্রী শ্রী পাদসাহের সন ২৪ চব্বিশ জলুশ সন ১৭৮৪ সতরশও চৌরাশী সালে শ্রী শ্রী পাদসাহের এবং ইঙ্গরেজ রাজ্যের রাজ্যতন্ত্র মন্ত্রিগণ পরলমেন্টের যে ২ আজ্ঞা হইয়াছে তাহার মধ্যে যে ২ বিষয় সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যা প্রভৃতি এই দেশ বাসীয় মনুষ্য ও প্রজাবর্গের সম্পর্কীয় হক এবং ন্যায্যের কারণ আজ্ঞা হইয়াছে তাহার মজমুন পারশী ও বাঙ্গলা শব্দে তরজমা করিয়া শ্রীযুত গবনর জনরেল সাহেব ও কৌশলের সাহেবের দিগের আজ্ঞা ক্রমে ইস্তহার করা জায়।'

সাধারণভাবে এই অনুবাদটিকে ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের পিটস্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের (Pitt's India Act) বঙ্গানুবাদ বলা হয়। ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে ডানকান এই অনুবাদের কাজ সম্পূর্ণ করেন।[১] ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দেই বইটি প্রকাশিত হয়, তবে এর কোথাও মুদ্রাকরের উল্লেখ নেই। কেবল জানা যায়, গবর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের আদেশক্রমে এটি প্রকাশিত। বইটির মুদ্রণবৈশিষ্ট্য এবং এর বাংলা হরফগুলির ধাঁচ ও উচ্চতা (৩'৫ মি. মি.) বিচার করে বলা চলে যে ডানকানের পূর্বোক্ত বইটির সঙ্গে এর মুদ্রণগত হুবহু সাদৃশ্য রয়েছে এবং সম্ভবতঃ এটিও কলকাতার কোম্পানীর প্রেসে ছাপা। ৮'৭৫" × ৬" আকারের এই বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ১৪। ইংরেজিতে ছাপা আখ্যাপত্র ও অমুদ্রিত ২য় পৃষ্ঠা ব্যতীত এর বাকি ১২টি পৃষ্ঠাই কেবলমাত্র বাংলায় ছাপা।

জোনাথান ডানকান : ইংরেজি আইনের বাংলা গদ্যানুবাদের প্রবর্তক

বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাসে জোনাথান ডানকান কর্তৃক বাংলা গদ্যে অনূদিত আইনের বইগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থ হিসাবে এগুলি যেমন ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে, তেমনই ব্যবহারিক প্রয়োজনে ছাপার অক্ষরে বাংলা গদ্য রচনার সূত্রপাত করে বইগুলি বুদ্ধিজীবীদের কাছে এক নতুন আদর্শ ও পথের সন্ধান দিতে পেরেছে। বাংলা মুদ্রণ ও বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাই জোনাথান ডানকানের

---

১ Duncan to Government, 16th March 1785, Consultation 23rd March, 1785, Bengal Revenue Consultations—'*Unpublished-Record-Range 50,* Vol. 58, p. 27 : V. A. Narain তাঁর গবেষণাগ্রন্থ '*Jonathan Duncan and Varanasi*' (1959)-এ এই তথ্য উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু ডানকানের এই অনুবাদটি যে মুদ্রিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল এখানে তার উল্লেখ নেই।

(১৭৫৬-১৮১১) নাম অবশ্যই স্মরণীয়। তাঁর লেখার সাহিত্যিক মূল্য বা তাঁর গদ্যের শিল্প-বৈশিষ্ট্য এখানে বিচার্য নয়, সব চেয়ে বড়ো কথা, ছাপার অক্ষরে বাংলা গদ্যের প্রবর্তন করে তিনি আমাদের কাছে এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিলেন।

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে মাত্র ষোল বছর বয়সে এই তরুণ ইংরেজ যুবক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য রাইটারের চাকরি নিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করেন এবং ৩৯ বছর ভারতের বিভিন্ন স্থানে সরকারী চাকরিতে কাটিয়ে বোম্বাই শহরে ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১] তাঁর সমগ্র চাকুরি জীবনে তিনি ধাপে ধাপে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছেন ও শেষ পর্যন্ত বোম্বাই প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। সেই পদে ষোল বছর কাজ করার পর ঐ চাকরিতে থাকাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। কর্মক্ষমতা, সততা, নিষ্ঠা, বিচক্ষণতা ও পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি হেষ্টিংস ও কর্নওয়ালিসের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি নানা পদে আসীন থেকে বহু দায়িত্ব পালন করেন। রাজস্ব বিভাগ ও কোম্পানীর অর্থসংগ্রহের কাজে ডানকান বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন এবং 'Superintendent of Khalsa Records' পদে তিনি কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন। 'Preparer of Reports' পদেও তিনি সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। পরে তিনি 'Secretary to the Public and Revenue Departments' পদে নিযুক্ত হন। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি বেনারসে Resident হিসাবে প্রেরিত হন এবং সেখানে ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কাজ করে কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণ উভয়েরই প্রশংসা অর্জন করেন। কর্মজীবনের শেষ পর্যায়ে ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি বোম্বাইয়ের গভর্নর নিযুক্ত হন ও সেই পদেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যান।

কর্মব্যস্ত এই রাজকর্মচারীর আরো একটা পরিচয় ছিল এবং সেই পরিচয়ের টানেই বাংলা ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভাষাচর্চার প্রতি তাঁর এমন এক সহজাত অনুরাগ ছিল যে বহুবিধ সরকারী কাজের ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও তিনি ওলন্দাজ, ফারসী ও বাংলা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁর এই বিশেষ ভাষাজ্ঞানের জন্যই তিনি প্রথম কর্মজীবনে সদর দেওয়ানী আদালতে ওলন্দাজ ভাষার অনুবাদক (Dutch translator) পদে নিযুক্ত হন, ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল কর্নওয়ালিসের উত্তর প্রদেশ সফরের সময় দোভাষীর কাজে তাঁর ডাক পড়ে ও সর্বোপরি ইম্পে কোডের বাংলা অনুবাদের গুরুদায়িত্ব তাঁর উপরেই ন্যস্ত হয়। বহুভাষাবিশারদ ডানকান বাংলা ভাষার প্রতিই বিশেষ আকৃষ্ট হন। দক্ষ প্রশাসক হয়েও ভাষা-সাহিত্য চর্চার প্রতি ডানকানের এই অকৃত্রিম অনুরাগ কখনো ক্ষুন্ন হয়নি। মূলত এই অনুরাগ-বশতই তিনি বাংলা অনুবাদের কাজে সানন্দে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সকল ব্যক্তিগত রচনায়— তাঁর চিঠিপত্র ও সরকারী প্রতিবেদনগুলিতেও পরিশীলিত সাহিত্যিক রুচির পরিচয়

১ V. A. Narain, '*Jonathan Duncan and Varanasi.*'

ছড়িয়ে থাকত। এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল-এর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। '*Asiatic Researches*'-এ তাঁর কিছু কিছু লেখাও প্রকাশিত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিবৃত্ত রচনার কাজে Bruce-কে সাহায্য করার জন্য তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন। প্রাচীন পারস্যের ইতিহাস রচনার কাজেও তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন, অবশ্য শেষ পর্যন্ত এটি কার্যে পরিণত হয়নি। প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগবশতই তিনি বেনারসে ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। এতে যেমন সংস্কৃত চর্চার প্রসার ঘটেছিল, তেমনই এখানে কোম্পানীর আইন ও প্রশাসনের কাজে প্রয়োজনীয় বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে আদালতে জজ-পণ্ডিত বা Law Officer হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। বেনারসের পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তিনি এমন অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন যে অনেকেই পরিহাস করে বলতেন, ডানকান নিজেই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে গেছেন। 'According to Mackintosh, the Recorder of Bombay, Duncan had been "Brahmanised" by long residence in India.'[১]

প্রশাসক ডানকান অপেক্ষা প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী ডানকানের এই পরিচয়ই আমাদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয়। কোম্পানীর বিচারবিভাগীয় ও প্রশাসনিক স্বার্থে যখন ইলাইজা ইম্পে কর্তৃক দেশের সমস্ত প্রাদেশিক, আঞ্চলিক ও নিম্ন আদালতের জন্য বিধিবদ্ধ বিস্তৃত আইনের ধারাগুলি জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে ফারসী ও বাংলায় অনুবাদের একান্ত প্রয়োজন দেখা দিল, তখন হেস্টিংসের অভ্রান্ত নির্বাচনে বাংলা অনুবাদের দায়িত্ব ডানকানের উপরই ন্যস্ত হয়।[২] কিন্তু এই গুরুদায়িত্বভার অর্পণ সত্ত্বেও ডানকানকে তাঁর অন্যান্য সরকারী কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। অথচ এই ধরনের অনুবাদের কাজ যাঁদের স্বাভাবিক কর্তব্যসীমার মধ্যে পড়ে তাঁরা হয় অক্ষমতা, অথবা পরিশ্রমের ভয়ে, এই কাজ এড়িয়ে যান।[৩] তাতে অবশ্য ডানকানের আক্ষেপ নেই, বরং সানন্দে তিনি দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসেন এবং মাত্র এগারো মাসের মধ্যেই (২৬ মার্চ ১৭৮২ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৩) এই কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলেন। কোম্পানীর সমসাময়িক দলিলপত্র এবং ডানকান ও তাঁর খুল্লতাত, কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর, জন মিকি (John Michie)-র মধ্যে লেখা চিঠিপত্র থেকে এই অনুবাদগ্রন্থ রচনার যে কৌতূহলজনক নেপথ্যকাহিনী জানা যায়, তাতে মনে হয় পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যাপারে ডানকানের প্রতি অবিচার করা হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্টের ফারসী দোভাষী ও কলকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের অন্যতম বিচারক Robert

---

১ V. A. Narain, *ibid*.

২ Resolution of the Board, 26 March 1782 : *Bengal Revenue Consultations, Range 50*, Vol. 39, p. 307—as quoted by V. A. Narain, *ibid*.

৩ *Duncan to John Michie*, 20th Oct. 1783, Guildhall Library, MSS. 5881—as quoted by V. A. Narain, *ibid*.

Chambers-এর ভাই William Chambers-এর উপর ইম্পে কোডের ফারসী অনুবাদের ভার দেওয়া হয়েছিল এবং সেজন্য কোম্পানী তাঁকে মাসিক দুহাজার টাকা বরাদ্দ করেন।[১] কিন্তু ডানকানের বেলায় এরূপ কোনো মাসিক বরাদ্দ করা হয়নি। তা সত্ত্বেও ডানকান অত্যন্ত দ্রুততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর অনুবাদ সম্পূর্ণ করে দিলে, কোম্পানীর ৮ই এপ্রিল ১৭৮৩ তারিখের প্রস্তাবক্রমে তাঁকে এককালীন মোট পনেরো হাজার টাকা আনুতোষিক দেওয়া হয়। এতে স্বভাবতই ডানকান খুব ক্ষুণ্ণ হন, কারণ অনুরূপ কাজের জন্য চেম্বার্সকে ইতিমধ্যেই বত্রিশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল, যদিও তাঁর ফারসী অনুবাদের কাজ তখনো অনেক বাকি এবং সেজন্য তাঁকে মাসে মাসে আরো টাকা দেওয়ার কথা। এই অসম ব্যবহারের জন্য ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ডানকান প্রতিবাদ জানালে, কোম্পানী তাঁকে কেবলমাত্র এইটুকু সান্ত্বনাই দিয়েছিলেন যে এর দ্বারা তাঁরা ডানকানের কাজের প্রতি কোনোরূপ অমর্যাদা দেখাতে চাননি; কিন্তু ফারসী অনুবাদের জন্য এমন আশাতিরিক্ত খরচ বেড়ে যাওয়ায়, বাংলা অনুবাদের জন্য তখন আর অনুরূপ খরচ করা তাঁদের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। তার ফলে এই অবিচারের আর কোনো প্রতিকার হয়নি।

সমকালীন বাংলা মুদ্রণের ধারা

ডানকানের অনুবাদ গ্রন্থের আলোচনা সূত্রে সমকালীন আইনের বাংলা অনুবাদ সম্বন্ধে আরো তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবার আগে, বক্ষ্যমান সূচনা পর্বে বাংলা মুদ্রণের বিশিষ্ট ধারাগুলির একটি সুস্পষ্ট শ্রেণীবিন্যাস করে নেওয়া প্রয়োজন।

বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদি যুগ প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই আমি হালহেডের বাংলা ব্যাকরণ ও ডানকান কর্তৃক বাংলায় অনূদিত আইনের বইগুলির বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এই ব্যাকরণ ও আইনের অনুবাদ অবশ্যই দুটি ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। একটির সঙ্গে অপরটির কোনো বিষয়গত সাদৃশ্য বা সম্পর্ক নেই, যদিও রচনার উদ্দেশ্য হিসাবে এগুলি একই সূত্রে বিধৃত। অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে বাংলা মুদ্রণের মূল ধারাটি এইরূপ আরো কয়েকটি বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। মোটামুটি বলা যায়, ঐ ধারাটি ছিল চতুর্মুখী: (১) আইনের অনুবাদ, (২) ব্যাকরণ (ইংরেজি অথবা বাংলা ব্যকরণ), (৩) অভিধান ও শব্দকোষ, এবং (৪) সমসাময়িক পত্রিকায় বাংলা বিজ্ঞপ্তি প্রচার। অষ্টাদশ শতকের বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থ বা বাংলা মুদ্রণের প্রয়াস মোটামুটি উপরোক্ত চারটি শ্রেণীভুক্ত ছিল। এ ছাড়া, মূল প্রবাহ বহির্ভূত একটিমাত্র বইয়েরই (বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ) সন্ধান পাওয়া যায়, তবে সেটিকে ব্যতিক্রম হিসাবে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। অষ্টাদশ শতকের চতুর্মুখী বাংলা

১ Resolution of the Board, 8 March 1782 : *Bengal Revenue Consultations, Range 50,* Vol. 39, p, 215—as quoted by V. A. Narain, *ibid.*

মুদ্রণ প্রয়াসের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ব্রিটিশ রাজত্বের প্রশাসনিক স্বার্থে বিদেশী রাজকর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় ও দেশীয়দের ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদান এবং দেশীয়দের জ্ঞাতার্থে আদালতে ব্যবহৃত ইংরেজি আইন কানুনের বাংলা ভাষ্যপ্রচার। মূল কথা, শাসক ও শাসিতের মধ্যে ভাষার যোগসূত্র গড়ে তোলাই ছিল বক্ষ্যমান সূচনাপর্বে বাংলা মুদ্রণের প্রধানতম উদ্দেশ্য। সুতরাং এই পর্বের মুদ্রিত বাংলা রচনায় কোনো সাহিত্যিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়েছিল কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। বাংলা মুদ্রণের বনিয়াদকে গড়ে তোলার কাজে, ছাপার হরফে বাংলা বর্ণমালাকে একটি সর্বজনস্বীকৃত বিধিবদ্ধ সুষম আদর্শ (Standard) রূপ দেওয়ার কাজে, ছাপার হরফের আধারে বাংলা গদ্যকে সাহিত্যের বাহন হিসাবে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে এই গ্রন্থগুলির যে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তার সম্যক বিচারই আমাদের বক্ষ্যমান আলোচনার মূল্য লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের কথা না জানলে আমাদের আলোচনার প্রতি সুবিচার করা যাবে না। সেইজন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

আইনের অনুবাদের ধারা

অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতবর্ষে প্রবর্তিত প্রশাসনিক ও বিচার-বিভাগীয় ইংরেজি আইনকানুনগুলি দেশীয় ভাষায় অনুবাদে প্রয়াসী হন। কারণ ঐ আইনগুলিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্যকর করার জন্য ও জনসাধারণের মনে ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আস্থার ভাব গড়ে তোলার জন্য এইসব অনুবাদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে দেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ ও তার কিছু পরেই ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপনের ফলে কোম্পানীর ব্রিটিশ কর্মচারীদের পক্ষে দেশীয় ভাষা শিক্ষা একান্ত অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সুতরাং তখন থেকেই তাঁরা বাংলা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভারতীয় ভাষা শিক্ষায় সর্বতোভাবে উদ্যোগী হন। যে কয়জন অগ্রগণ্য ইংরেজ রাজপুরুষ কোম্পানীর চাকরি নিয়ে এদেশে এসে ভাষাশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন এবং আপন অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার ফলে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন, সরকারী কর্তৃপক্ষ তাঁদের উপরই ইংরেজি আইনের ধারাগুলি বাংলায় অনুবাদের ভার দেন এবং অচিরেই সেগুলি মুদ্রিত করে প্রচারের যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

দেশের প্রচলিত হিন্দু ও মুসলমান আইনগুলি সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল হওয়া বিদেশী প্রশাসকদের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। তাই কোম্পানীর আইনের ধারাগুলি বাংলায় অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব হিন্দু মুসলমান আইনসমূহের ইংরেজি অনুবাদেও দূরদর্শী গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস উদ্যোগী হন। জোনাথান ডানকান কর্তৃক *Impey Code* ও *Pitt's India Act*-এর বঙ্গানুবাদের সঙ্গে সঙ্গে হালহেড কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত *Code*

of Gentoo Laws-ও প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং একই সঙ্গে ইংরেজি থেকে বাংলা ও বাংলা থেকে ইংরেজি— উভয়মুখী ভাষান্তরনের কাজ শুরু হয়েছিল।

ডানকানের আইনানুবাদের আগে থেকেই ইংরেজি আইনের বাংলা অনুবাদের কাজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি মুদ্রিত হয়েছিল কিনা তার সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের সর্বত্র, কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে মফস্বলের দেওয়ানি ও ফৌজদারী আদালত-গুলিতেও, যাতে একই মানে বিচার বিভাগীয় কাজকর্ম চালানো যায় সেই উদ্দেশ্যে ইংরেজি আইনকানুনগুলিকে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে ফারসী ও বাংলায় অনুবাদ করে প্রতিটি আদালতে পাঠাবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এই কাজে গোড়া থেকেই সজাগ ও সচেষ্ট ছিলেন। কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সযত্নে রক্ষিত এমন একটি দুর্লভ দলিলের সন্ধান পেয়েছি যার উপর ভিত্তি করে আমাদের এই বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা চলে। দলিলটি ওয়ারেন হেস্টিংসের স্বহস্ত লিখিত ও স্বাক্ষরিত একটি চিঠির পাণ্ডুলিপি। [*Cat. No. D. 17*, Victoria Memorial, Calcutta] চিঠিটিতে হেস্টিংসের সঙ্গে আরো কয়েকজনের স্বাক্ষর রয়েছে। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে চট্টগ্রামের কালেক্টর জন রীডকে (John Reed) লেখা হেস্টিংসের এই চিঠি থেকে জানা যায় যে ঐ সময়ের মধ্যেই কোম্পানীর সমকালীন আইনের ধারাগুলি ফারসী সহ বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছিল। চিঠিটির কিয়দংশ কীটদষ্ট হয়ে গেলেও এর বেশির ভাগ এখনো অক্ষত রয়েছে, তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল: 'We enclose a copy of some Regulations in the English, Persian and Bengal Languages for the process of the different Adawluts throughout this Province. They are calculated to correct the ambiguous and evasive manner in which suitors in this country generally carry on their Causes ; and we direct you to see that they are strictly observed in the Proceedings in your Court.' দুঃখের বিষয়, কেবল মূল চিঠিটিই পাওয়া গেছে, এখানে উল্লিখিত আইনের বাংলা অনুবাদটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। স্বভাবতই, এর অনুবাদকের পরিচয়ও অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

উক্ত চিঠির প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হল এইজন্য যে, এতে অন্তত এইটুকু প্রমাণ হয় যে ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই কিছু কিছু আইনের বাংলা অনুবাদের কাজ শুরু বা সম্পূর্ণ হয়েছিল। তবে আগেই বলা হয়েছে, তার মুদ্রিত নিদর্শন প্রথম পাওয়া যায় ১৭৮৪-৮৫ খ্রীস্টাব্দে, ডানকান-কৃত অনুবাদগুলি প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

এরই কিছুকাল পরে, কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স্ কর্তৃক প্রচলিত প্রথানুযায়ী সংশোধিত ও ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে জুন কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত কিছু কিছু আইনের ধারা G. C.

Mayer কর্তৃক বাংলায় অনূদিত হয় এবং ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দেই এই অনূদিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এটিও কোম্পানীর প্রেসে ছাপা।[১]

এর পরে আরো দু'জন বাংলা ভাষায় পারদর্শী ইংরেজ কর্মচারী— নীল বেঞ্জামিন এডমনস্টোন (Neil B. Edmonstone, 1765-1841) ও হেনরি পিট্স ফরস্টার (Henry Pitts Forster, 1761-1815) কর্তৃক বাংলায় অনূদিত আইন বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলি ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত।

সমসাময়িক কালে, ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে, দু'জন বাঙালী লেখক— রামতারক রায় ও রাধারমণ বসু বাংলায় আইনগ্রন্থ সংকলন করেছিলেন বলে শোনা যায়, কিন্তু তাঁদের কোনো বইয়ের অস্তিত্বের সন্ধান এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।[২]

এডমনস্টোন-অনূদিত আইন সংকলন

হালহেড, উইলকিন্স, ডানকান প্রভৃতির ন্যায় নীল বেঞ্জামিন এডমনস্টোনও কোম্পানীর চাকরি নিয়ে সিবিলিয়ন হিসাবে ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে পদার্পণ করেন, এবং নিজ অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার গুণে অল্প কিছুকালের মধ্যেই বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ফারসী ভাষাতেও তিনি দক্ষ ছিলেন। ব্রিটিশ অভিজাত পরিবারের সন্তান এডমনস্টোন চাকরিতে ক্রমোন্নতি করে ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় কোম্পানীর সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্য ও শেষ পর্যন্ত ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য স্যার আর্চিবল্ড এডমনস্টোনের পুত্র এন. বি. এডমনস্টোনের জন্ম হয় ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে। ভারতে কোম্পানীর চাকরিতে থাকাকালীন তিনি নানা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সরকারের ফারসী অনুবাদকের পদ থেকে তিনি ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে গভর্নর জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি পদে উন্নীত হন। ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি গভর্নমেন্টের চীফ সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্য হিসাবে গুরুদায়িত্ব পালন করার পর তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ইংলণ্ডে ফিরে যান। ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মে তাঁর মৃত্যু হয়।

এত বিভিন্নমুখী সরকারী কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের অনুরোধে যে তিনি দুটি ইংরেজি আইন সংকলনের বাংলা অনুবাদ সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন এ তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় কোম্পানীর প্রেস থেকে প্রকাশিত তাঁর প্রথম বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এইরূপ : Bengal Translation/of/Regulations/

---

১ 'First Establishment of a Press in Calcutta' : *Friend of India*, Feb. 26, 1835.

২ কেদারনাথ মজুমদার, 'বাংলা সাময়িক সাহিত্য', ময়মনসিংহ, ১৯১৭, পৃ. ২১। Amitabha Mukherjee, '*Reform and Regeneration in Bengal*'-নামক গ্রন্থে (পৃ. ২৪৭) প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে।

for the/Administration of Justice,/in the/Fouzdarry or Criminal Courts ; / in/Bengal, Behar, and Orissa./Passed by the Right Honorable the Governor General in Council, on the 3rd of December 1790. /Calcutta : / Printed at the Honorable Company's Press./M.DCC.XCI.

১২½" × ৯½" আকারের এই বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭। এর আখ্যাপত্রটি সম্পূর্ণ ইংরেজিতে লিখিত হলেও বইটির ৩৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী অবশিষ্ট অংশ পুরোপুরি বাংলায় ছাপা। এর ৩ পৃষ্ঠা থেকে ৬ পৃষ্ঠার প্রায় শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট আইনগুলির ঐতিহাসিক পটভূমি ও প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনুবাদকের বক্তব্য দেওয়া আছে। কোম্পানীর প্রেসে ছাপা ডানকানের পূর্বোক্ত অনুবাদ গ্রন্থে যে সাটের বাংলা হরফ ব্যবহৃত হয়েছিল সেই একই সাটের হরফে এই বইটিও ছাপা।

এডমনস্টোন-অনূদিত আরেকটি বাংলা আইনের বই এক বছর পরেই ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় কোম্পানীর প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বইটির আখ্যাপত্রটি এইরূপ : Bengal Translation of Regulations for the Guidance of the Magistrates. Passed by the Governor-General in Council in the Revenue Dept. on the 18th May 1792 (with some supplementary enactments). এডমনস্টোন-অনূদিত এই দুটি বই-ই এখন ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে।[১]

•

ফরস্টারের আইন অনুবাদ

ইংরেজি আইন সংকলনের বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে এডমনস্টোনের পরেই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হেনরি পিট্স ফরস্টারের। অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে বাংলা মুদ্রণের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে একটি সুসংহত মুদ্রিত রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে ফরস্টারের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৭৯৩ সালে বিধিবদ্ধ কোম্পানীর বিভিন্ন আইনকে বাংলায় অনুবাদ করে ফরস্টার তাঁর বাংলা ভাষায় পারদর্শিতার প্রথম স্বাক্ষর রাখেন। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কীর্তি, দুই খণ্ডে সংকলিত তাঁর ইংরেজি-বাংলা শব্দকোষ আলোচ্য শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে আজো আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এ বিষয় বিস্তৃততর আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে করাই শ্রেয়। আপাতত তাঁর পূর্বোক্ত আইনানুবাদটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। কর্নওয়ালিস কোডের বঙ্গানুবাদ হিসাবে সমধিক পরিচিত তাঁর এই অনুবাদগ্রন্থটিও কলকাতার সরকারী ছাপাখানা থেকে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। [বিভিন্ন রচনায় এই গ্রন্থের প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে।

১ J. F. Blumhardt, '*Catalogue of Bengali Printed Books in the Library of British Museum*', London, 1886.

যেমন : (ক) *Friend of India* (weekly) : February 19th & 26th, 1835. পত্রিকাটির এই দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত দুটি নিবন্ধ থেকে জানা যায়, ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে 'Govt. Regulations of 1793'-এর বঙ্গানুবাদ কলকাতা থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। (খ) সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস' (১৩৬৯), পৃ. ৩৮, ৪৩; ৮১ পৃষ্ঠার বিপরীতে এর একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি ছাপা আছে। বইটির আখ্যাপত্রে আছে : 'শ্রীযুক্ত নবাব গবর্নর জেনারেল বাহাদুরের হজুর কৌন্‌সেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন। তাহা নবাব গবর্নর জেনারেল বাহাদুরের হজুর কৌন্‌সেলের আজ্ঞাতে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ১৭৯৩।'] কিন্তু এই মুদ্রণের ক্ষেত্রে বাংলা হরফের রূপ পূর্ববর্তী ধারা থেকে পরিবর্তিত হয়েছে, আকারে কিছুটা ছোটো এক সাট নতুন মুদ্রাক্ষর এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ইতিমধ্যেই ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে উইলকিন্স ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিয়েছেন, উত্তরাধিকারী হিসাবে রেখে গেছেন বাঙালী শিল্পী পঞ্চানন কর্মকারকে। অনুমান করা যেতে পারে, এই নতুন সাটের বাংলা হরফগুলি পঞ্চানন কর্মকারেরই তৈরি। অবশ্য এই ধরনের অনুমানের স্বপক্ষে নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অনেকের মতে এই হরফগুলি কোম্পানীর প্রেসে ব্যবহৃত পূর্বোক্ত বাংলা হরফগুলির চেয়ে উন্নততর। বাংলা মুদ্রণের প্রথম প্রয়াসকালে কেরী এই হরফগুলিরই সন্ধান পেয়েছিলেন এবং তাঁর চিঠিপত্রে এর উল্লেখ করেন। মিশনারী ইতিহাসকার জে. সি. মার্শম্যানের উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় : 'The Great '*Cornwallis Code* of 1793, translated into simple and idiomatic Bengalle by Mr. Forster, the most eminent Bengalee scholar till the appearance of Mr. carey, was likewise printed at the Government press, but from an improved fount. It was to this fount that Mr. Carey alludes, and it continued to be the standard of typography till it was superseded by the smaller and neater fount prepared at Serampore'.[১]

কিন্তু ফরস্টার-কৃত কর্ণওয়ালিস কোডের বাংলা অনুবাদ ছাপায় ব্যবহৃত হরফের সঙ্গে কোম্পানীর প্রেসে ছাপা পূর্ববর্তী গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত বাংলা হরফের তুলনামূলক আলোচনা করলে মার্শম্যানের মতানুযায়ী এগুলি যে উন্নততর সাটের অপেক্ষাকৃত সুন্দর হরফ এ কথা স্বীকার করা যায় না।[২] কেবলমাত্র উচ্চতা বা আকারে নতুন কাটা এই হরফগুলি আগের

---

১ J. C. Marshman, '*The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*', Vol. I, p. 71.

২ এই তুলনামূলক আলোচনার জন্য সজনীকান্ত দাসের 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস' (১৩৬৯) গ্রন্থে মুদ্রিত (৮১ পৃ বিপরীতে) ফরস্টারের অনুবাদ গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি (Photostat copy) ব্যবহার করা হয়েছে।

চেয়ে কিছুটা ছোটো হয়েছে। অষ্টাদশ শতকেই ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের আগে বা পরে ছাপা অন্য কিছু কিছু বইয়ের বাংলা হরফ এই মুদ্রাক্ষরগুলির চেয়েও শ্রেষ্ঠতর বা সুন্দরতর এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে এ কথা স্বীকার্য, শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের যুগে পৌছে আমরা আরো ক্ষুদ্রতর ও সুন্দরতর বাংলা মুদ্রাক্ষরের সন্ধান পেয়েছি এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা হরফের এই উন্নতির মূলে পঞ্চানন কর্মকার ও তার শিষ্য মনোহর কর্মকারের অবদান অনস্বীকার্য।

লঙের ক্যাটালগে উল্লেখ আছে, ১৭৯৪-৯৫ খ্রীস্টাব্দের সরকারী আইনের ফরস্টার-কৃত অপর একটি বঙ্গানুবাদ ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় এর দ্বিতীয় সংস্করণ ; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০০, মূল্য ২৫ টাকা।

ব্যাকরণ রচনার ধারা

অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে চতুর্মুখী বাংলা মুদ্রণ ধারার মধ্যে আদিতম ধারাটির সূত্রপাত হয়েছিল ব্যাকরণ রচনার মধ্য দিয়ে। আইনের বাংলা অনুবাদ মুদ্রণের ধারা সংযোজিত হয় এর পরবর্তী পর্যায়ে। হালহেডের ব্যাকরণের (১৭৭৮) পরেও ব্যাকরণ রচনার প্রয়াস অব্যাহত ছিল। হালহেডের ব্যাকরণের অসম্পূর্ণতা ও দুষ্প্রাপ্যতা উভয়ই ছিল এই প্রয়াসের কারণ। বিদেশীদের বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয়দের ইংরেজি ব্যাকরণ শিক্ষার চাহিদাও বাড়তে থাকে। শাসক ও শাসিত বিদেশী ও দেশীয়দের মধ্যে ভাষার যোগসূত্র গড়ে তোলার পক্ষে ব্যাকরণ-অভিধান ছিল অপরিহার্য। ফলে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ব্যাকরণ রচনার প্রতিই আগ্রহ দেখা দেয়। বাংলাভাষাভিজ্ঞ ইংরেজরাই প্রধানত এ কাজে এগিয়ে আসেন। তাই বাংলা ভাষায় ইংরেজি ও বাংলা উভয় ব্যাকরণ রচনার প্রয়াসই ছিল সেদিনকার বৈশিষ্ট্য। ইংরেজরা যেমন বুঝেছিলেন, বাংলা ভাষাকে আয়ত্ত করতে না পারলে দেশীয়দের মধ্যে তাঁদের শাসনের ভিত্তিকে দৃঢ়মূল করা সম্ভব নয়, তেমনই এক শ্রেণীর দেশীয়দের মধ্যেও তখন এই চেতনা জাগ্রত হতে শুরু করেছিল যে ইংরেজি না জানলে বিদেশী শাসকদের রাজকার্যে অংশগ্রহণের বা তাঁদের কাছ থেকে কোনোরকম অর্থকরী সুযোগসুবিধা আদায়ের সম্ভাবনা নেই। তাই বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইংরেজি শেখার বাসনা কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী দেশীয়দের মধ্যে উদগ্র হয়ে দেখা দেয়। প্রমাণ স্বরূপ, ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু সংখ্যক দেশীয়দের একটি আবেদনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ আবেদনে তাঁরা এমন একটি বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানান যাতে প্রচলিত বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ দেওয়া হয় এবং যার ফলে তাঁরা বিদেশী আইনকানুন ও সরকারী আদেশাবলী অনুসরণে সমর্থ হন ও সরকারী কাজের উপযোগী হতে পারেন। ঐ আবেদনটি ছিল এইরূপ : 'Card. The humble request of several Natives of Bengal. We

humbly beseech any gentlemen will be so good to us as to take the trouble of making a Bengal Grammar and Dictionary, in which we hope to find all the common Bengal country words made into English. By this means we shall be enabled to recommend ourselves to the English Government and understand their orders ; this favor will be gratefully rememberd by us and our posterity for ever.[১] এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলা ব্যাকরণ-অভিধানের চাহিদা ও তৎকালীন ব্রিটিশ শাসন প্রভাবিত এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী বাঙালী সম্প্রদায়ের মনোভাব স্পষ্ট অভিব্যক্ত হয়েছে। তাঁদের এই আবেদন যে নিষ্ফল হয়েছিল, এমন কথা বলা চলে না, কারণ পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে তাঁদের অভিপ্রেত কয়েকটি বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষ ও ব্যাকরণ প্রকাশিত হতে দেখা গেছে।

দেশীয়দের উপর্যুক্ত আবেদনের পরের বছরই, ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত আরেকটি বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় যে ডঃ ম্যাকিনন (Dr. Mackinnon) কর্তৃক সংকলিত একটি ইংরেজি ব্যাকরন ফারসী ও বাংলা ভাষায় শীঘ্রই কলকাতার কোম্পানীর প্রেস থেকে প্রকাশিত হবে। ['An English Grammar compiled by Dr. Mackinnon will be speedily published in Persian and Bengal at the Honorable Company's Press in Calcutta…'][২] বিজ্ঞপ্তিটিতে উক্ত ব্যাকরণের অধ্যায়-বিভাগ ও বিস্তারিত বিষয়-নির্দেশও দেওয়া আছে।

পরবর্তীকালে, ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত জন মিলার (John Miller) কর্তৃক সংকলিত বাংলায় অপর একটি ইংরেজি শিক্ষার বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। মিলারের এই বইটিকে অবশ্য কেবলমাত্র ইংরেজি ব্যাকরণ বলে অভিহিত করা যায় না। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বইটির একটি খণ্ডে বাংলায় 'ইংরাজি ব্যাকরণ' আলোচিত হয়েছে। 'খণ্ড' বলতে এখানে অবশ্য 'অধ্যায়' বিভাগই বোঝানো হয়েছে। বাঙালীদের ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্যে জন মিলার কর্তৃক বইটি সংকলিত, অনূদিত ও মুদ্রিত। ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বইটির আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 'THE/TUTOR,/OR A/New English & Bengalee Work,/ WELL ADAPTED TO TEACH/THE NATIVES ENGLISH/IN THREE PARTS./শিক্ষ্যা গুরু/কিম্বা এক নৈতন ইংরাজি আর বাঙ্গালা বহি/ভালো উপযুক্ত আছে বাঙ্গালিদিগেরকে ইংরাজি/শিক্ষা করাইতে তিন খণ্ডে/Compiled, Translated and Printed,/By JOHN MILLER/1797'. আখ্যাপত্র থেকে সহজেই বোঝা যায়, বাঙালীদের ইংরেজি শেখানোর জন্য বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজি ও বাংলা উভয়েতেই

১ W. S. Seton-Karr, '*Selections from Calcutta Gazettes*', Vol. II, p. 497.

২ W. S. Seton-Karr, *ibid*, Vol. II, p. 514.

আলোচনা আছে। গ্রন্থারম্ভে 'বেওয়ারা' বা সূচীপত্র অংশটি লক্ষ্য করলে এর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আরো পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে: 'প্রথম খণ্ড: অক্ষর জুক্তঅক্ষর শারবর্ন্ন ব্যবধান। শংখেপ বর্ন্ন। কথাসকল একবর্ন্নের। পড়িবার পাঠ। কথা সকল দ্বিতিয়বর্ন্নের। পড়িবার পাঠ। কথাসকল ত্রিতিয়বর্ন্নের। পড়িবার পাঠ। কথাসকল চতুর্থবর্ন্নের। পড়িবার পাঠ। অঙ্গ স্বরিরের বর্ন্নিমা। মাষ। বার গণনা। দ্বিতীয় খণ্ড: ইংরাজি ব্যাকরণ। ত্রিতিয় খণ্ড: জবাব সওয়াল হরেকবীশয়ের। বিশিষ্টলোকের সহিত আলাপ। হুকুম দেওয়ান আর অন্ত-লোককে। ধান্যতণ্ডুল ও গয়রহো বেবসার উপর। জমি খরিদের। এমারতির···' ইত্যাদি। এক ভল্যুমে সম্পূর্ণ ৯১/২" × ৬" আকারের এই বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ + ১৬৪, প্রথম খণ্ড: পৃষ্ঠা ১ থেকে ৮৮, দ্বিতীয় খণ্ড: পৃষ্ঠা ৮৯ থেকে ৯৬ ও তৃতীয় খণ্ড: পৃষ্ঠা ৯৭ থেকে ১৬৪। বইটির শেষে আরো দুটি পৃষ্ঠা সংযোজিত আছে, যাদের কোনো পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া নেই। শেষোক্ত এই দুটি পৃষ্ঠায় 'ইংরাজি লিখিবার সিরিস্তা' অর্থাৎ Model English hand-writing ও ইংরেজি Letters and Numerals ছাপা আছে।

সমসাময়িক কালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতি বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বার্থে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী বাঙালীর মধ্যে যে আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছিল তারই ফলে দেশে ইংরেজি ভাষাশিক্ষার চাহিদা দেখা দিয়েছিল। অপরপক্ষে বিদেশী শাসকদের কাছেও ইংরেজি ভাষায় অভ্যস্ত কিছু সংখ্যক দেশীয়দের সাহায্য অপরিহার্য ছিল। এই পারস্পরিক স্বার্থের কথা স্মরণ করেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইংরেজি ভাষা শেখানোর জন্য 'শিক্ষ্যা গুরু'-র মতো গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন হয়েছিল। জন মিলার তাঁর বইয়ের ভূমিকায় বলেছেন যে 'বাঙ্গালিদিগেরকে' সহজে আর অনায়াসে 'ইঙ্গরাজি কথা' শেখাবার জন্য অদ্যাবধি কোনো বই প্রকাশিত হয়নি। তাই তিনি ইংরেজি শিক্ষার একটি প্রাথমিক বই দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশে উদ্যোগী হন। প্রথমে তিনি সংস্কৃত ভাষায় এই অনুবাদ করতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু তখন দেশে সংস্কৃতজ্ঞ লোকের সংখ্যা অল্প থাকায় শেষ পর্যন্ত তিনি অধিক সংখ্যক লোকের বোধার্থে 'চলতি' বাংলা ভাষায় এটি অনুবাদ ও সংকলন করে প্রকাশ করেন। অবশ্য তাঁর ভাষার নমুনা দেখে মনে হয় না তিনি বাংলা ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পেরে-ছিলেন। বিশেষ করে বাংলা idiom ও বাক্যগঠন রীতি বা যতিচিহ্নের ব্যবহার তিনি একেবারেই অনুধাবন করতে পারেননি। তা ছাড়া তাঁর চলতি বাংলায় তৎকালীন প্রচলিত বহু আরবী ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তাঁর বইয়ের মুখবন্ধে 'বাঙ্গালিদিগেরকে' উদ্দেশ করে লেখা কৌতূহলোদ্দীপক ভূমিকাটি তাঁর ভাষার নমুনা হিসেবে এখানে উদ্ধার করা হল:

'আমি এই অবধি বুঝিয়াছি বিশয়ের সহিত। জে কোনো কেতাব না অদ্যাবধি প্রকাশ পাইয়াছে শিখাইতে তোমাদিগেরকে ইঙ্গরাজি কথা সহজে আর অনায়াসে। তাহাতে লউয়েছে আমারে সাংগ্রহ করিয়া তরজমা করিতে এই কেতাব। এই উমেদ করো জে এ তোমাদিগের সাহসের দ্বারায় মঞ্জুর হয়।

আমর মনস্ত ছিলো সঁপরোধ করিতে এই কেতাব সমস্ততেতে। কিন্তু আমি এক্ষেনে দেখিলাম জে অতি অল্প লোক আছে জে আমার এ বিশয় বুঝে। অতয়েব আমি বিবচনা করিয়া এ তরজমা করিয়াছি চলতি কথার দ্বারায়।

মনুঃ। পরোপরচিত গ্রন্থ : মন্যথায়ঃ প্রকাশয়েৎ।
স্বয়শোর্থং নরঃ সোহি রৌরবং নরকং ব্রজেত।

অন্যের কৃত গ্রন্থ কেহো জদি গ্রন্থকারের জেমত ধারা জে জে অভিমত তাহা অন্যপ্রকার করিয়া আপন খোষ নামের জন্যে কিম্বা লাভের জন্যে করে সে রৌরব নামে নরকে জায় ইতি মনু লিখেন

ব্যাসঃ। পরনির্মিত শাস্ত্রাদীন স্ব নাম্না স্ব সুখায় বা।
য়োন্যথা কুরুতে মূঢ়ঃ সবিষ্ঠায়াং কৃমির্ভবেত।

অন্যে কেহো করিয়া থাকে এমন শাস্ত্রাদি জে কিছু জদি কোনো লোক আপনা সুখের নিমিত্তে কিম্বা আপন নামেতে কোনো প্রকারে চালায় সে লোক বিষ্ঠার কৃমি হইয়া জন্মে ইতি ব্যাস লিখেন

মৎরচিত গ্রন্থ-মন্যথায়ঃ প্রকাশয়েৎ। য়োন্যথা ক-
রুতে মূঢ়ঃ সোহি রৌরবং নরকং ব্রজেত

আমার এই কেতাব জে ব্যক্তি অন্যপ্রকারে আদরস করে আপন স্বাহাজ্য কারন তিনি মনুঃ ব্যাসঃ বিষ্ণু স্মৃতিতে জে জে নরক ইহ ভোগ করিবেন

শিক্ষারা জেন সন্ধান করে দেখে অক্ষরের পাইতে জে জে অক্ষরে তারা চিন্ন আছে উহার উচ্চারণ ভালো ওয়াকিব হইয়া শব্দেপর্বন্ন পঠে

পরে সকল আমি জা করিলাম আমি তল্বাষ করি আমার সত আর সিষ্টতা এই শ্লোকে
ভূল করিতে মনিস্তর মাপ করিতে ইশ্বরের'

জন মিলার তাঁর এই '*English & Bengalee Work*' বা 'ইংরাজি আর বাঙ্গালা বহি'-তে বাঙালীদের সহজে ইংরেজি শেখানোর উদ্দেশ্যে কথোপকথনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। দৈনন্দিন জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম ও কথাবার্তা চালানোর জন্য ব্যবহৃত ছোটখাটো ইংরেজি বাক্য ও তার বাংলা 'তরজমা' বইটির তৃতীয় 'খণ্ডে' বা অধ্যায়ে সংকলিত হয়েছে। 'জবাব সওয়াল হরেকবীশয়ের' অন্তর্গত 'সাহেব-চাকর' বা প্রভু-ভৃত্যের উত্তর-প্রত্যুত্তরের কিছু নমুনা (পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯) এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে :

'M. Coachman, you take great care of your duty ?
কোচমেন তুমি আপনার কাজে সাবধান থাক

S. Sir, I had a little business.
মহাসয় আমার কিছু কাজ ছিল

M. Don't absent yourself another time.
তুমি গাফিলি করিয় না পুনর্ব্বার

S. Sir, I shall not act so again.
মহাসয় আমি এমন কথন করিব না।

M. Shut the door.
দরজা বন্দ করো।

M. Go to your business.
জাও তুমি আপনার কাজে

M. Give me a clean handkerchief.
আমাকে একথান পরিস্কার গামছা দেও

...M. Give me a new hat.
আমাকে এক নৈতন টুপি দেও

M. Give me new stockings.
আমাকে নৈতন মোজা দেও

M. Open the door.
দরজা খোলো।

M. Light the candle.
বাতি জালাও

M. Clean the shades.
মজলিসি লান্টন সাফ করো।

M. Snuff the candle.
বাতির গুল কাটো।

M. Bring the snuffers.
গুলত্রাষ আনো।

M. I am going to sleep.
আমি সয়নে জাইতেছি

M. Come early to-morrow.
কল্য সকালে আইয

M. Let the retinue be got ready.
সওয়ারি তইআর করো।

M. Where did the bearers go.
কাহার সকল কোথা গিএছে

M. Where is the chattah bearer.
ছাতা বরদার কোথায়

M. Go to the right.
ডাইনে জাও

M. Do you know such a gentleman's house.
তুমি জান ফলনা সাহেবের ঘর

M. Go to the Left.
বাঁও জাও

M. Has not the Jammadar come today.
আজিকি জমাদার আইসে নাই'

আখ্যাপত্র থেকে জানা যায়, জন মিলার যেমন এই বইটির সংকলয়িতা ও অনুবাদক, তেমনি তিনিই এর মুদ্রাকর। কিন্তু কোন্ ছাপাখানায় বা কোথায় এটি ছাপা হয়েছে তার কোনো নির্দেশ পাওয়া যায় না। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ক্যাটালগে[১] যে এটিকে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা কোনো তথ্য দ্বারা সমর্থিত নয়। ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এই বইটি, অনুমান করা হয়, কলকাতাতেই মুদ্রিত কারণ শ্রীরামপুরে তখনো কোনো মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়নি। তবে যেহেতু ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মিশন প্রেসের পূর্বে শ্রীরামপুরে মুদ্রণ প্রচলনের কোনো সমর্থন পাওয়া যায়নি,

১ Blumhardt, '*Catalogue of the Library of the India Office*', Vol. II, pt. IV (London 1905), p. 177.

অতএব এটি কলকাতায় ছাপা— এ ধরনের সিদ্ধান্ত অনুমান মাত্র, তথ্যনির্ভর নয়। বইটিতে ব্যবহৃত বাংলা মুদ্রাক্ষরের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বরং উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থনে কিছু পরোক্ষ যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ক্রনিকল প্রেসে মুদ্রিত ইংরেজি-বাংলা শব্দকোষ বা ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানায় মুদ্রিত এইচ. পি. ফরস্টারের ইংরেজি-বাংলা শব্দকোষে ব্যবহৃত বাংলা মুদ্রাক্ষরের সঙ্গে আলোচ্য 'সিক্ষ্যা গুরু' গ্রন্থে ব্যবহৃত বাংলা মুদ্রাক্ষরের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই হরফ-বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গান্তরে [সূচনা পর্ব : দ্বিতীয় অধ্যায়] বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল। আপাতত এইটুকু বলা যেতে পারে যে, উপরোক্ত তিনটি বইয়ে প্রায় একই সাটের হরফ ব্যবহৃত হতে দেখে মনে হয়, প্রথমোক্ত দুটি বইয়ের মতো তৃতীয়োক্ত বইটিও সম্ভবত কলকাতাতেই মুদ্রিত। প্রথমোক্ত বই দুটির মুদ্রাকর বা প্রকাশকের মতো জন মিলারও হয়ত কোনো সাধারণ বা একই (common) হরফ ঢালাইখানা থেকে সংগৃহীত হরফের সাহায্যে তাঁর বইটি ছাপেন। কলকাতায় ক্রনিকল প্রেসের নিজস্ব হরফ ঢালাইখানা ছিল। পরে নানা সময়ে এটি হস্তান্তরিত হলেও এর একই সাটের হরফ অথবা একই সরঞ্জামাদির সাহায্যে, হয়ত বা একই কারিগরের দ্বারা, নির্মিত অনুরূপ হরফের সাহায্যে অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে বিভিন্ন সময়ে কলকাতার বিভিন্ন ছাপাখানায় বা বারে বারে হস্তান্তরিত একই ছাপাখানায় উপরোক্ত বইগুলি ছাপা হয়েছিল। এইসব পরোক্ষ প্রমাণের উপর ভিত্তি করে অনুমান করা যেতে পারে, 'সিক্ষ্যা গুরু' গ্রন্থের মুদ্রণস্থল ছিল কলকাতা এবং জন মিলার সম্ভবত তাঁর নিজস্ব ছাপাখানা বা অপরের কোনো ছাপাখানা থেকে এটি ছেপে প্রকাশ করেন।

কিন্তু দুঃখের কথা, জন মিলারের প্রকৃত পরিচয় এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সমসাময়িক কালে কোম্পানীর চাকরীতে মিলার নামের একাধিক কর্মচারী বা 'রাইটারের' সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কে যে 'সিক্ষ্যা গুরু' গ্রন্থের রচয়িতা, বা তাঁর বিস্তারিত পরিচয় কী, তা নির্ধারণ করা যায় না। কেবল এইটুকু বলা যায় যে জন মিলার বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই অভিজ্ঞ ছিলেন। অবশ্য তাঁর এই ভাষাজ্ঞানের গভীরতা সমসাময়িককালের মানদণ্ডে বিচার করাই যুক্তিসঙ্গত। হয়ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি নিয়ে অথবা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তিনি এদেশে আসেন। পরে তিনি ভারতীয় ভাষাচর্চায়, বিশেষ করে বাংলা ও সংস্কৃত চর্চায় আকৃষ্ট হন। তাঁর বইয়ের ভূমিকায় তিনি মনু, ব্যাস প্রভৃতি রচিত সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এগুলি অবশ্য বাংলা হরফেই ছাপা। এই সব উদ্ধৃতিগুলি দেখে মনে হয় মিলার copyright বা গ্রন্থস্বত্ব সম্বন্ধে খুবই সচেতন ছিলেন। আরো উল্লেখযোগ্য বিষয়, তিনি সম্ভবত মুদ্রণের কাজেও পারদর্শী ছিলেন। কারণ তাঁর বইটি তিনি নিজেই ছেপেছেন বলে উল্লেখ আছে। আপ-জনের মতো হয়ত তিনি কোনো ছাপাখানা, প্রকাশনা বা বইয়ের ব্যবসায়ে জড়িত ছিলেন।

প্রসঙ্গত বলা যায়, ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রামকমল সেনের ইংরেজি-বাংলা অভিধানের ভূমিকায় জনৈক মিলার রচিত একটি ইংরেজি-বাংলা বইয়ের উল্লেখ আছে। এই মিলার ও 'সিক্ষ্যা গুরু' গ্রন্থের রচয়িতা জন মিলার একই ব্যক্তি কিনা অনুমানের বিষয়। রামকমল সেন তাঁর বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন: 'In 1801 a Mr. Miller compiled a work in English and Bengalee, containing in a thin folio volume about a hundered and forty pages, in which were given the alphabet, a few syllables, the names of a few of the productions, some elementary rules of Grammar, and some stories, not equal however to forty pages of the English Reader lately published by the School Book Society. He printed no fewer than 4000 copies of this work and the whole impression was subscribed for at 32 Rupees the copy, before the work issued form the press.'[১]

১৮০১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত মিলার রচিত এইরূপ কোনো বই এখনো পর্যন্ত কোথাও দেখা গেছে বলে শোনা যায়নি। এখন প্রশ্ন, এটি ও ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'সিক্ষ্যা গুরু' কি একই বই, না দুটি ভিন্ন বই? রামকমল সেন কি প্রকাশনের তারিখ ভুল লিখেছেন, না ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে 'সিক্ষ্যা গুরু'-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল? অপেক্ষাকৃত ছোটো হরফে ছাপলে অবশ্য ১৬৪ পৃষ্ঠার প্রথম সংস্করণ (১৭৯৭ খ্রীঃ) ১৪০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮০১ খ্রীঃ) হিসাবে প্রকাশ করা সম্ভব। রামকমল সেন বিষয়বস্তুর যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মূল পুস্তকের সঙ্গে এর মোটামুটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ৩২ টাকা মূল্যের যে বই প্রকাশন-পূর্ব সংগৃহীত অর্থে ৪০০০ কপি ছাপা হতে পারে, জনপ্রিয়তা বা চাহিদার মাপকাঠিতে তা নিশ্চয়ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত লঙের ক্যাটালগেও মিলার রচিত এই বইয়ের উল্লেখ পাই, কিন্তু সেখানে এটিকে অভিধান বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এ পরিচয় ভুল। লঙ লিখেছেন: 'In 1801 Miller's Dictionary was published by subscription containing matter equal to an 8vo. of 50 pp. for Rs. 32.'[২]

যাই হোক, আমাদের সকল প্রশ্ন ও সংশয়ের নিরসন হত যদি ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত মিলারের এই বইটি কোথাও চাক্ষুষ দেখে বিচার করা যেত। ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত জন মিলারের 'সিক্ষ্যা গুরু' বইটি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে।

---

১ Ram Comul Sen, '*A Dictionary in English and Bengalee*,' 1834, Preface, pp. 17-18.

২ J. Long, '*A Descriptive Catalogue of Bengali Works*', 1855.

অভিধান বা শব্দকোষ রচনার ধারা

এদেশে ইউরোপীয়দের আগমনের পরে তাঁদের বাংলা ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনে বাংলা অভিধান বা শব্দকোষ রচনার সূত্রপাত। ধর্মপ্রচার, ব্যবসাবাণিজ্য বা রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে বাংলা ভাষাজ্ঞান তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। তাই বাংলা অভিধান রচনায় তাঁরাই সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের রচিত প্রথম যুগের বাংলা শব্দকোষ বা অভিধানগুলিতে তাই বাংলা শব্দের সঙ্গে ইউরোপীয় প্রতিশব্দ বা ইউরোপীয় শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া হত। বাংলা মুদ্রণের আদিযুগে এইভাবেই বাংলা অভিধান বা শব্দকোষ রচনার একটি বিশিষ্ট ধারা গড়ে উঠেছিল। পর্তুগীজরা এই ধারার সূত্রপাত করেন, পরে ইংরেজরা একে পরিপুষ্ট করে তোলেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত মানোএল্ দ্য আস্সুম্পসাম্ রচিত বাংলা ব্যাকরণ সহ বাংলা পর্তুগীজ শব্দ-সংগ্রহই ছিল প্রথম মুদ্রিত বাংলা অভিধান। কিন্তু এই অভিধান ছিল সম্পূর্ণ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত।

এর পরবর্তীকালে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত আরেকটি বাংলা শব্দ-সংগ্রহের সন্ধান পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত যেসব মুদ্রিত বাংলা অভিধানের সন্ধান পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত এই শব্দকোষটি থেকেই বাংলা-ইংরেজি অভিধান রচনার ধারার সূত্রপাত। তবে এটিও রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায় আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নয়। কেবলমাত্র বাংলা হরফে মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থগুলিকেই আমাদের বক্ষ্যমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তথাপি মুদ্রণের আদি পর্বে বাংলা অভিধান গ্রন্থের প্রকাশকালের ঐতিহাসিক ক্রম ও তাদের আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে এই বইটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ষোলপেজী ক্ষুদ্রাকৃতি এই বইটির এক খণ্ড কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এর ১৩৬ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দ-সংগ্রহের অন্তর্গত বাংলা শব্দগুলি রোমান অক্ষরে মুদ্রিত ও রোমান বর্ণমালানুক্রমে সাজানো। প্রতিটি শব্দের সঙ্গে তার ইংরেজি অর্থ দেওয়া আছে। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত এই বইটির সংকলয়িতার নাম জানা যায় না। বইটির আখ্যাপত্রটি এইরূপ: "INDIAN VOCABULARY/TO Which is prefixed/ THE FORMS OF IMPEACHMENTS. / LONDON ; / Printed for John Stockdale, / Opposite Burlington House, / Piccadilly. /M.DCC. LXXX-VIII'.

বইটিতে সংকলিত সকল শব্দই যে বাংলা, তা নয়। এতে বহু আরবী, ফারসী, হিন্দী শব্দও স্থান পেয়েছে। আসলে, মূলত বাংলা না হলেও, সেই সময় বাংলাদেশে প্রচলিত শব্দ বা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তৎকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বা গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত শব্দকে বাংলা

শব্দ বলে গ্রহণ করে এই শব্দ-সংগ্রহে স্থান দেওয়া হয়েছে। যেমন, 'ARREIT—A loan'; 'ARRIB—One hundred crore'; 'ARZEE or ARZDASHT—A Petition or address to the King'; 'ASBA—Relations'; 'AURUT—A Woman'; 'AZIM or AZEM—Great, glorious'; 'BAZOUBUND—A bracelet'; 'CHELAS—Favorite slaves, adopted by their masters'; 'ROWANNA or ROVINDA—A Passport or certificate from the collector of customs'; 'ZENANA—Belonging to women…', ইত্যাদি। এ ছাড়া আরো কিছু বাংলা শব্দ এখানে উদ্ধার করা হল: 'AMREETA—the water of immortality, the ambrosia of the Hindoo Gods'; 'CAPAS—Bengal cotton…'; 'CHAKRA—kind of discus with sharp edge, hurled in a battle from the point of the fore-finger, for which there is a hole in the centre'; 'COWRY—A small shell, which passes for money in Bengal'; 'DAN—A religious ceremony'; 'DOKAN—A shop or stall'; 'DOOT—An agent or hircarra'; 'FUSSUL—Harvest'; 'MAHAPATOK—Murder, and other heinous crimes'; 'MAHA RAJA—Chief or Great Raja'; 'NANDEE MOOKHAY—A ceremony preparatory to a marriage'; 'POOJAY—Worship'; 'POOTEE—A book or compilation', ইত্যাদি।

গ্রন্থের ভূমিকায় (Preface) এই শব্দ-সংগ্রহ সংকলনের উদ্দেশ্য বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নানা কারণে এই ভূমিকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। ভূমিকায় বলা হয়েছে, তদানীন্তনকালে প্রকাশিত বাংলাদেশ সংক্রান্ত বইয়ে, বিশেষ করে ইংরেজি বইয়ে, প্রায়ই আলাদাভাবে একটি বাংলা শব্দতালিকা ব্যাখ্যাসহ ছাপা হত, যাতে ঐ বইয়ে ব্যবহৃত বাংলাদেশে প্রচলিত শব্দাবলী বিদেশী পাঠক সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। বাংলাদেশের মানুষ ও তার সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা-রীতিনীতি প্রভৃতি বোঝার পক্ষে ঐসব শব্দসূচীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু বর্তমান সংকলক দুঃখ করেছেন, সমসাময়িককালে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ে সংযোজিত ঐসব বাংলা শব্দতালিকা এতই সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ ছিল যে প্রায়শই তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হত। সেইজন্য তিনি প্রভূত আয়াস স্বীকার করে নানা বইয়ে ছড়ানো বাংলাদেশ-প্রচলিত শব্দাবলী একত্র সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। এতে বাংলা ভাষার পরিচয় সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করতে না পারলেও তিনি আশা করেন বইটি বাংলাদেশ সংক্রান্ত বিষয়কে ভালোভাবে বোঝার পক্ষে সহায়ক হবে। ভূমিকাটি ছিল এইরূপ: 'The list of words generally printed with publications which relate to the East-Indies, have always been found so short and incomplete; as even frequently to be incapable of assisting the reader through the pages

to which they were prefixed or subjoined. It is from this consideration of the insufficiency of all Vocabularies of Bengal words hitherto pubished, that the Editor of the following has been induced, with cosiderable pains and application, to collect into one series, all such terms (in whatsoever publications they lay scattered) as could, by their explanation, in any respect tend to the elucidating and better understanding of East-India affairs'. Preface : '*Indian Vocabulary.*'

এই ভূমিকাটি পড়ে অনেকে অনুমান করেন যে ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে নিশ্চয়ই কিছু বাংলা অভিধান বা শব্দসূচী প্রকাশিত হয়েছিল।[১] তবে আমার মনে হয়, ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে যে কোনো বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়েছিল '*Indian Vocabulary*' গ্রন্থের ভূমিকায় এমন ইঙ্গিত করা হয়নি। বরং তিনি বলতে চেয়েছেন 'East-Indies' বা বাংলা দেশ সম্পর্কিত কিছু কিছু বইয়ের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে কয়েকটি বাংলা শব্দতালিকা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে পরিষ্কার দুটি উদাহরণ : ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে লিসবনে মুদ্রিত মানোএল-এর বাংলা-পর্তুগীজ শব্দ-সংগ্রহ এবং ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড রচিত— '*A Code of Gentoo Laws*' গ্রন্থে প্রকাশিত ইংরেজি অর্থ সহ বাংলা শব্দতালিকা। এই উভয় শব্দতালিকাই রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। বই দুটি সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। সমসাময়িককালে অনুরূপ আরো কিছু বইয়ের সঙ্গে বাংলা শব্দতালিকা প্রকাশিত হয়ে থাকা বিচিত্র নয়। উদাহরণ স্বরূপ একটি বইয়ের উল্লেখ করা যায়— ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত জর্জ হেডলী সংকলিত 'Grammatical Remarks on the Practical and Vulgar Dialect of the Indostan language, commonly called Moors, with a Vocabulary, English and Moors'. এই বইয়ের শব্দতালিকায় রোমান অক্ষরে মুদ্রিত 'মুর' শব্দের মধ্যে কিছু খাঁটি বাংলা শব্দও পাওয়া যায়। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত আলোচনা করেছেন।[২]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর '*Origin and Development of Bengali Language*' গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ২৩৪ পৃ.) ১৭৮১-৮৩ খ্রীস্টাব্দে Augustin Aussant প্রণীত ফরাসী-বাংলা শব্দাভিধানের উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এটি মুদ্রিত হয়নি, পাণ্ডুলিপি আকারেই থেকে গেছে।

১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হবার পর থেকেই বিদেশীদের বাংলা

---

১ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, 'বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়', ভূমিকা।

২ তদেব, পৃ. ১৮২-১৮৫।

শিক্ষার ও এদেশীয়দের ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহ ও প্রচেষ্টা দেখা দেয়। ফলত ইংরেজি-বাংলা শব্দকোষ রচনার সূত্রপাত হয়। সমসাময়িককালে সুপরিচিত আনন্দীরাম দাস ('Anondiram Doss') নামক জনৈক বাঙালী পণ্ডিত ইংরেজি ভাষায় দক্ষ ছিলেন এবং তিনি বহু বাঙালী হিন্দুকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দিতেন। শিক্ষকতার উদ্দেশ্যে তিনি একটি ইংরেজি-বাংলা শব্দ-সংগ্রহ প্রণয়ন করেছিলেন, তবে সেটি সম্ভবত মুদ্রিত হয়নি। রামকমল সেন তাঁর '*A Dictionary in English and Bengalee*' (Serampore, 1834) গ্রন্থের ভূমিকায় আনন্দীরাম দাস ('Anondiram Doss') সম্বন্ধে লিখেছেন: 'This man had a vocabulary or collection of words which was considered a treasure of English knowledge, and a number of young Hindoos used to attend daily upon him for hours and to wait his pleasure and convenience to get some scraps from his book. This pious philanthropist used to give out five or six words every day for their study. A specimen of the words in Bengalee characters with their meaning is as follows:

লার্ড…(Lord)…ইশ্বর।
গাড…(God)…ইশ্বর।
কম্‌…(To come)…আইশ।
গো…(To go)…জাও।
গোইন…(Going)…জাইতেছি।'

G. C. Haughton তাঁর '*Dictionary, Bengali and Sanskrit, explained in English*' (London, 1833) গ্রন্থের ভূমিকায় (p. VII) লিখেছেন চার্লস উইলকিন্স বাংলাদেশে অবস্থানকালে (১৭৭০-১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দ) তিনটি এদেশীয় শব্দের তালিকা সংকলন করেন; এগুলি পাণ্ডুলিপি আকারেই থেকে যায়: 'To his friend Sir Charles Wilkins thanks are due for the loan of three Ms. list of words collected during the course of that distinguished scholar's studies while resident in Bengal.'

অষ্টাদশ শতকে অভিধান ও ব্যাকরণ রচনার ধারার আলোচনা প্রসঙ্গে আরো একটি বইয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। এটিও অবশ্য রোমান অক্ষরে মুদ্রিত, তদুপরি অষ্টাদশ শতাব্দীর সীমানা পেরিয়ে ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত। কিন্তু হেরাসিম লেবেডফ কর্তৃক East Indian Dialects সম্বন্ধে রচিত এই বইটি সংকলনের প্রেরণা ও এর উপাদান সংগ্রহের মূল কেন্দ্র ছিল কলকাতায়— অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হলেও এটিকে তাই প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

মূল বইটির আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ: 'GRAMMAR/OF THE/PURE AND

MIXED EAST INDIAN DIALECTS,/WITH DIALOGUES AFFIXD,/ SPOKEN IN ALL THE EASTERN COUNTRIES,/Methodically arranged at Calcutta, according to the Brahmenian System,/OF THE / SHAMSCRIT LANGUAGE./...Calculated for the Use of Europeans./ ...BY HERASIM LEBEDEFF./LONDON...1801'. [সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত ও মহাদেবপ্রসাদ সাহা কর্তৃক সম্পাদিত বইটির একটি নতুন সংস্করণ কলকাতায় ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে।][1] এই বইয়ে লেবেডফ তৎকালীন কলকাতায় প্রচলিত বাজার হিন্দুস্থানী বা মিশ্রিত বাংলা-সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এই আলোচনায় লেবেডফ নিজেকে দক্ষ ভাষাবিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি।[2]

লেবেডফ Mixed East Indian Dialects বা মিশ্র পূর্বভারতীয় কথ্যভাষা বা বাজার হিন্দুস্থানীর আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু কিছু বাংলা শব্দের উল্লেখ করেছেন। এগুলি অবশ্য রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। 'The Mixed Indian Dialect', 'The English Tongue', 'The Civil Shamscrit Bengal Language'— এই তিন ভাষায় পাশাপাশি তিন কলামে কিছু সমার্থক শব্দের উল্লেখ আছে। যেমন :

Haddie—Bone, Bones—Har
Chamra—Skin, hide—Cham, Chormo
Seer, Sheer—Head—Mata
Bho—Eyebrow—Bhoroo
Dast—Wrist, part of the hand—Cobjie
Bogol—sides—Pash

'Mixed Indian Dialects'-এর অন্তর্গত শব্দতালিকাতেও রোমান অক্ষরে মুদ্রিত কিছু বাংলা শব্দ ও তার ইংরেজি অর্থ পাওয়া যায় :

---

১ রুশ পর্যটক ও শিল্পী হেরাসিম লেবেডফ ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় আসেন, পরে ভাগ্যবিপর্যয়ের তাড়নায় আবার ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করেন। এ দেশে অবস্থান কালে অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে কলকাতায় তিনি প্রথম বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করেন ও বাংলা ভাষাচর্চায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। তৎকালীন বাংলা মুদ্রণধারার সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এরই ফলে লণ্ডনে থাকাকালীন তিনি কলকাতায় প্রচলিত সংস্কৃত বাংলা সহ মিশ্রিত বাজার হিন্দুস্থানী ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করেন ও পরবর্তীকালে রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা, নানা ভারতীয় বই ও তার অনুবাদ প্রকাশ, মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন এবং বাংলা ছাপার হরফ তৈরি প্রভৃতি কাজে উদ্যোগী হন। ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে রাশিয়ায় বঙ্গ সংস্কৃতির সেবায় লেবেডফের এই কর্মসাধনা, বিশেষ করে বাংলাদেশ ও তার ভাষা সম্পর্কে তাঁর বই ও তাঁর তৈরি বাংলা হরফ সম্বন্ধে আরো অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

২ ১৯৬৩ সংস্করণের ভূমিকা।

Batash—wind, Matee—earth,
Kooa—spring of water,
Jaydak or Joydak—large drum,
Nolah—small river or channel, ইত্যাদি।

বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা শব্দ-সংগ্রহ

অষ্টাদশ শতকে বাংলা অভিধান রচনার ধারার আলোচনা প্রসঙ্গে এতক্ষণ যেসব গ্রন্থ বা বাংলা শব্দতালিকার উল্লেখ করা হল, তা সবই রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা শব্দ-সংগ্রহ প্রকাশিত হয় ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে। কলকাতায় Chronicle Press-এ মুদ্রিত এই বাংলা-ইংরেজি শব্দ-সংগ্রহ বা অভিধানের আখ্যাপত্রটি এইরূপ: 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি/AN EXTENSIVE/VOCABULARY,/Bengalese and English,/VERY USEFUL/TO TEACH THE NATIVES ENGLISH,/AND/TO ASSIST BEGINNERS IN LEARNING/THE BENGAL LANGUAGE./CALCUTTA, / PRINTED AT THE CHRONICLE PRESS/MDCCXCIII'.

লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে এই বইটি রক্ষিত আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারেও এর এক খণ্ড পাওয়া যায়, কিন্তু এটি আখ্যাপত্র, ভূমিকা, ইত্যাদি বিহীন খণ্ডিত কপি।

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির কপিটিতে আখ্যাপত্রে 'Bengalese and English'-এর পরে হাতে লেখা আছে '& Udiya'। অনুমান করা যায়, এই কপিটির মূল মালিক R. L. Brooke নিজের নামের সঙ্গে এটিও বইটির আখ্যাপত্রের উপর কালিতে লিখে রেখেছিলেন। আলোচ্য বাংলা-ইংরেজি অভিধানকে অবলম্বন করে একখানি ওড়িয়া-ইংরেজি অভিধান রচনার উদ্দেশ্যে R. L. Brooke তাঁর কপিটির সমগ্র অংশ জুড়ে প্রতিটি বাংলা শব্দের পাশে ওড়িয়া প্রতিশব্দ লিখে রেখেছিলেন। সম্ভবত তিনিই নিজের ব্যবহারের সুবিধার্থে বইটিকে 'ইণ্টারলিফ' করে দুই ভাগে বাঁধিয়ে নিয়েছিলেন— ১ম ভাগ ২১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এবং ২য় ভাগ ২১৭ পৃষ্ঠা থেকে ৪৪৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। সুতরাং ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত বইটির এই দুটি ভাগ থেকে বইটি দুখণ্ডে রচিত ও ছাপা বলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু আসলে বইটি এক খণ্ডেই রচিত ও ছাপা হয়েছিল; স্বভাবতই মূল বইয়ে কোথাও ১ম খণ্ড ২য় খণ্ড বলে কোনো কিছু ছাপা নেই। বর্তমানে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে বইটির দুটি বাঁধানো অংশেরই একই Accession Number—R.93, কারণ দুটি অংশই একই বই হিসাবে গণ্য।

ষোলপেজী ৬.৭"×৪" আকারের এই 'বোকেবিলরি'টির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৫; এখানেই বই শেষ, আর শেষের পৃষ্ঠায় 'Index' কথাটি মাত্র ছাপা আছে, যদিও তারপরে

কোনো Index দেওয়া নেই। বইয়ের ভূমিকায় অবশ্য মুদ্রাকর যথাশীঘ্র সম্ভব প্রতিটি ক্রেতাকে 'Index' ছেপে বিনামূল্যে সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বইয়ের ভূমিকায় আরো জানানো হয়েছে যে এই ধরনের বই এটিই প্রথম এবং দেশীয়দের ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এটির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে প্রতীয়মান হবে। ভূমিকাটি ('PREFACE') এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল: 'The Author spent ten years in compiling and revising this work. He is very sensible of its defects; but as it is the first of the kind, and promises much utility in diffusing the English language among the Natives, he hopes it will be candidly received by the Publick. The Printer engages to furnish to every Purchaser a complete Index, as soon as it can be prepared, gratis.'

ভূমিকায় গ্রন্থকার সংগতভাবেই দাবি করেছেন যে, 'it is the first of the kind', অর্থাৎ এটিই বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান। অবশ্য ফরস্টার ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর ইংরেজি-বাংলা শব্দ-সংগ্রহ বা অভিধানকে প্রথম প্রচেষ্টা 'a first attempt' বলে বর্ণনা করেছেন। ক্রনিকল প্রেসের শব্দ-সংগ্রহটির সন্ধান পাওয়ার আগে ফরস্টারের এই দাবিকে অনেকেই স্বীকারও করে নিয়েছিলেন। ফরস্টার-পরবর্তী যুগে উইলিয়ম কেরী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামকমল সেন প্রভৃতি আভিধানিকেরা ফরস্টারকেই বাংলা অভিধানের পথিকৃৎ হিসাবে স্বীকৃতি জানিয়েছেন, কারণ তাঁরা কেউই ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের অভিধানটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। লঙের তালিকাতেও (১৮৫৫) এই ১৭৯৩ সালের অভিধানটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু পরে এর আবিষ্কারের ফলে ফরস্টারের পথিকৃৎ হিসাবে যে দাবি তা সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। ফরস্টার তাঁর অভিধানের ভূমিকায় হালহেডের ব্যাকরণের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি যে কেন ১৭৯৩ সালে প্রকাশিত অভিধানটির সন্ধান পাননি বা পেলেও কেন যে তিনি তার উল্লেখ করেননি তা বিবেচনার যোগ্য। প্রথম অভিধানটির স্বল্পপ্রচার বা দুষ্প্রাপ্যতা এর কারণ হতে পারে, অথবা প্রথম কৃতিত্বের দাবির মোহে ফরস্টার তাঁর পূর্বসূরীর অবদানের কথা স্বীকার করতে চাননি।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত এই প্রথম বাংলা-ইংরেজি শব্দ-সংগ্রহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে এটি মূলত দেশীয়দের ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত, অপরপক্ষে সমসাময়িক অন্যান্য অভিধানাদি মূলত বিদেশীদের বাংলা শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত। আলোচ্য 'বোকেবিলরি'টি বাংলা-ইংরেজি অভিধান। এর প্রতি পৃষ্ঠায় দুটি কলাম, বাঁদিকে বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বাংলা শব্দ ও তার পাশে ডানদিকে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত ইংরেজি অর্থ দেওয়া আছে। সমগ্র অভিধানটি বাংলা বর্ণানুক্রমে সাজানো, তবে প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণ ও পরে স্বরবর্ণ স্থান পেয়েছে। স্বরবর্ণের মধ্যে 'ঈ' এবং 'ঊ' নেই, কেবল 'ই' এবং উ দিয়ে গঠিত শব্দ পাওয়া যায়। বইটির প্রথম থেকে ৩৯৩ পৃষ্ঠা (আংশিক) পর্যন্ত রয়েছে ব্যঞ্জনবর্ণ ও ৩৯৩

পৃষ্ঠার শেষার্ধ থেকে বইয়ের শেষ পর্যন্ত স্বরবর্ণ। তবে এখানে সকল শব্দ ঠিক বর্ণমালানুসারে সাজানো নেই। শব্দ ছাড়াও কিছু কিছু বাংলা বাক্য বা বাক্যাংশও ইংরেজি অর্থ সহ, এখানে সংকলিত হয়েছে। যেমন :

'জ'-এর নীচে : জুতা পায় দিতে to put on shoes (পৃ. ১০৮)

জুক্তি দিতে to give advice (পৃ. ১০৮)

'ত'-এর নীচে : তিলপ্রমানঠাক্তি নাক্তি not a hair's breadth space (পৃ. ১৩৪)

আমার তিলাঙ্গ অবকাশ নাই I have not the least leisure (পৃ. ১৩৪)

'আ'-এর নীচে : আলালের ছুলাল my dear (পৃ. ৪১৫), ইত্যাদি।

আলোচ্য 'বোকেবিলরি'তে তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সংখ্যা কম, দেশী শব্দের সংখ্যাই বেশি। বাংলাদেশে তৎকালীন প্রচলিত আরবী ও ফারসী শব্দও এতে স্থান পেয়েছে। এখানে সংকলিত অনেক শব্দ ইদানীং অপ্রচলিত হয়ে গেছে বা অনেক ক্ষেত্রে অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। অভিধানটি থেকে আরো কিছু শব্দ নীচে উদ্‌ধৃত করা হল :

খলাহাথ—a lame hand.

হিসকুট্যা—envious ;

হক্ককথা—truth ;

চটকা ভাঙ্গিতে—to wake from sleep.

জুতি—a shoe ;

জুঙ্গ—war ;

মা ছেউড়্যা ছেল্যা—a motherless child, orphan ;

অহঙ্কার—pride ;

অমঙ্গল—misfortune ;

কিরা—an oath ;

চিকিৎসক—a physician ;

ছেচেড়া—a bad paymaster ;

জবন—a Mussalman ;

ঝি—daughter ;

বসন্ত হইল তাহার—he has had the small pox ;

পূর্ন্ন মাসি—full moon.

বইটির আখ্যাপত্রে বা অন্য কোথাও এর রচয়িতার নাম উল্লেখ নেই। কেবল জানা যায় এটি কলকাতায় Chronicle Press-এ ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত। সমসাময়িককালে কলকাতায় ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে *Calcutta Chronicle* নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। এটি তার নিজস্ব ছাপাখানা Calcutta Chronicle Press বা

সংক্ষেপে Chronicle Press বা Chronicle Office থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। এই একই পত্রিকা অফিস বা ছাপাখানা থেকে আলোচ্য অভিধানটিও মুদ্রিত।

এই অভিধানের আসন্ন প্রকাশ ঘোষণা করে ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকায় প্রায় পাঁচ বছর ধরে নানা বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হতে থাকে। যেমন ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের ২০ মার্চ তারিখে (Vol. VII, No. 322) প্রকাশিত ইংরেজি-বাংলায় মেশানো বিজ্ঞপ্তিটি ছিল এইরূপ : 'New Publications,/In the Press,/And speedily will be published,/An Extensive/ Vocabulary,/Bengalese and English,/Very Useful to teach the Natives English and to assist Beginners in Learning the Bengal Language. Those who wish for the work are requested to send their orders to Mr. Upjohn.

ইংরাজ এবং বাঙ্গালিলোকের সিখিবার কারণ এক বহি অতি/শিঘ্র ছাপাখানায় তৈয়ার হইবে/ক সাহেবলোকে বাঙ্গলা কথা সিখিবেক এবং বাঙ্গালি লোকে ইংরাজি কথা সিখিবেক অতএ/ব সকল লোকের কেফাএত/কারণ এই বহি তৈয়ার করা জা ইতেছে জে ২ লোকে চাহে তা / হারা মেং আবজান সাহেবের / ছাপাখানায় আসিয়া লইবেক / ইতি সন ১৭৯২ ইংরাজী / তারিখ ১৯ মার্চ সন ১১৯৮ / বাঙ্গলা তারিখ ৯ চৈত্র'[১]

এই একই বিজ্ঞাপন, কখনো বা সামান্য পরিবর্তন করে আরো বহুবার ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রাক্-প্রকাশন বিজ্ঞপ্তিতে বইটির মূল্যও 'price twelve rupees' অনেকবার উল্লিখিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বাংলা নামটি সহ ইংরেজি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। পরিশেষে বইটি প্রকাশিত হয়েছে ('just published') বলে প্রথম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এপ্রিল ১৬, ১৭৯৩ তরিখে। এর পরেও অবশ্য ঐ বিজ্ঞপ্তি আরো কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে। ঐ বিজ্ঞপ্তিটি ছিল এইরূপ : 'Just Published / At the Chronicle Office, Chitpore Road,/(price four Rupees), / ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি/ বোকেবিলরি / An Extensive / Vocabulary, / Bengalese and English, / Very Useful to teach the Natives English / And / To Assist Beginners in Learning the / Bengal Language.'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বিজ্ঞপ্তিতে বইটির দাম বারো টাকা থেকে চার টাকায় নেমে আসায় অনেকে অনুমান করেছেন, বইটি প্রথমে যত বড়ো হবে বলে প্রকাশক আশা করেছিলেন, সম্পত্তি বিক্রয় ও হস্তান্তরজনিত গোলযোগ ও আর্থিক অনটন হওয়ায় ঠিক তত বড়ো হয়নি।[২] কিন্তু এইরূপ অনুমান গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ একটু

১ *Calcutta Chronicle*, 20th March, 1792.

২ সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ৪র্থ সংখ্যা ; যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, 'বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়', পৃ. ৯

অনুধাবন করলেই দেখা যায় ক্যালকাটা ক্রনিকল-এর ঠিক পরবর্তী সংখ্যাতেই (এপ্রিল ২৩, ১৭৯৩) যে বিজ্ঞাপন বেরোয় তাতে, আগের ও পরের অন্যান্য বিজ্ঞাপনের মতোই, বইটির দাম লেখা ছিল— বারো টাকা ('Price Twelve Rupees')। সুতরাং বইটি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথ আকারেই প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়, কেবল একবার মাত্র সম্ভবত ভুল করেই এর দাম চার টাকা ('price four rupees') লেখা হয়।

ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকায় 'বোকেবিলরি' সংক্রান্ত যে সব বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়, সেগুলি ছাপার জন্য যে বাংলা হরফ ব্যবহার করা হয়েছিল সেই একই হরফে ঐ বইটিও ছাপা হয়েছিল। বইটির আখ্যাপত্র ও ভিতরের পৃষ্ঠাগুলির সমুদয় অংশ একই সাটের সমান আকারের হরফে ছাপা।

'বোকেবিলরি' সংক্রান্ত প্রাক-প্রকাশন পর্বের প্রথম দিকের বিজ্ঞাপনগুলো থেকে জানা যায়, ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকার মতো এই অভিধানটিরও মুদ্রাকর ছিলেন আপজন। কিন্তু ২৬শে জুন, ১৭৯২ তারিখের পত্রিকা ও এতে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় আপজনকে পত্রিকার কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন থেকে সেখানে মুদ্রাকর হিসাবে তাঁর নামও ছাপা বন্ধ হয়ে যায়। ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকা ও তার আনুষঙ্গিক ব্যবসায়ের এক-ষষ্ঠাংশের মালিক ছিলেন আপজন। কিন্তু ঐ সময়ে দেনার দায়ে তাঁর ⅙ অংশ সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্যোগ চলতে থাকে ও সেই মর্মে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিও বেরোতে থাকে। ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৯২ তারিখের ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকায় প্রথম এইরূপ একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। পরে আরো কয়েকবার এই একই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। ২৬শে জুন, ১৭৯২ তারিখের ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকায় একটি বিজ্ঞপ্তিতে Chronicle Office-এর ব্যবসায়ের ঐ এক-ষষ্ঠাংশ ১লা আগস্ট নীলামে বিক্রয় হবে বলে জানানো হয়। পত্রিকার পরবর্তী আরো কয়েকটি সংখ্যায় এই একই বিজ্ঞাপন পুনর্মুদ্রিত হয়। পরে 'ক্যালকাটা ক্রনিকল'-এর ৩০শে অক্টোবর ১৭৯২ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন মারফৎ ঐ সম্পত্তির ⅙ অংশ নীলামের শেষ তারিখ ধার্য করা হয় ৩১শে অক্টোবর ১৭৯২। বিজ্ঞাপনটি ছিল এইরূপ: 'To be sold by public auction by DRING, ROTHMAN & CO. Tomorrow, Wednesday, the 31st instant—One-sixth share of the Calcutta Chronicle and business of the Chronicle Press, together with a proportional part of the outstanding debts, Presses, Types, Foundry for Types (which includes several complete sets of Matrices for casting the neatest and most perfect Persian, Nagri and Bengalese types), and other materials appertaining thereto. The Debts due to the concern now exceed sicca Rupees Fifty-one thousand. A particular statement of the monthly Expenses and collections for the last twelve months may be

seen at the Auction-room. N. B The share will be positively sold to the highest Bidder, it being the property of Mr. Upjohn, and sold by order of the Mortgage.[১] একই বিজ্ঞাপন ২৫শে অক্টোবর, ১৭৯২ তারিখের *Calcutta Gazette* পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়।[২] এই বিজ্ঞপ্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে *Calcutta Chronicle* পত্রিকা, Chronicle Press ও Chronicle Office-এর সমুদয় ব্যবসা থেকে আপজনের সকল সম্পর্কও শেষ হয়ে যায়। সুতরাং দেনার দায়ে আপজন 'ক্যালকাটা ক্রনিকল' ও তার অন্যান্য প্রকাশনার মুদ্রণের কাজ থেকে কার্যত ২৬শে জুন, ১৭৯২ থেকেই অপসারিত হন, এবং ৩১শে অক্টোবর, ১৭৯২ তারিখে তাঁর ওখানকার স্বত্বও নীলামে বিক্রয় করে ঐ ব্যবসা থেকে পাকাপাকি ভাবে বিদায় নেন। কিন্তু তখনো 'বোকেবিলরি'টির মুদ্রণের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। পত্রিকার কাজ থেকে আপজনের অপসারণের প্রায় দশ মাস পরে (১৬ই এপ্রিল ১৭৯৩) বইটি প্রকাশিত হয় এবং এই দশ মাস ধরে বইটি ছাপার যে কাজ চলেছিল তার সঙ্গে আপজন আর সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। ঐ মধ্যবর্তী সময়ে ক্রনিকল পত্রিকায় বইটির আসন্ন প্রকাশ সম্বন্ধে যেসব বিজ্ঞাপন বেরোত, তাতে গ্রাহকদের উদ্দেশে লেখা থাকত— 'to send their orders to the PRINTER.' এই পরবর্তী মুদ্রাকরের নাম জানা যায় না। এর আগে অবশ্য এই ধরনের বিজ্ঞাপনে PRINTER বা মুদ্রাকরের স্থলে আপজনের নাম উল্লেখ থাকত। বইটি সম্বন্ধে প্রথম বিজ্ঞাপন বেরোবার পর আপজন মাস তিনেক (২০ মার্চ থেকে ২৬ জুন, ১৭৯২) এর ছাপার কাজে জড়িত ছিলেন। সুতরাং আপজনকে পুরোপুরি 'বোকেবিলরি'টির মুদ্রাকর বলে আখ্যাত করা চলে না। তবে বইটির মূল মুদ্রণ পরিকল্পনা, এর জন্য প্রয়োজনীয় বাংলা হরফ নির্মাণ ও ছাপার প্রাথমিক পর্যায়ের কাজে আপজনের অবদান অনস্বীকার্য।

বইটির মুদ্রাকর প্রসঙ্গ ছাড়া আরেকটি গুরুতর প্রশ্ন দেখা দেয়, আলোচ্য 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' কি আপজনের রচনা? বইটির ভূমিকায় বলা হয়েছে, গ্রন্থকার দশ বছর পরিশ্রম করে এটি রচনা করেছেন। সেই হিসাবে বলা যায় প্রায় ১৭৮২-৮৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে লেখক এর রচনাকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আপজন কলকাতায় বসে এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এমন কোনো নির্দিষ্ট নজির পাওয়া যায়নি। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে মুদ্রাকর ও অন্যতম মালিক হিসাবে *Calcutta Chronicle* পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি যদি অভিধানটির রচয়িতা হতেন, তবে সংগত কারণেই মনে হয় তাঁর নিজের পত্রিকায় গোড়ার দিকে যখন এর বিজ্ঞাপন বেরোতে শুরু করে, তাতে নিজের নাম কেবল মুদ্রাকর / প্রকাশক হিসাবে না ছেপে গ্রন্থকার হিসাবেও

১ *Calcutta Chronicle*, 30th October, 1792.

২ W. S. Seton-Karr, '*Selections from Calcutta Gazettes*', Vol. II. p. 541.

ছাপতেন। তা ছাড়া বইটি যদি তাঁরই রচনা হত তা হলে তাঁর সঙ্গে ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকা, ছাপাখানা ও এর প্রকাশন ব্যবসার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইটির প্রকাশও বন্ধ হয়ে যেতে পারত, অথবা তিনি বইটি অন্য কোনো ছাপাখানা থেকে প্রকাশের চেষ্টা করতেন (যেমন, পরবর্তীকালে তিনি ম্যাপ, প্রতিকৃতি, প্রভৃতি ছেপেছেন), অথবা নীলামে তাঁর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তিতে[১] অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখের মতো (যেমন, ছাপাখানা, মুদ্রাক্ষর, হরফ ঢালাইখানা, বাংলা, ফারসী বা নাগরী হরফ নির্মাণের ছাঁচ, প্রভৃতি উল্লিখিত হয়েছে) এই বইটির স্বত্ব বিক্রয়ের কথাও উল্লিখিত হত। এই সব যুক্তি তথ্য বিচার করে মনে হয় বইটি আপজনের রচনা না হওয়াই স্বাভাবিক। এটি বাংলা ভাষায় পারদর্শী অন্য কোনো বিদেশী লেখক বা ইংরেজি শিক্ষিত কোনো দেশীয় পণ্ডিতের রচনা। বইটিতে দেশজ বাংলা শব্দ, ও তৎকালীন প্রচলিত আরবী, ফারসী শব্দের প্রাচুর্য দেখে এটি কোনো বিদেশীর রচনা বলেই মনে হয়। দেশীয় পণ্ডিতের রচনা হলে তৎসম বা তদ্ভব শব্দের সংকলনের দিকেই বেশি ঝোঁক দেখা দিত। গ্রন্থরচনায় সাহায্যকারী Native Assistant-এর নামোল্লেখ না করার নজির অবশ্য তখন প্রায়শই দেখা যেত। যাই হোক, গ্রন্থকার দেশী বা বিদেশী যাই হোন, তিনি হয়ত অর্থের বিনিময়ে এর স্বত্ব ক্রনিকল অফিসকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন, অথবা ক্রনিকল অফিস লব্ধপ্রতিষ্ঠিত প্রকাশক হিসাবে জনসাধারণের চাহিদার কথা চিন্তা করে এটি অপরকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে প্রকাশে উদ্যোগী হন। তাই বইয়ে কোথাও গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল ক্যালকাটা গেজেটে কয়েকজন দেশীয় ব্যক্তি একটি বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান প্রকাশের আবেদন জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন।[২] জনসাধারণের এই চাহিদাই সম্ভবত ক্রনিকল প্রেসকে অভিধানটি প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে।

বইটির ভূমিকা বা 'Preface'এ আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। এখানে 'author' ও 'printer' দুটি কথাই দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং মনে হয়, বইটির রচয়িতা ও মুদ্রাকর দুজন আলাদা। আপজন বইটির মুদ্রাকর, সমগ্র বইটির না হলেও এর প্রথম দিকের তো বটেই। তবে গ্রন্থকার আপজন নন, অন্য কেউ। এই অভিধান প্রসঙ্গে যেহেতু আপজন ছাড়া আর কোনো নামের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না, সেজন্য অনেকের মতে এটিকে আপজনের অভিধান বলে উল্লেখ করা উচিত।[৩] কিন্তু এই অভিমত যুক্তিসংগত বলে মনে হয় না। আরো তথ্য না জানা পর্যন্ত এটিকে ক্রনিকল প্রেসের অভিধান বলেই উল্লেখ করা সমীচীন।

---

১ *Calcutta Chronicle*, 30th October, 1792 পত্রিকায় প্রকাশিত।

২ W. S. Seton-Karr, '*Selections from Calcutta Gazettes*', Vol. II, p. 497.

৩ সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ৪র্থ সংখ্যা।

গ্রন্থকার হিসাবে আপজনের পরিচয় কোথাও সমর্থিত হয়নি। বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসাবেই তিনি সমধিক পরিচিত। ক্রনিকল প্রেস বা অফিস অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে মুদ্রাকর প্রকাশক ও পুস্তক ব্যবসায়ী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। মুদ্রাকর ও অন্যতম মালিক হিসাবে আপজন দীর্ঘকাল এই ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত বহু বইয়ের বিজ্ঞপ্তিতে মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসাবে আপজনের নাম পাওয়া যায়। '*A Vocabulary, English and Persian*, by Francis Gladwin' গ্রন্থের মুদ্রাকর ছিলেন এ. আপজন।[১] [প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, এই ইংরেজি-ফার্সী অভিধানের রচয়িতা ও মুদ্রাকর উভয়ের নামই বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু এর পরের মাসেই প্রচারিত অপর বিজ্ঞপ্তিতে বক্ষ্যমান বাংলা-ইংরেজি অভিধানের রচয়িতার নাম নেই, কেবল মুদ্রাকর এ. আপজনের নাম ঘোষিত।] সমসাময়িক আরেকটি বিজ্ঞাপন মারফত জানা যায়, শীঘ্রই প্রকাশিতব্য Gilchrist রচিত হিন্দুস্থানী-বাংলা অভিধানেরও মুদ্রাকর এ. আপজন।[২] জনসাধারণের চাহিদা ও অনুরোধে আপজন ফারসী ও ইংরেজি ভাষায় '*The Tootinamah, or Tales of a Parrot*' নামক গ্রন্থ প্রকাশেও উদ্যোগী হন।[৩] পরবর্তীকালে (২৬ জুন, ১৭৯২) ক্রনিকল প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত এই বইয়ের বিজ্ঞাপনে অবশ্য আপজনের নাম উল্লিখিত হয়নি। মূল কথা, ক্রনিকল প্রেস ও অফিস ছিল তৎকালীন প্রখ্যাত প্রকাশক। এর মুদ্রাকর ও অন্যতম স্বত্বাধিকারী হিসাবে প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞপ্তিতে আপজনের নাম উল্লিখিত হত। কিন্তু ২৬শে জুন, ১৭৯২ তারিখ থেকে এই ব্যবস্থায় ছেদ পড়ে যায়। দেনার দায়ে আপজন নানাভাবে জড়িয়ে পড়েন, হয়ত বা ঐ সময়ে তাঁর আচরণে ক্রনিকল প্রেসের অন্যান্য মালিকদের সঙ্গে তাঁর বিরোধও দেখা দেয়, ফলে তিনি ঐ সংস্থা থেকে কার্যত অপসারিত হন। এই বিষয়ে ক্রনিকল অফিস থেকে একটি অদ্ভুত বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়: 'The Proprietors of the Calcutta Chronicle are too sensible of the rectitude and liberality of their conduct towards Mr. Upjohn to presume to trouble the Public with any detail of private occurrences in reply to his address of this day, which would contribute as little to their amusement, as to Mr. Upjohn's credit.'[৪] এই বিজ্ঞপ্তিতে কিছু অপ্রীতিকর ব্যক্তিগত ঘটনা ও পারস্পরিক দোষারোপের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে হয়। এর ফলে ক্রনিকল অফিস, প্রেস ও পত্রিকার সঙ্গে

১ *Calcutta Chronicle*, Feb. 7, 1792 সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি দ্রষ্টব্য।

২ *Calcutta Chronicle*, Feb. 7, 1792.

৩ *Calcutta Chronicle*, May 8, 1792.

৪ *Calcutta Chronicle*, 26 June, 1792.

আপজনের প্রায় সাড়ে সাত বছরের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে পড়ে। এতকাল *Calcutta Chronicle* পত্রিকার শেষে ছাপা থাকত— 'Calcutta : Printed by A. Upjohn, at his office, No. 8, Loll Bazar' কিন্তু এখন থেকে তা পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়াল— 'CALCUTTA : Printed for the Proprietors, No. 8 Loll Bazar.' কিন্তু তারপরেও কলকাতার মুদ্রণ ও প্রকাশন জগতে আপজনের উপস্থিতি আরো কিছুকাল ধরে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা গেছে। এই সময়ে মানচিত্র, প্রতিকৃতি প্রভৃতির প্রকাশনেই তাঁকে নিয়োজিত দেখা যায়।

এতকাল ক্রনিকল প্রেসের মুদ্রাকর হিসাবে আপজনের নামটি জানা ছিল, তাঁর কর্মবহুল জীবনের আর কোনো তথ্যই বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসকার সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। অথচ অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে আপজনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। সমসাময়িক কালের নানা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত দলিলের সাক্ষ্য ও ঘটনার সূত্র অনুসন্ধান করে আমি এখানে তাঁর জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি। আপজনের পুরো নাম ছিল এ্যারন আপজন (Aaron Upjohn)। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারিতে 'Bengal Engineers' পর্যায়ভুক্ত সরকারী চাকরি থেকে অবসর প্রাপ্ত জনৈক প্রাক্তন মেজর উইলিয়ম বেইলী (Wm. Baillie) কলকাতায় ইংরেজি সাপ্তাহিক *Calcutta Chronicle* প্রতিষ্ঠা করার কয়েক বছরের মধ্যে (১৭৯০) এ্যারন আপজন এর মুদ্রাকর ও আংশিক স্বত্বাধিকারী হিসাবে তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন।[১] এই উইলিয়ম বেইলী পুরনো কলকাতা (Old Calcutta) সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন এবং আপজনও পরবর্তীকালে কলকাতার ম্যাপ প্রস্তুতকারক ('Calcutta Topographer') হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ক্যালকাটা ক্রনিকলের মালিকানা এর পরে কয়েকবারই হস্তান্তরিত হয়েছিল। ক্রনিকল অফিসের সমুদয় মুদ্রণ প্রকাশন কাজের সঙ্গে আপজন ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত জড়িত ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয় ও প্রভূত দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়ায় তিনি তাঁর ঐ সংস্থার এক-ষষ্ঠাংশ সম্পত্তির স্বত্ব বন্ধক দিতে বাধ্য হন। পরে তাঁর ঐ সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় হয়। ক্যালকাটা ক্রনিকলের মুদ্রাকরের কাজ ত্যাগ করার পর তিনি নানারূপ মানচিত্র ও নকশা প্রস্তুতে মনোযোগী হন। কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম থেকে সুখসাগর (Sooksaugor) পর্যন্ত নদীর বা গঙ্গার একটি নকশা ('Plan of the River') প্রকাশে তিনি উদ্যোগী হন।[২] ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে তিনিই প্রথম কলকাতার ম্যাপ

---

১ S. C. Saniel, '*Hartly House*' (reprint) p. 318 ; W. K. Firminger, '*History of Calcutta Streets & Houses*', note to No. 1900. *Bengal, Past & Present*, April-June, 1917 p. 218.

২ *Calcutta Chronicle*, July 3', 1792.

প্রকাশ করেন। W. S. Seton-Karr সম্পাদিত '*Selections from Calcutta Gazett-s*' গ্রন্থের সঙ্গে আপজনের এই ম্যাপের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ লিথোগ্রাফে ছেপে প্রকাশিত হয়েছে। [Vol. I. Preface, p. 7] ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ আপজন বিখ্যাত প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ উইলিয়ম জোন্‌স্‌-এর প্রতিকৃতি খোদাই করে ১০" × ৭½" আকারে ছেপে প্রকাশ করেন। এই ছবির প্রতিটির মূল্য ধার্য হয়েছিল এক স্বর্ণ মুদ্রা। ঐ সময়ে আপজন থাকতেন কলকাতার শিয়ালদহ অঞ্চলে।[১] পরবর্তীকালে তিনি সার্ভেয়ার জেনারেলের অফিসে মুখ্য ড্রাফ্‌টসম্যান নিযুক্ত হন। মানচিত্র-নকশা-প্রতিকৃতি প্রভৃতি প্রকাশনের মধ্য দিয়ে একজন প্রখ্যাত খোদাইকর (engraver) হিসাবে আপজনের পরিচয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর এই পরিচয়ের সূত্র ধরে অনুমান করা যায় যে ক্যালকাটা ক্রনিকলের মুদ্রাকর হিসাবে প্রথম দিকে তিনি যখন ক্রনিকল অফিসের ছাপাখানা-হরফ ঢালাইখানার কাজে জড়িত ছিলেন, সেই সময় ওখানকার তৈরি বাংলা বা ইংরেজি হরফ নির্মাণেও তাঁর বিশিষ্ট অবদান ছিল।

Aaron Upjohn ও Eleanor Crucifix নাম্নী জনৈকা অভিনেত্রী কর্তৃক ক্রনিকল প্রেসের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ও স্থপতি (architect) Richard Blechynden-কে সম্পত্তি বিক্রয়ের ঘটনা থেকে মনে হয় ঐ অভিনেত্রীর সঙ্গে কোনো সূত্রে আপজনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।[২] [অবশ্য এই সম্পত্তি বিক্রয়ের তারিখ সম্বন্ধে কিছুটা সংশয় রয়েছে।] সমসাময়িককালে কলকাতার প্রথম বাংলা নাট্য প্রযোজক ও রুশ পর্যটক-শিল্পী-ব্যবসায়ী লেবেডফের সঙ্গেও কি আপজনের যোগাযোগ ঘটেছিল? [২ই এপ্রিল, ১৭৯০ তারিখে কলকাতায় Old Court House-এ লেবেডফ তাঁর কণ্ঠ ও যন্ত্র -সংগীতের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। জানা যায় ঐ সময় তিনি ৪৭নং টেরিটি বাজারে Messrs. Cooper and Upjohn নামক প্রকাশক সংস্থার বাড়িতে বাস করতেন। (Herasim Lebedeff, 'A *Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects*', 1963 ed. : Introduction by Mahadeb Prasad Saha, p. 12.) এই যৌথ প্রকাশক সংস্থার Upjohn ও ক্যালকাটা ক্রনিকলের মুদ্রাকর Upjohn অভিন্ন ব্যক্তি। এরও আগে ছিল অপর একটি সংস্থা Messrs. Stewart and Cooper ; এই সংস্থাই Chronicle Press-এর হরফ ঢালাই-খানা প্রতিষ্ঠা করেন ও কিছুকাল পরিচালনাও করেন। পরবর্তীকালে এই সংস্থাটি উঠে যাওয়ায় তাদের উপরোক্ত ব্যবসাগুলি হস্তান্তরিত হয়। (W. K. Firminger, '*History of Calcutta Streets and Houses*,' No. 1900, 1st May 1791 : *Bengal, Past & Present*, April-June, 19:7, p. 188.) সম্পত্তি হস্তান্তর বা বিক্রয়ের উপরোক্ত

---

১ W. S. Seton-Karr, *op. cit.* Vol. II, p. 590.

২ W. K. Firminger, '*History of Calcutta Streets and Houses*', No. 2306 ; *Bengal, Past & Present*, April-June, 1917, pp. 199-200.

সূত্র থেকে জানা যায়, ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের আগেই এই সংস্থাটি উঠে যায়। হয়ত বা ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসেরও আগে এই সংস্থাটির বিলুপ্তি ঘটে। এই শেষোক্ত সময়ে কলকাতায় Messrs. Cooper and Upjohn-এর মুদ্রণ-প্রকাশন-হরফ ঢালাইয়ের ব্যবসা চালু ছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই সংস্থার অফিসেই লেবেডফ বাস করতেন। ক্যালকাটা ক্রনিকল-এর Upjohn-ই এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সে ক্ষেত্রে ঘটনার সূত্রে আপজনের সঙ্গে লেবেডফের যোগাযোগ হওয়া সম্ভব।] এইসব অভিনেত্রী, নাট্য-প্রযোজকের সঙ্গে আপজনের সম্ভাব্য যোগাযোগ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে আপজনের ক্রমবর্ধমান দেনা ও দেনার দায়ে সম্পত্তি বিক্রয়ের কথা। এইসব যোগাযোগ বা সম্পর্কের টানেই কি আপজনের দেনার সূত্রপাত ?[১]

খোদাইকর আপজনের পূর্বোক্ত ম্যাপ, প্রতিকৃতি প্রভৃতি প্রকাশের পরেও তিনি আরো কিছুকাল জীবিত ছিলেন। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে জুন তারিখে আপজনের মৃত্যু হয়।[২] মতান্তরে, ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ২১শে জুন তাঁর মৃত্যু হয়।[৩] *The East Indian Chronologist*, 1801-গ্রন্থে Aaron Upjohn সম্বন্ধে আরো উল্লেখ আছে— 'a very ingenious Artist— To whom we are indebted for the small rolling Map of the River Houghley, the perpetual Almanack, and other useful works.' উল্লেখযোগ্য, এখানে আপজনকে উদ্ভাবনপটু শিল্পী ('ingenious Artist') বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনিই প্রথম হুগলী নদীর গোটানো ম্যাপ বা নকশা প্রকাশ করেন, ধারাবাহিক পঞ্জিকা প্রকাশন প্রবর্তন করেন।

ফরস্টারের ইংরেজি-বাংলা অভিধান বা শব্দ-সংগ্রহ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে প্রকাশিত হেনরি পিটস ফরস্টার (Henry Pitts Forster) প্রণীত ইংরেজি-বাংলা শব্দ-সংগ্রহটি ছিল শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ফরস্টারের এই

১ দেনার দায়ে সম্পত্তি নীলাম বা জেল খাটার রেওয়াজ তখন খুবই ছিল। দেনা পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের নানা প্রচেষ্টাও মাঝে মাঝে হত। যেমন একটি বিজ্ঞপ্তির কথা ধরা যাক : For sale at the Chronicle office (For the Benefit of Insolvent Debtors) *SACONTALA* ; or *THE FATAL RING* : An Indian Drama, by Calidas (*Calcutta Chronicle*, October. 16, 1792.) অপর একটি বই বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি :

'For Sale...*Laili Majnun* a Persian Poem of Hatifi, with an English Preface. For the benefit of the Insolvent Debtors in the Prison of Calcutta, price sicca Rs. 16'. (*Calcutta Gazette*, 18th March 1790 : W. S. Seton-Karr, '*Selections from Calcutta Gazettes*', Vol. II, p. 509.)

২ W. K. Firminger, *op. cit.* Note to no. 2306 : *op. cit* ; p. 221.

৩ *The East Indian Chronologist*, 1801.

অভিধান দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল, প্রথম খণ্ড (ইংরেজি-বাংলা অভিধান) ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে ও দ্বিতীয় খণ্ড (বাংলা-ইংরেজি অভিধান) ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে। গ্রন্থের আয়তন, শব্দ-সংগ্রহের বিপুলতা ও মুদ্রণ পরিপাট্য সব দিক দিয়েই তাঁর এই অভিধান শতাব্দীর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি বলে মনে হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংকলিত ও জনসাধারণের মধ্যে সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থে মুদ্রিত দুই খণ্ডে সমাপ্ত মোট ৮৯৩ পৃষ্ঠার বৃহৎ আকারের এই অভিধান বাংলা মুদ্রণের আদি যুগকেই গৌরবান্বিত করে তুলেছে। বাংলা অভিধান হিসাবেও এটিই প্রথম সার্থক সুশৃঙ্খল অভিধানের মর্যাদা পাবার অধিকারী। বর্ণানুক্রমে সজ্জিত এই অভিধানে প্রায় ১৮০০০ শব্দ সংকলিত হয়েছে এবং এর মূল্য ছিল ৬০ টাকা। (লঙের ক্যাটালগ, ১৮৫৫)

অভিধানটির দুটি খণ্ডই সংকলন-পরিকল্পনা, মুদ্রণ বৈশিষ্ট্য, হরফ ও কাগজের ব্যবহার প্রভৃতি সব বিষয়েই অনুরূপ হওয়ায় দুটি বইকেই, একটি ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও, অষ্টাদশ শতকের বাংলা মুদ্রণের নিদর্শন হিসাবে গণ্য করা চলে। প্রথম খণ্ডের (ডিসেম্বর, ১৭৯৯) ইংরেজি-বাংলা শব্দ-সংগ্রহ ইংরেজি বর্ণমালানুক্রমে সজ্জিত। প্রতি পৃষ্ঠায় দুটি কলাম, প্রতিটি ইংরেজি শব্দের পাশে বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বাংলা অর্থ ও সঙ্গে রোমান অক্ষরে তার লিপ্যন্তর দেওয়া আছে। যেমন, 'Vigour, বল bol শক্তি shokti ক্ষমতা khyómota সামর্থ্য shamorthyo সাধ্য shadhyo বলবত্তা bolobotta.' নিঃসন্দেহে বিদেশীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার সুবিধার্থে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল। গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত উদ্যোগে বইটি সংকলিত ও প্রকাশিত হলেও বাংলা ভাষা শিক্ষণ প্রসারে বিদেশী রাজশক্তির উৎসাহ ও সহায়তার কথা এখানে স্মরণীয়। Thomas Graham-এর উদ্দেশ্যে লেখা বইটির উৎসর্গ পত্রে ফরস্টার লিখেছেন: '...as it was in a great Measure undertaken on your Suggestions, that it might prove of Utility; and further, his Lordship's judicious Resolutions relative to the Study of the Language.' উৎসর্গ পত্রের তারিখ ১৫ ডিসেম্বর ১৭৯৯।

১০.৬"×৮.৫" আকারের এই বইটির প্রথম খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০+৪২১। বইয়ের শুরুতে এক পৃষ্ঠায় বাংলা বর্ণমালা ('Bongalee Alphabet') মুদ্রিত আছে। ভূমিকার শেষাংশে (পৃষ্ঠা ১৭ থেকে ২০) শ্রীরামলোচন দেব দাস রচিত পাঁচালি গান 'বিক্রমাদিত্য রাজোপাখ্যান' উদ্ধৃত আছে। এ সম্বন্ধে ফরস্টার লিখেছেন: '...in order to give a better idea of the orthography, I have subjoined a few lines out of the Bikroomrajopakhyam, and rendered it in the Roman.' পয়ারে রচিত এই উপাখ্যান বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত এবং এর প্রতিটি পঙ্‌ক্তির নীচে রোমান অক্ষরে তার লিপ্যন্তর দেওয়া আছে:

শ্রীগুরু পদারবিন্দে প্রণাম করিয়া
Sree gooroo podar binde pronam koriya,
হেরম্বাবি বিষ্ণু শিব দুর্গাকে পূজিয়া।
Herombabi Bishnoo Shibo Doorgake Poojiya,
…ভূপতিনন্দের সুত বিছাল গ্নে জাত।
Bhoopoti nonder Shooto bichhalogne Jato,
তে কারণে বিছালতা হার নাম ভাত।
Tekarone Bichhal tahar nam bhato.
যুবাকালে একদিন মৃগয়া কারণে।
Jooba Kale ekdin mrigoya Karone,
অশ্বারূঢ়ে গিয়াছিল ভিতর কাননে।
Oshwaroorhe giya chhilo bhitor Kanone.

সহজেই অনুমেয়, বিদেশী পাঠকের সুবিধার্থে এই অক্ষরান্তরিত রূপ অনুসরণ করা হয়েছিল। তবে ফরস্টার এর ভূমিকায় বলেছেন, একাজ তিনি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কেবলমাত্র অন্যের উপরোধেই করেছেন : '…It has been in compliance with the recommendations of others,…that I have rendered the Bongalee in the Roman character, though in this point entirely against my own ; and I am free to say, I have never heard one tolerable argument adduced in its favour.' [Introduction.]

বাংলা ভাষাকে তৎকালীন আরবী ফারসীর সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে মুক্ত করে একটি বিশুদ্ধ রূপ দানে ফরস্টারের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। আলোচ্য অভিধানেই তার উজ্জ্বল পরিচয়। দেশীয়, তদ্ভব ও তৎসম শব্দই এখানে সর্বাধিক সংকলিত হয়েছে। বাংলা ভাষাপ্রেমী এই বিদেশীই বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দানের প্রস্তাব করেন। কোম্পানীর নানাবিধ কাজে, বিশেষ করে আইন আদালতের কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের তিনি প্রবক্তা ছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করেই তিনি বাংলা ভাষা চর্চার প্রবর্তন ও তার সাহায্যার্থে এই অভিধান সংকলনের কাজে উদ্যোগী হন। বইটির ভূমিকাতেই ফরস্টার তাঁর এই উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন : …'to show the importance of the study of the Bongalee, and the propriety of its adoption, as the only official language in the province of Bongal : …the propriety of adopting the Bongalee as the language of the courts of justice in particular, and the Company's affairs in general, in the

province of Bongal,…'[Introduction] বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে ফরস্টারের এই চিন্তা ও প্রয়াসের কথা স্মরণে না রাখলে তাঁর অভিধানের প্রতি যথোচিত মর্যাদা দেওয়া যাবে না। তিনি মনে করতেন— 'The Bongalee, even in its present corrupted state, is perhaps the purest dialect of the venerable Songskrit now spoken in any part of India.' [Introduction.] ফরস্টারের অভিধানই পরবর্তীকালে কেরীকে বৃহত্তর অভিধান সংকলনে অনুপ্রাণিত করেছিল। অপর পক্ষে বাংলা ভাষায় উপযুক্ত ব্যাকরণ অভিধানের অভাব বোধ করায় ফরস্টার নিজেই একাজে অগ্রণী হন এবং তিনি তাঁর শব্দ-সংগ্রহটিকে প্রথম প্রচেষ্টা ('a first attempt') বলে মনে করতেন। [অবশ্য আমি আগেই বলেছি, ক্রনিকল প্রেসের অভিধান আবিষ্কৃত হবার পর তাঁর এই দাবি যথার্থ বলে গ্রহণ করা যায় না।] ফরস্টার অবশ্য তাঁর বইয়ের ভূমিকায় হালহেডের বাংলা ব্যাকরণের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন, এর আগে কোনো দেশীয় ব্যক্তি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেননি ('There never having been a Native Bongalee Grammarian'), এবং হালহেডের ব্যাকরণে অনেক অসম্পূর্ণতা থাকায় একটি সম্পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ রচনায় তিনি আগ্রহী ছিলেন : 'It was my intention, had I met with the slightest encouragement to prosecute the undertaking, to have given a new edition of Mr. Halhed's excellent Grammar, with some supplementary chapters, on the formation of abstract nouns, nouns of action, adjectives, concrete nouns, and the like, from their roots ;…' কিন্তু ব্যাকরণেরই একটি বিভাগ হিসাবে তিনি প্রথমে শব্দ-সংগ্রহ সংকলনের কাজে উদ্যোগী হন এবং কাজটি সম্পূর্ণ হলে দেখা যায় যে বইটি তাঁর প্রস্তাবিত অভিধানের প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্ভাব্য গ্রাহকদের দেওয়া অগ্রিম চাঁদার টাকায় বইটি মুদ্রণের ব্যবস্থা হলেও সম্পূর্ণ খরচের টাকা তাতে ওঠেনি।

১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 'A/VOCABULARY,/IN TWO PARTS,/ENGLISH AND BONGALEE,/AND/VICE VERSA./BY H. P. FORSTER,/SENIOR MERCHANT ON THE BONGAL ESTABLISHMENT./VOX ET PRAETEREA NIHIL/CALCUTTA/FROM THE PRESS OF FERRIS AND CO./1799.'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এখানে বাংলা ভাষার ইংরেজি প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে— 'BONGALEE'। হালহেড তাঁর ব্যাকরণে (১৭৭৮) লিখেছেন, 'BENGAL LANGUAGE'। ক্রনিকল প্রেস প্রকাশিত 'বোকেবিলরি'তে (১৭৯৩) লেখা হয়েছে 'BENGALESE'। পরবর্তীকালে উইলিয়ম কেরীই তাঁর বাংলা ব্যাকরণে (১৮০১) প্রথম এর আধুনিক রূপটি ব্যবহার করেন— 'BENGALEE'।

ফরস্টারের অভিধানের প্রথম খণ্ডটি ইংরেজি-বাংলা অভিধান। উদাহরণ স্বরূপ এর কয়েকটি শব্দ এখানে উদ্ধৃত হল :

'Bear, ভল্লুক bhollook ভালুক bhalook ঋক্ষ rikhyo.

Beard, দাড়ী daree শ্মশ্রু shonshroo ঋক rik.' (page 28)

'Bundle, গাঁঠরী ganthree বোক্‌চা bookcha পুঁটলী poontlee বোক্‌চী bookchee পুলিন্দা poolinda মোট mot তলপী tolpee বোক্‌চা বোক্‌চি bokcha-bokchi পিঠহামচা pithamcha কাঁকতলপী kanktolpee' (p. 38)

ফরস্টার একই শব্দের সমার্থক বহু প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন। সাধুর সঙ্গে চলিত বা গ্রাম্য বাংলা শব্দও তাঁর অভিধানে সংকলিত হয়েছে।

প্রথম খণ্ডের অভিধান অংশের শেষে নিম্নোক্ত সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে গ্রন্থকারের নাম ও গ্রন্থপ্রকাশ কাল উল্লেখ করা হয়েছে :

'শাকেত্বূমিভুজাদ্রোক বর্ষে শব্দার্থ সংশহঃ।
শ্রীযুত ফারস্টরেণেষ পরোপকৃতয়েকৃতঃ॥'

অর্থাৎ ভূমি = ১, ভুজ = ২, অদ্রি = ৭, এক = ১ ; অঙ্কানাং বামতো গতিঃ সূত্রানুসারে ১৭২১ শক অর্থাৎ ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দ।[১] [এখানে প্রথম পঙ্‌ক্তির 'ভূ' সম্ভবত ভুলক্রমে 'ত্ত' হয়েছে।] এখানে আরো বলা হয়েছে, গ্রন্থকার 'ফারস্টার' (Forster) এই শব্দসংগ্রহ পরোপকারের জন্যই সংকলন করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, হালহেডও তাঁর ব্যাকরণের আখ্যাপত্রে লিখেছিলেন— 'ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং' অর্থাৎ, 'ফিরিঙ্গি' সম্প্রদায়ের উপকারার্থে তিনি তাঁর ব্যাকরণ রচনা করেছেন।

ফরস্টারের অভিধানের প্রথম খণ্ডটি কলকাতায় ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেসে ছাপা। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত অভিধানের দ্বিতীয় খণ্ডটি কলকাতায় P. Ferris কর্তৃক Post Press-এ ছাপা। কিন্তু দুটি খণ্ডের ঘনিষ্ঠ মুদ্রণ সাদৃশ্য দেখে মনে হয় বই দুটি একই প্রেসে ছাপা, হয়ত বা কোনো কারণে প্রেসের দুটি ভিন্ন নাম ব্যবহৃত হয়েছে। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের পরেও ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস চালু ছিল, পরবর্তীকালে তাদের ছাপা বাংলা বইয়ের সন্ধানও পাওয়া গেছে। এমন-কি এই ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস থেকেই পরবর্তীকালে ফরস্টারের অপর একটি বই *'Essay on the Principles of Sanskrit Grammar'* ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। হালহেডের ব্যাকরণে (১৭৭৮) ব্যবহৃত বাংলা হরফের সঙ্গে ফরস্টারের অভিধান গ্রন্থের বাংলা হরফের উচ্চতা ও ধাঁচের কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তা থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা বিপজ্জনক যে এই বইয়েরও বাংলা হরফগুলি

---

১ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, 'বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়', পৃ. ১২

'উইলকিন্স কর্তৃক ক্ষোদিত'।[১] উইলকিন্সের প্রথম তৈরি ও হালহেডের ব্যাকরণে ছাপা বাংলা হরফের সঙ্গে ফরস্টারের বইয়ে ছাপা বাংলা হরফের বহু বৈসাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উদাহরণ স্বরূপ, 'ট', 'ঙ্গ' প্রভৃতি অক্ষরের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে উইলকিন্স ভারত ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে যান। সুতরাং তাঁর পক্ষে নতুন করে ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে এইসব অক্ষর খোদাই করার প্রশ্ন ওঠে না। অপর পক্ষে ফরস্টারের অভিধান গ্রন্থের হরফের সঙ্গে ক্রনিকল প্রেসের অভিধানে (১৭৯৩) ছাপা হরফ বা মিলারের বইয়ের (১৭৯৭) হরফের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই সব শেষোক্ত মুদ্রাক্ষরগুলিকে তাই এক নতুন স্বতন্ত্র সাটের মুদ্রাক্ষর বলে মনে হয়। প্রন্থান্তরে এই মুদ্রাক্ষরের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আরো আলোচনা করা হল। [দ্রঃ সূচনাপর্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়]

ফরস্টারের অভিধানের দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 'A/VOCABULARY,/ IN TWO PARTS,/BONGALEE AND ENGLISH,/AND/VICE VERSA./ PART II./BY H. P. FORSTER,/SENIOR MERCHANT ON THE BONGAL ESTABLISHMENT./VOX ET PRAETEREA NIHIL,/CAL-CUTTA/ PRINTED BY P. FERRIS,—POST PRESS./1802.'

১১.২" × ৮" আকারের এই বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৩ + ৯। বইয়ের শেষে দুই পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রাহকদের নামের তালিকা ('List of Subscribers') ছাপা আছে। এঁদের কাছ থেকে নেওয়া অগ্রিম চাঁদার টাকায় বইটি ছাপা হয়েছিল। মোট ২৭৫ জন গ্রাহকের তালিকা থেকে জানা যায় এর বেশির ভাগই ছিলেন বিদেশী এবং তাঁরা প্রত্যেকে কত কপি বই কিনেছিলেন তারও হদিস এখানে পাওয়া যায়। The Hon'ble Company ১০০ কপি বই কিনেছিলেন, Tulloh & Company ১ কপি। এ ছাড়া গ্রাহক তালিকায় আছেন : W. Carey, E. Colebroke, H. Colebrooke, N. B. Edmonstone, John Gilchrist (চার কপি), Francis Gladwin, W. Hunter, George Udny, প্রভৃতি সমসাময়িককালের সুপরিচিত বাংলাভাষাভিজ্ঞ বিদেশী পণ্ডিত। অবশ্য এই তালিকায় অল্প কয়েকজন বাঙালীর নামও পাওয়া যায়, যেমন Gopymohun Tagore (গোপীমোহন ঠাকুর), Prithram Doss (প্রীতরাম দাস), Russickloll Babu (রসিকলাল বাবু), Samsoonder Dhar (শ্যামসুন্দর ধর—৩ কপি)।

ফরস্টারের অভিধানের কয়েকটি কপি এখনো পাওয়া যায়। কলকাতায় ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে এই বই সংরক্ষিত আছে।

ফরস্টারের অভিধানের দ্বিতীয় খণ্ডটি ছিল বাংলা-ইংরেজি অভিধান। বাংলা বর্ণানুযায়ী এটি সাজানো। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি শব্দ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

---

১ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ('বাংলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়' পৃষ্ঠা ১২) এই মত পোষণ করেন।

'গো gou, Cow

গৌর gour, Fair, White

গৌরব gourob, Promotion, reverence, respect, weight consequence, character, (ক-k) to revere, regard.

গ্রন্থ gronth, Book, volume, (ক-k) to write, compose.

গ্রন্থি gronthi, knob, knuckle, knot,

(মোচন mochon) to unite.' (p. 122).

দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে 'FINIS' কথার সঙ্গে লতাপাতায় জড়ানো একটি পতাকাদণ্ডের শীর্ষভাগ সমন্বিত 'design' ছাপা আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ঠিক এই 'design'টিই ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে Hon. Company's Press-এ ছাপা একটি বই (*'Essays by the students of the College of Fort William in Bengal'*—বঙ্গাক্ষরে ছাপা রচনা সহ একটি ইংরেজি বই)-এর শেষেও ছাপা আছে। এই ধরনের একই 'design' কি তখন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বাজারে পাওয়া যেত, নাকি, উভয় ছাপাখানার পরিচালনগত কোনো যোগাযোগের ফলে এটি সম্ভব হয়েছিল ?

ফরস্টারের অভিধানের দ্বিতীয় খণ্ডের আসন্ন প্রকাশ ঘোষণা করে ক্যালকাটা গেজেটে (২৬ আগস্ট, ১৮০২) একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল, তা থেকে জানা যায় বইটি প্রস্তাবিত আকারের দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ায় প্রকাশে এত বিলম্ব ঘটে। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই এর ছাপার কাজ চলতে থাকে এবং সাড়ে চারশো পাতার এই বইটির ছাপার কাজ সম্পূর্ণ হতে প্রায় দু বছর সময় লাগে। পূর্বোক্ত বিজ্ঞাপনটি ছিল এইরূপ : 'Mr. Forster—Has the pleasure to acquaint the subscribers to his Bengalee Vocabulary, that the second part is entirely printed off, and will be ready for delivery in all the present month of August, and as he has more than doubled the size of the work beyond what he engaged, he hopes this will be admitted as a sufficient excuse for the delay in the publication....'[১]

এই বিজ্ঞাপনটিতে ফরস্টার আরো জানান যে ইতিমধ্যে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধেও একটি বিস্তারিত মৌলিক রচনা (*'Essay on the Principles of Sanskrit Grammar'*) সম্পূর্ণ করেছেন এবং জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে তিনি এটি প্রকাশে ইচ্ছুক। এরই সঙ্গে বোপদেবের মূল সংস্কৃত ব্যাকরণ 'মুগ্ধবোধ' ও তার ইংরেজি অনুবাদও তিনি প্রকাশে উদ্যোগী হন। সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে তাঁর ঐ রচনা শেষ পর্যন্ত ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তবে এর ভূমিকা থেকে জানা যায় যে ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে

১ W. S. Seton-Karr, *'Selections from the Calcutta Gazettes'* Vol. III, p. 561.

ফরস্টার তাঁর ঐ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কলেজ কাউন্সিলের বিবেচনার্থে জমা দেন। তখন পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে কোলব্রুক, কেরী, উইলকিন্স প্রভৃতি কারোর গ্রন্থই প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং ঐ সময়ের বিবেচনায় ফরস্টার সংস্কৃত ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃতের সম্মান পাবার যোগ্য। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ হেনরি পিটস্ ফরস্টারের এটি ছিল একটি বড়ো পরিচয়। বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। বিশেষ করে দুই খণ্ডে সমাপ্ত বিরাট বাংলা অভিধান সংকলন করে তিনি বাংলা ভাষা চর্চার সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করে যান। বাঙালী মাত্রই এজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

অথচ বাংলা ভাষাপ্রেমী এই বিদেশী তাঁর অভিধানে নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে কেবল লিখেছেন— 'Senior Merchant on the Bongal Establishment.' বাংলাদেশে কোম্পানীর রাজত্বে তিনি বেশ কিছুকাল, অন্তত তাঁর অভিধান রচনা ও প্রকাশকালে, জীবিকার প্রয়োজনে ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। এর আগে ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের ৭ই আগস্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি নিয়ে তিনি প্রথম বাংলাদেশে পদার্পণ করেন।[১] হেনরী পিটস্ ফরস্টার-এর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে কিছু মতান্তর আছে। অনেকের মতে তাঁর জন্ম ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে। কেউবা বলেন ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে। সুশীলকুমার দে শেষোক্ত মত সমর্থন করেছেন।[২] ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮১৫ তারিখের ***Calcutta Government Gazette***-এর শোকবার্তায় এবং ***Calcutta Monthly Journal***-এর সেপ্টেম্বর, ১৮১৫ সংখ্যায় (পৃ. ২৮৫) প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে মৃত্যুকালে ফরস্টারের বয়স হয়েছিল ৫৪। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষের মাটিতেই তাঁর মৃত্যু হয়। সুতরাং সেই হিসাবে তাঁর জন্মতারিখ ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দেই হওয়া উচিত।

কোম্পানীর চাকরিতে প্রবেশ করার পর পর্যায়ক্রমে তাঁর উন্নতি হতে থাকে ও তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বভার বহন করেন। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি ত্রিপুরার কালেক্টর (Collector of Tipperah) ও ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে চব্বিশ পরগণা জেলার দেওয়ানী আদালতের রেজিস্ট্রার (Registrar) পদে নিযুক্ত হন। ১৮০৩-০৪ সালে তিনি কলকাতা টাঁকশালে (Calcutta Mint) যোগদান করেন ও ক্রমে এর অধ্যক্ষ (Master) পদে উন্নীত হন। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি সরকারী স্ট্যাম্প কাগজে সই করার অধিকারী মনোনীত হন। ঐ বছরেই তাঁর মৃত্যু হয়।[৩]

Dodwell and Miles রচিত '*Bengal Civil Servants, 1839*' গ্রন্থ (pp. 182-88 : Supp. list, pp. 600-01) থেকে জানা যায় ১৭৯৮ থেকে ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত

---

১ *Dictionary of National Biography*, Vol. VII, p. 454.

২ S. K. De, '*Bengali Literature in the Nineteenth Century*' ('62 ed.) p. 80.

৩ *Dictionary of National Biography, op. cit.*

এবং ১৮১২ থেকে ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ফরস্টারের কোনো চাকরি ছিল না।[১] সম্ভবত ঐ সব সময়ে ফরস্টার ব্যবসাতে জড়িত ছিলেন। তাঁর এই বেকারত্বের সময়েই দেখা যায়, তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ইংরেজি-বাংলা অভিধানের দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৭৯৩ সালে বিধিবদ্ধ 'কর্নওয়ালিস কোড' ও পরবর্তীকালের আরো অনেক সরকারী আইনের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেও তিনি বাংলা ভাষা চর্চায় নিজ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রেখে গেছেন। জীবনের শেষ ভাগে ফরস্টারকে অনেক দুঃখ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। ১৯ মার্চ, ১৮১১ তারিখের 'মিরর' ('*Mirror*') পত্রিকায় এর উল্লেখ আছে। কলকাতা টাঁকশালে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তহবিল তছরূপের দায়ে তিনি অভিযুক্ত হন ও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হেনরী রাসেল কর্তৃক একশত টাকা জরিমানা সহ ছয়মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।[২] ১৮ই মার্চ, ১৮১১ তারিখে স্যার হেনরি রাসেল রায়-দান প্রসঙ্গে বলেন : 'You have been found guilty of a breach of trust and duty, as servant of the East India Company, which by a statute passed in the 33rd of his present Majesty, is declared to be a misdemeanour at Law, and to be punishable as such···in your office, the money was not to rest for a day : it was your duty to make it and to send it to the Treasury every night ; the mere retaining of the funds though they were not made use of was a breach of duty ;···notwithstanding that you were liberally paid, you kept back the money for your own advantage, which is a breach of trust that calls for the heaviest punishment, and that is a heavy fine, a long imprisonment, and dismission from the service ; but it would be a painful duty to the court to inflict such a punishment on a man of your age, and I fear of your fallen condition,···You have already been dismissed from your office ; that of itself is a servere punishment. You have restored all the money, with interest upto the day on which it was paid ; thus making all the atonement for the offence that it was in your power to make, and the public have not enventually suffered any loss. Besides this, the Jury have said that you did not intend to defraud the Company—may warrant the mild sentence that we are about to pass ; which is that you pay a fine of 100 Rs. to the king, that

---

১ S. K. De, *op. cit.*

২ সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস', পৃ. ৪০

you be imprisoned for six calendar months in the Common Jail of Calcutta ; and that you be further imprisoned, till your fine be paid'.

ফরস্টারের মৃত্যুর পর তাঁর অভিধানের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর প্রথম খণ্ড ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল, মুদ্রণস্থল 70 Cossitollah Street ; এতে বাংলা শব্দগুলি রোমান অক্ষরে ছাপা।[১]

পত্রপত্রিকার ধারা

আলোচ্য সূচনা পর্বে বাংলা মুদ্রণের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার মূলে সমসাময়িককালের পত্রপত্রিকারও যে কিছুটা অবদান ছিল সে কথা অনস্বীকার্য। অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে প্রকাশিত ঐ সব পত্রপত্রিকাগুলি ছিল সবই ইংরেজি ; বাংলা পত্রিকা প্রকাশন তখনো শুরু হয়নি। কিন্তু তখনকার ইংরেজি পত্রিকাগুলিতে প্রায়ই বাংলা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হত। বাংলা হরফে ছাপা ঐ সব বাংলা বিজ্ঞপ্তিগুলির মধ্য দিয়ে বাংলা মুদ্রণের এক বিশিষ্ট ধারা গড়ে উঠেছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিদেশী শাসকের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্য বাংলা মুদ্রণের প্রবর্তন হয়েছিল। সাধারণত কোম্পানীর প্রশাসনিক স্বার্থে বা সরকারী আইনকানুন ও আদেশাবলী জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচারের উদ্দেশ্যে, অথবা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে এইসব বাংলা বিজ্ঞাপন মুদ্রণ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা হত। বাংলা অক্ষরে বাংলা বিজ্ঞপ্তি ছাপার প্রয়োজন ও চাহিদা থাকায় স্বভাবতই তদানীন্তন কালের পত্রপত্রিকার পরিচালকবৃন্দ এ বিষয়ে সজাগ হতেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলা মুদ্রণের স্বয়ংসম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকতেন। এর ফলে অনেক পত্রিকারই বাংলা ছাপার হরফ নির্মাণের নিজস্ব আয়োজন বা প্রয়োজন মতো এর নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা মুদ্রণ ও মুদ্রাক্ষর সাজানোর (composing) কাজে দক্ষ কর্মীও তাঁরা নিয়োগ করতেন। এইভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে কিছু কিছু পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি স্বয়ংনির্ভর বিশিষ্ট বাংলা মুদ্রণ পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। 'ক্যালকাটা গেজেট' ও 'ক্যালক্যাটা ক্রনিকল' ছিল সমসাময়িককালের এইরূপ দুটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা।

আধা-সরকারী ইংরেজি সাপ্তাহিক ক্যালাকাটা গেজেট ('*The Calcutta Gazette or Oriental Advertiser*') প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মার্চ। কলকাতায় ৩৭ নং লারকিন্স লেনে ছিল এদের ছাপাখানা। ফ্রান্সিস গ্লাডউইন ছিলেন ক্যালকাটা গেজেটের স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের অনুমোদন ও অধিকার বলে তিনি এটি প্রকাশ করেন। পত্রিকার শুরুতেই ছাপা এইরূপ একটি ঘোষণায় বলা হয় : 'The Hon. The Governor General and Council, having

১ K. S. Diehl, '*Early Indian Imprints*', p. 192.

permitted Mr. Francis Gladwin to publish a Gazette under their sanction and authority ; The Heads of offices are hereby required to issue all such Advertisements or Publications as may be ordered on the part of the Hon. Company through the channel of his paper.

Fort William, W. Bruere,
February 9, 1784. Sec.'[১]

এই সরকারী ঘোষণা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হলেও 'ক্যালকাটা গেজেট' সরকারী পত্রিকার মর্যাদা পেয়েছিল। জনসাধারণের উদ্দেশে কোম্পানীর যাবতীয় বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশাদি এই পত্রিকার মারফত প্রচারিত হত। সরকারী মর্যাদা সম্পন্ন আধা-সরকারী পত্রিকা হিসাবে ক্যালকাটা গেজেট ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল এবং ঐ সময় পর্যন্ত সরকারী মুদ্রণের যাবতীয় কাজ ঐ পত্রিকার ছাপাখানাতেই সম্পন্ন হত। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দের ২রা মে তারিখ থেকে সরকারী মুদ্রণের কাজ কলকাতায় Military Orphan Society-র ছাপাখানায় স্থানান্তরিত হয় এবং স্বল্পকাল মধ্যেই উক্ত ছাপাখানা থেকে '*The Government Gazette*' নামে একটি সরকারী সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশন শুরু হয়। এর পরেও অবশ্য ক্যালকাটা গেজেট চালু ছিল, কিন্তু তখন আর এটির সরকারী প্রকাশনার মর্যাদা ছিল না।

প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুকাল পরেই ক্যালকাটা গেজেট ছাপাখানার মালিকানা হস্তান্তরিত হয়েছিল বলে শোনা যায়। ১৭৮৬ সালের শেষে বা ১৭৮৭ সালের গোড়ায় ফ্রান্সিস গ্লাডউইনের ঐ ছাপাখানাটি Morris Harrington ও Mair কিনে নেন বলে শোনা যায়।[২] প্রথম বছরের কয়েকটি সংখ্যা থেকে জানা যায়, Daniel Stuart ছিলেন ক্যালকাটা গেজেটের মুদ্রাকর।[৩] জনৈক Mr. Jones পত্রিকার অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন বলে জানা যায়।

প্রথম বছর থেকেই ক্যালকাটা গেজেটের বিভিন্ন সংখ্যায় বাংলা হরফে ছাপা বাংলা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতে থাকে। জনসাধারণের উদ্দেশে প্রচারিত সরকারী বিজ্ঞপ্তি বা নির্দেশাদি, রাস্তাঘাট বা বাড়ি নির্মাণের 'টেণ্ডার' আহ্বান, সম্পত্তি কেনা-বেচা ও নীলামের বিজ্ঞাপন, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিধিনিষেধ বা সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি, ইত্যাদি বিষয়ে বাংলায় ছাপার নিদর্শন ক্যালকাটা গেজেটের বিভিন্ন সংখ্যায় ছড়িয়ে আছে। পত্রিকাটির নিজস্ব ছাপাখানায় ও নিজেদের তৈরি বাংলা মুদ্রাক্ষরে এইসব বিজ্ঞপ্তি ছাপা হত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ক্যালকাটা গেজেটই প্রথম সাময়িকপত্র যেখানে সঞ্চালনযোগ্য বাংলা

১ *Calcutta Gazette*, 11 March, 1784 (Vol. I, No. 2), p. 1.

২ মুহম্মদ সিদ্দিক খান, 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা', পৃ. ২১

৩ *Calcutta Gazette*, Vol. II, No. 32, 7th Oct. 1784.

মুদ্রাক্ষরে ছাপার নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই হিসাবে এই পত্রিকাটি এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

ক্যালকাটা গেজেটের চতুর্থ সংখ্যায় (Vol. I, No. 4) মার্চ ২৫, ১৭৮৪ তারিখে (এবং এই সংখ্যার supplement বা অতিরিক্ত সংযোজনে) প্রথম বাংলা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই এইরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হত। পত্রিকাটির প্রথম বছরে প্রকাশিত বাংলা বিজ্ঞপ্তির হিসাব নিলে দেখা যায় যে, ঐ বছরে অর্থাৎ ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত মোট ৪৪টি সংখ্যায় ও তাদের কয়েকটি অতিরিক্ত সংযোজনে (supplement) মোট ২৮টি বাংলা বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়েছে। মূলত প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে প্রচারিত এইসব বাংলা বিজ্ঞপ্তির মধ্য দিয়ে বাংলা মুদ্রণের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে উঠেছে। বাংলা গদ্যের মুদ্রিত রূপের সন্ধানও প্রথম এগুলির মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। দৈনন্দিন ব্যবহারিক কাজে গদ্যের প্রয়োগ এবং তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ— বাঙালী পাঠকের কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। বাংলা মুদ্রণ ও ছাপার অক্ষরে বাংলা গদ্য— একই সঙ্গে এই উভয়বিধ নতুনত্বের আস্বাদনে অষ্টাদশ শতকের স্তিমিতপ্রায় বুদ্ধিজীবী বাঙালী মননে চিন্তায় নবীন উৎসাহের জোয়ার এসেছিল।

ক্যালকাটা গেজেটে (২৫শে মার্চ, ১৭৮৪ : ভল্যুম ১, সংখ্যা ৪ : পৃষ্ঠা ৫) প্রথম যে বাংলা মুদ্রণের নিদর্শনটি পাওয়া যায় তা একটি নীলামের বিজ্ঞপ্তি। অর্ধ পৃষ্ঠাব্যাপী এক কলামে ছাপা এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে আলিপুর ও রিষড়ায় অবস্থিত 'শ্রীযুত গবনর জানরেল মেস্তর হিষ্টিন সাহেবের ঘর সকল ও বাগাত ও জমিন…' ইত্যাদি 'নিলাম হইবেক।' ঐ একই তারিখের (২৫শে মার্চ, ১৭৮৪) *Calcutta Gazette, supplement*-এ এক পৃষ্ঠাব্যাপী দুই কলামে ছাপা আরেকটি বাংলা বিজ্ঞাপনে কলকাতায় একটি Agency House পত্তনের খবর প্রকাশিত হয়। ভাষার নমুনা হিসাবে এই বিজ্ঞাপনের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল : '…জানাইতেছি মোকাম কলিকাতা লুলুপবংসালের রাস্তার পূর্বধার পুরানা কুটীরনজদিগ নত্তন এক আপিষ প্রকাষ কথক দিন হইয়াছে ইহার নাম এজেনশী আপিষ বাঙ্গলামানে আড়তের কারবারের দপ্তরখানা এই দপ্তরখানার মারফতে হরেক রকমের কারবার জে হইবেক তাহার রকম ওয়ারি নিচে মালুম হইবেক…'— এর পরে উক্ত দপ্তরখানা মারফত করা হবে এমন '১১ দফে' কাজের বিবরণী দেওয়া হয়েছে। বাংলাভাষায় স্বল্পজ্ঞান-বিদেশীর প্রাথমিক আড়ষ্টতা এইসব বাংলা গদ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। যতিচিহ্নের ব্যবহার তখনো শুরু হয়নি, বাংলা ভাষার নিজস্ব বাক্যগঠনরীতিও এখানে অনুসৃত হয়নি। বিদেশী শব্দের অবাধ অনুপ্রবেশে এর ভাষাও দুর্বল। কিন্তু এর ছাপা ঝরঝরে ও প্রশংসনীয়। Composing বা অক্ষর সাজানোর রীতি প্রায় নিখুঁত। অক্ষরগুলি মোটামুটি সুষম ও সুবিন্যস্ত। কেবল মাঝে মাঝে মাত্রামিলের অভাব, অর্থাৎ কয়েকটি শব্দের অক্ষর সামান্য উঁচুনিচু দেখা যায়। হালহেডের ব্যাকরণের আদর্শকে অতিক্রম করে সম্পূর্ণ নতুন এক সাট

বাংলা হরফ ক্যালকাটা গেজেটের এইসব বাংলা ছাপার কাজের জন্ম তৈরি করা হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত ছোটো আকারের এই বাংলা মুদ্রাক্ষরগুলির অধিকাংশই ছিল আধুনিক ধাঁচের, কিছু অবশ্য প্রাচীন পুঁথির হস্তাক্ষরের অনুরূপ।

ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত আরো কয়েকটি বাংলা বিজ্ঞপ্তি এখানে উদ্ধৃত হল :

(১) 'সকল লোককে খবর দেয়া জাইতেছে ২২ মাহ আপরিল সন ১৭৮৪ সাল ইংরেজি শ্রীযুত গবনর জেনরল সাহেবের বাটী সকল ও বাগিচান ও জমিন ও গয়রহ লিলামে বিক্র হবেক' (April 15, 1784, p. 4.)

(২) 'পান্ধা নিমকের সওদা এই নয়া আপিসে হইবেক জাহার জত দরকার হয় এই আপিসে আসিয়া সওদা করহ এই আপিসের নাম এজেনসী আপিস জানিবে তোমার দিগে জানাবার কারণ লিখিলাম আপিসের ঠীকানা স্লুপবসালের পূর্ব লাল দিগির পশ্চীম—' (April 29, 1784, p. 6.)

(৩) 'সকলকে জানাইতেছি মোকাম দক্ষিণেশ্বরে অনাথা গোরা লোকের দিগের কারন এক বাটী নয়া বানাইতে হইবেক…'—এই জন্ম এখানে 'কানট্রাকট' আহ্বান করা হইয়াছে। (May 13, 1784, Supp.)

(৪) বাংলাদেশের সঙ্গে তিব্বতের ব্যবসায়-সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব বিষয়ক : 'গবনর জেনরেল ও কৌসলের মনস্ত ছিল যে বাঙ্গলা মুলুক হইতে তেব্বত মুলুকে তেজারতের দফা জাতায়াত হয় এখন মারফত মেং সেমিএল টরনর রাজা টেস্‌লম্বু সহিত কওল করার এমত হইল যে কেহো এ মুলুক হইতে কম্পানির তরফে তেজারতের মনস্থতে মাল ও জিনিষ লইয়া তেব্বতে যাইবেক রাজামকুর মদত ও নিগাবানি করিয়া ভোটান্ত হইতে পহচাইবেক সেখাঁনে ভালস্থানে কিম্বা কনিসাতে জায়গা দিবেকএই কারণ খবর দেয়া যাইতেছে যে কেহো এই কর্ম্মের মনস্ত রাখ তেজারতের মাল সম্বলিত এ মুলুক হইতে তেব্বতে জাবার তবে গবনর জেনরেল ও কৌসল মহাজনের প্রথম বারকার জিনিষের মহসুল মাফ করিবেন কিন্তু তাহারা করার নামা সাহিদি সমেত দাখিল করিবেক আর এ তেজারতের ভাল গতিক এই যে কেহো মনস্ত রাখ পহিলা মাহ ফিবরিলেতে রঙ্গপুর মোকামে জমা হইয়া গবনর জেনরেল স্থানে দস্তক রাহাদারি চাহিবেক তখন ইহার খবর রাজা মজকুরকে পহচাইয়া দস্তক রাহাদারি আনাইয়া দিবেন পরে রঙ্গপুর হইতে মার্চ মাহাতে প্রস্থান করিবেক পহিলা এপরিল বসন্ত সময় তেব্বতের সরহদ্দে পহচিয়া সেই মাসেই টেসলম্বুতে পহচিবেক সেখানে পহচিয়া বরসাকাল পর্য্যন্ত আপন তেজারত করিবেক সেতম্বর মাহাতে সে মুলুক হইতে প্রস্থান করিবেক ইহাতে কোন দফায় বরসাকালের ও সিতের ব্যামহ পাইবেনা এই কারণ সকল মহাজন লোককে উপজুক্ত হয় জে আপনাদিগের স্থওু বন্দি করিয়া রঙ্গপুর হইতে প্রস্থান করেন কিন্তু স্থওবন্দি করিবার কর্ত্তত্তি উহার দিগের পর থাকিল ইতি…' (May 20, 1784, Supp.)

(৫) Commissioners of Police-এর বিজ্ঞপ্তি : নির্ধারিত তিন মাস সময়ের মধ্যে Tax remission-এর জন্য আবেদন করলে বিবেচনা করা হবে, ইত্যাদি জানিয়ে— 'রাস্তাবন্দীর কমিসন সাহেবেরা সকল লোককে জ্ঞাতো কারণ খবর দেন জদী কেহ টেক্‌সের কোন বাবুদীর রেয়াত কারণ আরজী দেন তাহার যে কারনের নিমিত্তে আরজী দিবেন সেই কারনের তিন মাসের মধ্যে আরজী দেন এবং টেক্‌সের কমিটের সাহেবের রসিদ দেখাবেন যে তাহার উপর টেক্‌সের বাবদী দাওয়ানাই তবে সাহেবেরা আরজী লইবেন এবং আরজী বিমজীম তর্জবিজ করিয়া জদি টেক্‌সের টাকা ফিরিয়া দিতে হয়ে তাহা ফিরিয়া দেয়াবেন কিম্বা যে বিহিত হয়ে তাহা করিবেন।' (Aug. 19, 1784 p. 6)

(৬) টাকসালের কাজে সরকারী ক্ষতির বিষয়ে : 'শ্রীযুত গবনর জেনরেল সাহেব ও শ্রীযুত কৌশলি সাহেবেরা জ্ঞাতা হইলেন যে টাকশালের কার্য্যে গত পাচ বৎসরের প্রতি বৎসর সিক্‌কা টাকা প্রস্তুত করনে কম্পানীর ক্ষেতি হইতেছে—...' ইত্যাদি। (September 9, 1784. p. 6.)

ক্যালকাটা গেজেট-এর পর অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে প্রকাশিত আরো একটি ইংরেজি পত্রিকার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যেটি বাংলা মুদ্রণের ধারাকে পরিপুষ্ট করে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এটি ছিল ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক *Calcutta Chronicle*। মাঝে মাঝেই এতে বাংলা অক্ষরে ছাপা বাংলা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হত।

কলকাতার ৮নং লালবাজারে ছিল এই পত্রিকার ছাপাখানা, পরে ১২ মার্চ, ১৭৯৩ থেকে তা চিৎপুর রোডে স্থানান্তরিত হয়। এর মালিকানাও বহুবার হস্তান্তরিত হয়েছে। Wm. Baillie, Blechynden, Upjohn প্রভৃতি এর একাধিক মালিকের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। আপজন ছিলেন এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও মুদ্রাকর এবং এর এক-ষষ্ঠাংশ সম্পত্তির মালিক। মূলত তাঁরই উদ্যোগে ক্যালকাটা ক্রনিকলে বাংলা মুদ্রণের প্রবর্তন হয়। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকাশন সংস্থা গড়ে উঠেছিল। তাদের নিজস্ব ছাপাখানা, হরফ নির্মাণের কারখানা, বই বিক্রয় কেন্দ্র প্রভৃতি সবই ছিল। Chronicle Press বা Chronicle Office নামে পরিচিত এই সংস্থার পক্ষ থেকে যে কেবল *Calcutta Chronicle* পত্রিকাই প্রকাশিত হত তা নয়, তাঁরা অনেক বইয়েরও প্রকাশক ছিলেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা-ইংরেজি অভিধান। আপজনের উদ্যোগে এর মুদ্রণ শুরু হয় এবং এই 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' সম্বন্ধে বাংলায় ছাপা বিজ্ঞপ্তি *Calcutta Chronicle* পত্রিকায় প্রায়ই প্রকাশিত হত। এইসব বিজ্ঞপ্তির কথা, বিশেষ করে ২০ মার্চ ১৭৯২ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম বিজ্ঞপ্তির কথা উক্ত অভিধানটির বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, *Calcutta Chronicle*-এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত এইসব বাংলা বিজ্ঞাপন

Chronicle Office-এর নিজস্ব হরফ ঢালাইখানায় তৈরি বাংলা মুদ্রাক্ষরের সাহায্যে ছাপা হত। এই বাংলা ছাপার হরফগুলি ছিল একই সাটের এবং ঐ একই সাটের হরফে তাদের বাংলা-ইংরেজি অভিধানটিও ছাপা। Chronicle Press-এর বাংলা হরফগুলি ছিল স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, *Calcutta Gazette*-এর মুদ্রাক্ষর থেকে তা ভিন্ন ধাঁচের, আকারেও কিছুটা বড়ো। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে করা হল [দ্র. সূচনা পর্ব : দ্বিতীয় অধ্যায়।]

মূলত নানাবিধ বাংলা বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মধ্য দিয়েই ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকায় বাংলা মুদ্রণের ধারাটি চালু ছিল। পূর্বোক্ত বাংলা অভিধান সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন ছাড়া অপর একটি বিশিষ্ট বাংলা বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করে পত্রপত্রিকায় বাংলা মুদ্রণধারা প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ করা যেতে পারে। এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল ৬ই জানুয়ারি ১৭৯৪ তারিখের *Calcutta Chronicle* পত্রিকায়।[১] সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে নীলামে বিক্রয়ের জন্য একটি সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ প্রসঙ্গে প্রচারিত দেড় কলমব্যাপী এই বাংলা বিজ্ঞাপনে তৎকালীন প্রচলিত বাংলা গদ্য ও বাংলা মুদ্রণ বৈশিষ্ট্য— উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যাবে। আলোচ্য বাংলা বিজ্ঞাপন অংশের প্রতিলিপি (photostat copy) এখানে সংযোজিত হল। ইতিপূর্বে বাংলা মুদ্রণের এই নিদর্শন আর কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আলোচ্য বিজ্ঞাপনটি আরো একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। মূল ইংরেজি বিজ্ঞাপন ও তার বাংলা অনুবাদ এখানে পাশাপাশি ছাপা আছে। ফলে এর মাধ্যমে সমকালীন বাংলা গদ্যানুবাদের মান সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া সম্ভব। তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার্থে তাই বিজ্ঞাপনের ইংরেজি ও বাংলা দুটি অংশই নীচে উদ্ধৃত হল :

'In the Supreme Court of Judicature, at Fort William in Bengal, RAMSAY HANNAH, against HEERA SING & JUGGUL MONAH.

In pursuance of an Order, to me directed, bearing date the 1st day of March, 1793, I do hereby give Notice, that I will set up to SALE the undermentioned Premises, and give attendance to Bidders for the same, at my office, on Mondays, Wednesdays and Fridays, between the hours of Eleven and One in the forenoon. The Lots may be bid for separately, or together.

The Premises are situated in Barrah Bazar, within two Biggahs and four Cottahs of Ground, bounded on the North by the house of Rada Kissen Baboo, on the South by the public road, on the East by the Great Bazar, and on the West by the public road, and the said bazar.

---

১ পত্রিকার এই সংখ্যাটি কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে।

The Lots are as follows :

Nos. 1 Three upper Roomed Pucka House,
2 Seven Pucka Godowns,
3 Five Straw Houses,
4 Nine Pucka Godowns,
5 Eight shops, Mat and Tile,
6 Ten ditto, ditto, and ditto.
7 & 8 Two straw Houses,
9 Twelve shops, Mat and Tile,
10 Thirtynine ditto, ditto, and ditto,
11 Seven ditto, ditto, and ditto,
12 Eight ditto, ditto, and ditto,
13 Fifteen ditto, ditto, and ditto,
14 Twentysix ditto, ditto and ditto,
15 Twelve ditto, ditto and ditto,
16 Two ditto pucka, two rooms in each,
17 Nineteen ditto, Mat, and tile,
18 Thirtyseven ditto, ditto, and ditto,
19 Twentyfour pieces of Ground, occupied by Shopkeepers, no Houses thereon,
20 Twenty shops, Pucka, two Rooms in each.

Given under my Hand, this First day of January, 1794.

F. MACNAGHTEN'.

উপরোক্ত ইংরেজি বিজ্ঞাপনের পরেই আছে নিম্নোদ্ধৃত বাংলা বিজ্ঞাপনটি [বাংলা অক্ষরের আধুনিক ধাঁচে এটি এখানে ছাপা হল, কিছু কিছু কৌতূহলোদ্দীপক সমকালীন মূল অক্ষর সংযোজিত প্রতিলিপিটিতে দেখা যাবে] :

'সুবে বাঙ্গালা ফোর্ত্ত উলেম সুপিরিম কোর্ট
আদালতে কৈং রামজিহানা-বনাম হিরাসিং
ও জুগল মান্না

সন ১৭৯৩ সালের ১ মরচ এক হুকুম আমার নামে জারি হয় সে হুকুম বিমরজিম আমি ইস্তাহার দিতেছি জে প্রিতি সমবার ও বুধবার ও সুক্রবার এগারো ঘড়ি নাগাদ দুই প্রহর এক ঘড়ি আমি আপনার আপিসে তপছিল জয়নে জে সকল জায়েনা লেখা আছে বিক্রিতে

খাজ্না করিবো এবং খরিদারদিগের কাছে রুজু থাকিবো জাহার জতো লাটের দরকার থাকে কিম্বত করিবেক এই জায়েগা বড়ো বাজারে একুনে জমি দুই বিগে চারি কাটা ইহার সরহদ্দ উত্তরে রাধাকৃষ্ণ বাবুর বাটি দক্ষিণে সদর রাস্তা পুর্ব্বে বড় বাজার পশ্চিমে সদর রাস্তা ও বাজার মঞ্জুকুর

জায়লাটবন্দি—

নং ১ ৩ তিনপাকাবালাখানা
২ ৭ সাত পাকা গুদাম
৩ ৫ পাচ খড়োঘর
৪ ৯ নয় পাকা গুদাম
৫ ৮ আট দোকান চাচের ও খাপরেল
৬ দস দফে দফে
৭ ২ দুই খড়োঘর
৮ বারো দোকান চাচের ও খাপরেল
৯ ২৯ উনত্রিস চাচের ও খাপরেল
১০ ৭ সাত দফে
১১ ৮ আট দফে
১২ পোনর দফে
১৩ ২৬ ছাবিস দফে
১৪ বারো দফে
১৫ দস দফে ফি ঘরে এক পাকা কুটরি
১৬ উনিশ দফে চাচের ও খাপরেল
১৭ ৩৭ সাইতিস দফে দফে
১৮ ২৪ চবিস কিতা জমি দোকানদার দিগরের দখলে কিন্তু তাহাতে ঘর নাই
১৯ কুজি দোকান পাকা ফি দোকানে দুই দুই কুটরি

দস্তখত ১ পইলে জানের ১৭৯৪ সাল

ফঃ মেকলাটন'

সমসাময়িককালে বাংলাদেশে প্রচলিত বহু আরবী ফারসী শব্দের সংমিশ্রণ এই বাংলা অনুবাদে ঘটেছে। এখানে ছেদচিহ্নের ব্যবহার নেই। এর কিছু কিছু হরফের বিচিত্র গঠন সম্বন্ধে প্রসঙ্গান্তরে [সূচনা পর্ব : দ্বিতীয় অধ্যায়] আলোচনা করা হল।

চতুর্মুখী ধারার ব্যতিক্রম : বাংলায় মুদ্রিত প্রথম সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ

অষ্টাদশ শতকের যে চতুর্মুখী বাংলা মুদ্রণধারার আলোচনা করা হল, তার আওতার বাইরে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসাবে একটিমাত্র মুদ্রিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। কোম্পানীর প্রশাসনিক স্বার্থে আইনের অনুবাদ বা ব্যাকরণ, অভিধান বা নীলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি ছাপাতেই যে বাংলা মুদ্রণ প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল, এই প্রথম তার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে একটি বিশুদ্ধ সাহিত্য প্রয়াস বাংলা মুদ্রাক্ষরে রূপায়িত হল। দুটি কারণে এই বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, আলোচ্য সূচনা পর্বে এটিই একমাত্র মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ; দ্বিতীয়ত, এটিই বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ। এর আগে ছাপার অক্ষরে কোনো সংস্কৃত বই প্রকাশিত হয়নি। তা ছাড়া প্রথম সংস্কৃত বই যে বাংলা অক্ষরে ছাপার সূত্রপাত হয়, দীর্ঘকাল সেই রীতিই চালু থাকে। নাগরী অক্ষরে সংস্কৃত বই ছাপা চালু হয়েছে অনেক পরে, তা সংখ্যায়ও অল্প। সুতরাং অষ্টাদশ শতকে বাংলা অক্ষরে ছাপা ঐ প্রথম সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি মহৎ ঐতিহ্যের সূত্রপাত। বাংলা মুদ্রণের সূচনা পর্বের এটি পরম গৌরবের বিষয়। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এই ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃত গ্রন্থটি ছিল কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্য। এর আখ্যাপত্রটি ছিল ইংরেজিতে, তাতে লেখা :

'THE/ SEASONS : /A/DESCRIPTIVE POEM, /BY/CÁLIDÁS, /IN THE/ORIGINAL SANSCRIT. /CALCUTTA : /M. DCC. XCII.'

প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ উইলিয়ম জোন্স ও তাঁর সহযোগীদের উদ্যোগে তখন প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যানুসন্ধান শুরু হয়েছে। ভারতাত্মা ও তার বাণীর আস্বাদন লাভের উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় মনীষা সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই আকর্ষণ থেকেই সংস্কৃত ভাষা চর্চার সূত্রপাত। শ্রীমদ্‌ভাগবতের তত্ত্বানুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কালিদাসের কাব্যরসাস্বাদনেও তাঁদের সমান আগ্রহ। যে দুর্লভ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য পুঁথির ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ছাপার অক্ষরের উদার বিস্তৃত প্রাঙ্গনে তাকে সাদরে প্রতিষ্ঠিত করে রসলোকের স্বর্ণদ্বার জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করে দিতে তাঁরাই প্রথম উদ্যোগী হন। এই উদ্যোগের প্রথম ফসল কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্য প্রকাশন। বিদেশীদের পক্ষে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পর পাঠাভ্যাসের জন্যও এই গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম হবে বলে এর প্রকাশকেরা মনে করেছিলেন। এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ক্যালকাটা গেজেট-এর যে নিজস্ব ছাপাখানা ছিল, সেখানে বাংলা ছাপার সম্পূর্ণ আয়োজন ছিল। নিজেদের তৈরি বাংলা হরফের সাহায্যে ক্যালকাটা গেজেটে তখন বাংলা বিজ্ঞপ্তি ছাপা শুরু হয়ে গেছে। ক্রমে ঐ প্রেসে বাংলা বই ছাপাও শুরু হয়। বাংলায় ছাপা কালিদাসের এই সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থই তাঁদের প্রকাশিত প্রথম বাংলা বই। উইলিয়ম জোন্সের উদ্যোগে ও সম্পাদনায় এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশ উপলক্ষে ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখের ক্যালকাটা

গেজেট পত্রিকায় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। বইটির আখ্যাপত্রে উল্লিখিত না থাকলেও, এই বিজ্ঞপ্তি থেকেই জানা যায় যে, এটি ক্যালকাটা গেজেট অফিস থেকে প্রকাশিত, মূল্য দশ টাকা :

'Just published at the Calcutta Gazette Office, price ten Rupees—The Seasons, a descriptive Poem by Cālidās, in the original Sanscrit.'[১] বইটির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে এই বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয় : 'This book is the first ever printed in Sanscrit ; and it is by the press above, that the ancient literature of India can long be preserved ; a learner of that most interesting language, who had carefully perused one of the popular grammers, could hardly begin his course of study with an easier or more elegant work than the Ritusanhāra, or Assemblage of Seasons. Every line composed by Cālidās is exquisitely polished, and every couplet in the following poem exhibits an Indian landscape, always beautiful, sometimes highly coloured, but never beyond nature ; four copies of it have been diligently collated ; and, where they differed, the clearest and most natural reading has constantly had the preference.'[২] ক্যালকাটা গেজেট-প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির এই শেষাংশটুকু উক্ত বইয়ের প্রারম্ভেও ছাপা আছে।

জার্মানীর Hannover শহরে এই গ্রন্থের হুবহু প্রতিলিপি পুনর্মুদ্রিত (facsimile reprint) হয়ে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুনর্মুদ্রিত সংস্করণে Herman Kreyenborg কর্তৃক জার্মান ভাষায় লিখিত দশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ভূমিকা ছাপা আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এর এক কপি রক্ষিত আছে। বৃটিশ লাইব্রেরিতেও এই বইটির একটি কপি আছে।

ষোলপেজী ৮" × ৫½" আকারের এই বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৩, শেষ পৃষ্ঠায় কেবল অশুদ্ধ-শুদ্ধ তালিকা দেওয়া আছে। ক্যালকাটা গেজেটে ছাপা বাংলা অক্ষরের সমতুল অক্ষরে এই বইটিও ছাপা। উভয় ক্ষেত্রে একই সাটের অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়। এখানেও অক্ষরগুলির উচ্চতা (type-height) ৩·৫ মি. মি., তবে এদের সম্মুখস্থ অংশ (face) কিছুটা মোটা ধরনের। যুক্তাক্ষর বা অন্যান্য অক্ষরের বৈশিষ্ট্য উভয়েই এক। প্রসঙ্গান্তরে এ বিষয়ে আরো আলোচনা করা হল। [সূচনা পর্ব : দ্বিতীয় অধ্যায়] এর মুদ্রণ পারিপাট্যের প্রশংসা করে '*The East Indian Chronologist*' (1801) গ্রন্থে

১ W. S. Seton-Karr, '*Selections from Calcutta Gazettes*', Vol. II, p. 535.

২ *Ibid.*

বলা হয়েছে যে এটি 'executed in such a manner as to reflect great credit on the printer.'[১] বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদি ইতিহাসে এটি একটি দুর্লভ নিদর্শন।

আলোচ্য বইটির প্রতি পৃষ্ঠায় ৯টি করে পঙ্‌ক্তি আছে। পরিষ্কার অক্ষরে ছাপা পঙ্‌ক্তিগুলি ফাঁক ফাঁক করে সাজানো। একই পঙ্‌ক্তিতে কিছু কিছু অসম অক্ষরের সমাবেশ ও পঙ্‌ক্তিগুলির সামান্য উঁচু নিচু বঙ্কিম গতি দেখা যায়।

কালিদাস তাঁর এই কাব্যে ছয়টি ঋতুর বর্ণনা দিয়েছেন। ঋতু বর্ণনাগুলির সমাপ্তি এইভাবে আছে : ইতি কালিদাসকৃতা ঋতুসংহারে কাব্যে গ্রীষ্ম বর্ণনা সমাপ্তা।...ইতি কালিদাসকৃতা ঋতুসংহারে বর্ষা বর্ণনা সমাপ্তা।...ইতি কালিদাসকৃতা ঋতুসংহারে শরদ্বর্ণনা। ...ইতি কালিদাসকৃতা ঋতুসংহারে হেমন্ত বর্ণনা।...ইতি কালিদাসকৃতা ঋতুসংহারে শিশির বর্ণনা।...ইতি কালিদাসকৃতা ঋতুসংহারে বসন্ত বর্ণনা সমাপ্তা।

বইটির ৬০-৬১ পৃষ্ঠা থেকে রচনার নমুনা হিসাবে কিছু অংশ উদ্ধৃত হল :

'...আকম্পিতানিহৃদয়ানি মন
স্বিনীনাং বাতৈঃ প্রফুল্লসহকারকৃতাধিবাসৈঃ
উতকূজিতৈঃ পরভৃতস্যমদাকুলস্য শ্রোত্র
প্রৈয়ৈর্মধুকরস্যচগীতশব্দৈঃ। ৩২। রম্য
প্রদোষসময়ঃস্ফুট চন্দ্রভাসঃ পুংস্কোকিল
স্যবিকৃতংপবনঃ সুগন্ধিঃ। মত্তালিযূথবি
রুতং নিশিশীধুপানং সর্ব্বং হিসাধনমিদং
কুসুমায়ুধস্য। ৩৩। নীলাশোকবিকল্পি
তাধরমধুর্মত্তদ্বিরেফস্বনঃ কুন্দাপীড়বিশুদ্ধ
দন্তনিকরঃ প্রোৎফুল্লপদ্মাননঃ। চূতামোদ
সুগন্ধিমন্দপবনঃ শৃঙ্গারদীক্ষাগুরুঃ কল্পান্তং
মদনপ্রিয়োদিশত্তবঃ পুষ্পাগমো মঙ্গলং।
৩৪। ইতি কালিদাসকৃতা ঋতুসংহারে
বসন্তবর্ণনা সমাপ্তা।'

সূচনা পর্বে বাংলা মুদ্রণের বৈশিষ্ট্য : বে'লেবাসের পটভূমি রচনা

বাংলা মুদ্রণের সূচনা পর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন বাংলা বই ও তৎকালীন প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত বাংলা নিদর্শনগুলি সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা করা হল। তবে এই আলোচনা শেষ করার আগে সূচনা পর্বে বাংলা মুদ্রণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করা যেতে পারে। বর্তমান আলোচনা থেকে দেখা যায়, ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত আলোচ্য পর্বে ২২ বছরে অন্তত ১৬টি বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ ছাড়া

অন্তত দুটি ইংরেজি পত্রিকার সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলির বিভিন্ন সংখ্যায় বাংলা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিষয়বস্তুগত শ্রেণীবিন্যাস করলে দেখা যায়, পূর্বোক্ত ১৬টি বাংলা বইয়ের মধ্যে ৩টি ব্যাকরণ— একটি বাংলা ব্যাকরণ এবং অপর দুটি ইংরেজি ব্যাকরণ ও ভাষা শিক্ষার বই, ৯টি আইন অনুবাদ, ৩টি শব্দ-সংগ্রহ ও ১টি সংস্কৃত কাব্য। আর বাকি মুদ্রিত নিদর্শনগুলি ছিল জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে পত্রিকায় প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি— ব্যবসা বাণিজ্য, নীলাম, বিক্রয়, ইত্যাদি বিষয়ক ঘোষণা বা সরকারী নির্দেশাদি প্রচার ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং কালিদাসের কাব্যগ্রন্থটির কথা বাদ দিলে এই পর্বের অবশিষ্ট মুদ্রিত নিদর্শনগুলি সংখ্যায় যেমন স্বল্প, সাহিত্য মর্যাদায় তেমনই নগণ্য। নিঃসন্দেহে এগুলির সাহিত্য-প্রসাদগুণসম্পন্ন রচনার কৌলীন্য নেই, তা খুঁজতে যাওয়ার চেষ্টাও অবান্তর। এর যা মূল্য বা বৈশিষ্ট্য তা ছিল অন্যত্র। প্রথমত, এগুলির অধিকাংশই ছিল বাংলা গদ্যে রচিত। দ্বিতীয়ত, এর রচয়িতাদের সবাই ছিলেন বিদেশী। তৃতীয়ত, এগুলি ছিল মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থে রচিত। ধর্মপ্রচার বা শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে অথবা নিছক সাহিত্য-প্রেরণায় বাংলা রচনার সূত্রপাত হয়েছিল আরো পরে— পরবর্তী শতাব্দীতে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্ব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাধারণত বন্ধ্যা যুগ বলেই পরিচিত। এই বন্ধ্যা যুগের অন্ধকারে কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবু আমাদের ভাষা সাহিত্যের ইতিহাসে এই পর্ব যে ঐতিহাসিক মর্যাদালাভের অধিকারী তা অন্তত দুটি কারণে। এই পর্বেই একাধারে বাংলা মুদ্রণ ও ছাপার অক্ষরে বাংলা গদ্যের জন্মলাভের ফলে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেল। শুরু হল নতুন যুগ, নতুন চেতনার স্পন্দন। আধুনিকতার জন্মলগ্ন ঘোষিত হল মুদ্রণযন্ত্রের ঘর্ষণজনিত আওয়াজ ও বাংলা গদ্যের উচ্চারণধ্বনির মধ্য দিয়ে।

বাংলা মুদ্রণের প্রচলনের ফলেই যে বাংলা গদ্যচর্চার পথ সুগম হয়ে উঠেছিল তা অনস্বীকার্য। জীবনে কাব্যের স্থান অনুভূতিনির্ভর, তাই তার প্রয়োজনের লগ্ন আসে মাঝে মাঝে। প্রাত্যহিকতার তাগিদে নয়, অবসরের ফাঁকে ফাঁকে চলে কাব্যচর্চা আর এই কাব্য মূলত স্মৃতিনির্ভর বলে কবি ও পাঠকের কণ্ঠ থেকে রসিক শ্রোতার অন্তরে তার স্বচ্ছন্দ প্রবাহ যুগ যুগ ধরে চলেছে। ছাপার অক্ষরে খোদাই করে ঘরে ঘরে জনে জনে তা পৌঁছে দিতে না পারলেও বিস্মৃতির চোরাবালিতে পদ্যের অপমৃত্যু ঘটে না। শ্রোতার মনের মণিকোঠায় অদৃশ্য অক্ষরে পদ্য লেখা থাকে, বেঁচে থাকে। কিন্তু গদ্যের জন্ম প্রাত্যহিক জীবনের নিত্য প্রয়োজনের তাগিদে। দিনে দিনে এই প্রয়োজন যায় বেড়ে, তার প্রকাশের মাধ্যম যে গদ্য তার কলেবরও তাই বেড়ে ওঠে। স্মৃতিতে তখন আর তাকে ধরে রাখা যায় না। অক্ষরের কারাগারে তাকে বাঁধতে হয়। কিন্তু যতই কলেবর বাড়ে ও চাহিদা বাড়ে— লিপিকর হার মানে। মুদ্রণের সাহায্য তখন অপরিহার্য। ছাপার হরফের অক্ষয়

বন্ধনে গদ্যের বিপুল কলেবরকে দ্রুত বেঁধে ফেলা সম্ভব। তখন তাকে ঘরে ঘরে জনে জনে অনায়াসে পৌছে দেওয়া যায়। এইভাবেই গদ্যের প্রয়োজনে মুদ্রণ বা মুদ্রণের সাহায্যে গদ্য প্রসারিত হয়ে এসেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই একই সূত্রে বাংলা মুদ্রণের হাত ধরে বাংলা গদ্য দ্বিধাজড়িত আড়ষ্ট পায়ে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত রাজপথে নেমে এসেছে। এর উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনায় উদ্দীপিত বাঙালী বুদ্ধিজীবীর দল ক্রমে ক্রমে বাংলা গদ্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন এবং পরম স্নেহভরে গদ্যকে তাঁদের ভাষার অন্যতম প্রধান বাহন হিসাবে গ্রহণ করায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে উত্তরোত্তর বাংলা গদ্যের প্রসার ঘটতে থাকে। অষ্টাদশ শতকে মুদ্রিত বাংলা গদ্যগ্রন্থগুলি যতই অকিঞ্চিৎকর হোক্, সেগুলির মাধ্যমে অন্তত এই সত্যটুকু ধরা পড়েছিল যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্রমবর্ধমান পরিসরে গদ্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিহার্য। ব্যবহারিক জীবনের এই প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে এক নতুন গদ্যরীতিও তাই ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। সুতরাং বলা যেতে পারে, অষ্টাদশ শতকের বাংলা মুদ্রণ বাংলা গদ্যের জন্মকে ত্বরান্বিত করে ও তার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের সহায়ক হয়ে বাঙালী জাতির মহৎ উপকার সাধন করেছিল। এর প্রভাবে সাহিত্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগ ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছিল, জ্ঞানের রাজ্যে ছাড়পত্র পেয়ে সাধারণ বাঙালীর চিন্তাকাশ আরো বহুদূর বিস্তারিত হয়েছিল। মুদ্রণের প্রসারের ফলেই জ্ঞানের রাজ্য আভিজাত্যের গণ্ডী ভেঙে নেমে এসেছিল সাধারণ মানুষের সীমানার মধ্যে। আর এইভাবে ধীরে ধীরে বাংলাদেশে রেঁনেশাসের (Renaissance) পটভূমি রচিত হয়েছিল। বাঙালীর এই মহৎ সম্ভাবনার প্রস্তুতি ও পটভূমি রচনা করে অষ্টাদশ শতকের বাংলা মুদ্রণ তাই এক ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত ভূমিকা পালন করেছিল বলা চলে। এখানেই আলোচ্য সূচনা পর্বের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য। এক কথায়, এই পর্ব ছিল অঙ্কুরোদ্গমের যুগ (Period of germination),— বাংলা মুদ্রণ ও বাংলা গদ্যের পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিয়োজিত ও সর্বোপরি বাংলাদেশে উনিশ শতকীয় রেঁনেশাসের পটভূমি রচনায় ব্যস্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অষ্টাদশ শতকে বাংলা ছাপার হরফের বিবর্তন

আগেই উল্লেখ করেছি সঞ্চালনযোগ্য বাংলা মুদ্রাক্ষরের (Bengali movable types) জন্ম ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে। চার্লস উইলকিন্স, পঞ্চানন কর্মকার ও অন্যান্যদের যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই মুদ্রাক্ষরের সাহায্যে প্রথম হালহেডের '*A Grammar of the Bengal Language*' বইয়ের বাংলা অংশগুলি ছাপা হয়। তারপরে কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরো নতুন ছাঁদের নানা সাটের বাংলা মুদ্রাক্ষর তৈরি হয়েছে এবং বিবর্তনের ধারায় বাংলা ছাপার হরফ পরিবর্তন ও ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে গেছে। আনন্দের কথা, জন্মলগ্নের পর থেকে অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানেই নতুন নতুন মুদ্রাক্ষর-শিল্পোদ্যোগ দেখা দিয়েছে এবং অষ্টাদশ শতকের চৌহদ্দিতে বাংলা মুদ্রণের সূচনা পর্বেই বাংলা ছাপার হরফের বিবর্তন ধারা কয়েকটি পর্যায়ে সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে।

হালহেডের বইয়ে ছাপা বাংলা হরফগুলির অধিকাংশই তৎকালীন প্রচলিত হাতে-লেখা পুঁথির অক্ষরের আদর্শে খোদাই করা হয়েছিল। অনেকের মতে, উইলকিন্স-পঞ্চানন হুগলী নিবাসী জনৈক খুসমৎ মুন্সীর হস্তাক্ষর অনুসরণ করে তাঁদের প্রথম বাংলা হরফ খোদাইয়ের কাজে ব্রতী হন।'[১] হস্তাক্ষরের জটিল টান ও বঙ্কিম বিন্যাস অনেক ক্ষেত্রেই ছিল দুরূহ, বিশেষ করে সেগুলি শক্ত ইস্পাতের উপর ছেনি কেটে খোদাই করতে গিয়ে তাঁদের নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। হালহেড তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় এইসব অসুবিধার কথা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন: 'That the Bengal letter is very difficult to be imitated in steel will readily be allowed by every person who shall examine the intricacies of the strokes, the unequal length and size of the characters, and the variety of their positions and combinations. It was no easy task to procure a writer accurate enough to prepare an alphabet of a similar and proportionate body throughout, and with that symmetrical exactness which is necessary to the regularity and neatness of a fount.'[২]

---

১ সুধীরকুমার মিত্র, 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২২

২ N. B. Halhed, '*A Grammar of the Bengal Language*' : Preface.

সুতরাং বাংলা অক্ষরের, বিশেষ করে যুক্তাক্ষরের জটিলতা, বিভিন্নতা ও অসমতা ছাড়াও, উপযুক্ত লিপিকরের অভাবও সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া প্রতি লিপিকরেরই এক-একটি নিজস্ব লেখার টান থাকায় এক-এক পুঁথিতে এক-এক ধরনের হস্তাক্ষর দেখা যেত। ফলে সমস্যা আরো জটিল হয়ে ওঠে। উইলকিন্স-পঞ্চাননের প্রথম কাজই ছিল, এই সমস্ত বিভিন্নতা ও জটিলতার মধ্য থেকে ছাপার কাজের উপযোগী বাংলা বর্ণমালার একটি বিধিবদ্ধ আদর্শান্বিত (standard) সর্বজন-স্বীকৃত নয়ন-শোভন রূপ স্থির করে নেওয়া। বাংলা অক্ষরের সেই বিধিবদ্ধ আদর্শ রূপ (standard form) অনুযায়ী তাঁরা তাঁদের প্রথম বাংলা ছাপার হরফ গড়ে তোলেন। হাতের লেখা অক্ষরের সঙ্গে ছাপার অক্ষরের কিছু পার্থক্য সব সময়েই থাকে। হস্তাক্ষরের রূপ থেকে স্বভাবতই এই প্রথম বাংলা মুদ্রাক্ষরের রূপেরও কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। আবার কয়েকটি বর্ণ বা সংযুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে তাঁরা অবশ্য হস্তাক্ষরের রূপকেই বজায় রাখেন। যেমন, হালহেডের বইয়ে 'কু'— হস্তাক্ষরের ধাঁচে ছাপা। অষ্টাদশ শতকের অন্যান্য প্রকাশনাতেও হস্তাক্ষরের আদর্শে কাটা 'কু'-এর এই জটিল মুদ্রিত রূপটি দেখা যায়। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের যুগে পৌঁছে তা আধুনিক রূপ লাভ করেছে। হস্তাক্ষরের আদর্শে ছাপার হরফ তৈরির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত— 'হ্ন' ['উপহ্নত'] অর্থাৎ 'হ্ন'। [আধুনিক বাংলায় এইরূপে হ + ন-ফলা লেখা হয়।] এই জটিল মুদ্রাক্ষরটির সন্ধান ক্যালকাটা গেজেট প্রেস, কোম্পানী প্রেস, ক্রনিকল প্রেস প্রভৃতি অষ্টাদশ শতকের বিভিন্ন ছাপাখানার নিজস্ব সাটে পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলি ব্যতিক্রম মাত্র। বিবর্তনের ধারায় পরবর্তীকালে তাও রূপান্তরিত হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাংলা ছাপার হরফ হস্তাক্ষরের বাহুল্য ও জটিলতা ত্যাগ করে নিজস্ব আদর্শ রূপ গড়ে তুলেছে।

হস্তাক্ষরের যুগ থেকে ছাপার অক্ষরের আদর্শ রূপে পৌঁছতে এইভাবে বাংলা মুদ্রাক্ষর-শিল্পকে বিবর্তনের কয়েকটি বিশিষ্ট ধাপ অতিক্রম করে এগোতে হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে ছাপা বিভিন্ন বইয়ের একাধিক সাটের বিভিন্ন হরফের বৈশিষ্ট্যের কথা একে একে বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করার আগে ঐ শতকে বাংলা মুদ্রাক্ষরের বিবর্তন ধারার গতি প্রকৃতি বা সাধারণ প্রবণতা এবং তাদের যে কয়টি বিশিষ্ট স্তর দেখা গেছে তার পরিচয় জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

আলোচ্য শতকে বাংলা মুদ্রাক্ষরের বিবর্তন ধারায় দুটি প্রধান প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। প্রথমত হরফের উচ্চতা (type-height) বা আকার ক্রমশ ছোটো করার প্রচেষ্টা দেখা গেছে। অপেক্ষাকৃত কম কাগজে বেশি ছাপার চেষ্টা হয়ত এর প্রধান কারণ। বিদেশ থেকে আমদানী করা দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য কাগজের খরচ (consumption) কমানোর দিকে তখনকার দিনের বিদেশী প্রশাসক ও মুদ্রাকরেরা প্রয়োজনের তাগিদে স্বভাবতই বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তা ছাড়া, বড়ো অক্ষরের মোহ ত্যাগ করে ক্রমশ ছোটো ছোটো

অক্ষর কেটে তৈরি করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে শিল্পগত উৎকর্ষের পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, পুঁথিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন হাতের লেখার বঙ্কিম জটিল টান পরিত্যাগ করে ক্রমশ অপেক্ষাকৃত সরল নয়ন-শোভন বিধিবদ্ধ আদর্শায়িত ছাপার হরফের রূপ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ঐ বিবর্তন ধারায় লক্ষ্য করা গেছে।

মুদ্রাক্ষরের উচ্চতা বা আকার যে তখন ক্রমশ ছোটো করার প্রবণতা ছিল তার প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, হালহেডের ব্যাকরণে (১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দ) ব্যবহৃত বাংলা অক্ষরের উচ্চতা ছিল সাধারণত ৪'৫ মি. মি., ক্যালকাটা গেজেটে (১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দ) এসে তা দাঁড়ায় ৩'৫ মি. মি., কোম্পানীর প্রেসে ছাপা বিভিন্ন বইয়েও, যেমন, জোনাথান ডানকানের আইনানুবাদ দুটিতে (১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দ) তা ৩'৫ মি. মি., এডমনস্টোনের আইনের অনুবাদ-গুলিতেও (১৭৯১/৯২ খ্রীস্টাব্দ) তা ৩'৫ মি. মি.। অবশ্য ক্যালকাটা গেজেট ও কোম্পানীর প্রেসের ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ক্রনিকল প্রেসের আরেকটি ধারায় পরবর্তীকালের হলেও মুদ্রাক্ষরের উচ্চতা আবার বাড়তে দেখা গেছে। সেটি তাদের প্রথম প্রচেষ্টা বলেই হয়ত এমন ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, ক্রনিকল প্রেসে ছাপা বাংলা অভিধানের (১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ) হরফের উচ্চতা সাধারণত ৪'৫ মি. মি., মিলারের 'সিক্ষ্যা গুরু' বইয়ে (১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দ) তা ৪'৫ মি. মি., আবার শতাব্দীর শেষবিন্দুতে পৌঁছে ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপা ফরস্টারের অভিধানেও (১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দ) তা রয়ে গেছে ৪'৫ মি. মি.। এইসব বইয়ে ব্যবহৃত অক্ষরগুলিতে কোনো সুস্পষ্ট বিবর্তনের চিহ্ন ধরা পড়ে না, কারণ একই সাটের হরফ নানা সূত্রে নানা সময়ে এইসব বইয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু যখন দেখা গেছে— একই শিল্পী বা একই প্রতিষ্ঠান বা একই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উদ্যোগে দ্বিতীয়বার অক্ষর কেটে নতুন সাট তৈরির চেষ্টা হয়েছে, তখন তাদের মূল প্রবণতাই ছিল অপেক্ষাকৃত ছোটো আকার বা কম উচ্চতার হরফ তৈরি করা। এবং সেই প্রবণতাই বাংলা মুদ্রাক্ষর-শিল্পকে বিবর্তনের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

অষ্টাদশ শতকে ছাপা বাংলা বই ও ইংরেজি পত্রপত্রিকায় বাংলা মুদ্রণের নিদর্শনগুলি পর্যালোচনা করলে বাংলা মুদ্রণের সূচনা পর্বে বাংলা হরফের অন্তত চারটি বিশিষ্ট স্তর বা ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, হালহেডের ব্যাকরণে ব্যবহৃত হরফের ধারা। দ্বিতীয়ত, ***Calcutta Gazette*** ও Honorable Company's Press-এ ব্যবহৃত হরফের ধারা। তৃতীয়ত, সরকারী ছাপাখানার জন্য পঞ্চানন কর্মকারের তৈরি অপেক্ষাকৃত ছোটো নতুন হরফের ধারা ; 'কর্নওয়ালিস কোডের' বঙ্গানুবাদ ছাপার কাজে এগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল। চতুর্থত, 'ক্রনিকল প্রেস', মিলারের প্রেস ও 'ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস'-এ ব্যবহৃত হরফের ধারা। অষ্টাদশ শতকে মোটামুটি এই চারটি বিভিন্ন ধারায় চারটি স্বতন্ত্র সাটের বাংলা হরফের সন্ধান পাওয়া যায়। সূচনাপর্বে বাংলা ছাপার যাবতীয় নিদর্শন বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এইগুলি পূর্বোক্ত কোনো না কোনো একটি সাটের হরফে ছাপা।

মূলত মুদ্রাক্ষরগুলির উচ্চতা, আকার, ধাঁচ, গঠনবৈশিষ্ট্য, কিছু কিছু স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ-স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন বা যুক্তব্যঞ্জন বর্ণের peculiarity বা অপ্রচলিত অ-সাধারণ টান ইত্যাদি লক্ষণ মিলিয়ে বিভিন্ন সাটের এই শ্রেণীবিন্যাস করা সম্ভব হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওই সময়ের কোনো বইয়েই একসঙ্গে একাধিক সাটের বা একাধিক আকারের হরফ ব্যবহৃত হয়নি। যে-কোনো বইয়ের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, তা আগাগোড়া একই হরফে ছাপা, এমন-কি আখ্যাপত্র ও বইয়ের ভিতরের অংশ— সর্বত্র একই হরফ ব্যবহৃত হয়েছে। তা ছাড়া কোনো মুদ্রণালয়েরই (Press) তখন একাধিক সাটের হরফ থাকত না। তাদের প্রত্যেকেরই সাধারণত একটি নিজস্ব fount বা সাটের হরফ থাকত এবং তার সাহায্যেই তাদের সমুদয় বাংলা ছাপার কাজ চলত। ফলতঃ বাংলা মুদ্রাক্ষরের ধাঁচ দেখেই মুদ্রণালয় বা প্রেসকে চিহ্নিত করা যেত। [শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের যুগে পৌঁছে প্রথম একই বইয়ে একাধিক আকারের হরফ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আখ্যাপত্র বা পরিচ্ছেদের শিরোনামায় ব্যবহৃত হরফ বইয়ের ভিতরের অন্য অংশে ব্যবহৃত হরফের চেয়ে বড়ো হতে দেখা যায়।]

পূর্বোক্ত চারটি সাটের বাংলা হরফ ছাড়াও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আরো একটি type-foundry বা হরফ ঢালাইখানায়, সম্ভবত পঞ্চানন কর্মকারের উদ্যোগে ১৭৯৭/৯৮ সালে, অপেক্ষাকৃত ছোটো আকারের নতুন সাটের বাংলা মুদ্রাক্ষর কাটা হয়েছিল। সমসাময়িক পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকেই এই হরফে ছাপা কোনো বাংলা বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে কেরী প্রভৃতির সমসাময়িককালে লেখা চিঠিপত্র ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু পরোক্ষ সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, কলকাতায় তৈরি এই নতুন বাংলা হরফ কিনেই শ্রীরামপুর মিশনের প্রথম দিকের কিছু কিছু বই ছাপা হয়েছিল। পরে মিশনের নিজস্ব হরফ-তৈরির কারখানা স্থাপিত হলে সেখানেই তাদের প্রয়োজনীয় বাংলা মুদ্রাক্ষর কাটা হত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, অষ্টাদশ শতকে ছাপা একটি বইয়ে অবশ্য আরো একটি নতুন সাটের অল্প কয়েকটি বাংলা হরফের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। হালহেডের ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ঐ বইয়ের শেষাংশে গদ্যে লেখা বাংলা চিঠিটি ছাপতে আর এক সাট নতুন বাংলা হরফ ব্যবহার করা হয়েছে। এই সাটের অপেক্ষাকৃত ছোটো আকারের পরিষ্কার সুন্দর হরফগুলির সঙ্গে বইয়ের মূল অংশের বড়ো আকারের বাংলা হরফগুলির অনেক পার্থক্য রয়েছে এবং এই নতুন হরফগুলিও পরে আর কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে বলে দেখা যায়নি। এই নতুন কাটা হরফগুলির উচ্চতা ২.৫ মি. মি., যদিও বইয়ের মূল বাংলা হরফগুলির উচ্চতা ছিল ৪.৫ মি. মি.। আলোচ্য চিঠিটি ছাপতে পুরো এক সাট নতুন হরফ কাটতে হয়েছিল কিনা সঠিক বলা যায় না, এবং এগুলি কে কোথায় কবে তৈরি করেছিলেন সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। তবে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই হরফগুলি হালহেডের বইয়ে ছাপা মূল সাটের

হরফগুলি থেকে স্বতন্ত্র এক নতুন ধারার হরফ। তথাপি তা ছিল মূল ধারা বহির্ভূত, ব্যতিক্রম মাত্র।

অষ্টাদশ শতকে বাংলা হরফের যে চারটি প্রধান ধারার উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রথমটির স্বাক্ষর রয়ে গেছে কেবলমাত্র হালহেডের ব্যাকরণ গ্রন্থে (১৭৭৮ খ্রী.)। দ্বিতীয় ধারার হরফে ছাপা হয় ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকার (১৭৮৪ খ্রী. থেকে শুরু) বাংলা বিজ্ঞপ্তিগুলি, জোনাথান ডানকান-কৃত ইম্পে কোড (১৭৮৫), পিট্‌স্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (১৭৮৫) প্রভৃতির বাংলা অনুবাদ, এডমনস্টোনের আইনানুবাদ (১৭৯১, ১৭৯২) ও কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্য (১৭৯২)। তৃতীয় ধারার হরফে ছাপা হয় ফরস্টার-কৃত কর্নওয়ালিস কোডের বাংলা অনুবাদ (১৭৯৩)। সর্বশেষে যে চতুর্থ ধারার বাংলা হরফের সন্ধান পাওয়া যায় তাতে ছাপা হয় ক্রনিকল প্রেসের বাংলা-ইংরেজি অভিধান (১৭৯৩), ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকার বাংলা বিজ্ঞপ্তিগুলি (যেমন, ১৭৯২/৯৩/৯৪ সালে প্রকাশিত বিভিন্ন বাংলা বিজ্ঞপ্তি), মিলার রচিত *Tutor* বা 'সিক্ষ্যা গুরু' (১৭৯৭) ও ফরস্টারের ইংরেজি-বাংলা শব্দ-সংগ্রহ (১৭৯৯/১৮০২)।

তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার্থে উপরোক্ত প্রধান চারটি ধারার অন্তর্গত বাংলা মুদ্রাক্ষরের আলোকচিত্র একত্র সমাবেশ করে একটি তুলনামূলক (comparative) শব্দ-তালিকা সংকলন করা হয়েছে। পূর্বোক্ত প্রতিটি বই বা প্রকাশনা থেকে কয়েকটি নির্বাচিত শব্দ আলাদা আলাদা ভাবে তুলে নিয়ে পাশাপাশি সাজিয়ে তাদের আলোকচিত্র তুলে এই তুলনামূলক শব্দতালিকা আমি প্রস্তুতি করেছি। এর ফলে তালিকাটিতে প্রতিটি শব্দের ও তার অন্তর্গত প্রতিটি অক্ষরেরই মূল (original) রূপ ও আকার যথাযথ বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। প্রতিটি বইয়ের নির্বাচিত শব্দাবলীর মধ্যে কিছু কিছু সাধারণ (common) অক্ষরের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। ঐ অক্ষরগুলিকে পাশাপাশি চোখের সামনে দেখতে পাওয়ায় তাদের পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বা তাদের বিবর্তনের ধারা অর্থাৎ এক বই থেকে অপর বই বা এক সাট থেকে অপর সাটে তাদের ক্রমিক রূপান্তরের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ যে-কোনো একটি বিশিষ্ট হরফের কথা ধরা যেতে পারে। যেমন 'ঙ্গ', 'ট' ইত্যাদি। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন বইয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন সাটের এই হরফ দুটির আকার বা ধাঁচ কেমনভাবে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে এসেছে তা তুলনামূলক শব্দতালিকাটি থেকে এক ঝলকে চোখের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানেই এই শব্দতালিকা প্রণয়নের সার্থকতা। [এই তুলনামূলক শব্দতালিকাটি স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ও সংযোজিত হল।][১]

---

১ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আলোচনায় যখনই আমি কোনো মুদ্রিত বইকে বিচার করার চেষ্টা করেছি, সব সময়ই আমি তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সহ মুদ্রণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর রেখেছি। বিশেষ করে তার হরফগুলিকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছি। তুলনামূলক বিচারের প্রয়োজনে হরফগুলির ধাঁচ ও গঠনবৈশিষ্ট্য

বাংলা মুদ্রাক্ষরের রূপান্তর সম্বন্ধে আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি বাংলা ছাপার হরফের অষ্টাদশ শতকীয় বিশিষ্ট রূপের পাশাপাশি তাদের আধুনিক রূপের প্রতিলিপিও নীচে দেওয়া হল (দুটি রূপের মাঝে বিকাশের গতিদ্যোতক চিহ্ন > ব্যবহৃত হয়েছে, যার তাৎপর্য, দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকে আগত) :

ও	>	উ	কু	>	কু	ক্ষ	>	ক্ষ
জ	>	জ	গু	>	গু	গন	>	গ্ন
ট	>	ট	জু	>	জু	জ্ঞ	>	জ্ঞ
ৰ	>	র	তু	>	তু	ঞ্জ	>	ঞ্জ
ন	>	ল	প্ব	>	পু	ন্থ	>	ন্থ
০	>	ং	দ্ব	>	দু	ন্ধ	>	ন্ধ
স্ত	>	স্ত	স্থ	>	স্থ	ষ্ট	>	ষ্ট

এখন, অষ্টাদশ শতকে ছাপা বিভিন্ন সাটের হরফের কথা একে একে আলোচনা করা যাক। হালহেডের ব্যাকরণের বাংলা উদাহরণগুলি ছাপার জন্য প্রথম যে এক সাট বাংলা হরফ তৈরি হয়, স্বকীয়তা ও মৌলিকতার গুণে আজও তা ভাস্বর হয়ে রইল। লক্ষ্য করা গেছে যে এই সাটের বাংলা মুদ্রাক্ষরগুলি অষ্টাদশ শতকের আর কোনো বই বা পত্রিকায় ছাপা হয়নি। প্রথম তৈরি এই সঞ্চালনযোগ্য বাংলা মুদ্রাক্ষরগুলি ছিল আদি যুগের স্বল্পতম শ্রেষ্ঠ অক্ষর। তবে এগুলি কেন যে পরে আর কোথাও ব্যবহৃত হয়নি সে রহস্যের সমাধান আজও করা যায়নি।

এই হরফগুলি ছিল বেশ বড়ো আকারের, তবে নিখুঁতভাবে কাটা, ঋজু, ঝরঝরে ও পরিচ্ছন্ন। সঞ্চালনযোগ্য বাংলা মুদ্রাক্ষর তৈরির প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে এর অভূতপূর্ব সাফল্য নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। অক্ষরগুলির উচ্চতা ছিল সামান্য কম-বেশি ৪.৫ মি. মি.। এর বেশিরভাগই ছিল নয়ন-শোভন সুষম ছাঁদের। অক্ষর সাজানোও (composing) সুন্দর। পঙ্‌ক্তিগুলি সুবিন্যস্ত ও সমান্তরাল। এই প্রথম হাতের লেখার যুগ অতিক্রম করে

যেমন বিচার করা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার উচ্চতাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই হরফের উচ্চতা (type-height) সঠিকভাবে পরিমাপের জন্য আমি একটি স্বকৃত পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি। আমার নিজস্ব প্রয়োজন মতো এক খণ্ড স্বচ্ছ ফিল্মের (transparent film) উপর একটি graph ছেপে নিয়েছি— এর প্রতি unit (ক্ষুদ্রতম বর্গ)-এর আয়তন ১ বর্গ মিলিমিটার। ছাপা বইয়ের যে-কোনো অক্ষরের উপর এই স্বচ্ছ ফিল্মের graph-টি ফেলে অতি সহজেই তার আকার বা উচ্চতা পরিমাপ করে নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

বাংলা বর্ণমালাকে ছাপার অক্ষরে আদর্শ-রূপে বাঁধার চেষ্টা দেখা যায়। এখানে অনেক দুরূহ যুক্তাক্ষর আধুনিক ধাঁচে ছাপা হয়েছে। যেমন, 'ঙ্গ' 'ষ্ক', 'স্ক' 'ক্র', 'স্ত', 'স্ত', 'ক্ষ', 'ঙ্গ' ইত্যাদি। অপরপক্ষে, প্রচলিত রীতির কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। যেমন, 'ঘ্ন'— এখানে 'গন', 'আজ্ঞা'— এখানে 'আঙ্গা' (এটি সম্ভবত বানান ভুলের ফলে ঘটেছে— 'জ + ঞ'-এর পরিবর্তে 'ঙ + গ' হয়েছে), 'স্থ'—এখানে 'স' ও 'থ' উপর-নীচে লেখা [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'স্থ' লেখার এই প্রাচীন রীতি আরেকভাবে আধুনিকতম লাইনো টাইপে ফিরে এসেছে। লাইনো টাইপে অবশ্য 'স' ও 'থ' উপর-নীচে লেখা হয় না, পাশাপাশি সংযুক্ত হয়ে লেখা। লাইনোর রীতি অনুযায়ী এই ধরনের যুক্তাক্ষরগুলির ক্ষেত্রে প্রথম অক্ষর অর্থাৎ বাঁদিকের অক্ষরটির অর্ধেক মাত্র লেখা হয় ও পরবর্তী অক্ষরটি, অর্থাৎ ডানদিকের অক্ষরটি সম্পূর্ণ লেখা হয়।] পুঁথির আদর্শে হাতের লেখার জটিল টান কিছু কিছু অক্ষরে, বিশেষ করে যুক্তবর্ণে অবশ্য রয়ে গেছে। যেমন 'কু'। ('কুলাঙ্গার' 'ঠাকুরে')। একই অক্ষর দুভাবে লেখার রীতিও এখানে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'র'-এর দুই রূপ : পেট-কাটা 'ব' ও নিম্ন-বিন্দু 'ব' (র), দুই-ই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক 'তু' 'ত্ত'— উভয় ক্ষেত্রেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ত্ত' ('ত্তমি', 'সোমদত্ত')। 'দস্যা-ন'-এর সম্মুখস্থ টানটিকে আরো বেশি গোলাকৃতি করে লেখা হয়েছে ল, আবার 'ল'-এর আধুনিক রূপের ব্যবহারও রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উ-কার ব-ফলার রূপ নিয়েছে। যেমন 'সাম্ব', অর্থাৎ 'সালু'। এ ছাড়া আঁ-কার চিহ্ন (া) সব সময় মাত্রা ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে। এ ছাড়া 'উ' 'ঙ' 'ট' 'ং' প্রভৃতি অক্ষরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

হালহেডের ব্যাকরণে উদাহরণস্বরূপ যে-সব বাংলা কাব্যের উদ্ধৃতি মুদ্রিতাকারে পাওয়া যায় তা সমকালীন হাতে লেখা পুঁথি থেকে গৃহীত। সেই আদর্শে পয়ার ছন্দের স্বাভাবিক যতিচিহ্ন এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু গদ্যে লেখা যে একমাত্র বাংলা চিঠিটি বইয়ের শেষে ছাপা আছে সেখানে কোনো বিরাম চিহ্নের (punctuation marks) ব্যবহার নেই।

সূচনা পর্বে দ্বিতীয় পর্যায়ের যে type fount বা নতুন সাটের বাংলা হরফের সৃষ্টি তার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় Calcutta Gazette Press-এর বাংলা মুদ্রণে। ১৭৮৪ খ্রী. থেকে ঐ প্রেসে ছাপা ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকার বাংলা বিজ্ঞপ্তিগুলি এই নতুন সাটের বাংলা হরফে ছাপা। এই সমস্ত বিজ্ঞপ্তির পুরোটাই একই সাটের হরফে ছাপা হত। এই বাংলা মুদ্রাক্ষরগুলি ছিল ক্যালকাটা গেজেট প্রেসের একান্ত নিজস্ব। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে ক্যালকাটা গেজেট প্রেসে ছাপা কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্য বা *The Seasons* গ্রন্থেও এই একই সাটের বাংলা হরফ ব্যবহৃত হয়। সমসাময়িককালে Honorable Company's Press-এ ছাপা ডানকান, এডমনস্টোন প্রভৃতির বাংলা আইনানুবাদগুলিতেও এই একই সাটের বাংলা হরফের ব্যবহার দেখা যায়। ক্যালকাটা গেজেট ছিল আধা-সরকারী পত্রিকা। ক্যালকাটা

গেজেট প্রেস ও কোম্পানীর প্রেসের কর্তৃত্ব ও পরিচালনগত যোগাযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। সেই সূত্রে উভয় প্রেসে একই বাংলা হরফ ব্যবহৃত হওয়া বিচিত্র নয়। অথবা একই শিল্পীর তৈরি এক সাটের বাংলা হরফ উভয় প্রেসেই সরবরাহ করা হয়। সম্ভবত উইলকিন্স-পঞ্চাননের যৌথ উদ্যোগে এখানকার বাংলা মুদ্রাক্ষর নির্মিত হয়েছিল। পূর্বোক্ত বিভিন্ন প্রকাশনায় ব্যবহৃত এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বাংলা মুদ্রাক্ষরের আকার ও ছাঁদে কোনো অসমতা বা বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না। ঐ হরফগুলি ছিল একই সাটের।

ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকায় বাংলা বিজ্ঞপ্তিগুলি ছাপার জন্য ব্যবহৃত হরফের উচ্চতা ছিল ৩.৫ মি. মি.। এগুলি হালহেডের ব্যাকরণে ব্যবহৃত হরফের চেয়ে ক্ষুদ্রতর। হরফ-নির্মাণশিল্পের আদিযুগে বিবর্তনের অন্যতম লক্ষণই ছিল, আকার ও উচ্চতায় হরফগুলির ক্রমশ ক্ষুদ্রতর হওয়ার প্রবণতা। সুতরাং উইলকিন্স-পঞ্চাননের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হিসাবে স্বভাবতই এই দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁদের কাটা হরফগুলি আগের চেয়ে ছোটো হয়েছিল। উচ্চতার পার্থক্য ছাড়া কিছু কিছু হরফের ছাঁদও পাল্টেছিল। এর অনেক যুক্তাক্ষর আধুনিক ধাঁচে লেখা। হালহেডের বইয়ে ব্যবহৃত হরফের সঙ্গে তুলনায় বলা চলে, এখানে যুক্তাক্ষরগুলি আধুনিক রূপের আরো কাছাকাছি এসেছে। যেমন, এখানে পাই 'স্থ', এখানে 'আঙ্গা' হয়েছে 'আঙ্গা'। (আধুনিক বাংলায় এর রূপান্তরিত রূপ 'আজ্ঞা'।) তবে 'ঙ্গ' অন্য শব্দে ('বাঙ্গলা') একই রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্যালকাটা গেজেট প্রেসের নিজস্ব সাটের আরো কয়েকটি বিশিষ্ট যুক্তাক্ষরে দেখি, ঞ-জ, ক-ষ ইত্যাদি উপরে-নীচে লেখা। এ ছাড়া র, উ, ঃ, ঠ, ট, প্রভৃতি হরফ প্রাচীন ধাঁচে কাটা। উল্লেখ্য, 'র'-বর্ণের কেবলমাত্র একটি রূপই (পেট-কাটা 'ব') এখানে পাওয়া যায়। অপর আধুনিক রূপটি (নিম্ন-বিন্দু 'ব') এখানে অনুপস্থিত। পুঁথির আদর্শে কাটা কিছু হরফের সন্ধান এখানে পাওয়া যায়। যেমন, হু, হু ('হু')।

সব মিলিয়ে, ক্যালকাটা গেজেটের বাংলা মুদ্রাক্ষরগুলি ছিল আদিযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হরফ। এই হরফগুলি ছিল ছোটো ও সুন্দর। সর্বোপরি, এর অক্ষর সাজানো (composing) ছিল সুন্দর, সুষম, সর্বত্র মাত্রামিল বজায় থেকেছে, কোথাও উঁচুনিচু নেই, পঙ্‌ক্তিগুলি সমান্তরাল রেখায় অবস্থিত। এর সবগুলি ছাপার নিদর্শনে না হলেও অন্তত অধিকাংশ নিদর্শনে composing শ্রেষ্ঠতম হিসাবে বিবেচিত হবার যোগ্য। তবে বিরাম চিহ্নের (punctuation marks) ব্যবহার এখানে শুরু হয়নি। সেই হিসাবে তা পুরোমাত্রায় আদিযুগের লক্ষণাক্রান্ত।

কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্য ('*The Seasons*', 1792) ক্যালকাটা গেজেট প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং এখানেও ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকায় ব্যবহৃত হরফের অনুরূপ একই সাটের অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা বলা যায়, এটিও একই হরফে ছাপা। আমি এই বইয়ের যে কপিটির সন্ধান পেয়েছি, তা ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে ছাপা মূল বই নয়, মূল বইয়ের

facsimile reprint বা হুবহু পুনর্মুদ্রিত কপি। সেইজন্যই সম্ভবত এর হরফগুলির face (সম্মুখভাগ) ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকায় ছাপা অক্ষরের তুলনায় একটু বেশি মোটা বা ধ্যাবড়া দেখায়।

ঋতুসংহার কাব্য (১৭৯২) গ্রন্থের অক্ষরের উচ্চতা ৩.৫ মি. মি.। এখানে সংস্কৃত কাব্য-ছন্দের প্রথানুযায়ী যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। এর প্রতি পৃষ্ঠায় ৯টি করে পঙ্‌ক্তি আছে। পরিষ্কার অক্ষরে ছাপা পঙ্‌ক্তিগুলি বেশ ফাঁক ফাঁক করে সাজানো। মাঝে মাঝে একই পঙ্‌ক্তিতে কিছু কিছু অসম অক্ষরের সমাবেশ ও পঙ্‌ক্তিগুলির সামান্য উঁচুনিচু গতি লক্ষ্য করা যায়।

ক্যালকাটা গেজেটের সঙ্গে একই বছরে কলকাতায় কোম্পানীর প্রেসে ছাপা প্রথম বাংলা বই আত্মপ্রকাশ করে। ঐ প্রেসও ছিল কলকাতায় কোম্পানীর প্রথম নিজস্ব ছাপাখানা। ক্যালকাটা গেজেটেরও নিজস্ব ছাপাখানা ছিল। এই দুটি প্রেস দুটি ভিন্ন জায়গায় অবস্থিত ছিল, পরিচালক ও কর্মীও ভিন্ন ছিল। কিন্তু এদের বাংলা ছাপার চেহারা ছিল অভিন্ন। তার মূল কারণ, দুটি ছাপাখানাতেই একই সাটের বাংলা মুদ্রাক্ষর ব্যবহৃত হত। একই শিল্পীর হাতে গড়া একই ছাঁচে ঢালাই করা হরফ উভয় প্রেসই সংগ্রহ করেছিল। সুতরাং তাদের ছাপা বাংলা প্রকাশনে স্বভাবতই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দুই ছাপাখানার কর্মীভেদে অক্ষর সাজানো ও ছাপার কৌশলে হয়তো কিছু পার্থক্য থাকা সম্ভব, ফলতঃ তাদের ছাপার কাজের বাহ্যিক রূপেও সামান্য পার্থক্য মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। ক্যালকাটা গেজেট প্রেস ও অনারেবল কোম্পানীর প্রেসে ব্যবহৃত বাংলা মুদ্রাক্ষর সম্ভবত পঞ্চানন কর্মকার-উইলকিন্স-এর তত্ত্বাবধানে বা তাঁদের নিজের হাতে তৈরি।

ইম্পে কোডের বাংলা অনুবাদ ও পিট্‌স্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্‌টের বাংলা অনুবাদ— দুটিই ১৭৮৪-৮৫ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়। ঐগুলি ডানকান কর্তৃক বাংলায় অনূদিত। এর মধ্যে ১৭৮৫ খ্রী. প্রকাশিত একটির আখ্যাপত্রে উল্লেখ আছে যে তা কলকাতায় Honorable Company's Press-এ ছাপা, কিন্তু অপরটির আখ্যাপত্রে বা অন্য কোথাও মুদ্রাকরের কোনো উল্লেখ নেই। কোনো প্রকাশন সংক্রান্ত এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের বা গ্রন্থ-বিবরণীর (Bibliographical information) অভাব পূরণের জন্য এর মুদ্রাক্ষর বিচারের আশ্রয় গ্রহণ করে অত্যাশ্চর্য ফল লাভ করা গেছে। উপরোক্ত বই দুটির বাংলা মুদ্রাক্ষরের বৈশিষ্ট্য ও ছাপার আঙ্গিক তুলনামূলকভাবে বিচার করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বই দুটি একই সাটের হরফে একই প্রেসে ছাপা।

উপরোক্ত দুটি গ্রন্থেই বাংলা মুদ্রাক্ষরের উচ্চতা ৩·৫ মি. মি.। উভয় গ্রন্থেই বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার নেই। অক্ষর-সাজানো অত্যন্ত সুন্দর, নয়ন-শোভন। অক্ষরগুলি কোথাও উঁচুনিচু হয়ে যায় নি, পঙ্‌ক্তিগুলি সমান্তরাল রেখায় বিন্যস্ত। প্রতি দুই পঙ্‌ক্তির বা প্রতি দুই শব্দের মধ্যবর্তী ফাঁক (spacing) সারা পৃষ্ঠাব্যাপী সমভাবে বজায় রাখা হয়েছে। এতে

মনে হয় hand-composing-এর আধুনিক সরঞ্জামাদি এখানেও ব্যবহৃত হয়েছিল। কোম্পানীর প্রেসে ছাপা এই দুটি বইয়ের অক্ষর সাজানোর পদ্ধতি সূচনা পর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ composing-এর নিদর্শন।

ক্যালকাটা গেজেটের মতো এখানেও বহু যুক্তাক্ষরই আধুনিক ধাঁচে লেখা। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে— 'স্থ', 'শ্চ', 'স্ত', 'ক্ত', 'স্ব', ইত্যাদি। এখানে অবশ্য 'র'-এর কেবলমাত্র একটি রূপই পাওয়া যায়— প্রাচীন পেট-কাটা 'ব'। 'ঞ্জ'—এর নিজস্ব ধাঁচে লেখা। পুঁথির ধাঁচে লেখা 'কু' হালহেডের ব্যাকরণের ধারা অনুসরণ করে এখানেও বজায় থেকেছে। এই বিশেষ যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে প্রাচীন পুঁথির প্রতি আনুগত্য বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ক্যালকাটা গেজেটে 'company' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ লেখা হয়— 'কম্পানি', কিন্তু ডানকানের অনুবাদ গ্রন্থে— 'কুম্পানি'। এমন ঘটেছে বানানের পার্থক্যের জন্য, হরফের পার্থক্যের জন্য নয়। কারণ পুঁথির ধাঁচের 'কু' ক্যালকাটা গেজেটেও অন্যত্র ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন, 'রাজামকুর'।

১৭৯১ ও ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে অনারেবল কোম্পানীর প্রেস থেকে প্রকাশিত এডমনস্টোন কর্তৃক বাংলায় অনূদিত দুটি আইনের বইও উপরোক্ত একই সাটের হরফে ছাপা। এই দুটি বইয়েরও মুদ্রাক্ষরের উচ্চতা ৩·৫ মি. মি.। এখানেও বিরামচিহ্নের ব্যবহার দেখা যায় না। অক্ষর সাজানোর পদ্ধতিও ডানকানের বই দুটিতে অনুসৃত পদ্ধতির অনুরূপ। এর হরফের বৈশিষ্ট্যও কোম্পানীর প্রেসে ছাপা আগের বইগুলিতে ব্যবহৃত হরফের বৈশিষ্ট্যের সমতুল।

ক্যালকাটা গেজেট প্রেসে ও কোম্পানীর প্রেসে ব্যবহৃত এই একই সাটের বাংলা হরফের পর প্রথম আরেকটি নতুন সাটের বাংলা হরফের সন্ধান পাওয়া গেল ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় সরকারী ছাপাখানার একটি প্রকাশনে। বইটি সাধারণভাবে কর্নওয়ালিস কোডের বঙ্গানুবাদ হিসাবে পরিচিত, অনুবাদক এইচ. পি. ফরস্টার। এই নতুন সাটের হরফের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য যে সেগুলি ছিল তৎকাল প্রচলিত হরফের তুলনায় ক্ষুদ্রতর। আগেই বলেছি, ক্রমশ ক্ষুদ্রাকৃতি বাংলা হরফ তৈরির প্রবণতাই ছিল আদি যুগে ছাপার হরফের বিবর্তনের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। সুতরাং ফরস্টারের এই আইনানুবাদটি ছাপার জন্য সরকারী মুদ্রণালয়ে যে নতুন ছোটো আকারের বাংলা হরফ কাটা হল বিবর্তনের ধারায় তা তৃতীয় স্তরের সূচনা করে। এই নতুন সাট তাই সমকালীন মুদ্রণ-সচেতন শিক্ষিত মহলের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। অনেকের মতে, কালীকুমার রায় নামক এক ব্যক্তির সুন্দর হস্তাক্ষরকে আদর্শ করে এই নতুন সাটের হরফগুলি তৈরি করা হয়।[১] কেরী সম্ভবত প্রথম এই মুদ্রাক্ষরগুলিরই সন্ধান পান। সমকালীন মানে (standard) এগুলি উন্নততর মুদ্রাক্ষর বলে অনেকে মনে করেন। যেমন, জে. সি. মার্শম্যান লিখেছেন: 'The Great *Cornwallis Code* of 1793, translated into simple and idiomatic

---

১ সুধীরকুমার মিত্র, ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২২

Bengalee by Mr. Forster, the most eminent Bengalee scholar till the appearance of Mr. Carey, was likewise printed at the Government press, but from an improved fount. It was to this fount that Mr. Carey alludes, and it continued to be the standard of typography till it was superseded by the smaller and neater fount prepared at Serampore'.[১] কিন্তু অষ্টাদশ শতকে আর যেসব বাংলা মুদ্রাক্ষরের সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের সঙ্গে এই মুদ্রাক্ষরগুলির তুলনামূলক আলোচনা করলে এগুলি যে উন্নততর সাটের ('improved fount') হরফ এমন অভিমত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।[২] ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের আগে বা পরে এর চেয়েও উন্নত ধাঁচের হরফের সন্ধান পাওয়া গেছে। হালহেডের ব্যাকরণে অথবা ক্যালকাটা গেজেট প্রেস বা কোম্পানীর প্রেসের বিভিন্ন প্রকাশনায় যেসব বাংলা ছাপার হরফ ব্যবহৃত হয়েছে তার অধিকাংশ সৌন্দর্যে ও গঠনসৌষ্ঠবে এগুলির চেয়েও উন্নততর ছিল; সেগুলি ছিল আধুনিক ধাঁচের আরো কাছাকাছি। পরবর্তী পর্যায়ে ক্রনিকল প্রেস বা ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেসও বেশ কিছু উন্নততর নয়ন-শোভন বাংলা মুদ্রাক্ষর তৈরি করেছিল। হালহেডের ব্যাকরণে ব্যবহৃত হরফ যে কর্ণওয়ালিস কোডের অনুবাদে ব্যবহৃত হরফের চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল সে কথার সমর্থন পাওয়া যায় সমাচার দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিবৃতি থেকেও। হালহেডের মৃত্যুর পর সেই শোক-সংবাদ পরিবেশন প্রসঙ্গে সমাচার দর্পণে লেখা হয়: …'অনুমান হয় যে সেই অক্ষরের (হালহেডের ব্যাকরণে ব্যবহৃত অক্ষরের) ছেনী উইলকিন্স সাহেব আপন হস্তে প্রস্তুত করেন। এই অক্ষর অতি বৃহৎ বটে যেহেতুক তাহা এই সম্বাদ পত্রে মুদ্রাঙ্কিতাপেক্ষা তিন গুণ বড় কিন্তু তদনন্তর যে হরপ প্রস্তুত হইল গবর্ণমেণ্টের ১৭৯৩ সালের আইন মুদ্রিত হয় তদপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্ট। সেই অক্ষর কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত হয় তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে অক্ষম। কিন্তু উইলকিন্স সাহেব পঞ্চানন নামক এক ব্যক্তিকে শিক্ষা করান ইহা জ্ঞাত আছি অতএব ঐ অক্ষর তার দ্বারা প্রস্তুত হয় এমত অনুমান হইতে পারে।' (সমাচার দর্পণ, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৩০)[৩] সুতরাং কর্নওয়ালিস কোডের বাংলা অনুবাদ (১৭৯৩) উন্নততর সাটের বাংলা হরফে ছাপা এমন কথা সর্বাংশে সত্য নয়। তবে এগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত ছোটো মাপের হরফ এবং সমকালীন মুদ্রাক্ষরের বিবর্তন ধারায় সেটিই ছিল অগ্রগতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। শ্রীরামপুর মিশন

১ J. C. Marshman, *'Life and Times of Carey, Marshman and Ward'*, Vol. I, p. 71.

২ এই তুলনামূলক আলোচনার জন্য সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস', ৮১ পৃষ্ঠার বিপরীতে মুদ্রিত ফরস্টারের কর্নওয়ালিস কোডের অনুবাদ গ্রন্থ থেকে গৃহীত একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি ব্যবহৃত হয়েছে।

৩ সুধীরকুমার মিত্র, ঐ, ১ম খণ্ড পৃ. ৪২৩

প্রেসের যুগে পৌঁছবার আগে এর চেয়ে ছোটো আকার বা উচ্চতার বাংলা হরফের সন্ধান পাওয়া যায় না।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে উইলকিন্স ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যান। সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত মুদ্রাক্ষরশিল্পে পঞ্চানন কর্মকারই ছিলেন তখন তাঁর উত্তরসাধক। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে কর্নওয়ালিস কোডের বঙ্গানুবাদ ছাপার কাজে ব্যবহৃত নতুন সাটের হরফগুলি সম্ভবত পঞ্চানন কর্মকারেরই তৈরি। তাঁর এই দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারের প্রয়াসে অপেক্ষাকৃত ছোটো আকারের হরফ তৈরি করে তিনি তাঁর শিল্পপ্রতিভার অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীরামপুর মিশনে যোগদান করে তিনি তাঁর শিল্পপ্রতিভার আর এক নতুন ফসল বা শেষ ফসল বাংলা মুদ্রাক্ষর-ভাণ্ডারে দান করে গেছেন। সে কথা পরে আলোচ্য।

অষ্টাদশ শতকে বাংলা ছাপার হরফের বিবর্তনে চতুর্থ স্তরের সূচনা হয় সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে। ক্রনিকল প্রেস (Chronicle Press) এর প্রথম উদ্যোক্তা। এই প্রেসের নিজস্ব হরফ ঢালাইখানায় (type foundry) যে নতুন সাটের বাংলা মুদ্রাক্ষর তৈরি হয় তাতে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ছাপা হয় বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা-ইংরেজি অভিধান বা শব্দসংগ্রহ— 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি—*An Extensive Vocabulary, Bengalese And English*'. এটিকে সাধারণভাবে ক্রনিকল প্রেসের বাংলা-ইংরেজি অভিধান বলেই উল্লেখ করা শ্রেয়। এ. আপজন (Aaron Upjohn) ছিলেন এই বইয়ের মুদ্রাকর ও ক্রনিকল প্রেসের অন্যতম স্বত্বাধিকারী। পরবর্তীকালে তিনিই কলকাতার প্রথম ম্যাপ খোদাইকারক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ক্রনিকল প্রেসের নিজস্ব যে হরফ ঢালাইখানা ছিল, অনুমান করা যায়, আপজনই ছিলেন সেখানকার প্রধানতম বাংলা মুদ্রাক্ষরশিল্পী। এখানকার বাংলা হরফ ঢালাইয়ের ছাঁচগুলি সম্ভবত তাঁরই কাটা। এখানে তৈরি নতুন সাটের বাংলা হরফে প্রথমে ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকায় (২০ মার্চ ১৭৯২ তারিখ থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে এর বিভিন্ন সাপ্তাহিক সংখ্যায়) পূর্বোক্ত বাংলা-ইংরেজি অভিধানের বিজ্ঞপ্তি ছাপা হতে থাকে। পরে ঐ একই হরফে মুদ্রিত হয়ে সম্পূর্ণ অভিধানটি প্রকাশিত হয় ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। এই সময়ের কিছু আগে থেকেই ক্রনিকল প্রেসের মালিকানা নানাভাবে হস্তান্তরিত হতে থাকে। ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, দেনার দায়ে ঐ প্রেসের ব্যবসায়ে আপজনের অংশ নীলামে বিক্রি করা হয় (৩১শে অক্টোবর, ১৭৯২)। এই নীলামে ক্রনিকল প্রেসের যাবতীয় সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ বিক্রি হয়। সেই হিসাবে ওখানকার বাংলা মুদ্রাক্ষরেরও সমানুপাতিক অংশ নীলামে বিক্রি হয়।[১] এইসব ছাপাখানার সরঞ্জামাদি ও বাংলা হরফ

১ ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকার ৩০শে অক্টোবর, ১৭৯২ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি লক্ষণীয়।

নীলামে কে কিনেছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। তবে এই 'নীলাম' থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ঐ সময়ের মধ্যে কলকাতায় ছাপাখানা ও তার সরঞ্জামাদি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বেচাকেনার প্রথা চালু হয়ে গিয়েছিল। (সমসাময়িককালে উইলিয়ম কেরীর জন্ত উড্‌নী-ও কলকাতায় নীলামে একটি কাঠের মুদ্রণযন্ত্র ক্রয় করেছিলেন।) পূর্বোক্ত নীলামে কেবলমাত্র যে আপজনের অংশই বিক্রি হয়েছিল তা নয়, ক্রনিকল প্রেসের আরো অংশ বা সমুদয় মালিকানাই অল্প সময়ের মধ্যে আরো কয়েকবার হস্তান্তরিত হয় এবং প্রেসটিও স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং ঐ প্রেস ও তাদের নিজস্ব বাংলা হরফগুলি যে নষ্ট হয়ে যায়নি তা অনুমান করা যায়। অন্য কোনো উদ্যোগী মুদ্রাকর কর্তৃক এগুলি পুনশ্চ ব্যবহৃত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

এই অনুমান ও সম্ভাবনার কথা মনে রেখে সমসাময়িককালে ছাপা অন্যান্য বাংলা বই পর্যালোচনা করতে গিয়ে অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে ছাপা এমন আরেকটি বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় যার বাংলা মুদ্রাক্ষরের সঙ্গে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ছাপা ক্রনিকল প্রেসের অভিধানটির বাংলা মুদ্রাক্ষরের হুবহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করে চমৎকৃত হয়েছি। ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত জন মিলার কর্তৃক অনূদিত, সংকলিত ও মুদ্রিত এই বইটি '*THE TUTOR*' বা 'সিক্ষ্যা গুরু' নামে পরিচিত। এই বইয়ে ছাপাখানার কোনো উল্লেখ নেই, কিন্তু এর বাংলা হরফ বৈশিষ্ট্য বিচার করে বলা যায় এটিও ক্রনিকল প্রেসের নিজস্ব হরফ-ঢালাইখানায় কাটা হরফের অনুরূপ একই সাটের হরফে ছাপা। সম্ভবত পূর্ববর্তী হরফগুলিই নানাভাবে হস্তান্তরিত হয়ে এই বই ছাপার কাজে পুনশ্চ ব্যবহৃত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকে বাংলা ছাপার হরফের বিবর্তনধারা অনুসরণ করতে গিয়ে আমার এই আবিষ্কারের বিস্ময় ও চমক আরো এক ধাপ বর্ধিত হয়েছে যখন কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল যে আরো কিছুকাল পরে ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানায় মুদ্রিত এইচ. পি. ফরস্টারের ইংরেজি-বাংলা শব্দকোষটিও (এবং ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডটিও) পূর্বোক্ত একই সাটের বাংলা হরফে ছাপা। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল, ছাপাখানা ও মুদ্রাকর-প্রকাশক পরিবর্তিত হলেও এখানেও সেই একই সাটের বাংলা হরফ ব্যবহৃত হয়েছে। হয়ত বা হস্তান্তরিত হয়ে ক্রনিকল প্রেসের পূর্ববর্তী হরফগুলিই বা একই হরফ ঢালাইখানায় একই মুদ্রাক্ষরশিল্পীর কাটা অনুরূপ হরফই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং বক্ষ্যমান বিবর্তনধারায় চতুর্থ স্তরের যে একই সাটের বাংলা হরফের কথা উল্লেখ করেছি, তার ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে পূর্বোক্ত তিনটি বইয়েই, অর্থাৎ ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ক্রনিকল প্রেসের অভিধানে, ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত মিলারের 'সিক্ষ্যা গুরু' গ্রন্থে ও ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ফরস্টারের অভিধানে। ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকায় মাঝে মাঝে (যেমন, ১৭৯২, ১৭৯৩, ১৭৯৪ সালের বিভিন্ন সংখ্যায়) প্রকাশিত বাংলা বিজ্ঞপ্তিগুলিতেও এই একই সাটের হরফ ব্যবহৃত হয়েছে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, অষ্টাদশ শতকে বাংলা মুদ্রণের সূচনা পর্বে বাংলা হরফ তৈরির ব্যাপক আয়োজন গড়ে ওঠেনি এবং ঐ সময়ে সাধারণত কোনো প্রেসেরই সঞ্চয়ে (stock) একাধিক সাটের বাংলা হরফ দেখা যেত না। প্রত্যেক প্রেসেরই সংগ্রহে এক-একটি নিজস্ব সাটের হরফ থাকত। সুতরাং তাদের ছাপা বইয়ের হরফ-বৈশিষ্ট্য বিচার করে বিভিন্ন প্রেসকে আলাদা আলাদাভাবে সনাক্ত করা যেত। অপরপক্ষে, একই সাটের হরফ একাধিক প্রেসে ছাপা বিভিন্ন বইয়ে দেখা গেলে অনুমান করা যেত, ঐ প্রেসগুলি ছিল একই মালিকানা বা একই পরিচালনাধীন অথবা ক্রমান্বয়ে বিক্রয় বা হস্তান্তরের ফলে নাম পরিবর্তন হলেও ঐগুলি ছিল মূলত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সহ একই ছাপাখানা। এই মানদণ্ডে অষ্টাদশ শতকে বাংলা ছাপার হরফের বিবর্তন ধারা পর্যালোচনা করতে গিয়ে আবিষ্কার করা গেছে যে ক্রনিকল প্রেস, মিলারের প্রেস ও ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেসের বাংলা হরফগুলি ছিল একই সাটের এবং সম্ভবত বিভিন্ন সময়ে হস্তান্তরের ফলে একই প্রেস বিভিন্ন সময়ে ঐরূপ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। ফরস্টারের অভিধানের বাংলা অক্ষরসমূহ চার্লস উইলকিন্স কর্তৃক খোদিত, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের এইরূপ অভিমত[1] তাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

উপরোক্ত তিনটি প্রেস থেকে যথাক্রমে ১৭৯৩, ১৭৯৭ ও ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে ছাপা বই তিনটির মুদ্রাক্ষরের উচ্চতা ছিল একই, অর্থাৎ ৪·৫ মি. মি.। ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা বিজ্ঞপ্তিগুলিও এই একই উচ্চতার হরফে ছাপা। অবশ্য এই পত্রিকা ও বইগুলিতে ক্ষেত্রবিশেষে দেখা গেছে কিছু কিছু অক্ষরের উচ্চতা ৪·২৫ মি. মি. থেকে ৫ মি.মি.-এর মধ্যে ওঠানামা করেছে। তবে এগুলি ব্যতিক্রম মাত্র। ক্রনিকল প্রেস প্রকাশিত অভিধানে (১৭৯৩) ও ফরস্টার সংকলিত অভিধানে (১৭৯৯) কোনোরূপ বিরাম-চিহ্ন ব্যবহারের সূত্রপাত হয়নি, অবশ্য অভিধান গ্রন্থ বলে সেখানে এরূপ কোনো সুযোগও ছিল না। ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা বিজ্ঞপ্তিতেও (যেমন, ৬ই জানুয়ারি ১৭৯৪ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত বাংলা বিজ্ঞপ্তি) বিরামচিহ্নের ব্যবহার দেখা যায় না। মিলারের 'শিক্ষা গুরু' (১৭৯৭) গ্রন্থের ভূমিকার বাংলা গদ্যাংশে অবশ্য পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার দেখা যায়। সেখানে অনুচ্ছেদ (paragraph) বিভাগও লক্ষ্য করা যায়। ফরস্টারের অভিধানে অক্ষর সাজানোর পদ্ধতি ঘন সন্নিবদ্ধ নয়— অক্ষরগুলি কিছুটা ছাড়া ছাড়া, উঁচুনিচুভাবে সাজানো। অক্ষর সাজানোর পদ্ধতি এই একই রূপ দেখা যায় আলোচ্য অন্যান্য প্রকাশনগুলিতেও।

ক্রনিকল প্রেসের বাংলা-ইংরেজি শব্দ-সংগ্রহ, ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা বিজ্ঞপ্তি, মিলারের 'শিক্ষা গুরু' ও ফরস্টারের ইংরেজি-বাংলা শব্দ-সংগ্রহ— অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে প্রকাশিত এইসব বিভিন্ন প্রকাশনায় বাংলা মুদ্রাক্ষরের যে সাদৃশ্যের কথা

১ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, 'বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়', পৃ. ১২

এতক্ষণ আলোচনা করা হল তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় পূর্বোক্ত 'তুলনামূলক শব্দতালিকা'র প্রতিলিপির প্রতি দৃষ্টি দিলে। পূর্বোক্ত প্রকাশনাগুলি থেকে নির্বাচিত কয়েকটি শব্দকে বা তার অন্তর্গত অক্ষরগুলিকে পাশাপাশি সাজিয়ে এখানে দেখানো গেছে যে এগুলিতে একই সাটের বাংলা হরফ ব্যবহৃত হয়েছে। এই সাটের হরফগুলিকেই আমি বিবর্তনধারায় চতুর্থ স্তরের বাংলা হরফ বলে উল্লেখ করেছি।

তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার্থে এর এক-একটি বিশিষ্ট অক্ষরের প্রতি আলাদা আলাদাভাবে নজর দেওয়া যেতে পারে। যেমন ধরা যাক, 'জ'। এই পর্যায়ে উল্লিখিত সব কটি প্রকাশনাতেই এর একই রূপ এবং পূর্ববর্তী স্তরের সাট থেকে এর পার্থক্য সুস্পষ্ট। এই অক্ষরটির ডানদিকের লম্বমান রেখাটি অপেক্ষাকৃত ছোটো এবং তা মূল অঙ্গ (curve) থেকে আরো কিছুটা বেশি সরে গেছে। এই লম্বমান রেখাটি মূল অঙ্গের সঙ্গে মাত্রার সমান্তরাল অপর একটি রেখার দ্বারা যুক্ত এবং উভয়ের সংযোগস্থলে একটি সমকোণের (৯০°) সৃষ্টি হয়েছে। অক্ষরটির এই গঠনবৈশিষ্ট্য ঐ সাটের সম্পূর্ণ নিজস্ব ধাঁচের পরিচায়ক। আগের বা পরবর্তী পর্যায়ের অক্ষরের সঙ্গে এর ধাঁচের পার্থক্য সুস্পষ্ট। 'ট' এইরূপ অপর একটি অক্ষর যা এই সাটের নিজস্ব ধাঁচ ও বৈশিষ্ট্যে তৈরি। চতুর্থ পর্যায়ের সব কটি প্রকাশনাতেই 'ট'-এর এই বিশিষ্ট রূপ বজায় থেকেছে এবং তা পূর্ববর্তী সকল রূপ থেকে ভিন্ন। এর মাথার ইলেক-চিহ্ন মাত্রার নীচে নেমে এসে মূল অঙ্গের সঙ্গে যে চতুর্ভুজের সৃষ্টি করেছে তা-ই এই সাট বা অক্ষরটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। হালহেডের ব্যাকরণের হরফ থেকে এইসব ক্ষেত্রে ('জ', 'ট' ইত্যাদির ধাঁচে) এই সাটের হরফের সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষণীয়। আবার হালহেডের ব্যাকরণে যেমন, এখানেও তেমনই 'কু' লেখা হয়েছে পুঁথির হস্তাক্ষরের টানের আদর্শে। এই রূপ ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকা বা মিলারের বইয়ে লক্ষণীয়। [উল্লেখযোগ্য, এই প্রাচীন 'কু' রূপটি ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সকল প্রকাশনাতেই বজায় থেকেছে।] 'ন' ও 'ধ' উপরে-নীচে একইভাবে লেখা হালহেডের ব্যাকরণে ও ফরস্টারের শব্দকোষে। এই মিল সত্ত্বেও, এ দুটি বইয়ের অন্যান্য হরফে অমিল অনেক। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সাটের হরফে বই দুটি ছাপা। অন্যদিকে ক্রনিকল প্রেসের অভিধান, ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকা, মিলারের 'শিক্ষা গুরু' ও ফরস্টারের অভিধানে বিভিন্ন অক্ষর বা যুক্তাক্ষরের— যেমন, 'জ', 'ট', 'থ', 'প', 'ই', 'কু', 'গু', 'ক্ত', 'যু', 'ফ', 'হ্র', ইত্যাদির গঠনবৈশিষ্ট্য বা ধাঁচে যে হুবহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, (সংযোজিত তুলনামূলক শব্দতালিকা লক্ষণীয়) তাতে এগুলি যে একই সাটের অন্তর্গত সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে। এই প্রসঙ্গে ক্রনিকল প্রেসের ছাপায় কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যবহার— যেমন, 'উ' (সম্ভবত 'ঊ'-এর পরিবর্তে), 'যু' (সম্ভবত 'শু'-এর পরিবর্তে), 'প্' (সম্ভবত 'পূ'-এর স্থলে) ইত্যাদি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ক্রনিকল প্রেসের অভিধানে প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণ ও পরে স্বরবর্ণ স্থান পেয়েছে। স্বরবর্ণের মধ্যে 'ঈ' এবং 'ঊ' নেই। সব দিক বিচার করে মোটা-

মূটি বলা যায়, অষ্টাদশ শতকে বাংলা ছাপার হরফের বিবর্তনধারায় এই চতুর্থ স্তরের সাটের হরফগুলি কোনো পূর্ববর্তী মুদ্রাক্ষরশিল্পীর শেষ পর্যায়ের সৃষ্টি বলে মনে হয় না, বরং মনে হয় এগুলি কোনো নতুন শিল্পীর প্রথম প্রচেষ্টা। তাই বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী আকার ও উচ্চতায় এগুলি অপেক্ষাকৃত ছোটো না হয়ে প্রথম পর্যায়ের বড়ো বড়ো হরফের ছাদেই গড়ে উঠেছে। তবে এই সাটের হরফগুলি বেশ স্পষ্ট, স্বচ্ছ, ঝরঝরে। কয়েকটি হরফ নয়ন-শোভনও বটে। অক্ষর-সাজানোর পদ্ধতি ঘন সন্নিবদ্ধ নয়। ফলে এর বড়ো বড়ো অক্ষরগুলি মাঝে মাঝে ছাড়া-ছাড়া উঁচুনিচুভাবে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেখানে অস্পষ্টতা নেই কোথাও, তবে হরফে আধুনিকতা বা ছোটো আকারের হরফের যে নিজস্ব সৌন্দর্য তা এখানে পাওয়া যায় না।

চারটি পর্যায়ে বিভক্ত অষ্টাদশ শতকের বাংলা ছাপার হরফের বিবর্তনধারার রূপরেখা বর্ণনা মোটামুটি এখানেই শেষ করা যায়। পরিশেষে কয়েকটি বিশিষ্ট হরফের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা মুদ্রণের আদিযুগের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 'উ' অক্ষরটির মধ্যে বরাবরই লক্ষ্য করা গেছে। আশ্চর্যের কথা অষ্টাদশ শতকে পাওয়া সব কটি সাটের অন্তর্ভুক্ত এই 'উ' হরফটির গঠনবৈশিষ্ট্য বরাবরই একই থেকে গেছে, কোথাও এর রূপগত কোনো পরিবর্তন হয়নি, এমন-কি উনবিংশ শতকে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের যুগে পৌঁছেও তার একই চেহারা দেখা যায়। 'উ'-এর এই আদি রূপটির সঙ্গে অবশ্য তার আধুনিক রূপের পার্থক্য আছে; তখন এর মাথার ইলেক-চিহ্নটি ছিল অর্ধচন্দ্রাকৃতি পুঁটলির মতো, মাত্রার নীচেও সেই অর্দ্ধবৃত্তের নিম্নভাগ বিস্তৃত; অবশ্য এর কোনো স্বতন্ত্র মাত্রা ছিল না।

আদি যুগে 'র', 'জ', 'ট', 'ং' প্রভৃতি হরফের বিবর্তনও লক্ষণীয়। ['তুলনামূলক শব্দতালিকা' দ্রষ্টব্য।] পশ্চিমবঙ্গীয় রীতি অনুযায়ী নিম্ন বিন্দু সহ 'ব' (dotted ব) অথবা উত্তর বঙ্গীয় রীতি অনুযায়ী (বর্তমান অসমীয়া ভাষায় যার প্রচলন রয়েছে) পেট-কাটা 'ব' (stabbed ব)— এই উভয় ধাঁচেই তখন 'র' লেখার রেওয়াজ ছিল। এক-একটি সাটে এক-একটি রূপ ব্যবহৃত হয়েছে, অবশ্য কোনো কোনো সাটে উভয় রূপ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, হালহেডের ব্যাকণে 'র'-এর উভয় রূপই দেখা যায়। মিলারের বইয়েও তাই। কিন্তু ক্যালকাটা গেজেট প্রেস ও কোম্পানীর প্রেসে অষ্টাদশ শতকে ছাপা পত্রিকা ও বইয়ে 'র'-এর কেবলমাত্র দ্বিতীয় রূপটি অর্থাৎ পেট-কাটা 'ব' দেখা যায়। আবার ক্রনিকল প্রেসে ছাপা পত্রিকা ও বইয়ে আধুনিক রীতি-সম্মত 'র', অর্থাৎ ফুটকি-সহ 'ব', এবং ফরস্টারের অভিধানে 'র'-এর অপর রূপ, অর্থাৎ পেট-কাটা 'ব' দেখা যায়।

'জ' অক্ষরটির বিবর্তনও উল্লেখযোগ্য। ছাপার হরফে 'জ'-এর প্রথম যে রূপের সন্ধান পাই, অর্থাৎ হালহেডের ব্যাকরণে যে রূপ, তাতে অক্ষরটির ডানদিকের শেষ লম্বমান টানটি ('final vertical stroke') মূল অঙ্গের ('curve') বেশ কাছ দিয়ে সোজা নীচে

নেমে গেছে ও শেষ প্রান্ত সামান্য ডানদিকে বাঁক নিয়ে ঈষৎ ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। প্রান্তভাগে এই সামান্যতম বাঁকটি থেকে হরফটির অলংকরণের পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী স্তরের ক্যালকাটা গেজেট প্রেস ও কোম্পানীর প্রেসে ব্যবহৃত সাটে 'জ'-এর শেষ লম্বমান টানটি হরফের মূল অঙ্গের ('curve') আরো কাছে সরে এসেছে। এ ছাড়া, আগেই বলা হয়েছে, পরবর্তী কালের অন্য সাটে, যেমন, ক্রনিকল প্রেসের তৈরি হরফে, অর্থাৎ ক্রনিকল প্রেসের অভিধানে, মিলারের বই ও ফরস্টারের অভিধানে এই শেষ লম্বমান টানটি আবার হরফের মূল অঙ্গ ('curve') থেকে দূরে সরে গেছে ; এখানে রেখাটি দৈর্ঘ্যেও কিছুটা ছোটো, হরফের শেষ প্রান্তে তা পৌছয় না। তা ছাড়া হালহেডের বইয়ের হরফের আদর্শে এই লম্বমান টানটির শেষ ভাগে কোনো বাঁক নেই ; ফলত, মনে হয়, এখানে অলংকরণের ঝোঁক কম। ডান পাশের রেখাটি মূল অঙ্গ থেকে বেরিয়ে প্রথমে মাত্রার সমান্তরালে এগিয়েছে, তারপরে একটি সমকোণ সৃষ্টি করে সোজাসুজি লম্বভাবে নীচে নেমে গেছে। অক্ষরটির আধুনিক ধাঁচের সঙ্গে এই রূপের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

'ট'-এর বিবর্তন কৌতূহলজনক। ক্যালকাটা গেজেটে ব্যবহৃত 'ট' হালহেডের ব্যাকরণে ব্যবহৃত 'ট'-এর রূপ থেকে কিছুটা ভিন্ন। ক্যালকাটা গেজেটে 'ট'-এর মাথার ইলেক্‌-চিহ্ন (বা 'flag stroke') মাত্রার সঙ্গে এক বৃহত্তর কোণে অবস্থিত এবং হরফটির face বা সম্মুখভাগ অপেক্ষাকৃত মোটা। ক্রনিকল প্রেসের সাটে 'ট'-এর face আরেকটু পরিবর্তিত হয়েছে। সুকুমার সেনের মতে, তা চতুর্দশ শতকের প্রস্তরফলকাদিতে খোদাই করা অক্ষরের ('inscriptions') ধাঁচে তৈরি।[১] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ক্রনিকল প্রেসের অভিধানে 'ট'-এর মাথার ইলেক্‌-চিহ্নটি পুরোপুরি মাত্রার নীচে নেমে এসেছে এবং তা মূল অঙ্গের সঙ্গে একটি সমকোণী চতুর্ভুজের সৃষ্টি করেছে। মিলারের 'সিক্ষ্যা গুরু' বইয়েও এই একই ধরনের 'ট' দেখা যায়। ফরস্টারের অভিধানেও তাই। তবে এর কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায় 'ট'-এর মাত্রা নেই, অর্থাৎ ঐ সব ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত সমকোণী চতুর্ভুজের উপরের বাহুটি নেই। তবে বিশেষভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই মাত্রার একটি অস্পষ্ট ছাপ রয়ে গেছে। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে, উক্ত সাটের 'ট' হরফটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাঙা থাকায় বা অক্ষর-সাজানোয় গলদ থাকায় ক্ষেত্রবিশেষে হরফটির মুদ্রণে আকৃতিগত বৈষম্য দেখা দিয়েছে।

অনুস্বার (ং) আলোচ্য পর্বের সব ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র একটি ছোটো শূন্যের রূপ (॰) নিয়েছে, এর নীচের ইলেক্‌টি অষ্টাদশ শতকের সব কটি সাটেই অনুপস্থিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৌছে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের নিজস্ব সাটে এর আধুনিক রীতিসম্মত রূপের (ং) সন্ধান পাওয়া যায়।

---

১ Dr. Sukumar Sen, 'Early Printers and Publishers in Calcutta' : *Bengal, Past & Present*, Jan-June 1968.

ওচিন ওচিত জত কটু আগিন দলাঙ্গার মোরে সদৃশ স্থালে Halhed, GRAMMAR, 1778	ওখন ওপযুক্ত বন্দি স্থালে বাঙ্গলা যসন্ত মতসবকে চৈশব CALCUTTA GAZETTE, 1784	কালিদাসঃ ঋতুসং গদ্য ভেদং মন্দ সমূহ শুভমস্ত Calidas, 'SEASONS,' 1792
রাজহাট সকল আজ্ঞা গন্থ ইঙ্গরেজি পূর্ব্ব উপস্থিত নিযুক্ত সম্পর্কীয় Duncan's Translation (Impey Code), 1785	আজ্ঞা ইঙ্গরেজ ওড়িশ্যা কম্পানি রাজস্থলীতে দৃষ্ট নিকট নিযুক্ত শাস্ত্র সম্পর্কীয় হিন্দুস্থান Duncan's Translation (Pitt's India Act), 1785	আদিন উপরে এবং কাজ লিখা দিষ্টে পুরুক্ত মহম্মদ Edmonstone's Translation, 1791

জানিতে পুরি পুর্ন্মাসি পুর্ব্বক ইঙ্গরাজি Chronicle Press, VOCABULARY, 1793	আছদফে পাচথতোঘর বাজার ইস্তাহার ভ্রুত্তরে গুদাম লাচবাড়ি মহম্মদর শুক্রবার CALCUTTA CHRONICLE, 1794	আর ইংরাজি খবরের চুপি সবতি ওপহুক্ত পুস্তক গুপ্ত বহু বর্ণ বাঙ্গালা বিশিষ্ট সিক্ষা Miller, TUTOR, 1797	আশা ওদয় কাচ খরচ খাটী জল দক্ষ নষ্ট স্থিত বিজ্ঞাপন মুক্তহস্ত Forster, VOCABULARY-Part 1, 1799

তুলনামূলক শব্দ তালিকা : অষ্টাদশ শতকে বাংলা ছাপার হরফের বিবর্তন

দ্র. পৃষ্ঠা ১৪১

তৃতীয় অধ্যায়

অষ্টাদশ শতকে বাংলা ছাপাখানা

এণ্ড্রুস নামক জনৈক পুস্তক-বিক্রেতা হুগলীতে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকেই ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে হালহেডের যুগান্তকারী গ্রন্থ '*A Grammer of the Bengal Language*' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম সঞ্চালনযোগ্য বাংলা মুদ্রাক্ষর ব্যবহৃত হয়। এণ্ড্রুসের এই ছাপাখানাটিই প্রথম বাংলা ছাপাখানার (First Bengali Printing Press) গৌরব দাবি করতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা হুগলীর এই ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত আর কোনো বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়নি। হালহেডের ব্যাকরণের মতো এমন আধুনিক রীতিসম্মত নিখুঁত সুন্দর বই যে ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়েছে, একটিমাত্র বই প্রকাশ করেই তার অবলুপ্তি হতে পারে এমন কথা স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য নয়। হয়ত এখান থেকে আরো কিছু বই প্রকাশিত হয়েছিল যার সন্ধান আমরা আজও পাইনি, অথবা এই ছাপাখানাটি অন্য কোথাও স্থানান্তরিত ও হস্তান্তরিত হয়েছিল বা এর ছাপার হরফ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি অপর কোনো ছাপাখানায় ব্যবহৃত হয়েছিল। হয়ত বা এইটিই পরে কলকাতায় কোম্পানীর প্রেসে রূপান্তরিত হয়েছিল। এ সবই অনুমানের কথা। এর রহস্যভেদ সম্ভব হলে, বাংলা মুদ্রণের আদি ইতিহাসের কিছু অবলুপ্ত যোগসূত্রের (missing link) সন্ধান পাওয়া যেত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হুগলীতে এণ্ড্রুসের মুদ্রণযন্ত্রের কাজ শুরু হওয়ারও অনেক আগে, ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ও সংবাদপত্র প্রকাশনের প্রচেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। এই প্রচেষ্টার মূলে ছিলেন উইলিয়ম বোল্টস (William Bolts)। সাপ্তাহিক '*Friend of India*' পত্রিকার ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫ তারিখের সংখ্যায় 'First Establishment of a Press in Calcutta' নামক নিবন্ধে প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে, তবে এখানে বোল্টসকে ভুলক্রমে 'Mr. Bolst' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুঃসাহসী ওলন্দাজ (মতান্তরে জার্মান) ব্যবসায়ী ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাক্তন কর্মচারী বোল্টস তদানীন্তনকালে কলকাতায় কোম্পানীর সঙ্গে নিত্য সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। কোম্পানীর চাকরিতে থাকাকালীন ছ'বছরের মধ্যেই নানাবিধ ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের সূত্রে তিনি নয় লক্ষ টাকার মতো বিপুল সম্পত্তি করে ফেলেছিলেন, ফলে অসাধুতার অভিযোগে কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দেখা দেয়। বাংলাদেশে মুদ্রণের আদি ইতিহাসের সঙ্গে বোল্টসের নাম জড়িত এই প্রসঙ্গে যে বোধকরি তিনিই

প্রথম যিনি কলকাতায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে সক্রিয় আন্দোলন শুরু করেছিলেন। (প্রসঙ্গত স্মরণীয়, লণ্ডনের হরফ-ঢালাইয়ে দক্ষ কারিগরদের সহায়তায় সঞ্চালনযোগ্য বাংলা মুদ্রাক্ষর নির্মাণের কাজে পরবর্তীকালে লণ্ডনে তিনিই প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন।)

কলকাতাস্থিত ব্রিটিশ জনগণের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ও পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যম গড়ে তোলার জন্য বা তাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য মুদ্রণযন্ত্রের একান্ত প্রয়োজনীতার কথা বোল্টস উপলব্ধি করেছিলেন। কোম্পানীর সঙ্গে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে এটি তাঁর বিশেষ সহায়ক হবে বলেও হয়ত তিনি মনে করেছিলেন। তাই এই বিষয়ে জনমত সংগঠনের জন্য তিনি উদ্যোগী হন। কলকাতায় অবিলম্বে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার আবেদন জানিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি লিখে ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বোল্টস কলকাতাস্থিত কাউন্সিল ভবনের দরজায় টাঙিয়ে দেন। ঐ বিজ্ঞপ্তিতে বোল্টস জানান যে হরফ ঢালাই ও ছাপার কাজে দক্ষ কোনো ব্যক্তি এ কাজে এগিয়ে এলে তিনি তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত : 'the want of a printing press in this city being of great disadvantage to business, and making it extremely difficult to communicate such intelligence to the community as is of the utmost importance to every British subject, he is ready to give the best encouragement to any person or persons who are versed in the business of printing, and will undertake to manage a press, the types and utensils of which he can produce.'[১] কিন্তু কলকাতায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার জন্য বোল্টসের এই উদ্যোগ সফল হতে পারেনি। ঐ সময়ে কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ তীব্র হওয়ায় ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[২] ফলে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ঐখানেই থেমে যায়। পররর্তীকালে আরো দশ বছর পরে, ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে হুগলীতে স্থাপিত হয়েছিল প্রথম বাংলা ছাপাখানা।[৩]

---

১ *Friend of India*, Feb. 26, 1835.

২ *Dictionary of National Biography*, Vol. II, p. 795.

৩ সম্প্রতি লণ্ডনে School of Oriental and African Studies-এর গ্রন্থাগারে কলকাতায় ছাপা ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের একটি ক্যালেণ্ডারের ['*Calendar for the year of Our Lord MDCCLXXVIII*. Calculated to the meridian of Calcutta.—Calcutta : printed at Calcutta.'] সন্ধান পাওয়ায় অনুমান করা হচ্ছে যে ইংরেজিতে ছাপা ১৬ পৃষ্ঠার ঐ পুস্তিকাটি সম্ভবত ১৭৭৮ খ্রী. শুরু হবার পূর্বেই অর্থাৎ ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ছাপা হয়। এবং সম্ভবত সংশ্লিষ্ট ছাপাখানাটির মালিক ছিলেন জেমস অগাস্টাস হিকী। এই দুটি অনুমান সত্য হলে বলা যায়, এটিই ছিল কলকাতা তথা বাংলাদেশের প্রথম ছাপাখানা (১৭৭৭)। [দ্র. Graham Shaw, '*Printing in Calcutta to 1800*', p. 74] তবে প্রথম বাংলা ছাপাখানা হিসাবে হুগলীর এণ্ড্রুসের প্রেসের (১৭৭৮) গৌরব অক্ষুণ্ণই থাকে।

হুগলীর ছাপাখানায় উইলকিন্সের প্রচেষ্টায় বাংলা ছাপার হরফের প্রবর্তন ও তার অত্যাশ্চর্য সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কোম্পানী কলকাতায় নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। স্বভাবতই মুদ্রণ বিষয়ে উইলকিন্সের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে কোম্পানী তাঁকেই এ কাজের দায়িত্ব দেন। এ বিষয়ে সমসাময়িক দলিলের একটি সাক্ষ্য উদ্ধার করা যেতে পারে। ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি তারিখে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত সরকারী চিঠি থেকে বোঝা যায় যে ঐ সময়ে গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিল চার্লস উইলকিন্সের তত্ত্বাবধানে কলকাতায় একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেছিলেন এবং সেখানে ইংরেজি ও ফারসী সহ বাংলাতেও ছাপার আয়োজন করা হয়েছিল[১] :

To J. P. Auriol, Esq. Secretary to the General Department.

Sir,

The Hon'ble the Governor-General and Council having thought to establish a Printing Office under the superintendence of Mr. Charles Wilkins, I am directed to transmit you the enclosed copy of the Rates of Printing and to desire that you will prepare and furnish Mr. Wilkins with copies of all such papers in your office as will admit of being printed, whether in the Persian, Bengal or Roman Character, leaving Blanks for Names, Dates and other occurrences as are liable to alter and specifying the Number of each Form usually issued in the course of a year.

Revenue Department,
Fort William,
the 8th January, 1779.

I am,
Sir,
Your most obedient Servant,
Sd/- Geo. Hodgson,
Secretary.

Copy :

Rates of Printing,

For English Impressions.

For every Quire of Folio Post, Paper included :

If Printed on One Side ... Sa. Rs. 3.

If Printed on both sides ... " " 5.

For Persian and Bengali.

১ সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৩১

For every Quire of Folio Post, Printed on One side ... Rs. 5.
Do Do (both) ... Rs. 7.

Revenue Dept.
A true copy.

Sd/- W. Webber,
Sub-Secretary.

উপরোক্ত চিঠিটির উল্লেখ করে অবশ্য সজনীকান্ত দাস মন্তব্য করেছেন, সরকারের মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঐ সংকল্প কার্যে পরিণত হয়নি। তাঁর এই মন্তব্য যথার্থ বলে মনে হয় না। এর অল্প কিছুকালের মধ্যেই যে কোম্পানীর ছাপাখানা বা Honorable Company's Press স্থাপিত হয়েছিল সে বিষয়ে কিছু কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়।

উইলকিন্সের তত্ত্বাবধানেই কোম্পানীর প্রেসের সূত্রপাত এবং তা প্রথম চালু হয় মালদহে —১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে। সেই সময় উইলকিন্স মালদহের কুঠির সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও ছিলেন। ১৭৮০ খ্রী. ঐ প্রেস থেকে ছাপা হয় Francis Gladwin-এর '*A Compendious Vocabulary, English and Persian*'। এর পরে ১৭৮১ খ্রী. উইলকিন্স পার্শী ও বাংলা অনুবাদকের পদে কলকাতায় বদলী হলে কোম্পানীর প্রেসও কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। এটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঠিকানায় কার্যকর ছিল— প্রথমে ১১৪ কাশীটোলা স্ট্রীটে, পরে লালবাজার ও লারকিন্স লেনে। ১৭৮১ খ্রী. কোম্পানীর প্রেসে ছাপা বইয়েরও সন্ধান পাওয়া গেছে— তবে তা ইংরেজিতে ছাপা। বাংলায় ছাপা প্রথম বই পাই ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় চালু ছিল হিকীর প্রেস। ঐ সময় হিকী কোম্পানীর মুদ্রাকর হিসাবেও কাজ করেন। কোম্পানীর নানাবিধ প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক ছাপার কাজ তখন তিনিই করে দিতেন।

১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি জেম্স অগাস্টাস হিকী কর্তৃক তাঁর ইংরেজি সাপ্তাহিক '*Bengal Gazette*' প্রকাশিত হয়। [HICKY'S/Bengal Gazette/or,/Calcutta General Advertiser.'] কলকাতা থেকে প্রকাশিত হিকীর 'বেঙ্গল গেজেট'ই বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র। এই গেজেট কোন্ প্রেস থেকে মুদ্রিত তা অনুমান সাপেক্ষ। এর প্রথম কয়েকটি সংখ্যা থেকে কেবলমাত্র এইটুকু জানা যায় যে, এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত, জে. এ. হিকী কর্তৃক মুদ্রিত। প্রতি সংখ্যার শেষে লেখা থাকত : 'CALCUTTA : Printed by J. A. HICKY.' সাপ্তহিক *Friend of India* (February 26, 1835) পত্রিকায় প্রকাশিত 'First Establishment of a Press in Calutta' নামক নিবন্ধ থেকে এইরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রথম গেজেটটি কলকাতার সরকারী ছাপাখানায় মুদ্রিত। ['The first Gazette in India was published at the Government Press, as we have heard, in the

year 1780.'] স্পষ্টত নিবন্ধকার হিকীর গেজেটের কথাই উল্লেখ করেছেন এবং এখানে উল্লিখিত সরকারী ছাপাখানা বলতে তিনি হিকীর মুদ্রণযন্ত্রের কথাই হয়ত বোঝাতে চেয়েছেন। তখন হিকীর ঐ প্রেসেই কোম্পানীর নানাবিধ ছাপার কাজ হত বলে তা সরকারী ছাপাখানা বলে অভিহিত হত। হিকী ছিলেন এই ছাপাখানার মুদ্রাকর। এখান থেকেই তিনি তাঁর 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশ শুরু করেন। প্রথম দশটি সংখ্যা এখানেই ছাপেন। কিন্তু অচিরেই কোম্পানীর সঙ্গে হিকীর তীব্র মতবিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা দেওয়ায় তিনি কোম্পানীর সংশ্রব ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে তাঁর ছাপাখানা চালাতে থাকেন ও সেখান থেকেই 'বেঙ্গল গেজেট' ছাপতে শুরু করেন। এর একাদশ সংখ্যা (৮ই এপ্রিল, ১৭৮০) থেকে হিকী নিজেই মুদ্রাকর পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁর পত্রিকার প্রতি সংখ্যার শেষে লিখতে শুরু করেন : 'CALCUTTA : Printed by J. A. Hicky. First, and Late Printer to the Hon. Company.' এইরূপ ঘোষণা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, হিকী তাঁর নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে কোম্পানীর প্রথম মুদ্রাকর হিসাবে কাজ করেছিলেন। সুতরাং কোম্পানীর নামে প্রচলিত তাঁর ঐ ছাপাখানা নিঃসন্দেহে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারির ('বেঙ্গল গেজেট'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশনের তারিখ) মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, হয়ত বা তারও আগে। 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশনার আগে হিকী সম্ভবত ঐ মুদ্রণযন্ত্রে কোম্পানীর প্রশাসনিক কাজে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ছাপার কাজ করতেন। নানাবিধ সরকারী ফর্ম, বিল, সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় বেতনের কাগজপত্র প্রভৃতি তিনি ছাপতেন। গ্রাহাম শ'র অনুমান সত্য হলে ঐ ছাপাখানা ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই চালু হয়ে থাকতে পারে। এখন পর্যন্ত যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় এইটিই কলকাতার প্রথম ছাপাখানা।

উইলকিন্সের তত্ত্বাবধানে যে ছাপাখানা পরিচালিত হত স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায় যে সেখানে বাংলা হরফে ছাপার আয়োজন ছিল। কারণ দ্বিবিধ, প্রথমত তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংসের তথা কোম্পানীর রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবেই তখন বাংলা ভাষাচর্চা ও বাংলা ভাষায় সরকারী প্রকাশনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছিল, দ্বিতীয়ত বাংলা ছাপার হরফ নির্মাণে উইলকিন্সের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সরকারী মহলে সমাদৃত হত। ফলত Honorable Company's Press-এর বাংলা ছাপার কাজ গোড়া থেকেই শুরু হয়েছিল অনুমান করা যায়। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কেবলমাত্র বাংলা হরফ নির্মাণ ও বিক্রয়ের জন্য কোনো হরফ ঢালাইখানা (type foundry) তখনো পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। ছাপাখানাগুলো তাদের প্রয়োজনীয় হরফ নিজেরাই তৈরি করে নিত। কোম্পানীর প্রেসের যে নিজস্ব হরফ ঢালাইখানা গড়ে উঠেছিল তাও উইলকিন্সের নির্দেশনায় পরিচালিত হত। হুগলীর প্রেসের মতো এখানেও পঞ্চানন কর্মকার তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন এমন অনুমান করা চলে। সরকারী রাজস্ব বিভাগের সচিব কর্তৃক লিখিত পূর্বোক্ত চিঠি (৮ই জানুয়ারি ১৭৭৯) থেকে মনে হয়, গোড়ার দিকে কোম্পানীর প্রেসে কেবল সরকারী নথিপত্র ও

নানাবিধ ফর্ম প্রশাসনিক প্রয়োজনে দেশীয় লোকেদের মধ্যে চালু করার জন্য ইংরেজি ও ফারসীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাতেও ছাপা হত। বাংলায় অনূদিত ও ছাপা ঐ ধরনের কোনো ফর্মের সন্ধান অবশ্য এখন আর কোথাও পাওয়া যায় না। পূর্বোক্ত চিঠিতে বাংলায় ছাপার খরচের যে হার উল্লেখ করা হয়েছে, তাও সম্ভবত উইলকিন্সের পরামর্শ-ক্রমেই স্থির হয়েছিল।

Honorable Company's Press থেকে বাংলায় ছাপা প্রথম বইয়ের যে নিদর্শন এখন পর্যন্ত সন্ধান করা গেছে, তা ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত— জোনাথান ডানকান কর্তৃক ইম্পে কোড-এর বাংলা তর্জমা। তবে ঐ Press-এর ইংরেজি ছাপার কাজের যে প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয়েছে, তা আরো আগের— ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে ছাপা। শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে এই বইটি পাওয়া যায়: '*East India Co. Regulations for the Administration of the Justice in the Courts of Mofussil Dewannee Adaulut.* Calcutta, at the Hon'ble Company's Press, 1781. 4-to'.[১] এ ছাড়া আরো কয়েকটি ইংরেজি বই ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই কোম্পানীর প্রেসে ছাপা হয়েছিল।

এইসব ইংরেজি বই বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় না হলেও, ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই কলকাতায় কোম্পানীর প্রেসের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা হল। তবে আগেই বলেছি, এই প্রেসে ছাপা প্রথম বাংলা বই ইম্পে কোডের বঙ্গানুবাদ বলে পরিচিত জোনাথান ডানকানের ছুটি আইনানুবাদ প্রকাশিত হয় ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে। ডানকান কর্তৃক বাংলায় অনূদিত ইম্পে কোডের আর-একটি সংস্করণ মূল ইংরেজি সহ ঐ একই প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে। ডানকান কর্তৃক অনূদিত আর-একটি আইনানুবাদ, যা সাধারণত পিট্‌স্ ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের বঙ্গানুবাদ বলে পরিচিত, তা প্রকাশিত হয় ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে। এতে প্রেসের নাম উল্লিখিত না হলেও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি বিচার করে বলা যায় এটিও কলকাতায় কোম্পানীর প্রেসে ছাপা।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে উইলকিন্স ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর ভারতত্যাগের পরেও কোম্পানীর ছাপাখানার কাজ অব্যাহত ছিল। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারিতেই উইলকিন্স পদত্যাগ করলে কোম্পানীর প্রেসের অধ্যক্ষ হন ফ্রান্সিস গ্লাডউইন। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী কর্তৃক বিধিবদ্ধ সংশোধিত আইনের ধারাগুলি G. C. Meyer কর্তৃক বাংলায় অনূদিত হয়ে ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দেই কোম্পানীর প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।[২] ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয় যে শীঘ্রই ফারসী ও বাংলায় Dr. Mackinon সম্পাদিত একটি ইংরেজি ব্যাকরণের বই Hon. Company's Press থেকে প্রকাশিত

১ K. S. Diehl, '*Early Indian Imprints*', p. 87.

২ *Friend of India*, Feb. 26, 1835.

হচ্ছে।[১] এর পরে কোম্পানীর প্রেস থেকে ছাপা এডমনস্টোন অনূদিত আরো দুটি আইনের বই ১৭৯১ ও ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

কোম্পানীর প্রেসে বাংলা মুদ্রণের ধারা এই ভাবে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের পর এই প্রেসে ছাপা আর কোনো বাংলা বই পাওয়া যায় না— সুকুমার সেনের এই উক্তি যথার্থ বলে মনে হয় না।[২] ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় প্রকাশিত হেনরি পিট্স্ ফরস্টার কৃত 'কর্নওয়ালিস কোডে'র বাংলা অনুবাদ গ্রন্থটিও এই একই ছাপাখানায় মুদ্রিত। এর পরেও কলকাতায় কোম্পানীর ছাপাখানা চালু ছিল। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে লিখিত কেরীর একটি চিঠিতে উল্লেখ আছে, তখন পর্যন্ত পঞ্চানন কর্মকার কোম্পানীর প্রেসেই চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকেও এই ছাপাখানার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে,কলকাতায় প্রকাশিত '*Easys by the students of the College of Fort William*' নামক সংকলনগ্রন্থটি এই Hon'ble Company's Press-এ ছাপা ; এই সংকলনগ্রন্থে বাংলা হরফে বাংলা রচনাও মুদ্রিত আছে। সমসাময়িককালে এই প্রেসে ছাপা আরো দুটি বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় : '***Primitae Orientales,***' 2 Vols., 1803-4 ; '*College of Fort William*···'1804. এই গুরুত্বপূর্ণ প্রেসে হয়ত বা আরো কিছু বই ছাপা হয়েছিল যা আজো অনাবিষ্কৃত রয়েছে। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কাউন্সিলের সভায় ওয়েলেসলি প্রস্তাব করেন যে কলেজের খরচ চালানোর জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থের অন্যতম উৎস হবে কলকাতায় সরকারী ছাপাখানার লভ্যাংশ। ['*College of Fort William in Bengal*, London, 1805' : p. 37.] ওয়েলেসলীর এই উক্তি নিঃসন্দেহে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় সরকারী ছাপাখানা বা কোম্পানীর প্রেসের অস্তিত্বকে সমর্থন করে। কোম্পানীর প্রেসের ইতিহাস সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হলে বাংলা মুদ্রণের আদি পর্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলা মুদ্রণের বিবর্তনধারায় কোম্পানীর প্রেসের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল যেমন গুরুত্বপূর্ণ, এর ব্যবসায়িক সাফল্যও ছিল তেমন উল্লেখযোগ্য। ছাপাখানাটির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকবৃন্দের কাছে তাই এর আর্থিক সম্ভাবনার দিকটিও বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে কোম্পানীর প্রেসের অধ্যক্ষ বা superintendent ডঃ কেরীকে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর ঐ পদকে বেতন বা আর্থিক লাভের দিক দিয়ে কাউন্সিলের সভ্য-পদের সমতুল বলে মনে করতেন।[৩]

---

১ W. S. Seton-Karr, '*Selections from Calcutta Gazettes*', Vol. II, p. 514.

২ Dr. Sukumar Sen, 'Early Printers and Publishers in Calcutta' : *Bengal, Past & Present*, Jan-June, 1968.

৩ *Friend of India*, Feb. 26, 1835.

কোম্পানীর প্রেস থেকে ডানকান-অনূদিত আইনের বাংলা বইগুলি প্রকাশের প্রাক্কালে কলকাতায় বাংলায় ছাপার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আরেকটি ছাপাখানার অভ্যুদয় ঘটেছিল। ৩৭নং লারকিন্স লেনে প্রতিষ্ঠিত এই ছাপাখানাটি Calcutta Gazette Press বা Office নামে পরিচিত ছিল। সেই সময় সরকারের বহুবিধ ছাপার কাজ এখানেই হত। এখান থেকেই ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মার্চ '*The Calcutta Gazette or Oriental Advertiser*' নামক ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশন শুরু হয়। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে ফ্রান্সিস গ্লাডউইন (Francis Gladwin) পত্রিকাটির প্রকাশনা শুরু করেন। এর বিভিন্ন সংখ্যা থেকে জানা যায়, Mr. Jones, Mr. Mackay প্রভৃতি এর নানা বিভাগীয় কর্মকর্তা ছিলেন। এটি ছিল আধা-সরকারী পত্রিকা, সরকারের যাবতীয় বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণা এর মাধ্যমে প্রকাশিত হত। প্রায় নিয়মিত নানাবিধ সরকারী বা বেসরকারী বাংলা বিজ্ঞপ্তি এই গেজেটে ছাপা হত। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই ক্যালকাটা গেজেট সরকারী মুখপাত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়ে এসেছে।

যে লারকিন্স লেনের ৩৭ নম্বর বাড়িতে ক্যালকাটা গেজেট ছাপাখানার পত্তন হয়, কলকাতার ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের সন্নিকটে সেই রাস্তা এখনো রয়েছে। কিন্তু এখানে দু'তিনটির বেশি বাড়ি আজ আর নেই। এরই একটি বাড়িতে (২নং) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছাপাখানার একাংশ (রাজভবনের যাবতীয় ছাপার কাজের জন্য) এখনো চালু আছে। অষ্টাদশ শতকের ছাপাখানার ঐতিহ্য লারকিন্স লেন আজো বহন করে চলেছে।

১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে মার্চ এই ছাপাখানার অফিস লালবাজারে (Loll Bazar) পুরনো জেলবাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।[১] Hon'ble Company's Press ও Calcutta Gazette Press— উভয়ের মধ্যে পরিচালনগত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বা সম্পর্ক ছিল। উভয় প্রেসে বাংলা ছাপার কাজে যেসব মুদ্রাক্ষর ব্যবহৃত হত সেইগুলির উৎস একই ছিল বলে মনে হয়।

পত্রিকা প্রকাশন ছাড়াও Calcutta Gazette Office থেকে ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে একটি উল্লেখযোগ্য বাংলা বই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।[২] এটি কালিদাসের 'ঋতুসংহার কাব্য', '*The Seasons*'-এই আখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটিই বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম সংস্কৃত কাব্য।

হিকীর 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হবার পর কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতায় অনুরূপ আরো সাত-আটটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এগুলি সবই ছিল ইংরেজি পত্রিকা। কিন্তু এরই মধ্যে দু'একটিতে বাংলা মুদ্রণেরও ব্যবস্থা ছিল। যেমন, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে,

---

১ W. S. Seton-Karr, '*Selections from Calcutta Gazettes*', Vol. I, p. 217.

২ *Op. cit.*, Vol. II, p. 535 (In *Calcutta Gazette*, dt. 5th April, 1792.)

'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকা। অনুরূপ আরেকটি পত্রিকা '*The Calcutta Chronicle*'— উইলিয়ম বেইলীর উদ্যোগে ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে এর প্রকাশন শুরু; শুরুতে এ. আপজন ছিলেন এর মুদ্রাকর ও প্রকাশক। ঐ সংস্থার অপর একজন মুদ্রাকর ছিলেন John Holmes। এই ইংরেজি সাপ্তাহিকের বিভিন্ন সংখ্যায় বাংলা মুদ্রণের নিদর্শন পাওয়া যায়। তাদের নিজস্ব প্রেসে ছাপা বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষ (১৭৯৩) সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি, সম্পত্তি নীলামের বিজ্ঞপ্তি (১৭৯৪) প্রভৃতি বাংলা হরফে ছেপে প্রকাশিত হত। সমসাময়িক কালের প্রায় সব পত্রিকাই তাদের নিজস্ব ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হত। 'ক্যালকাটা ক্রনিকল' পত্রিকাও তার নিজস্ব ছাপাখানা The Chronicle Press থেকে প্রকাশিত হত। এদের নিজস্ব হরফ ঢালাইখানায় প্রয়োজনীয় বাংলা হরফ নির্মাণেরও ব্যবস্থা ছিল। Messrs. Stewart & Cooper নামক সংস্থার উদ্যোগে প্রথম ঐ হরফ-ঢালাইখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ঐ সংস্থা উঠে যাওয়ায় হরফ-ঢালাইখানাটি হস্তান্তরিত হয়। শেষ পর্যন্ত এটি আপজন-সহ মোট ছয় জন মালিকের পরিচালনাধীন ক্রনিকল প্রেসের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পূর্বোক্ত বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষ বা অভিধান ('ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি') স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে এই ক্রনিকল প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

এ. আপজন ছিলেন *Calcutta Chronicle* পত্রিকা ও Chronicle Press-এর এক-ষষ্ঠাংশের (one-sixth share) মালিক। মুদ্রাকর John Holmesও এক-ষষ্ঠাংশের মালিক ছিলেন; ১লা মে ১৭৯১ তারিখে তিনি তাঁর অংশ বিক্রি করে দেন। গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশন এবং পুস্তক বিক্রয় ছিল Chronicle Office-এর প্রধান ব্যবসায়। পরে ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে এই ব্যবসায়ে আপজনের অংশের সব কিছুই নীলামে বিক্রয় হয়। এই নীলামের বিজ্ঞপ্তি ক্যালকাটা গেজেট ও ক্যালকাটা ক্রনিকলে প্রকাশিত হয়।[১] ছাপাখানা ও তার সরঞ্জামাদি, ছাপার হরফ, হরফ ঢালাইয়ের কারখানা, ফারসী-দেবনাগরী-বাংলা ছাপার হরফ নির্মাণের ছাঁচ প্রভৃতি সমুদয় সম্পত্তিরই আনুপাতিক অংশ নীলামে ডাকা হয়। এই সঙ্গে দেনার হিসাবও করা হয়। তাঁদের ব্যবসায়ে তখন ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৫১,০০০ টাকা। মনে হয় দেনার দায়েই আপজন তাঁর সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। অবশ্য এই নীলামের পরেও ঐ পত্রিকা, ছাপাখানা ও বইয়ের ব্যবসা চালু ছিল। প্রথমদিকে ছাপাখানাটি ছিল ৮নং লালবাজারে এবং আপজনের বাসস্থান শিয়ালদহে। পরে ছাপা-খানাটি হস্তান্তরিত হয় ও এর অফিস চিৎপুর রোডে স্থানান্তরিত হয়।

আপজনের সম্পত্তির নীলামের ঘটনা থেকে অন্তত একটি বিষয় পরিষ্কার হয়, সমসাময়িক কালে ছাপাখানা এবং বাংলা ছাপার হরফ নির্মাণ ও কেনা বেচার প্রচলন ছিল। বিশেষ

১ W. S. Seton-Karr, '*Selections from Calcutta Gazettes*', Vol. II, p. 541.

করে, অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে কলকাতায় এই ধরনের ছাপাখানা ও বাংলা ছাপার হরফের বাজার চালু ছিল। বাংলা ছাপার হরফ নির্মাণশিল্পও ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। মদনাবাটি ত্যাগ করে শ্রীরামপুরে পৌছবার আগেই কেরী জানতে পারেন যে কলকাতায় একটি হরফ ঢালাইখানা গড়ে উঠেছে, ফলে সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় বাংলা হরফ সংগ্রহ করা যাবে ভেবে তিনি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। লণ্ডনের Baptist Missonary Society-র নথিপত্র-সংগ্রহশালায় রক্ষিত Andrew Fuller-কে লেখা কেরীর একটি চিঠি (Mudnabati, 22 June 1797) থেকে এই তথ্য জানা যায়।[১] ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে ইংলণ্ডে প্রেরিত একটি চিঠিতে কেরী লেখেন যে তিনি অনুসন্ধানে জানতে পারেন যে তাঁর নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ তখন কলকাতাতেই ছাপানো সম্ভব, কিন্তু তার খরচ অত্যন্ত বেশি। ঐ খরচ জোগানো তাঁর সাধ্যাতীত হওয়ায় তিনি নিজেই ওটি ছাপার পরিকল্পনা করেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ইংলণ্ডের ক্যাসলন থেকে বাংলা ছাপার হরফ ঢালাইয়ের ছাঁচ আনাতে উদ্যোগী হন। কিন্তু এর কয়েক মাস পরেই, ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে কেরী স্থানীয় পত্রিকায় এইরূপ একটি বিজ্ঞপ্তি লক্ষ্য করেন যে কলকাতায় দেশীয় ভাষায় ছাপার হরফ ঢালাইয়ের একটি কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এর পরে কেরী ইংলণ্ড থেকে বাংলা মুদ্রাক্ষর আমদানী ব্যাপারে আর অগ্রসর হননি। কলকাতাই তখন তাঁর বাংলা মুদ্রণের কাজে সব দিক দিয়ে প্রস্তুত। এর অল্প কিছু পরেই, উড্‌নীর বদান্যতায় ৪০ পাউণ্ড মূল্যে কেরী কলকাতায় নীলামে একটি কাঠের মুদ্রণযন্ত্র কেনেন।[২] এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে আমার আগের বক্তব্যই সমর্থিত হয়, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে কলকাতায় বাংলা মুদ্রণের কাজ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল।

বাংলা ছাপাখানার এই বিবর্তন ধারায় কোনো এক সূত্রে ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে আরেকটি বাংলা বই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। জন মিলার (John Miller) কর্তৃক সংকলিত, অনূদিত ও মুদ্রিত এই বইটির নাম : '*The Tutor*' বা 'শিক্ষা গুরু', বইটিতে ছাপাখানার কোনো নামোল্লেখ নেই। তবে সমসাময়িককালে কলকাতায় মুদ্রিত অপর দুটি বাংলা বইয়ে (১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ক্রনিকল প্রেসে মুদ্রিত বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষ ও ১৭৯৯-১৮০২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় মুদ্রিত ফরস্টারের ইংরেজি-বাংলা শব্দকোষ) ব্যবহৃত হরফের সঙ্গে মিলারের বইয়ে ব্যবহৃত বাংলা হরফের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করে অনুমান করা যেতে পারে যে এটিও কলকাতাতেই মিলারের নিজস্ব বা অপর কোনো ছাপাখানায় মুদ্রিত।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে কলকাতায় আরেকটি ছাপাখানার সন্ধান পাওয়া যায়।

---

১ E. D. Potts, '*British Baptist Missionaries in India*', p. 110.

২ J. C. Marshman, '*Life and Times of Carey, Marshman and Ward*', Vol. I, pp. 79-80.

এটি Mirror Press, প্রথমে ছিল ১৫৮ নং চিৎপুর রোডে,[১] পরে তা স্থানান্তরিত হয় ৭নং লারকিন্স লেনে।[২] এই ছাপাখানায় কোনো বাংলা বই মুদ্রিত হয়েছিল কিনা সঠিক জানা যায় না, তবে *Calcutta Gazette*, *Calcutta Chronicle* প্রভৃতি সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তিতে মিরর প্রেসের কিছু কিছু প্রকাশনার উল্লেখ পাওয়া যায়। '*The Bengal Kalendar and Register*' (1792), '*General Military Register of the Bengal Establishment* : **1760-1795**' প্রভৃতি মিরর প্রেসে ছাপা। ইংরেজ বিরোধিতার উদ্দেশ্যে ফরাসী ও অন্যান্য বিদেশী শক্তির সঙ্গে টিপু সুলতান যেসব যোগাযোগ করেছিলেন সেই সংক্রান্ত সরকারী নথিপত্র ও তার অনুবাদ গভর্নর জেনারেলের আদেশক্রমে মিরর প্রেসে ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।[৩]

ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সহায়ক জন মিলারের বইটির পরেই অষ্টাদশ শতকের যে অত্যাশ্চর্য বৃহৎ কলেবর বাংলা বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় সেটি কলকাতায় Ferris and Co.-র প্রেসে ছাপা। হেনরি পিটস ফরস্টার সংকলিত এই বইটির ('*A Vocabulary, in two parts, English and Bongalee and vice versa*') প্রথম ভাগ ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশন ছিল সম্পূর্ণ বেসরকারী ব্যবসা-ভিত্তিক ব্যক্তিগত উদ্যোগ। ফরস্টারের নিজের প্রচেষ্টায় ও গ্রাহকদের অগ্রিম চাঁদার টাকায় বইটি মুদ্রিত হয়। সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানার প্রশংসনীয় উদ্যম। বাংলা মুদ্রণের আদি যুগের ইতিহাসে এই ছাপাখানার ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এখন পর্যন্ত যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, ফরস্টারের শব্দকোষটিই ছিল ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানার প্রথম বাংলা প্রকাশন। তাদের ছাপাখানাটি যে ঠিক কোন্ সালে প্রতিষ্ঠিত তা অবশ্য নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে অনুমান করা যেতে পারে যে তখনকার যুগে ৪৪১ পৃষ্ঠার বৃহৎ আকারের ঐ শব্দকোষটি ছাপতে অন্তত বৎসরাধিককাল সময় ব্যয়িত হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে মনে হয়, ঐ ছাপাখানাটি ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল এবং তখন থেকেই মুদ্রণের কাজ শুরু করে ফরস্টারের শব্দকোষটির প্রথম ভাগ ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এই শব্দকোষের দ্বিতীয় ভাগ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে ; এর আখ্যাপত্রে মুদ্রাকরের নাম উল্লেখ আছে : Printed by P. Ferries,—Post Press.' ফরস্টারের শব্দকোষের দুটি খণ্ডের বাংলা হরফের গঠন ও আকৃতি ও বই দুটির আকার, কাগজ ও তার ভাঁজ (forme), অক্ষর সাজানোর পদ্ধতি (composing), বাঁধাই প্রভৃতি মুদ্রণ-বৈশিষ্ট্যগত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের কথা বিচার করে মনে হয় বই দুটি একই ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত। সে ক্ষেত্রে অনুমান করা যায় যে 'Press of Ferris

---

১ **W. S. Seton-Karr, '*Selections from Calcutta Gazettes*', Vol. II, p. 592 : 7 May 1795.**

২ ***Ibid*, Vol. III, p. 536 : 12 Sept., 1799.**

৩ ***Ibid*, Vol. III, p. 536.**

and Co' এবং 'Post Press' দুটি ভিন্ন নামের একই ছাপাখানা যার স্বত্বাধিকারী ছিলেন জনৈক Mr. P. Ferris. হয়ত বা কোনো ব্যবসায়িক প্রয়োজনে এই ভিন্ন নাম ব্যবহার করতে হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে কলকাতার মুদ্রণ জগতে এই ফেরিস সাহেব ছিলেন একজন বিশিষ্ট বাংলা মুদ্রাকর। দুঃখের বিষয়, তিনি প্রথম কবে থেকে কলকাতায় ছাপার কাজ শুরু করেন বা তাঁর ছাপা সমস্ত বইয়ের পূর্ণ তালিকা সঠিক নির্দেশ করা যাচ্ছে না। ক্যালকাটা ক্রনিকল পত্রিকার প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় যে ব্রিটিশ সৈন্যদের জয় উপলক্ষে রচিত কর্নওয়ালিসের প্রশস্তিমূলক একটি কাব্যগ্রন্থ ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের ২২শে অক্টোবর প্রকাশিত হচ্ছে এবং এটি মুদ্রাকর Messrs. Thomson & Ferris-এর কাছে পাওয়া যাবে।[১] এখন এই মুদ্রাকর Thomson & Ferris পরবর্তীকালের 'Post Press' বা Ferris and Co.-এর ছাপাখানায় রূপান্তরিত হয়েছিল কিনা বা উভয়ের সঙ্গে মুদ্রাকর ফেরিস সাহেবের যোগাযোগ ছিল কিনা অনুমানের বিষয়। যাই হোক, ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানার বাংলা মুদ্রণের ঐতিহ্য দীর্ঘকাল বজায় ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত এই ছাপাখানাটির বাংলা প্রকাশনের কাজ চালু ছিল। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য তাঁর অনেক বই এদের মারফত প্রকাশ করেছিলেন। সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী পর্বে। বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখ করা প্রয়োজন, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা মুদ্রণের জোয়ার আসার আগেই ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর মতো একটি বেসরকারী ছাপাখানা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে বাংলা মুদ্রণের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। বোধ করি এই উপলব্ধির প্রেরণাতেই তারা বাংলা মুদ্রণের এক বিরাট কাজে সাহস করে এগিয়ে এসেছিল।

---

১ *Calcutta Chronicle*, Oct. 2, 1792.

চতুর্থ অধ্যায়

কেরীর আগমন : বাংলা মুদ্রণের উপকরণসন্ধানে অশান্ত পদচারণা

বাংলা মুদ্রণের স্থচনা পর্বের যে বিস্তৃত আলোচনা করা হল, তা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে অষ্টাদশ শতকের সমুদয় বাংলা মুদ্রণ প্রচেষ্টার মূলে ছিল বিদেশী শাসকবর্গের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থবুদ্ধি। মূলত সরকারী উদ্যোগে, আর কিছুটা প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ কয়েকজন বিদেশীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই বাংলা মুদ্রণধারার স্থত্রপাত। কিন্তু প্রায় সর্বকালে ও সর্বদেশে ধর্মপ্রচারের যে মৌল প্রেরণা ও প্রয়োজনে মুদ্রণের জন্ম ও প্রসার, বাংলাদেশের ইতিহাসে তা বিলম্বিত হয়ে কার্যকর হতে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর চৌহদ্দিতে পৌছবার পর। ধর্মপ্রচারার্থে বাংলা মুদ্রণের এই যে নব্য যুগ তার জন্ম শ্রীরামপুর মিশনে, উইলিয়ম কেরী ছিলেন যাঁর কেন্দ্রস্থিত প্রধান চরিত্র। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কেরী বাংলা মুদ্রণের আদি যুগকে নানাভাবে প্রভাবিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে এই যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও গতিশীল ব্যক্তিত্ব (dynamic personality) ছিলেন উইলিয়ম কেরী।

বাংলা মুদ্রণে কেরীর প্রত্যক্ষ প্রভাব ও অবদান শুরু হয় ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে, শ্রীরামপুর মিশনের পত্তনের মধ্য দিয়ে। তাঁর অবদানকে কেন্দ্র করেই বাংলা মুদ্রণের পরবর্তী অধ্যায়কে 'বিকাশ পর্ব' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগেই দেখা যায় কেরী স্থদূর ইংলণ্ডের মায়া কাটিয়ে বাংলাদেশে এসে পৌচেছেন এবং বাংলা মুদ্রণের রঙ্গমঞ্চে কেরীর আসন্ন আত্মপ্রকাশের পটভূমি রচিত হচ্ছে। স্থতরাং সেই স্থত্রে বক্ষ্যমান 'স্থচনা' পর্বেই কেরীর এই আত্মপ্রস্তুতির নেপথ্যকাহিনী আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর তারিখে উইলিয়ম কেরী প্রথম বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করেন এবং ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুরে পৌছে ব্যাপটিস্ট মিশনের জয়যাত্রার স্থচনা করেন। এই দুই তারিখের মধ্যবর্তী প্রায় সাত বৎসর কাল ছিল তাঁর প্রস্তুতিপর্ব। ধর্মপ্রচারের প্রেরণায়, বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের ঘরে ঘরে ঈশ্বরের বাণীকে পৌছে দেবার অদম্য বাসনায় তাড়িত হয়ে কেরী এদেশে এসেছিলেন। এখানে পৌছে তিনি প্রথমেই উপলব্ধি করেছিলেন, বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ ও হাজারে হাজারে তা মুদ্রিতাকারে প্রচার করতে না পারলে তাঁর মিশনের উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব নয়। আর এ কাজে বাংলা মুদ্রণের সাহায্য ছিল অপরিহার্য। বিশেষ করে তিনি চেয়ে-

ছিলেন একটি আধুনিক স্বয়ংসম্পূর্ণ নিজস্ব মুদ্রণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। তাই লক্ষ্য করা গেছে কলকাতায় প্রথম পদার্পণের পরবর্তী প্রায় সাত বৎসর ব্যাপী প্রস্তুতিপর্বে কেরী বাংলাদেশের নানা স্থানে আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা মুদ্রণের প্রাথমিক উপকরণ সন্ধানে অশান্ত পদচারণা করে বেড়িয়েছেন। পরিশেষে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তা সার্থকতার পথ খুঁজে পায়।

উইলিয়ম কেরীর বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জীবনী ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।[১] সুতরাং তাঁর জীবনের বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ বা প্রয়োজন এখানে নেই। বাংলা মুদ্রণের বিকাশ ও প্রসারের কাজে তাঁর ভূমিকা ও অবদানের কথাই এখানে বিশেষভাবে আলোচ্য। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর জীবনের কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসের আলোকে উইলিয়ম কেরীর জীবনের একটি মহৎ রূপ ও তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের পরিচয় এইভাবে নির্ধারণ করা যাবে।

ইংলণ্ডের নরদামটনশায়ারের অন্তর্গত পলার্সপিউরি (Paulerspury) গ্রামে এক সাধারণ পরিবারে ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই আগস্ট উইলিয়ম কেরীর জন্ম। তাঁর পিতা এডমণ্ড কেরী ছিলেন একজন তন্তুবায়, তাঁত বুনেই তিনি তখন জীবিকানির্বাহ করতেন। উইলিয়মের জন্মের বছর ছয়েক পরে এডমণ্ড কেরী তন্তুবায়বৃত্তি ত্যাগ করে স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। পিতার এই নতুন বৃত্তি কিশোর বালকের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানার্জনস্পৃহা, বিশেষ করে ভূগোল, ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনী ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পাঠের আগ্রহ ছোটোবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা যায়। ভবিষ্যতে ঘরের মায়া ও স্বদেশের ক্ষুদ্র গণ্ডি ত্যাগ করে অজানা সুদূর দেশে পাড়ি দেবার উৎসাহ, আগ্রহ ও মানসিকতা তাঁর কৈশোরের এই পাঠাভ্যাসের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। তদুপরি যৌবনে ধর্মপ্রচারের প্রেরণা যুক্ত হয়ে কেরীর জীবনের লক্ষ্যপথ স্থির করে দিয়েছিল।

কিন্তু এই লক্ষ্যপথে পৌঁছতে কেরীকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হতে হয়েছিল। ছোটোবেলা থেকেই ভাষাশিক্ষার প্রতি কেরীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। বারো বছর বয়স থেকেই কেরী পলার্সপিউরির তন্তুবায়-পণ্ডিত টমাস জোন্সের কাছে লাটিন ভাষা শিক্ষা শুরু করেন। শোনা যায়, মাত্র কয়েক মাসেই তিনি একটি লাটিন শব্দকোষ কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন। এ ছাড়া গ্রীক ও হিব্রু ভাষাও তিনি সযত্নে অধ্যয়ন শুরু করেন। কর্মোপলক্ষে স্থানান্তরে

---

১ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কেরী-জীবনচরিত : (১) Eustace Carey, '*Memoir of William Carey*'. (2) George Smith, '*The life of William Carey, Shoemaker and Missionary*'. (3) John Clark Marshman, '*Life and Times of Carey, Marshman and Ward*', 2 vols. (4) S. Pearce Carey, '*William Carey*'.

চলে যেতে হলেও প্রতি রবিবার তিনি পলার্সপিউরিতে আসতেন তাঁর পণ্ডিতের কাছে ভাষাশিক্ষার পাঠ নিতে। পরবর্তী জীবনে বাংলা সহ আরো বহু বিদেশী ভাষা শিক্ষার ভিত্তিভূমি এইভাবে তাঁর প্রথম জীবনেই রচিত হয়।

পিতার সংসারে অসচ্ছলতার জন্য বারো বছর বয়স থেকেই উইলিয়ম কেরীকে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় ব্যাপৃত হতে হয়। প্রথমে বছর দুয়েক কৃষিকার্যে জীবিকানির্বাহের চেষ্টা করেন। কিন্তু রৌদ্রতাপ সহ্য না হওয়ায় সে চেষ্টা তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। ভাবতে অবাক লাগে পরবর্তী জীবনে তিনিই আবার গ্রীষ্মপ্রধান বাংলাদেশে নিদাঘ-পীড়িত দিনগুলিতে ধর্মপ্রচারার্থে গ্রামে শহরে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। যাই হোক, এর পরেই চৌদ্দ বছরের বালক কেরী জীবিকার তাড়নায় হ্যাকেলটনের জুতো-নির্মাতা ক্লার্ক নিকল্‌সের সহযোগী হিসাবে জুতো-সেলাইয়ের কাজ শিখতে আরম্ভ করেন। এই কাজে তিনি চার বছর শিক্ষানবিশী করেন। ক্লার্ক নিকল্‌সের দোকানে কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ ছিল। জুতো-সেলাইয়ের ফাঁকে ফাঁকে তিনি ঐ বইগুলি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করতেন। ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে নিকল্‌সের হঠাৎ মৃত্যুর ফলে তাঁর আত্মীয় টি. ওল্ডের দোকানে কেরী শিক্ষানবীশ হন। আশ্চর্য, এই বদমেজাজী মস্তপ নতুন মনিব প্রায়ই তরুণ যুবক কেরীর সঙ্গে ধর্ম-বিষয়ক তর্কে প্রবৃত্ত হতেন। তর্কযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে কেরী তখন আরো গভীর মনোযোগের সঙ্গে ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন শুরু করেন। জুতো-সেলাইয়ের কাজে নিযুক্ত থাকায় কেরীর মনে কোনো আক্ষেপ ছিল না, বরং সেখান থেকেই তাঁর মন ধীরে ধীরে ধর্মচর্চার প্রতি আকৃষ্ট হতে পেরেছিল। তবে তাঁর কাজের পরিবেশ মোটেই সুস্থ ছিল না, কুসংস্পর্শে তাঁর চরিত্রের অধঃপতন দেখা দিতে থাকে। কিন্তু সেই সময় জন্ ওয়ার (John Warr) নামক জনৈক সহ-শিক্ষানবীশের প্রেরণায় তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ পাল্‌টে যায়, সাময়িক কলুষতাকে কাটিয়ে তাঁর মনে সত্যিকার ধর্মভাব জাগ্রত হয়।

১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে পিডিংটন গীর্জায় মনিব ওল্ডের শ্যালিকা-কন্যা নিরক্ষরা ডরোথি প্ল্যাকেটের সঙ্গে কেরীর বিবাহ হয়। তাঁর বয়স তখন কুড়ি, স্ত্রী ডরোথি আরো পাঁচ বছরের বড়ো। বিবাহের পরে জুতো-সেলাই, ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন, ভাষা-শিক্ষা ও মাঝে মাঝে বাগানের কাজ নিয়ে কেরী বছর দুয়েক নিরুপদ্রব জীবনচর্যায় কাটান। এই সময় ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে নরদামটনশায়ারের ব্যাপটিস্ট মণ্ডলীর সংস্পর্শে এসে কেরী প্রথম রাইল্যাণ্ড, সাটক্লিফ, ফুলার, পীয়ার্স প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। এই পরিচয়ের সূত্র ধরেই বাংলাদেশে তাঁর পরবর্তী মিশনারী জীবনের পটভূমি গড়ে ওঠে।

১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে কেরী হ্যাকেলটন (পিডিংটন) ত্যাগ করে মূলটনে চলে যান এবং সেখানে একটি অবৈতনিক পাঠশালায় শিক্ষকতা শুরু করেন। সঙ্গে জুতো-সেলাইয়ের ব্যবসা আরো কিছুদিন চালান। কিন্তু শেষে তা ত্যাগ করেন। এখানেই তিনি ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা-শিক্ষাও শুরু করেন।

মূলটনে থাকাকালীন ধীরে ধীরে কেরীর মনের গতি ভিন্নমুখী হতে শুরু করে। ক্যাপ্টেন কুকের ভ্রমণবৃত্তান্তের তিনি তখন মনোযোগী পাঠক, দূর-দূরান্তের নেশা নিয়ত তাঁর মন টানে। অন্ধকারাচ্ছন্ন হিদেনদের নিগ্রহের কথা ভেবে দুঃখ-বেদনায় তাঁর মন ভারাক্রান্ত, অধীর আগ্রহে তিনি ভাবতে থাকেন— খ্রীস্টানধর্মের আলোকে তাদের মুক্তির পথ ত্বরান্বিত করার উপায় কী। ক্রমে মূলটনের শিক্ষকতাও তিনি ত্যাগ করলেন। পরিশেষে ধর্মযাজকবৃত্তিকেই তিনি শ্রেয়তম বলে গ্রহণ করেন এবং ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে লীস্টার শহরের হার্ভি লেনে পুরোপুরি পাদরির কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে কেরীর বিখ্যাত গ্রন্থ— '***An Enquiry into the Obligations of Christians to use means for the conversion of the Heathen***'— মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়। হিদেনদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে কেরী ক্রমশ সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং ঐ সময়ে তিনি তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে ধর্মপ্রাণব্যক্তিদের কয়েকটি সমাবেশে আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের ২রা অক্টোবর কেরী, সাটক্লিফ, ফুলার, রাইল্যাণ্ড, হগ প্রভৃতির উপস্থিতিতে কেটারিঙে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক সভায় 'The Particular Baptist Society for Propagating the Gospel Amongst the Heathen' নামক সমিতি গঠিত হয়। কার্যত ঐ সভাই ছিল ইংলণ্ডের ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটির প্রথম সভা। জন টমাস নামক জনৈক ব্রিটিশ প্রোটেস্টান্ট ধর্মযাজক ইতিমধ্যে দুবার বাংলাদেশে ঘুরে এসেছেন। সেখানে ধর্মপ্রচারের কাজ অসম্পূর্ণ রেখে ঐ সময় টমাসকে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টায় ইংলণ্ডে ফিরে আসতে হয়। টমাসই প্রথম কেরীকে তাঁদের সমিতির ধর্মপ্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে বাংলাদেশকে নির্বাচিত করতে অনুরোধ করেন। অনেক বিচার বিবেচনার পর সমিতি টমাসের এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন এবং কেরী সর্বাগ্রে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই কাজের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসেন। প্রভূত আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে জন টমাসের নেতৃত্বে উইলিয়ম কেরী— পত্নী ডরোথি, শ্যালিকা ক্যাথারিন প্ল্যাকেট, পুত্র ফেলিক্স, উইলিয়ম, পিটার ও সদ্যোজাত জাবেজকে সঙ্গে নিয়ে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই জুন কাপ্টেন ক্রিস্মাসের অধীনে পরিচালিত ডেনিস ইণ্ডিয়াম্যান 'প্রিন্সেস মারিয়া' (*Kron Princesse Marie*) জাহাজ-যোগে বাংলাদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। কেরীর বয়স তখন ৩২ বছর, তাঁর জীবনের পরবর্তী ৪১ বছর তিনি বাংলাদেশে কাটান ও সেখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবনের এই বৃহত্তর অংশ বাংলাদেশে অতিবাহিত করে তিনি খ্রীস্টের বাণী প্রচারে সমর্থ হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যের সহায়ক হিসাবে বাংলা ভাষাচর্চা ও বাংলা মুদ্রণের প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করায় কেরী বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হয়ে রইলেন।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর টমাস ও কেরী সপরিবারে কলকাতায় পৌছেন।

জাহাজঘাটে টমাসের প্রাক্তন মুন্শী রামরাম বসু তাঁদের অভ্যর্থনা করেন। এর আগে টমাস যখন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আসেন সেই সময় প্রায় সাড়ে ছয় বছর আগে ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের ৮ই মার্চ তারিখ থেকে রামরাম বসু তাঁর ভাষাশিক্ষক ছিলেন। এবারে কেরীর কলকাতায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে আবার রামরাম বসুর উপরই কেরীকে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেবার দায়িত্ব অর্পিত হয়। বাংলা ভাষাশিক্ষার কাজে টমাসও কেরীকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। কেরী জাহাজেই টমাসের কাছে বাংলা শিখতে শুরু করেন। টমাসও জাহাজে বসেই হিব্রু ভাষায় পারদর্শী কেরীর সাহায্যে জেনেসিসের অনুবাদ শেষ করেন।

কেরীর কলকাতায় পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই রামরাম বসু মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে তাঁর মুন্শী নিযুক্ত হন। বাংলা ভাষাশিক্ষা ও অনুবাদের কাজে রামরাম বসুর সাহায্য কেরীর কাছে অপরিহার্য ছিল। তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। মদনাবাটীতে থাকাকালীন একটি নৈতিক অপরাধের ফলে কিছুকালের জন্য রামরাম বসুকে কেরী বিদায় দিতে বাধ্য হন, কিন্তু পরে আবার তিনি বসুকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকগোষ্ঠীর মধ্যে টেনে আনেন ও তাঁকে বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনায় অনুপ্রাণিত করেন। সুতরাং দেখা যায়, কেরীর বাংলা ভাষাচর্চা ও মুদ্রণ পরিকল্পনার কাজে তাঁদের উভয়ের এই পারস্পরিক সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে প্রথম কলকাতায় পৌছবার পর থেকেই আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে কেরীকে বাংলা দেশের নানা স্থানে সপরিবারে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। সাড়ে সাত মাস কাল তিনি কলকাতা থেকে ব্যাণ্ডেল, ব্যাণ্ডেল থেকে নদীয়া, নদীয়া থেকে পুনশ্চ কলকাতায় ব্যবসায়ী নেলু দত্তের মানিকতলার বাগানবাড়ি, সেখান থেকে সুন্দরবন অঞ্চলের দেবহাট্টায় সপরিবারে ও মুন্শী-সহ নিঃস্ব অবস্থায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই সময় নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণায় তাঁর স্ত্রী অর্ধোন্মাদিনী হয়ে যান। কিন্তু তবু কেরী তাঁর উদ্দেশ্য ও আদর্শে অবিচল নিষ্ঠায় স্থির থাকেন। বাইবেলের বাণী প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী স্থির করার আগে কেরীর নিজস্ব একটি স্থায়ী আস্তানা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই আস্তানা ও তাঁর উদ্দেশ্যের পক্ষে অনুকূল একটি পরিবেশের সন্ধান করতে করতে শেষ পর্যন্ত কেরী তাঁর পরিবার ও রামরাম বসু-সহ মালদহে গিয়ে পৌছলেন ১৫ই জুন, ১৭৯৪ তারিখে। এরই তিরিশ মাইল উত্তরে মদনাবাটীতে টমাসের চেষ্টায় কেরী উড্‌নীর নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হলেন। এখানে আসার পরই তিনি প্রথম সুস্থির হয়ে বসতে পারেন। এই মদনাবাটীতেই কেরী তাঁর প্রবাসজীবনের প্রথম পর্যায়ের প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর কাল কাটান এবং ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষে এর নিকটবর্তী খিদিরপুর থেকে যাত্রা করে কেরী শ্রীরামপুরে পৌছে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের গোড়া থেকে তাঁর কর্মময় জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু করেন।

মদনাবাটীতে কেরীর জীবন বেশ নিরুপদ্রব ছিল। কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতাও তখন তাঁর এসেছিল। মদনাবাটীতে কাজে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে উড্‌নী তাঁর মাসিক বেতন স্থির করে দেন ২০০ টাকা, এ ছাড়া মোট নীলের উৎপাদনের উপরও তাঁর কমিশন নির্দিষ্ট করে দেন। কেরী তাঁর এই মাসিক আয়ের এক-চতুর্থাংশ, কখনো বা এক-তৃতীয়াংশ কষ্ট করে সঞ্চয় করে ফেলতেন— তাঁর ধর্মপ্রচারের কাজে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে। কাজের অবসরে কেরী সাধারণ লোকদের সঙ্গে মিশতেন, মাঝে মাঝে ধর্মপ্রচারে বেরোতেন, আর ঐকান্তিক নিষ্ঠায় বাংলা ভাষাচর্চায় ব্যাপৃত থাকতেন। মদনাবাটীর এই শান্ত সমাহিত নিরুপদ্রব জীবন পরবর্তীকালে তাঁর কর্মব্যস্ত সংগ্রামমুখর জীবনের জন্য রসদ সঞ্চয়ে সহায়তা করেছিল।

মদনাবাটীতে পৌছবার পর থেকেই কেরী যথেষ্ট গুরুত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা ভাষাচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। মূলত রামরাম বসুই, স্বল্প কিছুকাল টমাসও ছিলেন তাঁর প্রধান ভাষাশিক্ষক। ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাংলায় বাইবেল অনুবাদের কাজও শুরু করে দেন। ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর মদনাবাটী থেকে বিলেতে ফুলারকে লেখা একটি চিঠিতে কেরী জানান যে ভগবানের আশীর্বাদে তিনি নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। ['I have, through the good hand of my God upon me, now nearly translated all the New Testament'···Eustace Carey, '*Memoir of William Carey*', pp. 275-76]

১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাস থেকেই নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ মুদ্রণের কাজে কেরী বিশেষভাবে আগ্রহী ও উদ্যোগী হয়ে ওঠেন।[১] তখন থেকেই তিনি ধীরে ধীরে তাঁর বাংলা মুদ্রণ পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে এগোতে থাকেন। বাংলায় বাইবেল ছাপার উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি ইংলণ্ড থেকে এক সাট বাংলা হরফ তৈরি করিয়ে আনাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই সে পরিকল্পনা তিনি ত্যাগ করেন, কারণ খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলেন যে ইতিমধ্যেই কলকাতায় বাংলা মুদ্রণ প্রচলিত হয়েছে এবং তাঁর প্রয়োজনীয় বাংলা মুদ্রাক্ষর তখন কলকাতাতেই পাওয়া যেতে পারে। কলকাতায় কোম্পানীর প্রেসে বা সরকারী ছাপাখানা থেকে যে-সব আইনের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলিতে, বিশেষ করে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে সরকারী ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হেন্‌রি পিট্‌স ফরস্টার কর্তৃক বাংলায় অনূদিত 'কর্নওয়ালিস কোড'-এ যে বাংলা হরফ ব্যবহৃত হয় কেরী তার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই বইয়ের অপেক্ষাকৃত ছোটো আকারের সুন্দর বাংলা মুদ্রাক্ষরগুলির কথাই কেরী ইংলণ্ডে প্রেরিত তাঁর চিঠিপত্রে উল্লেখ করেছিলেন।[২] সুতরাং কলকাতাতেই যখন পছন্দমত প্রয়োজনীয় বাংলা হরফ পাওয়া সম্ভব, তখন কেরী লণ্ডনের বিখ্যাত ঢালাইকর ক্যাসলন

১ J. C. Marshman, '*Life and Times of Carey, Marshman and Ward*', Vol. I, pp. 68-69.
২ *Ibid*, Vol. I, pp. 71-77.

থেকে বাংলা হরফ বা তার ছাঁচ আমদানীর যে পরিকল্পনা পূর্বে করেছিলেন তা ত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করলেন। তা ছাড়া কেরী হিসাব করে দেখলেন যে লণ্ডন থেকে হরফ তৈরির ছাঁচ (punch) আনাতে গেলে তার দাম কলকাতার ছাঁচের তুলনায় অনেক বেশি পড়ে যাবে। প্রথমে তিনি খবর পেয়েছিলেন ইংলণ্ডে একটি ছাঁচের দাম ৫ শিলিং, কিন্তু পরে জানতে পারেন তখন লণ্ডনে একটি ছাঁচের দাম এক গিনি।[১] আগের হার অনুযায়ী কেরী হিসাব করে দেখেন যে প্রতি সাটের জন্য ৬০০টি হরফ কাটতে হলে তার ছাঁচের দাম পড়বে ৬০০ × ৫ শিলিং বা ১৫০ পাউণ্ড এবং সমগ্র বাইবেল মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় হরফের দাম পড়বে ৫০০ পাউণ্ড (বা ৪০০০ টাকা)।[২] বর্ধিত হারে এই খরচ আরো বেড়ে যাবে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত কেরী স্থানীয় কারখানা ও শিল্পীদের কাছ থেকেই বাংলা মুদ্রণের উপরকরণ সংগ্রহ করতে মনস্থ করেন।

বাংলা ছাঁচ তৈরি ও তার ঢালাইয়ের কাজ কলকাতাতেই করা সম্ভব জেনে তাঁর বাংলা মুদ্রণ-পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার বিষয়ে কেরী আরো খোঁজখবর নিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তিনি টমাস মারফত কলকাতার মুদ্রাকরের কাছ থেকে তাঁর নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ মুদ্রণের খরচের একটা হিসাব নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই খরচের হিসাব দেখে তিনি স্বভাবতই খুব হতাশ হন। ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে নেওয়া ঐ হিসাব থেকে দেখা যায়, কলকাতায় তাঁর বাংলায় অনূদিত নিউ টেস্টামেন্টের দশ হাজার কপি ছাপাতে খরচ লাগবে ৪৩৭৫০ টাকা বা ৪৪০০ পাউণ্ড। তখন কলকাতায় কাগজ সমেত প্রতি সীট বা ফর্মা ছাপতে খরচ পড়ত ছ'আনা। কেরীর হিসাবে তাঁর বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট ছাপতে ৩৫ সীট বা ফর্মা (অর্থাৎ ৮ পেজী আকারের ৩৫ × ৮ = ২৮০ পৃষ্ঠা) কাগজ লাগবে। সুতরাং প্রতি কপি নিউ টেস্টামেন্ট ছাপতে খরচ পড়ে ৩৫ × ২ = ৭০ আনা (৪ টাকা ৬ আনা), এবং দশ হাজার কপি ছাপার খরচ ৪৩৭৫০ টাকা বা ৪৪০০ পাউণ্ড।[৩] [S. P. Carey ঐ খরচের হিসাব দিয়েছেন ৪৪,০০০ পাউণ্ড ! এটি ভুল। (S. Pearce Carey, '*William Carey*', P. 179)]। প্রস্তাবিত বাইবেল মুদ্রণের জন্য এত টাকা সংগ্রহ করা তখন কেরীর সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত। সুতরাং তিনি তখন লণ্ডনস্থিত সোসাইটির শরণাপন্ন হন। পূর্বোক্ত হিসাবের সূত্রে কেরী আরো জানান যে তাঁর বাংলা বাইবেল যদি লিপিকরদের দিয়ে হাতে লেখানো যায় তা হলেও প্রতি ৩২ হাজার অক্ষরের জন্য এক টাকা হিসাবে অনেক খরচ পড়ে যাবে। তা ছাড়া এইরূপ হাতে লেখা কপিতে যে পরিমাণ ভুল হওয়া সম্ভব তা সংশোধনের অযোগ্য। ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর কেরী ফুলারকে লেখা ঐ চিঠিতে জানান যে

---

১ *Ibid*, Vol. 1, pp. 79-80.

২ E. Carey, *Memoir of William Carey'*, pp. 276-77.

৩ Carey to Fuller, Mudnabatty, Nov. 16, 1796 : E. Carey, *ibid*, pp. 276-77; J. C. Marshman, *op. cit.*, pp. 79-80.

বাংলাদেশে পদার্পণের পর থেকেই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস ও আন্তরিক আগ্রহে তিনি নিউ টেস্টামেন্টের যে বাংলা অনুবাদ শুরু করেছিলেন তা সমাপ্তির মুখে, এমন-কি তাঁর চিঠি লণ্ডনে পৌছবার আগেই এই অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এখন এটি মুদ্রণের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি ঐ চিঠিতে সোসাইটিকে অনুরোধ করেন যেন তাঁরা অবিলম্বে কলকাতায় একটি মুদ্রণযন্ত্র ও প্রয়োজনীয় ছাপার কাগজ পাঠান ; সঙ্গে একজন কর্মনিষ্ঠ দক্ষ মুদ্রাকরকেও পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে কেরী লেখেন : 'if a serious printer could be found willing to engage in the Mission, he would be a great blessing to it, to superintend, for natives would do the work.…Such a printer I knew at Derby before I left England.'[১] কেরী এখানে নিঃসন্দেহে প্রখ্যাত মুদ্রাকর ধর্মপ্রাণ ওয়ার্ড-এর কথাই উল্লেখ করেন, যিনি পরবর্তীকালে শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানার প্রধান কর্ণধার হন। যাই হোক, ইতিমধ্যে ইংলণ্ডস্থিত ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি কেরীর এই আবেদনে সাড়া দিয়ে কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারার আগেই আরেকটি উল্লেখযোগ্য, কিছুটা বা অপ্রত্যাশিত, সুসংবাদের প্রতি কেরীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। একটি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারিতে কলকাতায় দেশীয় ভাষায় হরফ নির্মাণের একটি কারখানা স্থাপিত হয়েছে : 'a letter foundry had been established in Calcutta for the country languages.'[২] [মতান্তরে, ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে কেরী খবর পান যে দেশীয় ভাষার হরফ নির্মাণের একটি কারখানা তখন সবেমাত্র কলকাতায় প্রথম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে স্থাপিত হয়েছে।[৩]] এই চমকপ্রদ সংবাদে স্বভাবতই কেরী অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ কারখানার পরিচালকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। এ সম্বন্ধে আর কোনো বিস্তৃত সংবাদ অবশ্য পাওয়া যায় না, কেবল এইটুকুই জানা যায় যে ঐ হরফ ঢালাইখানায় হরফ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ছাঁচগুলি (punches) চার্লস উইলকিন্স-এর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত জনৈক দক্ষ কারিগরের কাটা। জে. সি. মার্শম্যান তাঁর বইয়ে এই কারিগরের নামোল্লেখ না করলেও সহজেই অনুমান করা যায় যে এখানে পঞ্চানন কর্মকারের কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেরী অচিরেই এই হরফ নির্মাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তিনি তখন নিঃসংশয় হন যে বাংলা হরফের জন্য আর ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষী হওয়ার দরকার নেই, প্রয়োজন মতো তা এখান থেকেই সংগ্রহ করা যাবে।

বাংলা হরফ ছাড়াও কেরীর আর-একটি অভাব ছিল— মুদ্রণযন্ত্র। ১৭৯৮ সালের

---

১ E. Carey, *op. cit.*, pp 276-77.

২ J. C. Marshman, *op. cit.*, pp. 79-80.

৩ S. Pearce Carey, '*William Carey*', p. 179.

গোড়া থেকেই কেরী মদনাবাটিতে উড্নীর সহয়তায় একটি ছাপাখানা স্থাপনে প্রয়াসী হন। জনৈক Powell তাঁর জন্য একটি মুদ্রণযন্ত্র নির্মাণে উদ্যোগী হন। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ফুলারকে লেখা কেরীর চিঠিতে এর সাক্ষ্য পাওয়া যায় : '...I have also been talking with Mr. Udnag about setting up a printing press at Mudnabatty, which he highly approves of, and I believe will contribute liberally towards it. Mr. Powell will be able to construct a press, and workmen may be obtained from Calcutta...'[১] এই মুদ্রণযন্ত্র সংগ্রহের সমস্যাটি অবশ্য শীঘ্রই এক আকস্মিক শুভ যোগাযোগের ফলে সহজ হয়ে আসে। এর অল্প কিছুকাল পরেই বিদেশ থেকে সদ্য আমদানী করা কাঠের তৈরি একটি মুদ্রণযন্ত্র কলকাতায় নীলামে বিক্রির খবর বেরোয়। উড্নীর বদান্যতায় ৪০ পাউণ্ড মূল্যে [J. C. Marshman, '*Life and Times of Carey, Marshman & Ward*', pp. 79-80 ; মতান্তরে, ৪৬ পাউণ্ড মূল্যে : S. P. Carey, '*William Carey*', p. 179 ; বা ৪০০ টাকা মূল্যে : Carey to Baptist Society, Hooghly River, Jan. 10, 1799 : E. Carey, '*Memoir of W. Carey*', p. 330] কেরী তৎক্ষণাৎ ঐ কাঠের তৈরি মুদ্রণযন্ত্রটি সংগ্রহ করেন। কলকাতা থেকে অত্যুৎসাহে ওটি মদনাবাটীতে (১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) নিয়ে যাওয়া হয়। কেরীর মুখে ঐ যন্ত্রটির অশ্রুতপূর্ব অলৌকিক ক্ষমতা ও গুণাবলীর কথা শুনে ও ঐটিকে ঘিরে মিশনারী সাহেবদের হৈ-চৈ ও উৎসাহ লক্ষ্য করে স্থানীয় অধিবাসীরা এর নাম দিয়েছিল— 'সাহেবদের পুতুল বা ভগবান' ('European idol' বা 'Sahibs' idol')।

কেরীর বাংলা বাইবেল মুদ্রণ পরিকল্পনা ও তার আনুষঙ্গিক বাংলা হরফ ও ছাপাখানা সংগ্রহের সমস্যা এইভাবে ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসে। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের বসন্তকালে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস নাগাদ কেরী একবার মদনাবাটী থেকে কলকাতায় আসেন। চার্লস শর্ট (Charles Short) নামক জনৈক বন্ধুর অসুস্থতার কথা শুনে তিনি তাঁকে দেখতে আসেন। এ ছাড়াও কেরীর উদ্দেশ্য ছিল, তখন কলকাতা থেকে তাঁর বাইবেল মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় বাংলা হরফ কিনে নিয়ে যাওয়া।[২] ১৭৯৯ সালের গোড়ার দিকে কেরী কলকাতায় গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর অভীষ্ট কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। সেখানকার নব প্রতিষ্ঠিত দেশীয় হরফ ঢালাইখানায় অগ্রিম টাকা দিয়ে তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় বাংলা হরফ ঢালাইয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেন। এপ্রিলের আগেই এই হরফ নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যে উড্নী কেরীকে ২৪০০ টাকা অগ্রিম দেন ও পরে আরো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। কেরী হিসাব করে দেখেন যে তাঁর সমগ্র বাংলা বাইবেলের এক হাজার কপি ছাপতে হরফ, কাগজ, কর্মীদের মজুরী ও মুদ্রণের অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ মোট খরচ হবে ২০০০

১ E. Carey, *op. cit.*, p. 316.

২ S. P. Carey, *op. cit.*, p. 182.

পাউণ্ড বা ১৬০০০ টাকা। নিঃসন্দেহে তা খুবই শস্তা, প্রচলিত হারের অর্ধেক মাত্র। এর প্রতি কপি ৩২ টাকা হারে ৫০০ কপি বিক্রি করতে পারলেই সমস্ত খরচও উঠে আসবে। ১লা এপ্রিল ১৭৯৯ তারিখে মদনাবাটী থেকে বিলেতে ব্যাপটিস্ট সোসাইটিকে লেখা কেরীর চিঠিতে সমগ্র বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে : 'I wrote to you, dt. Jan. 10, current, on my journey to Calcutta, and now inform you, that I fully succeeded in accomplishing the end of my journey thither, which was to get types cast for printing the Bible. The types are now casting. A gentleman in this neighbourhood has already advanced two thousand four hundred rupees, for the expense; and I have drawn a set of bills in triplicate, dt. Mar. 19th current, on Mr. Thomas King, of Birmingham, for the amount, in favour of George Udney, Esq., at two shillings and six pence per rupee, viz., £300 sterling, which I hope will be duly honoured. I shall have occasion to draw for £200 more to finish the furniture of the printing house, besides what I shall want for workmen, paper, etc.; which, I suppose, will make the whole expense about £2000, or sixteen thousand rupees. The whole Bible and New Testament will be printed in four volumes, octavo; and if I can perform it for the sum I have mentioned, it will be the cheapest work that was ever published in India by one half. I propose to print one thousand copies,···Of these, however, if five hundred copies can be disposed of at thirty-two rupees each, it will pay the whole expense; and we shall have five hundred copies to give away···'[১]

১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ কলকাতার ঐ হরফ ঢালাইখানায় কেরীর প্রয়োজনীয় বাংলা হরফ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়। ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯৯ তারিখে কেরী ফুলারকে লেখা একটি চিঠিতে জানান যে ফাউন্টেন কলকাতা থেকে ফেরার পথে ঐগুলি মদনাবাটীতে নিয়ে আসবেন : 'I had a letter, a month ago or more, informing me that the types and furniture for printing would be fiinished in about eight days; so that I conclude they are coming up by this time; but at any rate, brother Fountain, who is going to Calcutta, to meet our brethren, Ward and Brunsdon, and a female companion for himself, will bring them up···'[২]

---

১ E. Carey, *op. cit.*, pp. 334-35.

২ *Ibid*, p. 345.

১৮০০ সালে শ্রীরামপুরে মিশন ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার আগে অবশ্য কেরীর বাংলা মুদ্রণ পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি, তবু এ কথা অনস্বীকার্য, অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে বাংলা মুদ্রণের উপকরণ সন্ধানে কেরীর এই অক্লান্ত প্রয়াসই শেষ পর্যন্ত তাঁর চরম সার্থকতা লাভ সম্ভব করে তুলেছিল। কেরীর বাংলাদেশে পদার্পণের পরবর্তী ছয় বৎসর-ব্যাপী কার্যকলাপ ও আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মদনাবাটীতে থাকাকালীন আত্মপ্রকাশের প্রস্তুতিপর্বের মধ্যেই শেষ পর্যন্ত কেরী তাঁর অদম্য উৎসাহ ও নিরলস পরিশ্রমের ফলে নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন এবং তা ছাপার জন্য একটি কাঠের তৈরি মুদ্রণযন্ত্র ও কলকাতায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে স্থাপিত দেশীয় ভাষার হরফ নির্মাণের কারখানা থেকে বাংলা হরফ সংগ্রহের কাজও সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু তাঁর ছাপার কাজ শেষ পর্যন্ত মদনাবাটীতে আর শুরু করা যায়নি। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে উড্‌নী মদনাবাটীর ভগ্নপ্রায় নীলকুঠি বন্ধ করে দেওয়ায় কেরীকে জীবিকার প্রয়োজনে অন্য আশ্রয়ের সন্ধান করতে হয়। মদনাবাটী থেকে মাইল দশেক দূরে খিদিরপুরে উড্‌নীর কাছ থেকে ৩০০ পাউণ্ড মূল্যে কেরী ছোটো একটি নীলকুঠি ক্রয় করেন ও সপরিবারে সেইখানেই চলে যান। কিন্তু কেরীর ব্যবসায়িক বুদ্ধি বা ঝোঁক বিশেষ না থাকায় ঐ কুঠির কাজও আশানুরূপ এগোতে পারে না। তা ছাড়া উড্‌নীও ঐ সময়ে উচ্চতর সরকারী চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। তাঁর পরবর্তী যে ব্যক্তির হাতে মালদহের কুঠিগুলির দায়িত্ব অর্পিত হয়, তিনি ছিলেন মিশনারী কার্যকলাপের ঘোর বিরোধী। ফলে কেরীর পক্ষে ওখানকার পরিবেশ অত্যন্ত প্রতিকূল হয়ে ওঠে। এই দুঃসময়ে ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ এক অপ্রত্যাশিত নতুন সুযোগ এসে যায় কেরীর কাছে। ফলে তাঁর জীবন ও কর্মের স্রোত নতুন পথে মোড় নয়।

ইংলণ্ডের ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি বাংলাদেশে কেরীর ধর্মপ্রচারের কাজকে আরো জোরদার করার জন্য অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি চারজন মিশনারীর আর-একটি দলকে কলকাতা অভিমুখে পাঠান। এই দলে ছিলেন প্রখ্যাত মুদ্রাকর উইলিয়ম ওয়ার্ড। আর ছিলেন জোশুয়া মার্শম্যান, ব্রান্সডন ও গ্রাণ্ট। ১৩ই অক্টোবর, ১৭৯৯ তারিখে তাঁরা দিনেমার গভর্নর কর্নেল বী'র শাসনাধীন শ্রীরামপুরে পৌছন। তদানীন্তন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় ধর্মবিধির উপর ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের ফলে ভারতবর্ষে তাঁদের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে এই আশঙ্কায় এদেশে মিশনারী কার্য-কলাপকে মোটেই সুনজরে দেখতেন না, তাই তাঁরা অবিলম্বে ঐ মিশনারী দলকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করার আদেশ দেন। কিন্তু কেবলমাত্র কর্নেল বী'র দৃঢ়তা ও বদান্যতায় তাঁরা রক্ষা পান, ও শ্রীরামপুরে আশ্রয় নেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লী তাঁদের ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু মদনাবাটী অঞ্চলে তাঁদের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার আবেদন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন। কলকাতার বাইরে কোম্পানীর কোনো

এলাকায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার তারা ঘোর বিরোধী ছিলেন। এমন-কি ঐ সময়ে ওয়েলেস্লী কলকাতার পত্র-পত্রিকাগুলি সম্বন্ধেও অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রার সময় তিনি Sir Alured Clarke-এর উপর কলকাতার সরকারী কর্তৃত্বের ভার দিয়ে যান ও প্রসঙ্গত আদেশ দেন : 'If you can not tranquillise the editors of this and other mischievous publications, be so good as to suppress their papers by force, and send their persons to Europe.'[১] এই একই সময়ে (নভেম্বর, ১৭৯৯) ওয়েলেস্লী মুদ্রণব্যবস্থার উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ ('rigid censorship of the press') বলবৎ করেন। দুর্ভাগ্যবশত, কলকাতার সরকারী মহল যখন মুদ্রাকর-প্রকাশক-সম্পাদকদের সঙ্গে এইরূপ এক বিরোধের আবহাওয়ার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন, ঠিক সেই সময়ই মিশনারীদের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার আবেদন পেয়ে তাঁরা সরাসরি তা প্রত্যাখান করে দেন। মূলকথা, তদানীন্তন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মিশনারীদের কার্য-কলাপকে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখতেন, এবং তাঁদের কোনো এলাকায় মিশনারী-ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হোক্ আদৌ তাঁরা তা চাননি। ফলে ব্রিটিশ এলাকার বাইরে শ্রীরামপুরই ছিল তখন তাঁদের একমাত্র আশা-ভরসা ও আশ্রয়স্থল। নবাগত ওয়ার্ড মার্শম্যান প্রমুখ ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা তাই শ্রীরামপুরেই তাঁদের মিশন ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

তাঁদের পক্ষ থেকে তখন মুদ্রাকর ওয়ার্ড স্বয়ং একটি দিনেমার পাশপোর্ট সংগ্রহ করে কেরীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন ১লা ডিসেম্বর, ১৭৯৯ তারিখে। তিনি কেরীকে জানালেন শ্রীরামপুরে মিশন ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এবং ঐ কাজে তাকে যোগদানের সাদর আমন্ত্রণ। ভগবানের নির্দেশ হিসাবেই কেরী তা সানন্দে গ্রহণ করেন এবং ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর কেরী সকলকে নিয়ে খিদিরপুরের সম্পত্তি ত্যাগ করে শ্রীরামপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। সঙ্গে নিলেন তাঁর নীলামে কেনা কাঠের তৈরি মুদ্রণযন্ত্রটি। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তাঁরা শ্রীরামপুরে পৌছলেন, শুরু হল শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ও তার ছাপাখানার জয়যাত্রা। নেতৃত্বে রইলেন কেরী, আর তাঁর প্রধান সহযোগী হলেন মার্শম্যান ও ওয়ার্ড। সেখান থেকেই বাংলা মুদ্রণের 'বিকাশ' পর্বের সূচনা।

---

১ J. C. Marshman, *op. cit.*, p. 119.

বিকাশ পর্ব

(১৮০০-১৮১৬)

প্রথম অধ্যায়
বিকাশের পথে বাংলা মুদ্রণ

ঊনবিংশ শতাব্দীর যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা মুদ্রণের রঙ্গমঞ্চে নতুন দৃশ্যের অবতারণা শুরু হয় এবং সেদিন থেকেই বলা যায় বাংলা মুদ্রণের 'বিকাশ' পর্বের সূচনা। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই বিকাশ পর্বের কালপরিধি বিস্তৃত বলে চিহ্নিত করা যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে যে মুদ্রণ প্রচেষ্টার সূত্রপাত, ঊনবিংশ শতাব্দীর চৌহদ্দিতে পৌছবার পর থেকেই তার বিকাশের লক্ষণ পরিস্ফুট হতে থাকে। দেখা যায়, বাংলা মুদ্রণধারা তখন আর 'সূচনা' পর্বের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নেই, আলোচ্য পর্বে তার সৃষ্টির পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, মুদ্রিত গ্রন্থাদির সংখ্যা বেড়েছে, বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও তা ব্যাপকতর হয়েছে, মুদ্রণযন্ত্র ও আনুষঙ্গিক উপকরণের আয়োজন-সংখ্যা ও মান আরো উন্নত হয়েছে, ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ আরো সংহত ও শক্তিশালী হয়েছে। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, দৃঢ়তর সংকল্প, গভীরতর নিষ্ঠা এবং ব্যাপকতর আয়োজন ও সম্বলের ফলেই আলোচ্য পর্বের বাংলা মুদ্রণধারা প্রাণোচ্ছল সৃষ্টির আবেগে বিকশিত হতে পেরেছে। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারই প্রত্যক্ষ প্রভাবে এই পর্বের সূচনা। কারণ, মূলত এই দুটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ, উৎসাহ, প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই বাংলা মুদ্রণের প্রায় অকর্ষিত শুষ্ক খাতে প্রথম জোয়ার আসে এবং এরই ফলশ্রুতি হিসাবে আমাদের মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডার বিকশিত লাবণ্যে নিত্য নতুন ফসলে ভরে ওঠে। অপরপক্ষে, এই বিকাশ পর্বের শেষ সীমা চিহ্নিত করা হয়েছে ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে, কারণ তারপরেই ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির মতো একটি বৃহৎ মুদ্রণোৎসাহী সংস্থার প্রতিষ্ঠা ও ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বাংলা মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশনের মধ্য দিয়ে বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে আর-এক নতুন পর্বের সূচনা হয়। এই নতুন পর্ব অজস্র মুদ্রিত গ্রন্থ ও পত্রিকার দানে ভরে ওঠে এবং আমাদের মুদ্রণজগৎ এক নতুন উজ্জ্বল দিগন্তের পথে প্রসারিত হয়। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই যে নতুন পর্বের সূচনা তাকে তাই বাংলা মুদ্রণের 'বিস্তার' পর্ব আখ্যা দিয়েছি এবং এই নব পর্ব সূচনার প্রাক্মুহূর্ত পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের শেষ পর্যন্ত আমি আলোচ্য 'বিকাশ' পর্বের প্রান্তসীমানা নির্দিষ্ট করতে চেয়েছি।

বাংলা মুদ্রণের সূচনা পর্বের মতো বিকাশ পর্বেও বিদেশী প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকরী ছিল। বরং বলা উচিত, এই পর্বেও বিদেশী প্রভাবই বাংলা মুদ্রণের বিকাশের পথকে উন্মুক্ত

ও সুগম করেছিল এবং এর গতিকে দ্রুত সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছিল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য, এই পর্বে এসে মুদ্রণ প্রচেষ্টার বিদেশী প্রভাব ও শক্তির সঙ্গে দেশীয় প্রতিভা ও ঐতিহ্য সম্মিলিত হয়েছিল। ফলত বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির চেহারা ও চরিত্রে যেমন মৌল পরিবর্তনের রূপটি ধরা পড়ে, পর্বান্তরের নানা লক্ষণও তেমনি সেখানে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র আইনানুবাদ ও ব্যাকরণ অভিধানের গণ্ডি ত্যাগ করে ছাপার হরফে বাংলা গদ্যের স্বচ্ছন্দ বিহার এখন থেকে শুরু হয়। অনূদিত কাহিনী ও সংকলন গ্রন্থ ছাড়াও কিছু কিছু মৌলিক বাংলা গদ্যরচনার সন্ধান পাওয়া যেতে থাকে। রাজা প্রতাপাদিত্য ও কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী, কথোপকথনে সাধারণ মানুষের কথ্যভাষার রূপ, লিপিমালায় পত্ররচনার আদর্শ, বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, তোতাকাহিনী, ইতিহাসমালার গল্পকথা, রাজাবলীর ইতিহাস প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে সমকালীন বাংলা গদ্যরচনার ধারা প্রসারিত হয়। মিশনারী বাংলায় বাইবেল অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে ছাপার হরফে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত হাতে পেয়ে চমৎকৃত ও রসতৃপ্ত বাঙালী পাঠক বাংলা মুদ্রণের এই অনাস্বাদিতপূর্ব নবযুগের শুভাগমনকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েছিল নিঃসন্দেহে। ব্রিটিশ শাসক ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের আন্তরিক প্রয়াস, নিরন্তর উৎসাহ ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত কর্মদক্ষতার সঙ্গে বাঙালী মনীষা ও শিল্পনৈপুণ্য যুক্ত হয়েছিল বলেই বাংলা মুদ্রণের বিকাশের কাজ ত্বরান্বিত, জনপ্রিয় ও সার্থক হতে পেরেছিল। একদিকে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, গোলোকনাথ শর্মা, মোহনপ্রসাদ ঠাকুর প্রভৃতি বাঙালী লেখক-সম্প্রদায়ের অবদান এবং অপরদিকে পঞ্চানন কর্মকার, মনোহর কর্মকার, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, রামকমল সেন, বাবুরাম, লল্লুলাল প্রভৃতি দেশীয় শিল্পী ও মুদ্রণব্যবসায়ীদের শিল্পনৈপুণ্য ও কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে দেশীয় প্রতিভার যে সামগ্রিক রূপটি ফুটে উঠেছিল তারই কল্যাণস্পর্শে বাংলা মুদ্রণের বিকাশ পর্ব সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদেশী শাসনের আগ্রাসী ভূমিকায় যখন শাসন, শোষণ ও বৈরিতাই প্রকট হয়ে ওঠা স্বাভাবিক, সেই যুগসন্ধিক্ষণে বিদেশী ও দেশীয় প্রতিভা ও কর্মোদ্যোগের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের বিরল দৃষ্টান্ত হিসাবে বাংলা মুদ্রণের বিকাশ পর্ব গড়ে উঠেছিল।

এই পর্বে বাংলা মুদ্রণশিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্যও বিকশিত হয়ে উঠেছিল। 'ধর্মপুস্তক' বা ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্টের বঙ্গানুবাদ ছেপে শ্রীরামপুর মিশনারীদের পক্ষে ধর্মপ্রচারের উন্মাদনায় ও উদ্দেশ্যগত পরম সার্থকতার আনন্দে অভিভূত হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু বাঙালী পাঠকের কাছে ঐ 'মিশনারী বাংলা'র কোনো আকর্ষণ ছিল না; বরং এ সম্বন্ধে তাদের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ, অবজ্ঞা, অনুকম্পা ও অনীহা গড়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক। আলোচ্য পর্বে যেটুকু সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল তা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙালী লেখকগোষ্ঠীর অবদানেই ঘটেছিল। কেরী প্রমুখ মিশনারী অনূদিত খ্রীস্টান ধর্ম-

পুস্তকাদি বাংলা সাহিত্যের আসরে কোনো স্থায়ী আসন লাভের অধিকারী ছিল না। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টার পরোক্ষ প্রভাবে বাংলা ভাষা সাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছিল। এই প্রভাব পড়েছিল মূলত বাংলা মুদ্রণশিল্পের উন্নতি ও বিকাশের ফলে। স্বাভাবিক কারণেই বিদেশী মিশনারীদের পক্ষে আদর্শ বাংলা রচনা সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রধানত তাঁদের প্রচেষ্টাতেই বাংলা মুদ্রণের আদর্শরূপ গড়ে উঠেছিল। বুদ্ধিজীবী বাঙালী তার মুখের ভাষাকে ছাপার হরফে প্রত্যক্ষ করে নিঃসন্দেহে উৎসাহিত হয়েছিল এবং সেই উৎসাহের বন্যায় ধীরে ধীরে সাহিত্যের ডাঙা জেগে উঠতে শুরু করেছিল। ক্রমশ উন্নততর ছাপার প্রয়োজনে বাংলা মুদ্রাক্ষর তৈরির পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবিরাম চলেছিল এই পর্বে, ফলে বাংলা ছাপার হরফ হস্তাক্ষরের বহু জটিল বঙ্কিম বিন্যাস ও মেদবাহুল্য ত্যাগ করে একটি সুষম আদর্শ রূপ বেছে নিতে পেরেছিল। আকারেও তা পূর্ববর্তী সূচনা পর্বের তুলনায় অনেক ছোটো ও নয়নশোভন হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া বিকাশ পর্বে পৌছে বহু বাংলা মুদ্রাক্ষর আধুনিক ধাঁচে রূপান্তরিত হয়েছিল। যেমন, 'জ', 'র', 'ট', 'প', 'ং', 'কু', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলা ছাপার হরফের এই রূপান্তর, আধুনিকীকরণ ও আদর্শ স্থাপন বাংলা মুদ্রণের বিকাশ পর্বের অন্যতম বিশিষ্ট অবদান।

আলোচ্য পর্বে বাংলা গদ্যের বিকাশের কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'মিশনারী' বাংলার ব্যর্থতা যেমন আমরা লক্ষ্য করেছি, এই পর্বে কয়েকজন বিশিষ্ট বাংলা গদ্যশিল্পীর আবির্ভাবের কথাও উল্লেখ্য। বিশেষ করে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মতো গদ্যশিল্পীর অবদানের ফলে আলোচ্য বিকাশ পর্বের মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডার উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী হতে পেরেছে। ব্রিটিশ শাসক ও মিশনারীদের যৌথ উদ্যোগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারার্থে এইসব বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচিত হলেও, মুদ্রণশিল্পের কল্যাণে সেগুলি বাংলা গদ্যসাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ হয়ে রইল। এখানেই বক্ষ্যমান পর্বের পরম সার্থকতা।

গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলীর শাসনকালে এই পর্বের সূচনা। তাঁর ও পরবর্তী অন্যান্য গভর্নর জেনারেলের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কর্মনীতির উপর বক্ষ্যমান পর্বের মুদ্রণধারার গতি প্রকৃতি অনেকটা নির্ভরশীল ছিল। সর্বোপরি এ বিষয়ে সরকারী মুদ্রণনিয়ন্ত্রণবিধি অথবা মুদ্রণযন্ত্র এবং পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য প্রকাশন সম্বন্ধে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

আলোচ্য বিকাশ পর্বে বাংলা মুদ্রণের বিকাশের তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে দুটি ধারা মূলত দুটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত হয়েছে: একটি শ্রীরামপুর মিশন ও অপরটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। এ ছাড়া— তৃতীয় ধারাটি ব্যবসায়-ভিত্তিক ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মুদ্রণযন্ত্রকে আশ্রয় করে বাংলা মুদ্রণের বিকাশের পথকে সুগম করে তুলেছিল।

বাংলা মুদ্রণের বিকাশের কাজে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অবদান

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুটি অগ্রগণ্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলা মুদ্রণের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল নিঃসন্দেহে। এই দুটি প্রতিষ্ঠানেরই মূলে ছিলেন বিদেশাগত ইংরেজরা, ভারতবর্ষ থেকে বহুদূরে অবস্থিত একই ছোট্ট দেশের অধিবাসী তাঁরা— এখানে এসে বাংলার বুকে এই দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠান দুটির উদ্দেশ্যও যেমন ভিন্ন ছিল, তাদের উদ্যোক্তারা একই দেশের অধিবাসী হলেও তাঁদের আচার আচরণ উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতিও ছিল ভিন্ন। ফলে কর্মক্ষেত্রে তাঁদের একটি গোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রায়ই অবতীর্ণ হতে দেখা গেছে। বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারাকাঙ্ক্ষী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ইংরেজ রাজপুরুষগোষ্ঠী ব্রিটিশ মিশনারী গোষ্ঠীকে প্রথমাবধিই সন্দেহ ও আশঙ্কার চোখে দেখতেন। শাসকগোষ্ঠীর ধারণা ছিল মিশনারী গোষ্ঠীর ধর্মপ্রচারমূলক কার্যকলাপ তাঁদের স্বার্থের পরিপন্থী। ব্রিটিশ মিশনারীরা এদেশীয়দের মধ্যে খ্রীস্টানধর্ম প্রচার শুরু করলে এদেশে সনাতন ধর্মের প্রতি আঘাত হানা হবে। তার ফলে এদেশীয়দের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক, তাঁরা তখন অনিবার্যভাবে ব্রিটিশ মিশনারীদের বিরুদ্ধে বা সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ জাতি ও তাদের প্রতিনিধি ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবেন। স্বভাবতই এই সম্ভাব্য পরিণতি ও পরিস্থিতি বাংলাদেশের তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসকদের অভিপ্রেত ছিল না, সুতরাং তাঁরা মিশনারী কার্যকলাপকে আদৌ উৎসাহ দিতে চান নি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন, এমন-কি ভারতের ব্রিটিশ শাসনাধীন এলাকায় ব্রিটিশ মিশনারীদের প্রবেশও ক্ষেত্রবিশেষে নিষিদ্ধ করেছেন। সাধারণভাবে এই বিরোধের পরিবেশে থেকেও যে শেষ পর্যন্ত সরকারী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে উইলিয়ম কেরী প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন, এমন-কি সাদরে গৃহীত হয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে এক আশ্চর্য ও শুভ ব্যতিক্রম। কেরীর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করার ফলেই শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে সরকারী মহল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে, একে অন্যের পরিকল্পনা ও স্বার্থের পরিপূরক ও সহায়ক হয়ে ওঠে এবং এরই ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলা মুদ্রণ ও বাংলা গ্রন্থ প্রকাশনের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়। বলা যেতে পারে, কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদান করায় পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ও কলেজ গোষ্ঠীর যেন একটি যৌথ সত্তা গড়ে ওঠে এবং তারই প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বের বাংলা মুদ্রণধারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতে থাকে।

বাংলা মুদ্রণের বিকাশ পর্বে এই সহযোগিতার ফলশ্রুতি আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনার পূর্বে সমসাময়িককালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিশনারীদের সম্পর্ক, বৈরিতা, বিরোধিতা ও সহযোগিতার পটভূমি ও স্বরূপটি আরেকটু বিশদভাবে জেনে রাখা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতে মিশনারী কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকারী নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রধানত বাণিজ্য ব্যপদেশে ভারতবর্ষে পদার্পণ করলেও শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তারে অধিকতর মনোযোগী হয়ে ওঠে। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে তাদের সরকারী নীতিও অনিবার্যভাবে নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হতে থাকে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রক্ষার জন্য আভ্যন্তরীণ নানা বিষয়ে তাদের প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারী কর্মনীতির প্রয়োগবিধিকে প্রয়োজন অনুযায়ী অদল-বদল বা নবরূপে বিন্যস্ত করতে হয়েছে। ধর্ম-সম্পর্কিত সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত সেই চিন্তা ছিল তাদের কাছে সাম্রাজ্যের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এদেশীয়দের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণ সম্পর্কে সরকারী নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবিস্তার ও শাসন-পরিচালনার স্বার্থ ই তাদের কাছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছিল। তারা কখনোই এমন কোনো ধর্মনীতি গ্রহণ করতে চায়নি যা তাদের মূল স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে। ধর্ম-সম্পর্কিত তাদের এই সামগ্রিক নীতির উপর ভিত্তি করেই এদেশে মিশনারী কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে।

নিজেরা খ্রীস্টধর্মাবলম্বী হলেও এদেশে খ্রীস্টানধর্মপ্রচারে অংশগ্রহণ কোনোদিনই কোম্পানী কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত ছিল না। বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য চরিতার্থতার জন্য প্রয়োজন হলে তাঁরা খ্রীস্টধর্মপ্রসার-বিরোধী কাজে নামতেও কুণ্ঠিত হতেন না। অপরপক্ষে— ভারতবর্ষে মিশনারী কার্যকলাপের মূল লক্ষ্যই ছিল— খ্রীস্টধর্মপ্রচার। ফলত উভয়ের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত মাঝে মাঝে অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাই নানা সময়ে ইংরেজ মিশনারীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছেন, এমন-কি প্রত্যক্ষ বিরোধিতায়ও নেমেছেন। তবে মাঝে মাঝে উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এলে, এবং নতুন করে প্রত্যক্ষ স্বার্থসংঘাতের কারণ না ঘটলে, সরকারী কর্তৃপক্ষ কিছু কিছু মিশনারী কার্যকলাপকে পরোক্ষ প্রশ্রয় দিয়েছেন বা বিরোধিতা না করে সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করেছেন।

ভারতে মিশনারী কার্যকলাপের যে প্রধানতম লক্ষ্য— এদেশীয় অখ্রীস্টান বা হিদেনদের মধ্যে খ্রীস্টধর্মের প্রচার, সে সম্বন্ধে সরকারী নীতি ছিল সুস্পষ্ট। মূলত, ধর্ম সম্পর্কে তাঁরা নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। মিশনারীদের ধর্মপ্রচার যখনই এদেশীয়দের সনাতন ধর্মবিশ্বাসকে উগ্রভাবে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে, তখনই সরকারী কর্তৃপক্ষ তাতে বাধা

দিতে চেয়েছেন। কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন, এই আহত ক্ষুব্ধ ধর্মবোধ এদেশীয়দের কেবলমাত্র ইংরেজ মিশনারীদের বিরুদ্ধেই নয়, সামগ্রিকভাবে ইংরেজ জাতি ও শাসকদের বিরুদ্ধেও বিক্ষুব্ধ করে তুলবে। সুতরাং সাম্রাজ্যের স্বার্থে এদেশীয়দের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ না করাই ছিল তদানীন্তন সরকারী নীতি। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিস্তারের পক্ষে মিশনারী কার্যকলাপ ক্ষতিকারক হতে পারে এই আশঙ্কায় সরকারী কর্তৃপক্ষ তাঁদের অধীনস্থ ভারতীয় এলাকায় মিশনারীদের আস্তানা গাড়তে দিতে চাননি।

বাংলাদেশে মিশনারী কার্যকলাপের মোটামুটি তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, Preaching অর্থাৎ ধর্মসভা-বক্তৃতা ইত্যাদি মারফত ধর্মপ্রচার ও দীক্ষাদান; সভা-সমিতি-বৈঠক-জমায়েতে এদেশীয়দের কাছে বক্তৃতা, উপদেশ ও প্রার্থনা মারফত খ্রীস্টান ধর্মের মাহাত্ম্য ও হিন্দু বা মুসলমান ধর্মের অসারতা প্রমাণ। দ্বিতীয়ত Translation and Printing অর্থাৎ দেশীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ ও সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় অক্ষরে তা মুদ্রণের ব্যবস্থা প্রবর্তন: এইভাবেই যীশুখ্রীস্টের জীবন-মাহাত্ম্য ও বাণী সম্বলিত ছোটো ছোটো প্রচার পুস্তিকা ও অনূদিত বাইবেল বা 'ধর্মপুস্তক' ছেপে সাধারণ্যে প্রচার। এইসব অনূদিত ও মুদ্রিত 'ধর্মপুস্তক' (Bible) ও প্রচার-পুস্তিকাকে (Tracts) তাঁরা এদেশীয় ধর্মের উচ্ছেদ সাধনের কাজে শক্তিশালী যন্ত্র ('mighty engine') হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তৃতীয়ত Education, অর্থাৎ জায়গায় জায়গায় সাধ্যমতো বিদ্যালয় স্থাপন করে এদেশীয় বালক-বালিকাদের শিক্ষাদান ও খ্রীস্টধর্মাশ্রয়ী সেই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে খ্রীস্টধর্ম প্রচার। মিশনারীদের ধারণা ছিল, 'শিক্ষা'র আলো পেলেই এদেশীয় ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজেদের ধর্মের চেয়ে খ্রীস্টানধর্ম যে কত মহৎ ও উদার সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবে। ধর্ম-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা তাঁদের শিক্ষা-পরিকল্পনায় ছিল না, খ্রীস্টানধর্মের প্রচারই ছিল তাঁদের শিক্ষা ও পাঠক্রমের মূল লক্ষ্য। 'The missionaries never contemplated anything like secular education, to them education always meant Christian education'.[১]

মিশনারী কার্যকলাপের উপরোক্ত ত্রিমুখী ধারার মধ্যে তাঁদের দ্বিতীয় ধারায় এদেশীয় ভাষায় মুদ্রণ প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত সুদূরপ্রসারী স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। তবে কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে, তাঁদের এই প্রচেষ্টা বাংলাদেশে খ্রীস্টানধর্ম-প্রচার বা এদেশীয়দের খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষিত করার কাজে যতটা সাফল্য লাভ করেছিল, পরোক্ষ ফল হিসাবে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল বাংলা মুদ্রণের প্রসার ও বাংলা গদ্যের বিকাশ সাধনের কাজে। আরো উল্লেখযোগ্য, মিশনারীদের এই বাংলা মুদ্রণ প্রচেষ্টাকে সরকারী কর্তৃপক্ষ অনেক সময়েই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তা করেছেন বা প্রশ্রয় দিয়েছেন।

---

১ K. P. Sen Gupta, '*Christian Missionaries in Bengal*', p. 193.

কারণ মিশনারীদের এই প্রচেষ্টা বহু ক্ষেত্রে সরকারী উদ্দেশ্য চরিতার্থতার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। বিদেশীয় সরকারী কর্মচারীদের বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান বা দেশীয় ভাষায় ইংরেজি আইনকানুন ও সরকারী বিজ্ঞপ্তি-আদেশাদি প্রচার প্রভৃতি সরকারী উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ মিশনারীদের মুদ্রণপ্রচেষ্টার মাধ্যমেই বহুলাংশে সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং মিশনারীদের মুদ্রণপ্রচেষ্টায় সরকারী আনুকূল্যের অভাব ঘটেনি। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে মিশনারীদের এই কাজে সরকারী আশঙ্কা ও সন্দেহ হয়ত অমূলক ছিল না, তাই প্রতিকূলতাও অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছিল। সেইজন্যই কেরীর নেতৃত্বাধীন ব্যাপটিস্ট মিশনের ছাপাখানা ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীন এলাকায় স্থাপিত হতে পারেনি, দিনেমার আশ্রয়ে শ্রীরামপুরে তা প্রথম স্থাপিত হয়। পরে অবশ্য ছাপাখানা নিয়ে তাদের পারস্পরিক বিরোধ মিটে যায়, ব্রিটিশ সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনের সহযোগিতার সেতু গড়ে ওঠে, কেরীও পরিশেষে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সাদরে গৃহীত হন। তবে মাঝে মাঝে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ছাপা ধর্মবিদ্বেষ-মূলক দু-একটি প্রচার পুস্তিকাকে কেন্দ্র করে বিরোধের ঝড় ঘনিয়ে উঠেছে। মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের ঐ অন্ধ আতিশয্যে যখনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দেশীয়দের মধ্যে বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, সরকারী কর্তৃপক্ষ তখনই কঠোর আঘাতে মিশনারী কার্যকলাপকে স্তব্ধ করে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁদের ঐ কঠোরতার জবাবে মিশনারীরা তৎপরতার সঙ্গে পশ্চাদাপসরণ করায় বিরোধের উত্তাপ আবার কমে এসেছে, সহযোগিতার অনুকূল বায়ুপ্রবাহে মিশনারী মুদ্রণপ্রচেষ্টা আবার এগিয়ে গেছে।

কিন্তু মিশনারী কার্যকলাপের অপর দুই ক্ষেত্রে— Preaching ও Education অর্থাৎ ধর্মসভা-বক্তৃতা ও শিক্ষায়তন মারফত খ্রীস্টধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে— তাঁরা তেমন সার্থকতা লাভ করতে পারেননি এবং এসব ক্ষেত্রে সরকারী আনুকূল্যও তেমন সুলভ ছিল না। মিশনারী কার্যকলাপের যে মূল উদ্দেশ্য ছিল, 'হিদেন'দের ধর্মান্তরিকরণ ও 'মুক্তিসাধন', অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন এদেশীয় অখ্রীস্টানদের খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষিত করা[1]— তাঁদের সেই মূল লক্ষ্যের পথে শেষ পর্যন্ত তাঁরা বেশিদূর এগোতে পারেনি। Preaching, Translation ও Education— এই ত্রিমুখী অভিযানের মারফত, শেষ পর্যন্ত তাঁরা ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মোট ১৪০৬ জন এদেশীয়দের খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন।[2] এই মোট দীক্ষিতের সংখ্যাও অবশ্য সন্দেহের অতীত নয়। মূলত মিশনারী-প্রচারিত নানা দলিল ও লেখা থেকে সংগৃহীত এই সংখ্যায় কিছু অসত্য, অর্ধসত্য ও অতিরঞ্জন থাকা

১ লণ্ডনের ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে খ্রীস্টান জনগণের ('Christians at large') উদ্দেশে প্রচারিত প্রথম আবেদনে ঘোষণা করে : 'The object of this Society is to evangelize the poor, dark idolaterous Heathen, by sending missionaries', [B. M. S., *Periodical Accounts*, Vol. I, p. 8.] K. P. Sen Gupta, '*Christian Missionaries in Bengal*', p. 76.

২ K. P. Sen Gupta, *ibid*, p. 194.

স্বাভাবিক। সুতরাং মিশনারীদের চল্লিশ বৎসর ব্যাপী প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত অতিরঞ্জিত সংখ্যা তাঁদের পক্ষে কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় বহন করে না। প্রত্যক্ষ সরকারী আনুকূল্যের অভাবই যে মিশনারী ধর্মপ্রচার-কার্যের সাফল্যের অন্যতম অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছিল সে কথা অনস্বীকার্য। মিশনারী ব্যর্থতার আরো বহুবিধ কারণ ছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু সে আলোচনা বর্তমান গবেষণার পরিধির বাইরে। প্রসঙ্গত কেবল এইটুকুই উল্লেখ্য, দোর্দণ্ডপ্রতাপ খ্রীস্টান শাসকদের পদানত হয়েও যে আলোচ্য পর্বে এ দেশে খ্রীস্টানধর্মের প্লাবন দেখা দেয়নি তার অন্যতম কারণই ছিল বিদেশী সরকারের তদানীন্তন ধর্মনীতি ও মিশনারী কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি। একবার তাই ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে এই ধরনের একটি সরকারী বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে উইলিয়ম কেরীর কণ্ঠে ক্ষুব্ধ হতাশার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল ; কেরী আক্ষেপের সঙ্গে লিখেছিলেন : 'No Christian Government that I know of has prohibited attempts to spread Christianity.'[১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্যের যুগ শেষ হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সরকারী কর্তৃত্ব ভারতবর্ষে প্রসার লাভ করতে থাকে, সাম্রাজ্যবিস্তারের সেই প্রথম যুগে মিশনারীদের প্রায়ই সরকারী বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হত। ফলে, সেই সময় তাঁদের পক্ষে ভারতের ব্রিটিশ এলাকায় অনুপ্রবেশ ও কাজকর্ম করা কঠিন সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় [··· it was···difficult for missionary work to gain any foothold at all'.][২] কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেছে, ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগ থেকেই ভারতে ব্রিটিশ মিশনারী সম্প্রদায়ের ঘোরাফেরা শুরু হয়েছে এবং বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্তভাবে হলেও, তাঁদের ধর্মপ্রচারাভিযান ও অন্যান্য কাজকর্ম ধীর লয়ে এগিয়ে চলেছে। তার কারণ, মাঝে মাঝে বিরোধ দেখা দিলেও মিশনারী সম্প্রদায়কে কখনোই সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সার্বিক বিরোধিতা ও সংঘর্ষে উপনীত হতে হয়নি, বরং তাঁদের মধ্যে বরাবরই কিছু কিছু ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগ অব্যাহত ছিল। ['Yet, from quite an early date there was a certain amount of collaboration between the Government and Mission.'[৩]] এই আংশিক সহযোগিতার পরিমণ্ডল গড়ে উঠতে পেরেছিল, কারণ বরাবরই এমন কিছু কিছু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন যাঁরা মিশনারী কার্যকলাপের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিশীল এবং তাঁরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে মিশনারীদের নানাভাবে সাহায্য করতেন।

---

১ J. C. Marshman, '*The Life and Times of Carey, Marshman & Ward*', Vol. I, p. 316.

২ J. Richter, '*A History of Missions in India*', p. 132 ; quoted by K. P. Sen Gupta, '*Christian Missionaries in Bengal*', p. 17.

৩ J. N. Farquhar, '*Modern Religious Movements in India*', p. 10 : quoted by K. P. Sen Gupta, *ibid*, p. 17.

বাংলাদেশে আগত মিশনারীদের মধ্যে জন টমাসই ছিলেন প্রথম ব্রিটিশ ব্যাপটিস্ট মিশনারী। প্রথমে একটি জাহাজের ডাক্তার হিসাবে তিনি এদেশে পদার্পণ করেন, পরে ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে পুরোপুরি মিশনারী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই মিশনারী কাজে উৎসাহ ও সহায়তা দিয়েছিলেন তদানীন্তন চারজন বিশিষ্ট পদস্থ সরকারী কর্মচারী— চার্লস গ্রান্ট, উইলিয়ম চেম্বার্স, ডেভিড ব্রাউন ও ও জর্জ উড্‌নী। অবশ্য অস্থিরমতি টমাস নিজেরই নানা দোষত্রুটি ও অসংগত আচরণের ফলে পরিশেষে গ্রান্ট প্রভৃতির সমর্থনলাভে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু চার্লস গ্রান্ট আন্তরিক ভাবে চেয়েছিলেন, বাংলা ও বিহার অঞ্চলে প্রোটেস্টান্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হোক ও এদেশে তাঁদের কার্যকলাপ সম্প্রসারিত হোক। সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সরকারের কাছে প্রস্তাবাকারে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও পেশ করেন এবং এর প্রতি সরকারী সমর্থন আদায়ের জন্য উইলিয়ম উইলবারফোর্স (Willam Wilberforce) ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল কর্নওয়ালিসের কাছে বিষয়টি পেশ করা হলে, তিনি তাঁর সরকারী পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকে এই প্রস্তাব সমর্থনে অস্বীকৃত হন। কোনোরূপ মিশনারী কার্যকলাপের সঙ্গে সরকারের সংশ্লিষ্ট হওয়ার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেন।

মিশনারী কার্যকলাপ সম্পর্কে এই সরকারী নীতি বিঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে বা তার পরে ইংরেজ মিশনারীরা কোনোরূপ বৈধ অনুমতিপত্র না পেয়েও বাংলাদেশে আসতে শুরু করেন। চার্লস গ্রান্ট ও তাঁর সহযোগিদের এঁদের প্রতি উৎসাহ ও সমর্থন তখনো অব্যাহত ছিল। গ্রান্ট ইংলণ্ডে ফিরে গিয়েও বাংলাদেশে মিশনারী কার্যকলাপের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। মূলত তাঁরই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে উইলবারফোর্স আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির সময় ১৭৯৩ সালের Charter Act-এ এমন একটি ধারা গৃহীত হয় যার বলে মিশনারী ও শিক্ষকগণ ভারতবর্ষে অবাধ প্রবেশাধিকার পান। কিন্তু কোম্পানীর অধিকাংশ ডিরেক্টর ও অংশীদার আইনে এরূপ কোনো ধারা গ্রহণ করার বিরোধী ছিলেন। তার ফলে কোম্পানীর বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের (Board of Control) সভাপতি শেষ পর্যন্ত ১৭৯৩ সালের Charter Act-এ এরূপ কোনো ধারা গ্রহণের প্রস্তাবকে সরাসরি নাকচ করে দেন।[১]

সুতরাং ১৭৯৩ সালের পরেও মিশনারীদের প্রতি কোম্পানীর মনোভাব ও নীতি আগের মতোই অব্যাহত রইলো। ভারতবর্ষে কোম্পানীর এলাকায় মিশনারীরা অবাধ

---

১ C. H. Philips, '*The East India Company*', p. 159 : quoted by K. P. Sen Gupta, *ibid*, p. 49.

প্রবেশাধিকার লাভে তখনো বঞ্চিত রইলেন। কঠোর সরকারী বিধিনিষেধ তখন নতুন করে আরোপিত হলেও অবশ্য মাঝে মাঝে সেখানে শৈথিল্য দেখা গেছে, এবং তারই সুযোগে কিছু কিছু ইংলণ্ডাগত খ্রীস্টান মিশনারী মাঝে মাঝে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন। মিশনারী কার্যকলাপের প্রতি কর্তৃপক্ষস্থানীয় কিছু কিছু সরকারী কর্মচারীর ব্যক্তিগত পরোক্ষ সহানুভূতি থাকার ফলেই তাঁদের এই অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়েছিল। স্যার জন শোর (Sir John Shore) গর্ভর্নর জেনারেল থাকাকালীন (অক্টোবর ১৭৯৩ - মার্চ ১৭৯৮) টমাস ও কেরী বাংলাদেশে পদার্পণ করেছিলেন। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল ওয়েলেস্লী (মে ১৭৯৮ - জুলাই ১৮০৫)[১] তাঁর সরকারী কর্মনীতিতে খ্রীস্টানধর্ম প্রচারে কোনো উৎসাহ না দেখালেও, ব্যক্তিগতভাবে তিনি মিশনারী কার্যকলাপের বিরোধী ছিলেন না, বরং ক্ষেত্রবিশেষে সরকারী এলাকায় তিনি তাঁদের অবস্থিতি মেনে নিয়েছিলেন। ওয়েলেস্লী সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রোভোস্ট নিয়োগকালে স্থির করেন যে যিনি এই কলেজের প্রোভোস্ট হবেন তিনি 'shall always be a clergyman of the Church of England as established by law' (ওয়েলেস্লীর মিনিটের ১১শ ধারা), এমন-কি ওয়েলেস্লী তাঁর এই কলেজে তদানীন্তন বাংলাদেশের ব্যাপটিস্ট মিশনারী প্রধান উইলিয়ম কেরীকে অন্যতম শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেননি। সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনের সহযোগিতার সেতুবন্ধন সেখান থেকেই শুরু। ওয়েলেস্লীর বদান্যতা ও দূরদৃষ্টির ফলেই তা প্রথম সম্ভব হয়েছিল। অন্যভাবে বলা যায়, তা ছিল মিশনারী কার্যকলাপের পরোক্ষ সরকারী স্বীকৃতির নামান্তর। জনৈক সমালোচকের মতে, 'Wellesley's act of friendliness to the missionaries constituted the first de facto acceptance by the Indian government of missionary activity in India'.[২] কিন্তু মিশনারীদের সঙ্গে সরকারের একটানা নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতার পর্ব কখনোই দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকেনি। মিশনারী কার্যকলাপের ফলে যখনই সরকারী স্বার্থ বিঘ্নিত হবার উপক্রম হয়েছে, তখনই আপাতসহযোগিতা ও সহাবস্থান পর্বের দ্রুত সমাপ্তি ঘটেছে, এবং মিশনারীদের প্রতি শাসকগোষ্ঠীর বিরোধিতার খড়্গ উদ্যত হয়েছে। এইভাবেই দেখা গেছে, ওয়েলেস্লীর অবসর গ্রহণের পর মিশনারীদের প্রতি সরকারী মনোভাব আবার পরিবর্তিত হয়েছে। মাদ্রাজ প্রদেশের ভেলোর অঞ্চলে ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে কোম্পানীর মনোভাবের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সিপাহীদের ঐ বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে ইংলণ্ডে বেশ বড়ো রকমের চাঞ্চল্য দেখা যায় এবং সেখানে পার্লামেন্টের বহু প্রভাবশালী সদস্য অভিযোগ করেন যে ভারতীয় ধর্মের বিরুদ্ধে

---

১ শোর-এর পর Sir A. Clarke অল্প সময়ের জন্য (মার্চ-মে ১৭৯৮) গভর্নর জেনারেল ছিলেন।

২ David Koff, '*British Orientalism and Bengal Renaissance*', p. 76.

মিশনারীদের আক্রমণাত্মক প্রচারাভিযানের ফলেই সিপাহীদের মধ্যে ঐ বিদ্রোহ দেখা দেয়। মিশনারীদের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের সদস্য সহ বহুজনের বিক্ষুব্ধ মনোভাব ও উত্তেজনা শেষ পর্যন্ত অবশ্য কোম্পানীর পরিচালকগোষ্ঠীর (Court of Directors) সভাপতি এডোয়ার্ড প্যারী (Edward Parry) ও সহ-সভাপতি চার্লস গ্রাণ্ট (Charles Grant)-এর আপ্রাণ প্রচেষ্টায় কিছুটা প্রশমিত হয়।[১]

লর্ড মিণ্টো (জুলাই ১৮০৭ - অক্টোবর ১৮১৩) শাসনভার নিয়ে ভারতে আসেন ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে। ঐ বছরেই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা মিশনারীদের একটি প্রচার পুস্তিকা সরকারী মহলে নতুন করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে ফারসী ভাষায় মুসলমানদের উদ্দেশে প্রচারিত ঐ পুস্তিকায় জনৈক অত্যাচারী নেতার জীবন কাহিনী 'An Account of a certain Tyrant, from his birth to death'[২] এই শিরোনামায় পয়গম্বর মুহম্মদের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ পুস্তিকায় পয়গম্বরের বাণীকে 'অবাস্তব ও অসত্য' বলে অভিহিত করে মুসলমানদের স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রীস্টানধর্মে আশ্রয় গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। মুসলমানধর্ম-বিদ্বেষী এমন একটি পুস্তিকার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া আশঙ্কা করে লর্ড মিণ্টো তৎক্ষণাৎ এর প্রচার বন্ধ করে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনারীদের অন্যান্য প্রকাশনা ও ধর্মপ্রচারকার্যের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। শ্রীরামপুর মিশনের সমুদয় মুদ্রণকার্যকে প্রত্যক্ষ সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁদের ছাপাখানাটিকেও শ্রীরামপুর থেকে কলকাতার স্থানান্তরিত করার আদেশ দেন।[৩]

এই ধরনের কঠোর সরকারী আদেশ পেয়ে মিশনারীরা স্বভাবতই খুব বিচলিত হয়ে পড়েন এবং তখনই কেরীর কণ্ঠে পূর্বোদ্ধৃত আক্ষেপোক্তি শোনা যায় ; তিনি দুঃখ করে বলেন যে এমন খ্রীস্টধর্মপ্রচার-বিরোধী আর কোনো খ্রীস্টান সরকারের কথা তিনি শোনেননি। মিণ্টো ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য মিশনারী-বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু সাম্রাজ্যের সামগ্রিক স্বার্থে সরকারী নীতি হিসাবে তিনি তাঁদের প্রতি ঐ কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেন। বহু প্রতিবাদ ও আবেদন-নিবেদনের ফলে শেষ পর্যন্ত একমাস পরে মিণ্টো শ্রীরামপুর মিশন প্রেসকে কলকাতায় স্থানান্তরের যে আদেশ দিয়েছিলেন তা প্রত্যাহার করে নেন। ভেলোরের বিদ্রোহের কথা স্মরণ করে অতিরিক্ত সতর্কতা হিসাবেই মিণ্টো পূর্বোক্ত আদেশটি জারি করেছিলেন। পরে মিশনারীদের পক্ষ থেকে মুদ্রণ-প্রকাশন-প্রচারাদির ব্যাপারে আরো

---

১ Bodlein Mss. *'Correspondence on Missions in India'*, 1807—as quoted by K. P. Sen Gupta, *'Christian Missionaries in Bengal'*, p. 50.

২ K. P. Sen Gupta, *ibid*, p. 50

৩ H. M. S. Vol. 690, pp. 57-58, also P. P. *(East India Affairs)*, Vol. X, p. 52 : quoted by K. P. Sen Gupta, *ibid*, p. 50.

সংযত আচরণের আশ্বাস পেয়ে তিনি তা প্রত্যাহার করে নেন। ফলে সরকার ও মিশনারী-দের ছিন্নপ্রায় সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায়।

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির কালে মিশনারীদের প্রতি সরকারী বিধিনিষেধ বহুলাংশে শিথিল হতে দেখা যায়। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের Charter Act-এর ৩৩ সংখ্যক ধারায় বলা হয় যে ভারতীয়দের মধ্যে ব্যবহারিক জ্ঞানের বিস্তার ও তাঁদের ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে যাঁরা বিদেশ থেকে ভারতে আসতে ও এখানে অবস্থান করতে ইচ্ছুক তাঁদের প্রয়োজনীয় আইনগত সুযোগ সুবিধে দেওয়া হোক। [···'such measures aught to be adopted as may tend to the introduction among them (Indians) of useful knowledge, and of religious and moral improvement, and in furtherance of the above object, sufficient facilities aught to be afforded by law to persons desirous of going to and remaining in India.'] পূর্বোক্ত ধারায় মিশনারীদের কথা স্পষ্টভাবে বলা না হলেও, তাঁদেরও নিঃসন্দেহে এই আইনের আওতায় আনা হয়। তবে তখনো তাঁদের ও অন্যান্য বিদেশীদের ভারতে অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি। আইনের পূর্বোক্ত ৩৩ সংখ্যক ধারায় ভারতে প্রবেশেচ্ছুকদের বৈধ অনুমতি-পত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু আইনে যতটুকু সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার আশ্বাস বিধিবদ্ধ হয় তারই বলে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে আরো অধিক সংখ্যায় বিদেশী মিশনারীদের দল ভারতে আসতে থাকেন। কিন্তু তার পরেও লর্ড হেস্টিংসের (১৮১৩-১৮২৩) শাসন-ব্যবস্থায় মিশনারীদের সম্পর্কে সতর্ক সরকারী নীতি অব্যাহত থাকে।

লর্ড আমহার্স্ট ও (১৮২৩-১৮২৮) এই একই সরকারী নীতি অনুসরণ করে চলেন। সরকারী নীতির ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে চললেও, হেস্টিংস ও আমহার্স্ট উভয়েরই মিশনারীদের প্রতি, বিশেষ করে তাঁদের নানাবিধ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ ও তার মুদ্রণব্যবস্থা এবং শিক্ষাপ্রসার প্রচেষ্টার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও সমর্থন বরাবরই ছিল। তবে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের আমলে (১৮২৮-১৮৩৫) মিশনারীদের প্রতি সরকারী নীতির কঠোরতা ও সতর্কতা আবার কিছুটা বৃদ্ধি পায়। হয়ত বা বেন্টিঙ্কের পূর্ব অভিজ্ঞতাই এর জন্য দায়ী। ভেলোর বিদ্রোহের ফলে মাদ্রাজের গভর্নরের পদ থেকে তাঁর অপসারণের স্মৃতি বেন্টিঙ্কের পরবর্তী সরকারী নীতিতে অনিবার্যভাবে প্রতিফলিত হয়। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের Charter Act প্রবর্তিত হবার পর সরকারী নীতি আরো উদার হয়, মিশনারী ও অন্যান্য বিদেশীরা তখন ভারতে অবাধ প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত আলোচ্য যুগে এইভাবেই সরকারী নীতির কঠোরতার হ্রাসবৃদ্ধির তালে তালে ভারতে মিশনারী কার্যকলাপের গতিও ওঠা-নামার ছন্দে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে। তদানীন্তন সরকারী ধর্মনীতির মূল কথাই ছিল, এদেশীয়দের ধর্মবিশ্বাস ও আচরণের ক্ষেত্রে

মোটামুটি নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। মিশনারীরা যতক্ষণ তাঁদের কার্যকলাপে সরকারী মৌল নীতিকে আঘাত না করে সংযমের মাত্রা বজায় রেখেছেন, সরকারী কর্তৃপক্ষ ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করে এসেছেন। এমন-কি সহাবস্থানের পর্যায় থেকে এগিয়ে এসে নানা সময়ে মিশনারীরা সরকারী সমর্থন ও সহযোগিতাও লাভ করেছেন। বিশেষ করে মিশনারীদের দেশীয় ভাষায় মুদ্রণপ্রসারের অক্লান্ত প্রয়াসে সরকার অধিকাংশ সময়েই অকুণ্ঠ সমর্থন ও সাহায্য করেছেন। মুদ্রণকার্যে এই সহযোগিতার আবহাওয়ায় যেমন মিশনারী উদ্দেশ্য ও সরকারী স্বার্থ উভয়ই রক্ষিত হয়েছে, তেমনি আবার এই একই সঙ্গে উভয়ের অলক্ষ্যে বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসারের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাসে মিশনারী মুদ্রণ প্রয়াসের এইটিই সবচেয়ে বড়ো অবদান।

তৃতীয় অধ্যায়

সহযোগিতার সেতু বন্ধন : মিশন ও কলেজের যৌথ উদ্যোগে বাংলা মুদ্রণের বিকাশ

১৮০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাংলা মুদ্রণের যে বিকাশ পর্বের সূচনা, তার মূল নিয়ামক ছিল দুটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান— শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের দুই ভিন্নমুখী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বাংলা মুদ্রণের বিকাশ সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। তরুণ ইংরেজ সিভিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষা-শিক্ষা নব প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের স্বার্থে অপরিহার্য ছিল এবং মূলত তারই প্রয়োজনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং বলা যায়, বিদেশী শাসকগোষ্ঠির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই কলেজের প্রতিষ্ঠা। অপরপক্ষে, এদেশীয়দের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ব্যাপটিস্ট মিশনারী সম্প্রদায় কর্তৃক শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা। মূলত এই উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ও উদ্যোগে বাংলা মুদ্রণের বিকাশ শুরু হওয়ায় বলা যেতে পারে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজনৈতিক কারণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচারমূলক উদ্দেশ্য সিদ্ধির কারণেও বাংলা মুদ্রণের ব্যবহার ও প্রসার ঘটতে থাকে। এই বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে, অষ্টাদশ শতকের চৌহদ্দি পেরিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা মুদ্রণের গতি প্রকৃতিতে এক মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতকে বাংলা মুদ্রণের 'সূচনা পর্বে' রাজনৈতিক কারণই ছিল মুদ্রণ প্রচেষ্টার মৌল প্রেরণা, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা মুদ্রণের বিকাশ পর্বে মুদ্রণ প্রচেষ্টার মূলে রাজনৈতিক কারণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচারের প্রেরণাও সক্রিয় হয়ে ওঠে। আবার এই পর্বান্তে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি নতুন প্রেরণা অর্থাৎ শিক্ষা বিস্তারের প্রেরণাও বাংলা মুদ্রণের প্রসারের কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

বাংলা মুদ্রণ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে পরম আনন্দের কথা যে জন্মলগ্নের পর থেকেই শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পরস্পরের মধ্যে এক সহযোগিতার সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে পেরেছিল। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা যেমন বাংলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, বাংলা মুদ্রণের বিকাশ পর্বে তেমনই সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঐ প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন। তাদের কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার সেতুবন্ধন গড়ে না উঠলে, একক ও বিচ্ছিন্নভাবে

তাদের কারোর উদ্দেশ্যই অভিপ্রেত সাফল্য লাভ করতে পারত না, এবং সর্বোপরি, বাংলা মুদ্রণের বিকাশ নিঃসন্দেহে আরো বিলম্বিত হত।

মিশন ও কলেজের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে দেখা গেছে উভয় প্রতিষ্ঠানই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নানাভাবে উপকৃত হয়েছে। উভয়ের এই উপকার আবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শেষ পর্যন্ত বাংলা মুদ্রণের বিকাশ সাধনের পথকে সুগম করে তোলে।

প্রথমে দেখা যেতে পারে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে শ্রীরামপুর মিশন কী কী ভাবে উপকৃত হয়েছিল। প্রথমত, উইলিয়ম কেরীকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতার জন্য সাদরে গ্রহণ করার অর্থ ই দাঁড়ায় সরকার কর্তৃক মিশনকে পরোক্ষ স্বীকৃতি দান। গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলীর নিজস্ব উদ্যোগে যে সরকারী কলেজের প্রতিষ্ঠা সেখানে ১৮০১ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মে (জন ক্লার্ক মার্শম্যানের মতে ১২ই মে ১৮০১) কেরীর যোগদানের ফলে ব্যক্তিগতভাবে যে কেবল কেরীই সম্মানিত হলেন তা নয়, তাঁর মধ্য দিয়ে সমগ্রভাবে তাঁদের ব্যাপটিস্ট মিশনই প্রথম সরকারী স্বীকৃতি, আইনগত না হলেও কার্যত স্বীকৃতি লাভ করলেন। সমকালীন সরকারী প্রতিবন্ধকতার পরিপ্রেক্ষিতে মিশনের পক্ষে এটি পরম লাভ।

দ্বিতীয়ত, কলেজ থেকে প্রাপ্য কেরীর মাসিক বেতন প্রথম যুগে মিশনের নিদারুণ আর্থিক সংকটের দিনে ভগবানের আশীর্বাদস্বরূপ প্রভূত উপকারে আসে। কেরী প্রথমে মাসিক ৫০০ টাকা বেতনে বাংলা বিভাগের প্রধান শিক্ষক (Teacher) হিসাবে নিযুক্ত হন। তাঁর ঐ টাকার অধিকাংশই মিশনের নানাবিধ কাজে ব্যয় করা হত, ফলে তাঁদের কাজের বিভিন্ন বিভাগে কিছু কিছু সচ্ছলতা দেখা দেয়। জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখেছেন, কেরীর এই চাকরির ফলে তাঁদের আর ইংলণ্ডের ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের আর্থিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত না। 'This appointment to the college was a source of great gratification to Carey and his associates, chiefly from the prospect it afforded them of becoming independent of support from England.'[১] ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে মারাঠী ভাষার শিক্ষকতার ভারও কেরীর উপর অর্পিত হয়। আরো কিছু পরে ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে কেরী মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ও মারাঠী ভাষার শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হন। কেরীর এই পদ গ্রহণের আগে মিশনারীদের মনে অনেক সংশয় ও দ্বিধা ছিল, বিশেষ করে তাঁরা চিন্তিত ছিলেন, কলেজের এই চাকরির বন্ধনে তাঁদের মূল মিশনারী কার্যকলাপের কোনো ক্ষতি হবে কি না। কলেজ কর্তৃপক্ষ এই আশঙ্কা অমূলক বলে তাঁদের আশ্বস্ত করলে মিশনারীদের যৌথ সিদ্ধান্তের ফলে কেরী ঐ পদ গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত জে. সি. মার্শম্যানের উক্তি উল্লেখ্য : 'College

---

১ J. C. Marshman, '*Life and Times of Carey, Marshman and Ward*', Vol. I, p. 141.

assured Carey that the office would require no compromise of his missionary character.'[১] এ সম্বন্ধে কেরীর নিজের উক্তিও স্মরণ করা যেতে পারে। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জুন ডঃ রাইল্যাণ্ডকে লেখা চিঠিতে তিনি বিশদ করে বলেছেন :…'One morning a letter from Mr. Brown came, inviting me to cross the water, to have some conversation with him upon this subject. I had but just time to call our brethren together, who were of opinion that, for several reasons, I ought to accept it provided it did not interfere with the work of the mission ….Both Mr. Brown and Mr. Buchanan were of opinion that the cause of the mission would be furthered by it ; and I was not able to reply to their arguments. …I therefore, consented…'[২] সুতরাং কলেজের সঙ্গে কেরীর সম্পর্ক স্থাপনের ফলে শ্রীরামপুর মিশন যে তাদের মিশনারী উদ্দেশ্যকে ব্যাহত হতে না দিয়েও আর্থিক দিক দিয়ে উপকৃত হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তৃতীয়ত, কলেজে যোগদানের ফলেই কেরীর কাছে এদেশীয় ভাষা সংস্কৃতির বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রবেশের প্রথম সুবর্ণ সুযোগ আসে। বাংলা ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে কেরীর যোগাযোগ মূলত কলেজের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজের বাংলা বিভাগে কেরীর সহকর্মীরূপে যে সকল বিদগ্ধ পণ্ডিত শিক্ষক যোগদান করেন তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুযোগে কেরী তাঁর নিজস্ব ভাষাজ্ঞানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সক্ষম হন। ইতিপূর্বে কেরী তাঁর বাংলা ভাষা শিক্ষায় কেবলমাত্র তাঁর মুন্সী রামরাম বসুর সহায়তা পেয়েছিলেন। কিন্তু কলেজে যোগদান করার পর তাঁর ভাষাচর্চা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বাচস্পতি, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, পদ্মলোচন চূড়ামনি প্রভৃতি জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতের সাহচর্যে শাণিত হবার সুযোগ পায়। তা ছাড়া কলেজে এদেশীয় নানা ভাষা শিক্ষার ব্যাপক পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে আরবী, ফারসী, হিন্দী, সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি নানা ভাষায় পারদর্শী যে সব বিভিন্ন মৌলভী, পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল তাঁদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য নিয়ে কেরী তাঁর নানা ভাষায় বাইবেল অনুবাদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার সুযোগ পান। মূলত বহুভাষাবিদ হিসাবে কেরীর যে পরিচয় ও বিভিন্ন কার্যকলাপ তা তাঁর কলেজে যোগদানের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। প্রসঙ্গত জে. সি. মার্শম্যানের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে : 'In that Institution (Fort William College) more than fifty of the most eminent scholars of the East were collected together, and

---

১ *Ibid.*

২ George Smith, '*Life of William Carey*' (Everyman's Lib. ed., 1913), pp. 163-64.

it was in this association that he (Carey) was enabled to discover the genius of Oriental philology and the true principles of translation.'[১]

চতুর্থত, কলেজে অধ্যাপনার সূত্রে কেরী নিজেই কিছু কিছু প্রয়োজনীয় বাংলা বই রচনায় অনুপ্রাণিত ও উদ্যোগী হন। কলেজের পঠন-পাঠনের প্রয়োজনের জরুরী তাগিদে কেরী এক বছরের মধ্যেই বাংলা ব্যাকরণ ('*A Grammar of the Bengalee Language*') ও 'কথোপকথন' এই দুটি বই রচনা ও সংকলন সম্পূর্ণ করে ফেলেন। শিক্ষকতার তাগিদ না থাকলে হয়ত কোনোদিনই এই সব বই রচনার অবকাশ হত না। ১৮০১ সনের ১৫ই জুন ডঃ রাইল্যাণ্ডকে লেখা পূর্বোক্ত চিঠিতে কেরী নিজেই একথা উল্লেখ করেছেন : ...'When the appointment was made, I saw that I had a very important charge committed to me, and no books or helps of any kind to assist me. I, therefore, set about compiling a grammar, which is now half printed...'[২]

পঞ্চমত, কলেজের সঙ্গে কেরীর সম্পর্ক গড়ে ওঠায় তদানীন্তন কলকাতার ইংরেজ সমাজ ও বুদ্ধিজীবী বাঙালী সম্প্রদায়ের কাছে কেরী একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ভাষাবিদ হিসাবে মর্যাদার আসন পেয়েছিলেন। তাঁর এই মর্যাদালাভ কেবলমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত সম্মানেরই কারণ হয়নি, সামগ্রিকভাবে তা কেরী পরিচালিত শ্রীরামপুর মিশনকেই কলকাতায় ইংরেজ মহলে সামাজিক প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল।

ষষ্ঠত, কলেজের সহযোগিতায় মিশন প্রেসের নিজস্ব মুদ্রণ-পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা সহজতর হয়েছিল। কারণ কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ছেপে মিশন প্রেসের যে আর্থিক লাভ হতে থাকে, সেই লভ্যাংশের টাকায় তাঁরা তাঁদের অন্যান্য ধর্মীয় প্রচারপুস্তিকা (Tract), বাইবেল-অনুবাদ, প্রভৃতি ছাপার নিজস্ব পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলতে সমর্থ হন।

সপ্তমত, উল্লেখ করা যেতে পারে যে আরো একভাবে কলেজ কর্তৃপক্ষ মিশন প্রেসের ছাপার কাজে উৎসাহ দিতেন। সাধারণত কলেজ মিশনের ছাপা তাঁদের নিজস্ব কিছু কিছু বইও অগ্রিম বা নগদ মূল্যে, অন্তত প্রকাশমাত্রই প্রতি বইয়ের শতাধিক করে কপি, কিনে নিতেন। ফলে মিশন প্রেসের পক্ষে ঐ সব বই ছাপার খরচ চালানো সহজতর হত। উদাহণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, কলেজ কর্তৃপক্ষ মিশন কর্তৃক প্রকাশিত রামায়ণ বা মহাভারতের বিভিন্ন খণ্ড, দাউদের গীত ও অন্যান্য ধর্মপুস্তক প্রভৃতি প্রকাশমাত্রই নগদ মূল্যে কিনে নিয়ে ছাত্র ও কলকাতার বিদগ্ধ সমাজে প্রচার করেছিলেন। কলেজের এই সহযোগি-

১ J. C. Marshman, *op. cit.*, p. 180.

২ George Smith, *op. cit.*, p. 164.

তায় মিশনের মুদ্রণ পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ ও আর্থিক লাভের সঙ্গে সঙ্গে মিশনের সুনামও প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুতরাং দেখা যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে কেরী ও তাঁর শ্রীরামপুর মিশন এইরূপ নানাভাবে উপকৃত হন। অপরপক্ষে এ কথাও সত্য যে কেরী ও শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে সহযোগিতার ফলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজও নানাভাবে উপকৃত হয়। এই উপকারের নিদর্শনগুলি একে একে বিচার করা যেতে পারে।

প্রথমত, কেরী ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের সহযোগিতা লাভের ফলেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তার দেশীয় ভাষায় পঠন-পাঠনের ব্যাপক কর্মসূচীকে কার্যকরী করে তুলতে পেরেছিল। কলকাতায় সদ্য-আগত তরুণ ইংরেজ সিভিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষায় যথোপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া প্রশাসনিক প্রয়োজনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল এবং সেই উদ্দেশ্যেই ওয়েলেসলী কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা। কলেজে বাংলা, ও ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত ও মারাঠী, এই তিনটি ভাষায় শিক্ষকতার দায়িত্ব কেরীর উপর ন্যস্ত হয়। এই ভাষাশিক্ষার কাজে ব্যাকরণ, অভিধান ও পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজন অপরিহার্য। অথচ কেরী যখন কলেজে যোগদান করেন (মে, ১৮০১), তখন অন্যান্য দেশীয় ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও কোনো মুদ্রিত গদ্যপুস্তক ছিল না। 'Not a single prose work was found to exist when he delivered his first lecture in May 1801.'[১] সুতরাং কেরীর প্রথম কাজই ছিল ছাত্রদের জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করা। সেই উদ্দেশ্যে কেরী বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে বিদগ্ধ পণ্ডিত সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ করে উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ করেন ও তাঁদের সহকারী শিক্ষক ও পণ্ডিত হিসাবে কলেজের বাংলা বিভাগে নিয়োগ করেন। কলেজের শিক্ষক সংগ্রহের প্রস্তুতিপর্ব অবশ্য এর পূর্বেই শুরু হয়েছিল। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে সারা ভারতবর্ষে কটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি এই মর্মে প্রচারিত হয় যে, গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলী কর্তৃক কলকাতায় যে সরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে ভারতের সকল প্রদেশের পণ্ডিত সম্প্রদায়কে সাদর আহ্বান জানানো হচ্ছে, এবং সেখানে তাঁরা শিক্ষকতাকার্যে যোগদান করলে সরকার বিশেষ আনন্দিত হবেন। পঞ্চাশ জনেরও অধিক পণ্ডিত ও মুন্সী এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। যাই হোক, কলেজের বাংলা বিভাগে সহকারী শিক্ষক ও পণ্ডিত নিয়োগের কাজ সম্পূর্ণ হবার পরই বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কেরী প্রথম তাঁদের উপর আলাদা আলাদাভাবে কিছু কিছু বাংলা গদ্য পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব দেন। কেরীর পরামর্শে কলেজ কর্তৃপক্ষও উদ্যোগী পণ্ডিতদের আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য ভাবে উৎসাহদানে এগিয়ে আসেন। ফলে অচিরে কয়েকটি বাংলা গদ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে যায়। কলেজীয় পণ্ডিতগোষ্ঠি রচিত ঐ সব বই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে দ্রুত ছাপার ব্যবস্থাও কেরী করেন। ফলে অল্প

১ J. C. Marshman, *op. cit.* p. 159.

সময়ের মধ্যেই কলেজের বিদেশী ছাত্রদের হাতে বাংলা অক্ষরে ছাপা গদ্যপুস্তক পৌঁছে যায়। এই ভাবেই কলেজের বাংলা পঠন-পাঠনের সুরাহা হয় মিশন প্রেসের সহযোগিতায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশিত হবার পূর্বে যাঁদের বাংলা গদ্যে রচিত সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাঁরা প্রায় সকলেই যেমন, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুন্সী প্রভৃতি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁদের প্রায় সকল বইই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা হয়েছিল। সমসাময়িককালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেবলমাত্র অপর দুই লেখক তারিণীচরণ মিত্রের 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' (১৮০৩) রোমান অক্ষরে হরকরা প্রেসে এবং মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের 'বাংলা-ইংরেজি অভিধান' (১৮১০) হিন্দুস্থানী প্রেসে ছাপা হয়েছিল। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে মিশন প্রেস কলেজের লেখকগোষ্ঠির অধিকাংশ বই ছেপে দিয়ে কলেজের পাঠ্যপুস্তক সমস্যার সমাধানে সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠির লেখা বাংলা বই ছাপা ছাড়াও মিশন প্রেস তাঁদের নিজস্ব উদ্যোগে আরো কিছু বাংলা বই ছাপেন যা কলেজে ছাত্রদের অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ভাষাশিক্ষার কাজে পরম সহায়ক হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, চার খণ্ডে সম্পুর্ণ কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' (১৮০১-১৮০৩), পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' (১৮০২-১৮০৩), 'ধর্মপুস্তক' (১৮০১), 'দাউদের গীত এবং যিশঈহার ভবিষ্যৎ বাক্য' (১৮০৩) প্রভৃতি। কলেজের পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে শ্রীরামপুর মিশনের অবদান তাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কলেজের নিজস্ব প্রেস বা কোম্পানীর প্রেসেও অবশ্য দুয়েকটি বই ছাপা হয়। যেমন, '*Primitiae Orientales*' (১৮০২-১৮০৪), '*Essays by the students of the College of Fort William*' (১৮০২), ইত্যাদি। এই বইগুলি মূলত ইংরেজিতে ছাপা হলেও এগুলিতে বাংলা হরফে ছাপা কিছু কিছু বাংলা রচনাও আছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এইরূপ বইয়ের সংখ্যা খুবই অল্প ছিল। কলেজের পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজে মিশন প্রেসের সাহায্য ছিল অপরিহার্য।

সুতরাং এই বিচার বিশ্লেষণের আলোকে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মিশন ও কলেজের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে উভয় প্রতিষ্ঠানই নানাভাবে উপকৃত হয়েছিল এবং তাঁদের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত কর্মসূচীর ফলশ্রুতি হিসাবে একাধারে বাংলা গদ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও বাংলামুদ্রণের বিকাশ সাধন সম্ভব হয়েছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীরামপুর মিশন : সমকালীন বাংলা মুদ্রণের বৃহত্তম কেন্দ্র

শ্রীরামপুরে বাংলা মুদ্রণের প্রস্তুতি

উইলিয়ম কেরী ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারী সমভিব্যাহারে উত্তরবঙ্গের আশ্রয় ছেড়ে শ্রীরামপুরে এসে পৌছন। দিনেমার শাসনাধীন শ্রীরামপুরে প্রকৃতপক্ষে সেদিন থেকেই শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের পত্তন। অবশ্য তার আগেই ১৭৯৯ সালের ১৩ই অক্টোবর শ্রীরামপুরে এসে সমবেত হয়েছিলেন জোশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড, ব্রান্সডন ও গ্রান্ট নামক চারজন মিশনারী। কেরী তাঁদের সঙ্গে এসে যোগ দেওয়ায় মিশনের পাকাপাকি ভিত্তি স্থাপিত হয়। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে তাঁরা প্রথম দিন থেকেই মিশনের কাজ শুরু করে দেন। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে 'তমসাচ্ছন্ন নেটিভদের' কর্ণকুহরে খ্রীস্টের বাণীকে পৌছে দেওয়াই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছনোর অন্যতম ও প্রধানতম পথ হিসাবে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন বাংলাভাষায় বাইবেল মুদ্রণের দুরূহ কাজকে। এই কাজের দুটি প্রধান পর্ব : বাংলায় বাইবেল অনুবাদ ও বাংলায় মুদ্রণের আয়োজন। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশে পদার্পণের কিছু পর থেকেই কেরী এই অনুবাদকার্যে উদ্যোগী হন। টমাস ও রামরাম বসুর সহায়তায় কেরী প্রথমেই নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ শুরু করেন এবং ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের শেষে বা ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দের প্রারম্ভে সে কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। জর্জ স্মিথের মতে নিউ টেস্টামেন্টের মূল গ্রীক থেকে বাংলায় অনুবাদ কেরী ১৭৯৬ সাল শেষ হবার আগেই সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন। 'The first Bengali version of the whole New Testament Carey translated from the original Greek before the close of 1796.'[১] স্বয়ং কেরী বন্ধু ফুলারকে ১৬ই নভেম্বর ১৭৯৬ তারিখে লেখেন : 'I have, through the good hand of my God upon me, now nearly translated all the New Testament…I expect the New Testament will be complete before you receive this, except a very few words, which may want altering on a third or fourth revisal.'[২] উদ্যোগ পর্বের নানা বাধাবিপত্তির কথা স্মরণ করে কেরী ১৭৯৭ সালের বসন্তে (মার্চ মাস নাগাদ) বন্ধু ফুলারকে আবার লেখেন : 'Whereas in any land there are only two obsta-

১ George Smith, '*The Life of Williem Carey*' (Everyman's Library edition), p. 186.

২ Eustace Carey, '*Memoir of William Carey*', pp. 275-76.

cles to God's work—the sinfulness of man's heart and the lack of the Scriptures—this latter God has here begun to remove; for the New Testament is now translated into Bengali. Its treasure will be greater than Diamonds.'[১]

সুতরাং এর পরের কাজ— বাংলা মুদ্রণের আয়োজন। এই কাজ কেরী মদনাবাটীতে থাকাকালীন কিছু কিছু শুরু করেছিলেন। উড্‌নীর বদান্যতায় বিদেশাগত যে কাঠের মুদ্রাযন্ত্রটি তিনি কলকাতা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, সেটিকে তাঁরা মদনাবাটীর কুঠিতে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করেন ১৭৯৮ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর। তারপর থেকেই কেরী বিলেতে ব্যাপটিস্ট মিশনের সহকর্মীদের ক্রমাগত তাগাদা দিতে থাকেন অবিলম্বে একজন খ্রীস্টানুগত দক্ষ মুদ্রাকরকে বাংলাদেশে মিশনের কাজে পাঠাবার জন্য। বিশেষ করে ইংলণ্ডে থাকাকালীন তাঁর পূর্বপরিচিত ওয়ার্ডের কথাই তিনি এ প্রসঙ্গে বারবার উল্লেখ করেছিলেন। পরিশেষে তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছিল। ওয়ার্ড স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মিশনারী কাজে কেরীর সহায়তার জন্য বাংলাদেশে এসে উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় বাংলা হরফ সংগ্রহের কাজেও কেরী বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। প্রথমে তিনি ইংলণ্ড থেকে এই হরফ তৈরি করিয়ে সরাসরি আমদানীর চেষ্টা করেন। কিন্তু সে কাজে নানা অসুবিধার কথা বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত তা তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়। এইসব প্রসঙ্গ আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি। অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি কেরী যখন সন্ধান পান যে কলকাতাতেই তাঁর প্রয়োজনীয় দেশীয় ভাষায় হরফ তৈরি সম্ভব এবং ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দের শেষ বা ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দের শুরু থেকে যখন এখানেই দেশীয় হরফ ঢালাইখানা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চালু হয়ে যায়, তখন কেরী তাঁর বাংলা মুদ্রণের কাজে আবার নতুন করে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ১৭৯৯ সালের গোড়ার দিকে একবার তিনি নিজেই কলকাতায় চলে আসেন ও সেখানকার হরফ ঢালাইখানায় তাঁর প্রয়োজনীয় বাংলা হরফের জন্য সরাসরি যোগাযোগ করেন। তারপর থেকেই ঘটনার গতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ নতুন মিশনারী দলটি ১৭৯৯-এর শেষে দিনেমার আশ্রয়ে শ্রীরামপুরে এসে হাজির হন। তাঁরা প্রথমে মদনাবাটী অঞ্চলে কেরীর আস্তানায় গিয়ে মিশন ও তাঁদের ছাপাখানা স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তখন কলকাতা থেকে এতদূরে তাঁদের শাসনাধীন কোনো এলাকায় ছাপাখানা স্থাপনের প্রস্তাব রূঢ়ভাবে নাকচ করে দেন। এমন-কি তাঁরা ঐ মিশনারীদের অবিলম্বে ভারত ছেড়ে চলে যাবার আদেশ দেন। তখন শ্রীরামপুরের দিনেমার গভর্নর কর্নেল বী দৃঢ়তার সঙ্গে মিশনারীদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন ও শ্রীরামপুরে তাঁদের আশ্রয় দেন। এর ফলে তাঁরা শ্রীরামপুরেই তাঁদের মিশন ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা শ্রেয় বলে সিদ্ধান্ত নেন। অচিরেই

১ S. Pearce Carey, '*William Carey*' (1934 ed.), p. 179.

নবাগত মিশনারীদের পক্ষ থেকে ওয়ার্ড ও অন্য কয়েকজন মালদহ জেলার খিদিরপুরে গিয়ে কেরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও তাঁকে শ্রীরামপুরে চলে আসার সাদর আমন্ত্রণ জানান। কলকাতার সন্নিকটে থেকে মুদ্রণ ও প্রচারের কাজ পরিচালনার নানাবিধ সুবিধার কথা বিবেচনা করে কেরী ওয়ার্ডের প্রস্তাবে সানন্দে স্বীকৃত হন ও খিদিরপুরের কুঠি ও তাঁর সেখানকার আস্তানার সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে সপরিবারে ওয়ার্ডকে নিয়ে ডিসেম্বরের শেষে নৌকাযোগে শ্রীরামপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। ১০ই জানুয়ারি, ১৮০০ তারিখে তাঁরা সদলবলে শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন। শুরু হয় শ্রীরামপুর মিশনের বিজয় অভিযান। কেরী তাঁর এই নতুন অভিযানে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দুটি উপকরণ— নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদের পাণ্ডুলিপি ও তাঁর সাধের সম্বল কাঠের মুদ্রাযন্ত্রটি। শ্রীরামপুর মিশন পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই গড়ে ওঠে তাঁদের নিজস্ব ছাপাখানা— যার প্রথম সম্বল ছিল ঐ একটিমাত্র কাঠের মুদ্রাযন্ত্র ও কলকাতা থেকে কিনে আনা কিছু বাংলা হরফ এবং যার একমাত্র দক্ষ মুদ্রাকর ছিলেন উইলিয়ম ওয়ার্ড। আর তাঁদের প্রথম প্রচেষ্টা ছিল নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ মুদ্রণ। অদম্য উৎসাহ, সদাজাগ্রত মিশনারী প্রেরণা ও অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে পরবর্তী অল্প কিছুকালের মধ্যে এই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস সমকালীন বাংলা মুদ্রণের বৃহত্তম কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং তা বাংলা মুদ্রণের বিকাশ পর্বের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলে।

শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন ও বাংলা মুদ্রণের বিজয় অভিযান

শ্রীরামপুরে পৌছবার পরের দিনই (১১ই জানুয়ারি, ১৮০০) কেরী সেখানকার দিনেমার গভর্নর কর্নেল বী'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও সাদরে অভ্যর্থিত হন। দিনেমার কর্তৃপক্ষের সমর্থনে মিশনের কাজ সেদিন থেকেই শুরু হয়ে যায়। তার পরের দিনই (১২ জানুয়ারি, ১৮০০) কেরী শ্রীরামপুরের স্থানীয় বাসিন্দাদের সামনে প্রথম বাংলায় বক্তৃতা করেন। শ্রীরামপুরে পৌছে প্রথম তাঁদের যে বাসগৃহের সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা তাঁরা কয়েকদিনের মধ্যেই মিটিয়ে ফেলতে পেরেছিলেন। ফলত দেখা যায়, প্রভূত আর্থিক ঝুঁকি সত্ত্বেও তাঁরা সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ছ'হাজার টাকা মূল্যে স্থানীয় গভর্নরের ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছ থেকে একটি সুদৃশ্য বাগানবাড়ি কিনে ফেলেন। ওয়ার্ড তাঁর দিনলিপিতে তাঁদের এই প্রথম ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ আস্তানাটির কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।[১] তাঁদের বাড়িটি ছিল শহরের প্রায় মাঝ বরাবর গঙ্গার ধারে। এটি একাধারে তাঁদের ছ'টি মিশনারী পরিবারের বাসস্থান হিসাবে এবং ধর্মোপাসনা ও ছাপাখানার কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রথমে ঐ বাগানবাড়ি কেনার জন্য প্রয়োজনীয় টাকার অঙ্কের কথা ভেবে তাঁরা আতঙ্কিত হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে,

---

১ George Smith, *op. cit.*, pp. 90-91.

কিন্তু যখন হিসাব করে দেখা যায় যে ঐ টাকা যে-কোনো ভাড়া বাড়িতে চার বছর ভাড়া বাবদ দেয় অর্থের সমান দাঁড়ায়, তখন তাঁরা হাতে ২০০ পাউণ্ড মাত্র পুঁজি বাকি রেখে প্রায় ৮০০ পাউণ্ড (৬০০০ টাকা) মূল্যে ঐ বাগানবাড়িটি কিনে নেন। বাড়িটিতে ছিল সামনে একটি বড়ো বারান্দা ও তারপরেই একটি বিরাট হলঘর (যা তাঁদের সমবেত প্রার্থনাস্থলের উপযোগী ছিল), এবং দু'পাশে ছিল দুটি করে ঘর। এ ছাড়া মূল বাড়িটির লাগোয়া সামনের দিকে আলাদা দুটি ঘর ও আর-এক পাশে আরেকটি আলাদা গুদাম ঘরের মতো ছিল। এই লাগোয়া বাড়িটিতেই তাঁদের প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়। এ ছাড়া মূল বাড়ির সামনে ছিল একটি জলাধার ও বাগান এবং পিছন দিকেও ছিল বিস্তৃত বাগান, যার পরিচর্যার ভার নিয়েছিলেন কেরী নিজেই। মিশনারীদের এই প্রথম আবাসস্থল ও প্রথম ছাপাখানার বাড়িটি শ্রীরামপুরে গঙ্গার ধারে আজও টিকে আছে। কলকাতার কাছাকাছি থাকায় তাঁদের এই আস্তানাটি তখন মিশনারী ও ছাপাখানার কাজে বিশেষ উপযোগী ছিল, সেইজন্যই শ্রীরামপুর মিশনারীরা জায়গাটি বেছে নিয়েছিলেন।

শ্রীরামপুর মিশনের প্রথম ছাপাখানা

মিশন স্থাপনের পরই তাঁরা প্রথম যে কাজে সর্বাধিক আগ্রহে তৎপর হয়ে ওঠেন তা ছিল তাঁদের ছাপাখানার কাজ। আবাসস্থলের ডানদিকের আলাদা ঘর দুটিতেই শুরু হয় তাঁদের ছাপাখানার কাজ। কলকাতায় নীলামে কেনা মদনাবাটী-ফেরত কাঠের মুদ্রাযন্ত্রটি এখানেই বসানো হয়। ঐ একটি প্রেস নিয়েই তাঁদের যাত্রারম্ভ, ঐটিতেই তাঁদের প্রথম বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট ছাপা হয়। ['It was from the old press bought in Calcutta, set up in Mudnabati, and removed to Serampore, that the first edition of the Bengali New Testament was printed'.][১] এণ্ড্রু ফুলারকে লেখা এই সময়ের একটি চিঠিতে তাঁদের মনের আশা স্পষ্ট হয়ে ওঠে: 'From hence may the Gospel issue and pervade all India'.[২] প্রথম নিউ টেস্টামেন্ট ছাপার কাজের পুরোধায় ছিলেন দক্ষ ওয়ার্ড ও তাঁর সহকারী ছিলেন ব্রান্সডন ও ফেলিক্স কেরী। এ ছাড়া ছাপাখানার নানা কাজে সাহায্য করার জন্য তাঁরা কিছু দেশীয় কর্মীও নিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তীকালের প্রখ্যাত বাঙালী মুদ্রণ ব্যবসায়ী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রথম এই সময়ে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে একজন 'কম্পোজিটর' হিসাবে যোগদান করেন। তিনি অবশ্য অল্প কিছুকাল পরেই এখানকার কাজ ত্যাগ করে কলকাতায় চলে যান স্বাধীন বৃত্তির সন্ধানে। ছাপাখানার কাজ শুরু হবার কয়েক মাস পরে লেখা ওয়ার্ডের দিনলিপি (১লা আগস্ট, ১৮০০) থেকে

১ George Smith, *op. cit.*, p. 181.

২ George Smith, *op. cit.*, p. 91.

জানা যায়, ঐ সময়ে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে দেশীয় কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন পাঁচজন মুদ্রাযন্ত্র-চালক, একজন ছিলেন যিনি শুধু ছাপা কাগজ ভাঁজ করে বাঁধাইয়ের জন্য সাজাতেন ও অপর একজন দপ্তরী ('have five pressmen, one folder and one binder')। ঐ সময় অবশ্য তাঁদের দেশীয় 'কম্পোজিটর' (গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য) কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ায় তাঁরা নিজেরাই (অর্থাৎ ওয়ার্ড, ব্রান্সডন ও ফেলিক্স কেরী) অক্ষর সাজানোর কাজ (composing) করে নিতেন। উইলিয়ম কেরী স্বয়ং প্রুফ দেখার কাজ করতেন। ফেলিক্স প্রধানত ছাপাখানার অফিসের কাজকর্ম দেখতেন। পরবর্তীকালের এরূপ আরো কিছু কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায় মিশন প্রেস কেমন ধাপে ধাপে দ্রুততালে এগিয়ে গেছে, তাদের মুদ্রণযন্ত্রের সংখ্যা ও কর্মীর সংখ্যাও ক্রমশ বেড়ে গেছে। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে মিশনারীরা তাঁদের পাশের সুন্দর বাড়িটি ১০৩৪০ টাকায় কিনে নেন। এর ফলে সেখানে যেমন স্কুলের জন্য আরো প্রশস্ত জায়গা করা সম্ভব হয়, তেমনি ছাপাখানা ও বাঁধাইয়ের কাজের জন্যও সেখানে আরো বেশি স্থানের সংস্থান হয়।[১]

ওয়ার্ড ছিলেন মিশন প্রেসের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বা কর্মাধ্যক্ষ। মুদ্রণের প্রথম বছর থেকেই তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা, অথবা বলা যায় মিশনের সকলেই, কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে সময় মেপে মেপে নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করে যেতেন। যেমন ধরা যেতে পারে, ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসের কথা। তখন মিশন প্রেসে বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট ছাপার কাজ পুরোদমে চলেছে। ঐ সময় তাঁদের প্রাত্যহিক কর্মের বর্ণনা দিতে গিয়ে ওয়ার্ড তাঁর দিনলিপিতে (Journal) লিখেছেন: 'August 1 (1800)—Our labours for everyday are now regularly arranged. About six o'clock we rise; brother Carey to his garden; brother Marshman to his school at seven; brother Brunsdon, Felix and I, to the printing-office. At eight the bell rings for family worship: we assemble in the hall; sing, read and pray. Breakfast. Afterwards, brother Carey goes to the translation, or reading proofs; brother Marshman to school and the rest to the printing office. Our compositor having left us, we do without; we print three half-sheets of 2000 each in a week; have five pressmen, one folder, and one binder. At twelve o'clock we take a luncheon; then most of us shave and bathe, read and sleep before dinner, which we have at three,...In the afternoon, if business be done in the

১ J. C. Marshman, *'Life and Times of Carey, Marshman and Ward,'* Vol. I, p. 141; *Periodical Accounts*, p. 228.

office, I read and try to talk Bengali with the brahman,...Felix is very useful in the offiice ; William goes to school and part of the day learns to bind',...[১]

মুদ্রণ পর্বের প্রথম বছর

মিশন প্রেসের মুদ্রণ পর্বের প্রথম বছরটি ছিল একটানা অক্লান্ত পরিশ্রমের ইতিহাস। একদিকে শ্রীরামপুরে চলত বাংলা বাইবেল মুদ্রণের কাজ— 'কম্পোজিং, ছাপা, প্রুফ দেখা ও বাঁধাইয়ের কাজ, আর অপরদিকে মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে কাগজ, হরফ প্রভৃতি সরঞ্জাম সংগ্রহের কাজ ও সেখানকার মিশন-প্রেমী ইংরেজ মহলের কাছ থেকে মিশনের খরচ চালাবার জন্য অর্থসংগ্রহের অভিযান। নিউ টেস্টামেণ্ট ছাপা শুরু হবার পরে এই সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে ব্রান্সডন লিখেছেন : 'Now the day will soon begin to break. And we are constantly finding the advantage of our nearness to Calcutta, for the purchase of paper, type, etc.'[২] ১৮০০ সালে যখন দ্রুততালে ওয়ার্ডের নেতৃত্বে বাংলা নিউ টেস্টামেণ্ট ছাপার কাজ চলছে, তখন তাঁরা সবাই যেন 'হরিণের পেছনে নেকড়ের মতো' কেরীকে তাড়া করতেন অনুবাদের শেষ মুহূর্তের অদল-বদল ও প্রুফ সংশোধনের জন্য, যাতে ছাপার কাজ কখনোই বন্ধ না থাকে। তার ফলে মুদ্রণের সেই প্রথম যুগের পক্ষে এক অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে, মাত্র ন' মাসের মধ্যে আট শতাধিক পৃষ্ঠার বাংলা নিউ টেস্টামেণ্ট ছাপা সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। এই সময়ের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কেরী লিখেছেন : 'They pursue me as hounds a deer. The labour is tenfold what it would be in England—printing, writing, and spelling in Bengali being all such a new thing.'[৩] মুদ্রণের কাজে ওয়ার্ডের উৎসাহ ও অনুরাগ এত গভীর ছিল যে তিনি প্রথম বছরে একদিনের জন্যও, এমন-কি অসুস্থতার কারণেও, ছুটি নেননি। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মে ওয়ার্ড ফাউণ্টেনের বিধবা পত্নী টিডকে (Tidd) বিবাহ করেন। কিন্তু সেই বছরের হিসাবে দেখা যায়, ছাপাখানার আয় তখন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও সস্ত্রীক ওয়ার্ড তাঁদের ব্যক্তিগত খরচের জন্য ছাপাখানার আয় থেকে বছরে কেবলমাত্র ২০ পাউণ্ড গ্রহণ করতেন।[৪] মিশনের কাজে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ অক্লান্তকর্মী দক্ষ মুদ্রাকর ওয়ার্ডের চরিত্রের এটি একটি উজ্জ্বল পরিচয়।

---

১ George Smith, *op. cit.*, pp. 92-93.

২ S. Pearce Carey, *op, cit.*, p. 198.

৩ S. P. Carey, *op. cit.*

৪ J. C. Marshman, *'Life and Times of Carey, Marshman & Ward'*, Vol. I., p. 165.

মিশন পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেরী, ওয়ার্ড প্রভৃতি মিশনারীরা সর্বাগ্রে তাঁদের বাংলা মুদ্রণের অভীষ্ট কাজে উদ্যোগী হন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁরা ওয়ার্ডের নেতৃত্বে ছাপাখানার ঘরটি সাজিয়ে ফেলেন। মদনাবাটীর পুরাতন মুদ্রাযন্ত্রটি তাঁরা প্রথম এখানে বসিয়ে ফেলেন এবং ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ ও বাংলা হরফ কলকাতা থেকে সংগ্রহ করে আনেন। জে. সি. মার্শম্যান মিশনের মুদ্রণের প্রাথমিক উদ্যোগ বর্ণনা করেছেন এইভাবে, 'Their first attention was given to the printing offiice. The press brought from Mudnabatty was set up, and the types arranged.'[১] ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৮০০ তারিখে লেখা তাঁদের চিঠিতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়: 'We intend to teach a school, and make what we can of our press. The paper is all arrived, and the press, with the types, etc., complete. The Bible is wholly translated, except a few chapters, so that we intend to begin printing immediately, first the New and then the Old Testament.' (*Letter from Carey, Fountain, Marshman, Ward*)[২] পরবর্তীকালে ওয়েঙ্গারের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮০০ তারিখে ওয়ার্ড তাঁর প্রতিবেদনে জানান যে সেদিনই তিনি বাংলায় বাইবেল মুদ্রণের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করতে পেরেছেন। ['5th Feb. (1800). Date on which W. Ward reported everything to be ready for printing the Bengali Bible.'][৩]

মিশন প্রেসে মুদ্রণের প্রাথমিক উদ্যোগ সংক্রান্ত উপরোক্ত বর্ণনাগুলি থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে মিশনারীদের প্রথম সংগৃহীত বাংলা হরফগুলি কলকাতা থেকে কেনা, নিজেদের তৈরি নয়। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যেই তাঁরা মুদ্রণের কাজ পুরোপুরি শুরু করেছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের নিজস্ব হরফ ঢালাইখানা স্থাপিত হয়নি। ১৭৯৮-৯৯ সাল থেকেই কলকাতায় স্থাপিত যে দেশীয় ভাষার হরফ ঢালাইখানার সঙ্গে কেরীর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল, সম্ভবত শ্রীরামপুর প্রেসের এই প্রথম সংগৃহীত বাংলা হরফগুলি তাদেরই তৈরি। এই হরফেই তাঁদের প্রথম বৃহৎ প্রকাশন— নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ ছাপা হয়। এগুলি কলকাতার বাজারে দেশীয়দের উদ্যোগে তৈরি। কোম্পানী প্রেসের হরফ এগুলির তুলনায় কিছুটা বড়ো ছিল, কেরী তা ব্যবহার করেননি।

---

১ J. C. Marshman, *ibid*, Vol. I, p. 124.

২ E. Carey, *op. cit*, p. 390 ; George Smith, *op. cit.*, p. 91.

৩ E. S. Wenger, '*Missionary Biographies*' (Handwritten Manuscript in 4 Vols., kept at Carey Library, Serampore) : *BMS Chronology*, Vol. I.

প্রসঙ্গত, ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে কেরীর লেখা কয়েকটি চিঠির কিছু কিছু অংশ স্মরণ করা যেতে পারে, যা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, ১৭৯৯ সাল শেষ হবার আগেই কেরী কলকাতার দেশীয় হরফ ঢালাইখানা থেকে তাঁর বাইবেল মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় বাংলা হরফ তৈরি করিয়ে নেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। ১লা এপ্রিল, ১৭৯৯ তারিখে মদনাবাটী থেকে কেরী বিলেতে ব্যাপটিস্ট সোসাইটিকে লিখে জানান যে তিনি কলকাতায় গিয়ে তাঁর প্রয়োজনীয় হরফ ঢালাই করানোর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে পেরেছেন এবং সেইমত কাজও শুরু হয়ে গেছে : 'I wrote to you, dt. Jan. 10, current, on my journey to Calcutta, and now inform you, that I fully succeeded in accomplishing the end of my journey thither, which was to get types cast for printing the Bible. The types are now casting…' (Carey to Baptist Society, Mudnabatty, April I, 1799)[১] ঐ বছরেই ২৮শে সেপ্টেম্বর কেরী পুনশ্চ মদনাবাটী থেকে ফুলারকে লিখে জানান যে পূর্বকথামত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হরফ তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং ফাউন্টেন শীঘ্রই ঐগুলি কলকাতা থেকে ফেরার পথে নিয়ে আসবেন :'…I had a letter, a month ago or more, informing me that the types and furniture for printing would be finished in about eight days ; so that I conclude they are coming up by this time ; but at any rate, brother Fountain who is going to Calcutta, to meet our brethren, Ward and Brunsdon, and a female companion for himself, will bring them up…' (Carey to Mr. Fuller, Mudnabatty, Sept. 28, 1799)[২] অনুমান করা যায়, এইসব হরফ পঞ্চাননের তৈরি ছিল। শ্রীরামপুর মিশনে যোগদানের আগে কলকাতায় কোনো দেশীয় হরফ ঢালাইখানায় তিনি ঐগুলি তৈরি করতেন।

এইসব হরফ ছাড়া কাগজও মিশনারীরা প্রথমে কলকাতা থেকে সংগ্রহ করেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে প্রথম যখন ছাপার কাজ শুরু হয় তাঁদের নিজস্ব কাগজকল তখনো স্থাপিত হয়নি। প্রথম বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের অধিকাংশ কপিই স্থানীয় পাটনা কাগজে ছাপা, কেবল এর তিনশো কপি বিদেশী কাগজে ছাপা। প্রথমদিকের এই উভয়বিধ কাগজই তাঁরা কলকাতা থেকে সংগ্রহ করে আনেন।

মিশন প্রেসে ছাপা প্রথম বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রথম মুদ্রণ উদ্যোগ সম্বন্ধে যে সব নথিপত্র ও বই পাওয়া যায় তার সবগুলি থেকেই জানা যায় যে তাঁরা প্রথম কেরী-কৃত নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ

১ E. Carey, *op. cit.*, pp. 334-35.

২ E. Carey, *op. cit.*, p. 345.

ছাপা শুরু করেন। জে. সি. মার্শম্যান এর বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'With the exception of two books of the Old Testament, the translation of the whole Bible into Bengalee had been completed. The Missionaries determined to begin with the printing of the New Testament. Ward set the first types with his own hands, and presented the first sheet of the Testament to Carey on 18th of March.' (1800)[১]

১৮০০ সালের ১৮ই মার্চ বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট মুদ্রণের কাজ, তথা শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রথম মুদ্রণের কাজ যে শুরু হয় তা অন্যান্য বই ও প্রাসঙ্গিক দলিল থেকেও সমর্থিত হয়। তবে ঐসব বর্ণনায় পাওয়া যায় যে বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম পৃষ্ঠার ছাপটি তোলেন স্বয়ং কেরী, ওয়ার্ড নন। অনুবাদক স্বয়ং এখানে মুদ্রাকরের ভূমিকায় অবতীর্ণ। জর্জ স্মিথ এই প্রসঙ্গটি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন : 'On Tuesday, 18th March 1800, Ward's Journal records ; "Brother Carey took an impression at the press of the first page in Matthew." The translator was himself the pressman.[২] স্যামুয়েল পীয়ার্স কেরীও তাঁর বইয়ে কেরীর ভূমিকার কথাই উল্লেখ করেছেন, তবে ভুলক্রমে তারিখটি লিখেছেন ১৭ই মার্চ।[৩] আমার কাছেও এই মতটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। E. S. Wenger-ও তাঁর হাতেলেখা 'B. M. S. Chronology' (Vol. I of '*Missionary Biographies*' in MSS.) নামক মিশনারী ঘটনাপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন : '1800, 18th March : An impression of the first page of the Bengali New Testament, composed by W. Ward himself, was taken by Dr. Carey'. ১৮০০ সালের ১৮ই মার্চ— এই ঐতিহাসিক দিনটিতে প্রথম কেরী শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে সর্বপ্রথম বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম পৃষ্ঠার ছাপটি তুলে নেন। সেদিন থেকে শুরু হয় তাঁদের মুদ্রণ পর্বের জয়যাত্রা। অবশ্য ঐ নিউ টেস্টামেন্টের প্রধান মুদ্রাকর ছিলেন ওয়ার্ড। ফেলিক্স কেরী ও ব্রান্সডন ছিলেন তাঁর সহকারী।

১৮০১ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি এই বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের শেষ পৃষ্ঠাটি ছাপা সম্পূর্ণ হয়।[৪] সুতরাং এর ছাপার কাজ শুরু ও শেষ হবার তারিখ দুটি বিচার করলে মনে হয় যে ১৮ই মার্চ, ১৮০০ থেকে ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮০১, অর্থাৎ প্রায় এগারো মাস সময় লেগেছিল নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ ছাপতে। কিন্তু জে. সি. মার্শম্যান ও জর্জ

---

১ J. C. Marshman, *op. cit.*

২ George Smith, *op. cit*, p. 187.

৩ S. P. Carey, *op. cit.*, p. 198.

৪ J. C. Marshman, *op. cit.*, p. 141 ; George Smith, *op. cit.*, p. 188.

স্মিথ উভয়েই লিখেছেন, বইটি ছাপতে মোট সময় লেগেছিল প্রায় ন'মাস। ওয়ার্ডের দিনলিপি বা 'পিরিঅডিক্যাল একাউন্টস'-এও একই তথ্য পাওয়া যায়। এর ফলে বইটি মুদ্রণের সময়কাল নিয়ে সমস্যা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮০১ তারিখে বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের ছাপার কাজ শেষ হলে এবং তা ছাপতে প্রায় ন'মাসের মতো সময় লেগে থাকলে, বলা যেতে পারে যে বইটির প্রথম পৃষ্ঠাটি মুদ্রিত হয় ১৮০০ সালে মে মাসের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যায়, ১৮০০ সালের ১৮ই মার্চ তা হলে কোন বইটি ছাপা শুরু হয়, এবং সেটির ছাপা কবে শেষ হয়? অথবা প্রশ্ন, প্রথম বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট কবে ছাপা শুরু হয়? প্রায় ন'মাসের হিসাব ধরে বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট ছাপা শুরু হবার যে তারিখ পাওয়া যায়, অর্থাৎ ১৮০০ সালে মে মাসের মাঝামাঝি, ওয়ার্ডের দিনলিপির সাক্ষ্যে তার সমর্থন পাওয়া যায়। ১৬ই মে, ১৮০০ তারিখে ওয়ার্ড তাঁর জার্নালে লিখেছেন: 'This week (16th May 1800) we have begun to print the first sheet of the New Testament. We print 2000 copies of which 1700 are on Patna paper and 300 on English. We also print 500 of Matthew to give away immediately, which will merely be an expense of paper only, and so will not cost more than two or three pounds'.[১] সুতরাং মিশন প্রেসের প্রধান মুদ্রাকর স্বয়ং ওয়ার্ডের এই দিনলিপি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে মে মাসের মাঝামাঝি থেকেই প্রকৃতপক্ষে বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট ছাপা শুরু হয় এবং প্রায় ন'মাস পরে ১৮০১ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি এর শেষ পৃষ্ঠাটি ছাপা সমাপ্ত হয়। বইটি ছাপতে যে প্রায় নয় মাস কাল সময় লেগেছিল তার আরেকটি পরোক্ষ প্রমাণ উদ্ধার করা যায়। এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১লা আগস্ট, ১৮০০ তারিখে লেখা ওয়ার্ডের দিনলিপি থেকে জানা যায় যে ঐ সময়ে তাঁদের ছাপার গতি ছিল, প্রতি সপ্তাহে ২০০০ কপি করে তিনটি অর্ধ-সীট ('We print three half sheets of 2000 each in a week'), অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে ২০০০ কপি করে মোট ৩×৮=২৪ পৃষ্ঠা ছাপা হত। [কাগজের প্রতি পূর্ণ সীট থেকে ডিমাই ষোলোপেজী (Demy 8vo.) আকারের বইয়ের ১৬ পৃষ্ঠা পাওয়া যায়, অর্থাৎ প্রতি অর্ধ-সীটে ৮ পৃষ্ঠা। সুতরাং তিনটি অর্ধ-সীটে ৩×৮=২৪ পৃষ্ঠা। আলোচ্য বইটিতে কোনো পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া নেই, কেবল এর প্রতি ৮ পৃষ্ঠা অন্তর বাংলা বর্ণে 'signature', অর্থাৎ বাঁধাইয়ের কাজের সুবিধার্থে মুদ্রাকরের দেওয়া সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেওয়া আছে। এইরূপ 'signature' থেকেও অর্ধ-সীট বা ৮ পৃষ্ঠা হারে ছাপার হিসাব সমর্থিত হয়।] সুতরাং এই গতিতে ছাপা হলে, প্রায় ন'মাসে অর্থাৎ ৩৮ সপ্তাহে মোট ২৪×৩৮=৯১২ পৃষ্ঠা

---

১ সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস', পৃ. ৯৩ (*Periodical Accounts*-এও এর উল্লেখ আছে।)

ছাপা হয়। আলোচ্য বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮০৬। তা হলে বইটি ছাপতে যে প্রায় ন'মাস সময় লেগেছিল (এই দীর্ঘ সময়ে কয়েক সপ্তাহ ছাপার কাজ বন্ধ থাকা বা শ্লথ হওয়া খুবই স্বাভাবিক মেনে নিলে) সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। সুতরাং আমাদের এই আলোচনা ও সাক্ষ্য-প্রমাণ সহ ঘটনার বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা যায় যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা প্রথম বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের মুদ্রণের কাজ প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে মে মাসের মাঝামাঝি এবং শেষ হয় প্রায় ন'মাস পরে ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে ৭ই ফেব্রুয়ারি।

তা হলে আরেকটি প্রশ্ন থেকে যায়, মিশন প্রেসে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই মার্চ ছাপার কাজের সূচনা হয়েছিল বলে যে বিবরণ পাওয়া যায় তার তাৎপর্য কী। ঘটনাটি এইভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে মিশন প্রেসে প্রথম ছাপা শুরু হয় আলোচ্য বাংলা নিউ টেস্টামেন্টই, অন্য কোনো বই নয়। ওয়ার্ড এর প্রথম পৃষ্ঠাটির জন্য হরফ সাজানোর কাজ নিজ হাতে সম্পূর্ণ করলে, নতুন সৃষ্টির আনন্দে অনুবাদক কেরী স্বয়ং মুদ্রণযন্ত্রে তার ছাপ তুলে নেবার জন্য মুদ্রাকরের ভূমিকায় এগিয়ে আসেন। এই ঘটনারই বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ১৮ই মার্চ (১৮০০) মঙ্গলবার কেরী 'first page' বা প্রথম পৃষ্ঠার 'impression' বা ছাপ তোলেন,[১] অথবা অন্যত্র বলা হয়েছে— 'Carey pulled the first page of the Bengali Testament.'[২] অর্থাৎ সেটিই ছিল প্রথম পৃষ্ঠার 'galleyproof' বা কাঁচা ছাপ। তারপর চলে সেই প্রুফ সংশোধন বা হরফ অদল-বদলের কাজ এবং অনুরূপ-ভাবে পরবর্তী আরো অন্যান্য পৃষ্ঠার হরফ সাজানোর কাজ (composing) ও পূর্ণ সীট বা ফর্মার 'make ready'-র কাজ। এইভাবে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছে বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম সীটের অর্থাৎ এই ষোলোপেজী বইয়ের প্রথম ফর্মার প্রকৃত ছাপার ('print') কাজ শুরু হয়।[৩] সমগ্র বইটি ছাপার কাজ শেষ হয় প্রায় ন'মাস পরে, ১৮০১ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি। এই বক্তব্যের সমর্থনে শ্রীরামপুর মিশন গোষ্ঠীর আরেকটি প্রকাশনা থেকেও প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া যায় : 'The New Testament Scriptures, after being nine months in the press, were published on the 7th of February 1801.'[৪]

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের এই প্রথম ছাপা বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা

---

১ George Smith, *op. cit.*, p. 187.

২ S. P. Carey, *op. cit.*, p. 198.

৩ *Ward's Journal*, 16th May 1800.

৪ *'Brief Review of translations and printing of the Scriptures from 1794 to close of the 10th Memoir* (1834)'. [Serampore Carey Library : BR 56.]

৮০৬, তবে এতে পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া নেই। ডিমাই অক্টেভো আকারের (৭.৭" × ৪.৮") এই বইটি ব্লটিং কাগজের মতো খসখসে মোটা পাটনা কাগজে ছাপা। তবে ওয়ার্ডের বর্ণনা অনুযায়ী (১৬ই মে, ১৮০০) এর প্রথম সংস্করণের ২০০০ কপির মধ্যে ৩০০ কপি বিলিতী কাগজে ছাপা হয়েছিল। [অবশ্য এটি মূলত দশ হাজার কপি ছাপার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু পরে এর খরচের কথা চিন্তা করে এবং প্রথম প্রচেষ্টার আনুষঙ্গিক ত্রুটিবিচ্যুতি ও অনুবাদের অসম্পূর্ণতার ('imperfection') কথা চিন্তা করে বিলেতে Baptist Missionary Society প্রথম সংস্করণ দু'হাজার কপি ছাপার সিদ্ধান্ত নেন। J. C. Marshman লিখেছেন : 'In 1798, Mr. Carey had proposed to Mr. Fuller to print, in the first instance, an impression of 10000 copies of the New Testament. He was stranger to the difficulties of the undertaking and placed undue confidence in the accuracy of his translation.' ('*Life and Times of Carey, Marshman & Ward*', Vol. I, p. 179) E. S. Wenger তাঁর পাণ্ডুলিপি-গ্রন্থ '*Missionary Biographies*, Vol. I, B. M. S. Chronology'-তে লিখে রেখেছেন '1798, 10th April—Date in which the Home Committee resolved to send paper from England for printing the Bengali New Testametnt & it was decided at the next meeting to print only 2000 copies as there might be many imperfections'.]

প্রথম ছাপা বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ :

'ধর্ম্মপুস্তক | তাহা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য। | যাহা প্রকাশ করিয়াছেন মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্য | শোধনার্থে | তাহার অন্তভাগ | তাহা আমারদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যেশু খ্রীস্টের | মঙ্গল সমাচার | তর্জ্জমা হইল গ্রীক ভাষা হইতে। | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল | ১৮০১'

শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে এই বইটির একটি কপি রক্ষিত আছে (No. A/5/5)। তবে ঐ কপিটিতে আখ্যাপত্রটি নেই। বইটি বাঁধিয়ে তার ধারে (spine) লিখে রাখা হয়েছে '*Bengal New Testament*, 1800 edition'। অবশ্য এই তারিখ সঠিক নয়। আমি আগেই উল্লেখ করেছি, ১৮০০ সালে এর ছাপা শুরু হলেও এর প্রকাশ সন ১৮০১।

শ্রীরামপুর নিবাসী জনৈক আইনজীবি ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত সংগ্রহেও এই বইয়ের একটি কপি আছে, তাতে বাংলা আখ্যাপত্রটি অক্ষত আছে। তাঁর সংগৃহীত এই কপিটি ও শ্রীরামপুর কলেজের কপিটি একই। [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম সংস্করণের (১৮০১) কপি যে একমাত্র ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছেই আছে এই দাবি অনেক কাল প্রচলিত ছিল এবং অনেকেই তা মেনে নিয়েছিলেন।[১] কারণ তাঁরা

১ সুধীরকুমার মিত্র, 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৫, ৪৮২।

কেউই শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে রক্ষিত আখ্যাপত্রহীন পূর্বোক্ত কপিটি ভালোভাবে বিচার বিবেচনা ও পরীক্ষা করে দেখেননি। কিন্তু এই বিষয়টি সযত্নে পরীক্ষার পর আমি নিঃসংশয় হতে পেরেছি যে পূর্বোক্ত বহুল প্রচারিত দাবিটি গ্রহণযোগ্য নয়।] এই বইটির আখ্যাপত্রে কেবলমাত্র 'শ্রীরামপুরে ছাপা হইল' লেখা থাকায় অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন যে তা শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের ছাপা নয়, সমসাময়িককালে, এমন-কি ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই, শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত অপর কোনো প্রেসে তা ছাপা।[১] তবে এই সংশয় ও ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের বহু বইয়ের (যেমন, বাংলা ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম ভাগ—'মোশার ব্যবস্থা', 'মহাভারত', 'রামায়ণ', 'হিতোপদেশ', 'লিপিমালা', ইত্যাদির) বাংলা আখ্যাপত্রে কেবলমাত্র 'শ্রীরামপুরে ছাপা হইল' এই কথাই লেখা থাকত এবং আশ্চর্যের কথা, ঐ একই বইগুলির ইংরেজি আখ্যাপত্রে লেখা দেখা যায় 'SERAMPORE, PRINTED AT THE MISSION PRESS'। আশ্চর্যের কথা হলেও, এইরূপ লেখাই ছিল তাঁদের রীতি। সুতরাং এ থেকে কোনোরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ নেই। [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত '*Tutor*' গ্রন্থ শ্রীরামপুরে ছাপা নয়। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে 'সূচনা পর্ব : প্রথম অধ্যায়ে' আলোচনা করা হয়েছে।]

প্রথম মুদ্রিত বাংলা নিউ টেস্টামেণ্ট বা 'ধর্মপুস্তক'-এর অন্তভাগ বা 'মঙ্গল সুমাচার' গ্রন্থটি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রতি অধ্যায় আবার একাধিক পর্বে বিন্যস্ত। এর ২৭টি অধ্যায়-বিভাগ এইরূপ : মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত (১-১০৭ পৃষ্ঠা) মঙ্গল সমাচার মার্কের রচিত (১০৮-১৭৬ পৃ.), মঙ্গল সমাচার লূকের রচিত (১৭৭-২৮৭ পৃ.), মঙ্গল সমাচার য়োহনের রচিত (২৮৮-৩৬৪ পৃ.), প্রেরিতের ক্রিয়া (৩৬৫-৪৭৮ পৃ.), পাওল প্রেরিতের পত্র রোমানকে (৪৭৯-৫১৯ পৃ.), পাওলের প্রথম পত্র করিন্থীরদিগকে (৫২০-৫৫৯ পৃ.), পাওল প্রেরিতের দ্বিতীয় পত্র করিন্থীরদিগকে (৫৬০-৫৮৭ পৃ.), পাওল প্রেরিতের পত্র গালাতীকে (৫৮৮-৬০১ পৃ.), পাওল প্রেরিতের পত্র এফেসীকে (৬০২-৬১৪ পৃ.), পাওল প্রেরিতের পত্র ফিলিপীকে (৬১৫-৬২৪ পৃ.), পাওল প্রেরিতের পত্র কলসীকে (৬২৫-৬৩৪ পৃ.), পাওল প্রেরিতের প্রথম পত্র তসলোনীকে (৬৩৫-৬৪৩ পৃ.), পাওল প্রেরিতের দ্বিতীয় পত্র তসলোনীকে (৬৪৪-৬৪৯ পৃ.), পাওলের প্রথম পত্র টিমোতিয়যকে (৬৫০-৬৬০ পৃ.), পাওলের দ্বিতীয় পত্র টিমোতিয়যকে (৬৬১-৬৬৮ পৃ.), পাওল প্রেরিতের পত্র টিটসকে (৬৬৯-৬৭৩ পৃ.), পাওল প্রেরিতের পত্র ফিলেমনকে (৬৭৪-৬৭৬ পৃ.), পাওল প্রেরিতের পত্র ভেব্রিরদিগকে (৬৭৭-৭০৬ পৃ.), যাকুবের সর্ব্বত্র পত্র (৭০৭-৭১৭ পৃ.), পিতরের সর্ব্বত্র

---

১ সুধীরকুমার মিত্র প্রণীত 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে (১ম খণ্ড পৃ. ৪৭৭, ৪৭৯, ৪৮১-৪৮২) এইরূপ সংশয় ও অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ও এই একই সংশয়ের কথা বলেন।

পত্র (৭১৮-৭২৯ পৃ.), পিতরের দ্বিতীয়া সর্ব্বত্র পত্র (৭৩০-৭৩৬ পৃ.), যোহনের প্রথম সর্ব্বত্র পত্র (৭৩৭-৭৪৮ পৃ.), যোহনের দ্বিতীয় সর্ব্বত্র পত্র (৭৪৯-৭৫০ পৃ.), যোহনের তৃতীয় সর্ব্বত্র পত্র (৭৫১-৭৫২ পৃ.), য়িহেদার সর্ব্বত্র পত্র (৭৫৩-৭৫৬ পৃ.), যাহা প্রকাশিত য়োহন মঙ্গল সমাচার বক্তার ঠাঁই (৭৫৭-৮০৬ পৃ.)। এখানেই ৮০৬ পৃষ্ঠায় বইটি সমাপ্ত।

এর প্রতিটি অধ্যায় আবার একাধিক পর্বে বিভক্ত। যেমন ১০৭ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রথম অধ্যায় 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত'—'২৮ অষ্টবিংশতি পর্ব্বে' বিভক্ত। এর প্রতি পৃষ্ঠায় ২৫টি করে পঙ্‌ক্তি আছে।

প্রথম অধ্যায় তথা গ্রন্থের সূচনা এইরূপ (পৃ. ১):

'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত

১ প্রথম পর্ব্ব—

এ আবরহামের সন্তান দাউদের সন্তান য়েশু খ্রীস্টের পূর্ব্ব পুরুষের পুস্তক—

আবরহাম জন্ম দিল য়িছক্ককে এবং য়িছক্ক জন্ম দিল যাঁকুবকে ও যাঁকুব জন্ম দিল য়িহোদা ও তা…র ভ্রাতারদিগকে এবং য়িহোদা জন্ম দিল পরছ ও জরক্ত তমরের গর্ভ হইতে এবং পরছ জন্ম দিল ক্ষছরোন ও ক্ষছরোন জন্ম দিল রামকে এবং রাম জন্ম দিল উমিনদব ও উমিনদ্দব জন্ম দিল নাক্ষশোনকে এবং নাক্ষশোন জন্ম দিল শালমাকে এবং শালমা জন্ম দিল বউজকে রক্ষবের গর্ভে ও বউজ জন্ম দিল ঔোবেদকে রোতের উদরে এবং ঔোবেদ জন্ম দিল য়িশিকে তার…র য়িশি জন্ম দিল দাউদ রাজাক এবং দাউদ রাজা জন্ম দিল শলমাকে তাহার গর্ভে যে পূর্ব্বে ছিল আওরী হা…জায়া এবং শলমা জন্ম দিল রক্ষবাঁমকে ও রক্ষবাঁম জন্ম দিল আবীহা ও আবীহা জন্ম দিল আসাকে অতঃপরে আসা জন্ম দিল য়িহোশপটকে এবং য়িহোশপট জন্ম দিল য়োরমকে ও য়োরম জন্ম দিল ঔোজীহুকে এবং উজীহু জন্ম দিল য়োতমকে ও য়োতম জন্ম দিল আক্ষজকে ও আক্ষজ জন্ম দিল ক্ষিজকীহাকে'

প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি (পৃষ্ঠা ১০৭) এইভাবে :

'২৮ অষ্টবিংশতি পর্ব্ব মাতিউর রচিত

…পরে সে একাদশ শিষ্য গিয়াছে গালিলিতে এক পর্ব্বতে…য়েশু নিরূপন করিয়া ছিলেন তাহার দের জন্য তখন তাহারা তাঁহার দর্শন পাইয়া ভজনা করিল কিন্তু কাহার ২ সন্দেহ থাকিল। পরে য়েশু আসিয়া বলিলেন এ কথা তাহারদিগকে পৃথিবী ও স্বর্গের সকল সাসন দাত্তব্য হইয়াছে আমাকে। অতএব যাইয়া শিক্ষা করাও সকল বর্ণেরদিগকে তাহারদিগকে ডুবাইতে ২ পিতা পুত্র ও ধর্ম্মাত্মার নামে তাহারদিগকে শিক্ষাইতে ২ সকলে মানিতে যাহা আজ্ঞা দিয়াছি তোমারদিগকে এবং দেখ আমি সর্ব্বদা তোমারদের সহিত জগতের শেষ পর্য্যন্ত। আমেন।—'

এখানেই 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' অধ্যায় শেষ। আর মূল গ্রন্থটির পরিসমাপ্তি হয়েছে এইভাবে (পৃষ্ঠা ৮০৬):

'২২ দ্বাবিংশতীয় পর্ব্ব প্রকাশিত

ভাগ জীবনের পুতি ও ধর্ম্ম সহর হইতে ও সে সকল হইতে যাহা গ্রন্থিত হইয়াছে এ পুতিতে। যিনি ইহার সাক্ষী দেন তিনি কহেন অবশ্য আমি শীঘ্র আসিব। আমেন। হউক তাহা আইস প্রভু য়েশু।—

আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীস্টের অনুগ্রহ হউক তোমারদের সকলের সহিৎ। আমেন।—'

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত বাংলা হরফের উচ্চতা সাধারণত ৩ মি. মি.। 'উ', 'র' প্রভৃতি হরফে প্রাচীন ধাঁচ রয়ে গেছে। 'উ'-এর মাথায় মাত্রার নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত অর্ধচন্দ্রাকৃতি পুঁটলি এখানেও বজায় আছে। পেট-কাটা 'ৰ' ও নিম্ন-বিন্দু 'র'— উভয় রূপই এখানে পাওয়া যায়। উপরে নীচে লেখা শ-ত, স-ক, ন-থ প্রভৃতি যুক্তবর্ণের রূপ আদিযুগের লক্ষণাক্রান্ত। এখানে ব্যবহৃত তৎসম শব্দের বানান প্রায়ই অর্ধতৎসমের মতো। যেমন—'ঘৃন্না' (ঘৃণা, ঘেন্না)।

বইটিতে পৃষ্ঠাঙ্ক নেই, তবে ৮ পৃষ্ঠা অন্তর বাংলা বর্ণে signature (বাঁধাইয়ের সুবিধার্থে সাঙ্কেতিক চিহ্ন) দেওয়া আছে। দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার শুরু হয়েছে। তবে বাক্যবিন্যাস রীতি মোটেই বাংলা ভাষার রীতি অনুসারী নয়।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে এক নতুন যুগ প্রবর্তনের সম্মানের অধিকারী এবং আলোচ্য বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট বা 'ধর্ম্মপুস্তক-অন্তভাগ'-ই ছিল সেই প্রেসে ছাপা প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনূদিত বাংলা গদ্যগ্রন্থ। সেই হিসাবে এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেই গুরুত্বের কথা স্মরণ করেই এর উদ্যোক্তাদের অক্লান্ত প্রয়াস ও এর মুদ্রণের পটভূমি, প্রস্তুতি ও অগ্রগতির ইতিহাস এবং এর বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের কথা সবিস্তারে আলোচনা করা হল। এর প্রকাশনের কালনির্ণয় ও প্রাসঙ্গিক সকল সংশয় নিরসনের চেষ্টাও আমি করেছি। ফলত একথা এখন নির্দ্বিধায় বলা যায় যে বাংলা মুদ্রণের আদিযুগের পক্ষে এক অবিশ্বাস্য দ্রুততায় মাত্র ন'মাসের প্রচেষ্টায় তাঁরা এই বইটির ছাপার কাজ ১৮০১ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়েও নিঃসংশয় হওয়া গেছে যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে তাঁরা এই বইটিই প্রথম ছাপতে শুরু করেন। কিন্তু এই বইটির মুদ্রণের কাজ শেষ হবার আগেই, ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই, তাঁরা অন্য দু-একটি ক্ষুদ্র বাংলা পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন।

মিশন প্রেস প্রকাশিত প্রথম বাংলা রচনা

কেরীর পূর্বপরিচিত ও এককালে তাঁর মদনাবাটীর নিত্য সহচর রামরাম বসু শ্রীরামপুর মিশন স্থাপিত হবার কয়েক মাস পরেই ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ (মে-জুন মাসে) শ্রীরামপুর মিশনে আসেন। সেই সময়ে কেরীর অনুরোধে তিনি বাংলায় খ্রীস্টধর্মের মহিমা ব্যাখ্যা সম্বলিত ও হিন্দুধর্মের নিন্দাসূচক দু-একটি ছোটো প্রচার পুস্তিকা রচনা করে দেন।

রামরাম বসু রচিত এই প্রচার পুস্তিকা অবিলম্বে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে মিশন প্রেসে ছাপা হয় এবং সমকালীন বিভিন্ন নথিপত্রের সাক্ষ্যে জানা যায়, ঐটিই ছিল শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা প্রথম প্রকাশিত বাংলা রচনা। [সমকালীন নথিপত্র থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে :

১. 'About the middle of this year (1800), Ram-bosoo···came upon a visit to the missionaries (at Serampore)···At the request of Carey, he compiled a religious tract, the first which had ever apperared, called the '*Gospel Messenger*'···At the same time he composed another pamphlet in which he exposed the absurdities of Hindooism···Large editions of these papers were printed and circulated (by 1800), and produced no little sensation in the native community'. J. C. Marshman, '***Life and Times of Carey, Marshman & Ward.***'

২. 'This able man (Ram Basu),···wrote the first tract the "*Gospel Messenger*", and the first pamphlet exposing Hindooism, both of which had an enormous sale and caused much excitement'.—George Smith, '***The Life of Willam Carey***' p. 303.

৩. Ward's Journal (communicated to Mr. Fuller), Lord's day, Aug. 31, 1800—

'After dinner, brother Carey read and translated to us a most cutting piece in verse against the brammans, written by Ram Boshoo ;···We have the honour of printing the first book that was ever printed in Bengalee ; and this is the first piece in which brammhans have been opposed, perhaps for thousands of years.'—***Periodical Accounts***, p. 111.]

রামরাম বসুর প্রথম রচনা '*Gospel Messenger*' বা 'হরকরা'। ১০০ পঙ্‌ক্তির বাংলা কবিতায় রচিত এই ক্ষুদ্র ধর্মীয় প্রচার পুস্তিকায় ('Religious Tract') খ্রীস্টের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে।[১] এ ছাড়া, ঐ একই সময়ে মিশনারীদের অনুরোধে রামরাম বসু বাংলা কবিতায় আরেকটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। সম্ভবত এটির নাম ছিল 'জ্ঞানোদয়', এটিতে হিন্দুধর্মের প্রতি তীব্র আক্রমণ করা হয়। এই দুটি পুস্তিকাই ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে, সম্ভবত আগস্ট-অক্টোবরের মধ্যে,[২] শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছেপে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়।

---

১ ***Periodical Accounts***, II, p. 69.

২ মার্ডকের ক্যাটালগ অনুযায়ী, জুন মাসে (১৮০০) প্রথম পুস্তিকা 'হরকরা' ছাপা হয়। [S. K. Dey, '***Bengali Literature in 19th century***' p. 146]

এই দুটিই ছিল মিশন প্রেস প্রকাশিত প্রথম বাংলা পুস্তিকা এবং হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ও খ্রীস্ট-ধর্মের মহিমা প্রচারার্থে কোনো হিন্দুর রচনাও মুদ্রিতকারে এই প্রথম। বলা বাহুল্য, এই ধরনের পুস্তিকা প্রচারের ফলে তৎকালে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

বার্মিংহামের স্যামুয়েল পীয়ার্স রচিত *'Letters to the Laskars'*-এর কেরী-কৃত বাংলা অনুবাদও এই সময় (১৮০০ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট-অক্টোবর মাসে) মিশন প্রেসে ছাপা হয়। [Mr. Carey to Dr. Ryland : Aug. 13, 1800 : 'The printing of the New Testament is the work which at this time most occupies our attention. Matthew, Mark and part of Luke are now printed off and I am happy to think that it will be easily understood. We have begun to distribute Matthew's gospel··· We have printed several small pieces in Bengalee which have had large circulation,···. I am now translating the address of dear brother Pearce to the Lascars, and intend to do the same with yours entitled, "A Message from God, unto Thee".'[১]

মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত

এ ছাড়াও ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বাংলা প্রকাশন শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রচারিত হয়। সেটি ছিল *'Gospel of Matthew'*-র বাংলা অনুবাদ। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে মিশন প্রেসে কেরী অনূদিত বাংলা নিউ টেস্টামেণ্ট ছাপতে ছাপতে তাঁরা এর প্রথম অধ্যায়টি *'Gospel of Matthew'* বা 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' আলাদাভাবে ৫০০ কপি বেশি ছেপে নেন। [···'while the missionaries were carrying the Bengalee New Testsment through the press they printed 500 additional copies of the Gopel of Matthew ;···'—J. C. Marshman, *'Life and Times of Carey, Marshman & Ward'*, Vol. I—Ward's Journal, 16th May, 1800.] বাংলা নিউ টেস্টামেণ্ট ২০০০ কপি ছাপার আয়োজন হয়েছিল, কিন্তু সমগ্র বইটির মুদ্রণের কাজ শেষ হবার আগেই তাঁরা এর প্রথম অধ্যায়টির ঐ বাড়তি মুদ্রিত কপিগুলি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করেন। কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন এর মাধ্যমে যীশুখ্রীস্টের পূর্ণ জীবনকাহিনী সাধারণ্যে প্রচার করার অনেক গুরুত্ব আছে। এ সম্বন্ধে ওয়ার্ড তাঁর জার্নালে লিখেছেন যে ঐ গ্রন্থ প্রচার এমনই একটি কাজ ছিল—'Which we considered of importance as containing a complete life of the Redeemer,' (Smith, *'Life of W. Carey*, p. 187)। প্রথম অধ্যায়টির ঐ বাড়তি ৫০০ কপি ছাপার

১ সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস', পৃ. ৯৪

জন্ম বাড়তি কাগজ বাবদ তাঁদের মাত্র দু-তিন পাউণ্ড বেশি খরচ হয়।[১] ১০৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' ঐ অংশটি ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের শেষাশেষি ছাপা সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে এর ৫০০ কপি জুলাই-আগস্ট মাস (১৮০০) নাগাদ বিলি করা হয়। এই পুস্তিকার পরিশিষ্টে বাংলায় রচিত ও মুদ্রিত যীশু সম্বন্ধীয় ওল্ড টেস্টামেন্টের কিছু ভবিষ্যদ্বাণী সংযোজিত করা হয়।[২] পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী এই পরিশিষ্টটি অনুবাদ নয়, স্বাধীন রচনা— এর শিরোনাম: 'কালের অল্প বিবরণ এবং কতক ভবিষ্যৎ বাক্য য়েশু খ্রীস্টের বিষয়।'[৩]

বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম সংস্করণের (১৮০১) কেবলমাত্র প্রথম অধ্যায়টি আগাম প্রকাশিত ও সাধারণ্যে বিতরিত হওয়ার এই বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করতে না পারায় কোনো কোনো মহলে অবশ্য কিছু কিছু ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা মনে করেছেন ম্যাথু লিখিত মঙ্গল সমাচার একটি স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ অনুবাদকর্ম এবং ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সেটিই প্রথম প্রকাশিত হয়; ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত মঙ্গল সমাচার বা বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট এর পরবর্তী গ্রন্থ, এবং তার প্রথম অধ্যায়ে পূর্ববর্তী ম্যাথু লিখিত মঙ্গল সমাচার পুস্তিকাটি পরিবর্তিত ও সংশোধিত আকারে স্থান পেয়েছে। কিন্তু আগেই বলেছি, ঘটনাটি তা নয়। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র নিউ টেস্টামেন্ট বা মঙ্গল সমাচার সর্বপ্রথম ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এবং তার প্রথম অধ্যায়টি মাত্র আগাম ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই প্রকাশ করা হয়। সুতরাং ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ম্যাথু লিখিত মঙ্গল সমাচার ও ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম অধ্যায় এক ও অভিন্ন, একটি অপরটির পরিবর্তিত সংশোধিত রূপ নয়। এই ম্যাথু লিখিত মঙ্গল সমাচার পুস্তিকাটি বা অধ্যায়টি 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' নামে আখ্যাত।

'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত'

কিন্তু এই বিষয়টি আর কোনো সমালোচনা গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি। পূর্বোক্ত ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েই তাই সজনীকান্ত দাস বলেছেন, ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসের গোড়ায় 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' প্রকাশিত হয় এবং এটিই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত সর্বপ্রথম গদ্যপুস্তক।[৪] লক্ষণীয়, এটির ভাষা ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম অধ্যায়ের ('মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত') ভাষা থেকে ভিন্ন।

---

১ *Ward's Journal* : 16th May, 1800.

২ *Periodical Accounts*, II, p. 69.

৩ সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', পৃ. ১৮-১৯

৪ সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস', পৃ. ৯০

শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে রক্ষিত আখ্যাপত্রহীন একটি পুস্তককে (Call No. A/6/1) তিনি ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত পূর্বোক্ত 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' নামক শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রথম মুদ্রিত গদ্যপুস্তক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং এর একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিও প্রকাশ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে এরই 'ভাষা অল্পকালের মধ্যে সংশোধন ও পরিবর্তন' করে কেরী যা দাঁড় করান তাই ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।[১] কিন্তু আমার পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্রে বলা যায় তাঁর এই মত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়।

সজনীকান্ত দাস কর্তৃক উল্লিখিত শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরির ঐ বইটি (Call No. A/6/1 : 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত') আমি সযত্নে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং আমার স্থির সিদ্ধান্ত, ওটি কোনোক্রমেই ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ছাপা নয়, নিঃসন্দেহে আরো কিছু কাল পরে ওটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বইটির প্রথম পৃষ্ঠা শুরু হয়েছে এইভাবে :

"মাতিউ প্রথম অধ্যায়।

মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত।—

১ম অধ্যায়।—

১ আবরহামের সন্তান দাউদ তাহার সন্তান য়িশু
খ্রীস্ট তাহার পূর্ব্ব পুরুষাখ্যান।—

২ আবরহাম হইতে য়িসহকের উদ্ভব ও য়িসহক হইতে
যাকুবের উদ্ভব ও যাকুব হইতে য়িহুদা ও তাহার ভ্রাতা

৩ গণের উদ্ভব। ও য়িহুদা হইতে তামরের উদরে ফরস
ও জরখের উদ্ভব ও ফরস হইতে হসরোণের উদ্ভব ও

৪ হসরোণ হইতে রামের উদ্ভব। ও রাম হইতে আমি
নদেরের উদ্ভব ও আমিনদের হইতে নাখসোনের উদ্ভব

৫ ও নাখসোন হইতে শলমার উদ্ভব।…" ইত্যাদি

১২৩ পৃষ্ঠায় বইটির পরিসমাপ্তি এইভাবে :

123

"মাতিউ অষ্টাবিংশতি অধ্যায়।—

১৬……

তখন এগারটা শিষ্যগণ

য়িশুর নিরূপিত এক পর্ব্বতে গালিলি দেশে চলিয়া গেল।

১৭ পরে সে তাহাকে দেখিয়া তাহার ভজনা করিল

---

১ তদেব, পৃ. ২৫-২৬।

১৮ কিন্তু কাহার ২ সন্দেহ ছিল। তখন য়িশু আসিয়া
তাহারদিগকে শুনাইয়া কহিলেন যে স্বর্গেতে পৃথি
১৯ বীতে সকল সাধ্য আমাকে দেওয়া গিয়াছে। অতএব তোমরা যাইয়া সকল
দেশের লোকের দিগকে পিতার ও পুত্রের ও ধর্ম্মাত্মার নামেতে ডুব দেওয়াইয়া
২০ যে কিছু আমি তোমারদিগকে আজ্ঞা করিয়াছি সে সকল পালন করিতে
তাহারদিগকে শিখাইয়া শিখা করহ এবং দেখ জগতের শেষ পর্য্যন্তই আমি সতত
তোমারদের সঙ্গে আছি।—"

বইটির প্রতি পৃষ্ঠায় ২৩টি করে পঙ্‌ক্তি আছে। বইটিতে কোনো আখ্যাপত্র নেই তবে এটি বাঁধিয়ে তার ধারে (spine) লিখে রাখা আছে—'BENGALI—ST. MATTHEW —FIRST EDITION।' এই বর্ণনা সঠিক নয়, প্রথম সংস্করণ হিসাবে উল্লেখ করাতেই এখানে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। বইটিতে কোনো তারিখ নেই, তবে এর ভিতরের পৃষ্ঠায় কেউ কালিতে লিখে রেখেছেন—1826 (?)। হয়ত বা এরই উপর নির্ভর করে K. S. Diehl এই বইটির সম্ভাব্য প্রকাশ সন ১৮২৬ বলে উল্লেখ করেছেন।[১] এই প্রকাশ সনও নির্ভরযোগ্য নয়। তবে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এটি ১৮০০ বা ১৮০১ খ্রীস্টাব্দের অনেক পরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, পরবর্তী সংশোধনের ফলে তখন এর ভাষাও নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম সংস্করণের (১৮০১) ভাষা থেকে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। আমার এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করা চলে :

১. ডিমাই অক্‌টেভো আকারের (৮.২" × ৫") এই বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৩ (সজনীকান্ত দাসের বর্ণনানুযায়ী ১২৫ নয়), এতে ইংরেজিতে পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া আছে। কিন্তু বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট, ১ম সংস্করণের (১৮০১) প্রথম অধ্যায় 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' ১০৭ পৃষ্ঠাব্যাপী, সেখানে কোনো পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া নেই। সহজ যুক্তিতে মনে হয় পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া বই পৃষ্ঠাঙ্ক-বিহীন বইয়ের পরে ছাপা ; কারণ মুদ্রণের আধুনিক রীতি অনুযায়ী পৃষ্ঠাঙ্ক দিয়ে বই ছাপা প্রথম শুরু করে সেই বইয়ের পরবর্তী সংস্করণ আবার প্রাচীন প্রথানুযায়ী পৃষ্ঠাঙ্ক না দিয়ে ছাপার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

২. অক্ষর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে মনে হয় নিউ টেস্টামেন্ট, ১ম সংস্করণ (১৮০১) অথবা এর প্রথম অধ্যায় 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' অংশ বক্ষ্যমাণ পুস্তকটির চেয়ে আগে লেখা, compose করা ও ছাপা। এই প্রথমোক্ত গ্রন্থে অনেক পুরনো ধাঁচের হরফ, যেমন 'তুমি,' 'তুচ্ছ' 'প্রভু' প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু বক্ষ্যমাণ পুস্তকটিতে অপেক্ষাকৃত আরো আধুনিক ধাঁচের হরফ দেখা যায় যেমন, 'তুমি,' 'প্রভো', 'অন্ধকার' ইত্যাদি। এছাড়া প্রথমোক্ত গ্রন্থে 'র'-এর উভয় রূপই— পেট-কাটা 'ব' (ৰ) ও নিম্নবিন্দু

১ K. S. Diehl, '*Early Indian Imprints*', p. 397.

'ব' (র) পাওয়া যায়। এই ধরণের হরফ অপেক্ষাকৃত পূর্ববর্তী পর্বের : কলকাতা থেকে কিনে এনে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রথম ছাপা বইয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। মিশন প্রেসের নিজস্ব তৈরি সাটে 'ৰ' হরফ নেই, মিশনের পরবর্তী কোনো বইয়েও তাই এই বিশেষ হরফটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটিতেও 'ৰ' হরফ দেখা যায় না। এটি পরবর্তী-কালে ছাপা।

৩. ভাষা বিচার করে মনে হয়, বক্ষ্যমাণ পুস্তকটির ভাষা নিউ টেস্টামেণ্ট, ১ম সংস্করণের (১৮০১) ভাষা অপেক্ষা উন্নততর, এবং তা অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে সংশোধনের ফলে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ছুটির ভাষা তুলনামূলকভাবে বিচার করা যেতে পারে :

বাংলা নিউ টেস্টামেণ্ট, ১ম সংস্করণ (১৮০১) গ্রন্থের ভাষার নমুনা :

তৃতীয় পৃষ্ঠায় : "২ দ্বিতীয় পর্ব্ব মাতিউর রচিত

হেরোদ রাজার কালে যখন য়েশু জন্ম ছিলেন য়িহোদার বীতলক্ষমে

তখন দেখ পণ্ডিৎ পূর্ব্ব দিক

২ হইতে য়িরোশলমে আসিয়া বলিল কোথায় তিনি

যিনি জন্ম হইয়াছেন য়িহোদীরদের রাজা একারণ তাহার তারা

পূর্ব্ব দেশে দেখিয়া আসীয়াছি পূজা করিতে তাঁহাকে—

হেরোদ রাজা এই কথা শুনিয়া উদ্বিগ্নিত ছিল এবং

সকল য়িরোশলম তাহার সহিত।..."

'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' নামক বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে এই একই অংশটি লেখা হয়েছে এইভাবে : ৩-৪ পৃষ্ঠায় : "মাতিউ দ্বিতীয় অধ্যায়

১ অনন্তর হেরোদ রাজার সময়ে য়হুদিয়ার বীতলহমে

য়িশুর জন্ম হইলে পরে দেখ কতেক পণ্ডিত পূর্ব্ব

দিক্ হইতে য়িরোশলমে আসিয়া কহিলেক যে য়হুদীর

২ দের রাজা হইয়া যিনি জন্মিয়াছেন তিনি কোথায়

কেননা আমরা পূর্ব্ব দিক থাকিয়া তাহার নক্ষত্র দেখি

লাম এবং তাহার সাক্ষাতে দণ্ডবৎ করিতে আসি

৩ য়াছি। হেরোদ রাজা একথা শুনিয়া তিনি সম্

৪ দায় য়িরোশলমের সঙ্গে বিস্মিত হইলেন।..."

নিঃসন্দেহে প্রথম বইটির ভাষা অপেক্ষাকৃত বেশি আড়ষ্ট, এর তুলনায় দ্বিতীয়টির ভাষা উন্নততর। দ্বিতীয় গ্রন্থে বাক্যবিন্যাস রীতিও অনেকটা বাংলা ভাষার নিয়মানুগ হতে পেরেছে। পরবর্তী পর্যায়ের সংশোধন ও সংস্কারের ফলেই ভাষার এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

সুতরাং শ্রীরামপুর কলেজে রক্ষিত আখ্যাপত্রহীন 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত'

বইটিকে সজনীকান্ত দাস যে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম বাংলা বাইবেল বলে প্রতিপাদন করেছেন, উপরোক্ত তথ্য ও যুক্তির আলোকে তা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। এটি ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের অনেক পরে সংশোধিত হয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীরামপুর কলেজে রক্ষিত 'ধর্ম্মপুস্তক···তাহার অন্তভাগ···আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যেশু খ্রীস্টের মঙ্গল সমাচার' নামক আখ্যাপত্রহীন অপর বইটিই ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম মুদ্রিত সমগ্র বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট। এই বইয়েরই প্রথম অধ্যায়টি— 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' ('Gospel of Matthew') ৫০০ কপি অতিরিক্ত মুদ্রিত হয়ে সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে আগাম ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই প্রচারিত হয়।

বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের সফল প্রকাশ : কেরী ও শ্রীরামপুর মিশনের সামগ্রিক সাফল্যের সূত্রপাত

৮০৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত সমগ্র বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট (১ম সং, ১৮০১) ২০০০ কপি ছাপতে মোট খরচ পড়েছিল ৬১২ পাউণ্ড,[১] অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাজার টাকা (৪৮৯৬ টাকা)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠার আগে কেরী যখন তাঁর বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট কলকাতায় অপরের প্রেস থেকে ছাপানোর পরিকল্পনা করছিলেন, সেই সময় কলকাতার মুদ্রাকরের কাছ থেকে তিনি এর ছাপার খরচের একটা হিসাব নিয়েছিলেন। ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে বিলেতে মিশনারী সোসাইটিকে লেখা চিঠিতে কেরী সেই হিসাবের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন যে তখন এর ১০,০০০ কপি ছাপতে খরচ লাগত ৪৩,৭৫০ টাকা।[২] অবশ্য আরেকটি সূত্রে জানা যায় যে ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে কেরী একবার কলকাতায় এসে অনুসন্ধান করে জানতে পারেন যে তাঁর সমাপ্তপ্রায় বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট ছাপতে ডিমাই অক্টেভো আকারের প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা লাগবে এবং নতুন কাটা হরফে এর ১০,০০০ কপি ছাপতে খরচ পড়বে ৩০০০ পাউণ্ড,[৩] অর্থাৎ প্রায় ২৪,০০০ টাকা। এই সমস্ত হিসাব থেকে এটুকু অন্তত স্পষ্ট বোঝা যায় যে বাংলা বাইবেল ছাপার জন্ত কেরী দীর্ঘদিন অনেক হিসাব ও বিবেচনা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজস্ব ছাপাখানায় তা অপেক্ষাকৃত কম খরচে ছাপতে পেরেছিলেন।

কিন্তু মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠার পর নিউ টেস্টামেন্ট ছাপতে শুরু করেই মিশনারীদের আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। তাই তাঁরা কলকাতার ইংরেজ মহলের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানান। তাঁরা কলকাতার কাগজে (আধা-সরকারী 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকায়—২২শে মার্চ ১৮০০ তারিখে)[৪] এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন যে শ্রীরামপুরে

---

১ George Smith, *op. cit.*, p. 187 ; J. C. Marshman, *op. cit.*, Vol. I, p. 141.

২ J. C. Marshman, *op. cit.*, Vol I, pp. 79-80.

৩ E. S. Wenger, '*Missionary Biographies*' (in MSS.), Vol. I, B. M. S. Chronology.

৪ E. S. Wenger, *ibid* ; George Smith, *op. cit.*, p. 187.

তারা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বাংলায় নিউ টেস্টামেন্ট মুদ্রণ শুরু করেছেন। প্রতি কপি নিউ টেস্টামেন্টের জন্য অগ্রিম ৩২ টাকা (বা ৪ পাউণ্ড বা দুই স্বর্ণমোহর) দিয়ে গ্রাহক তালিকাভুক্ত হবার জন্য কলকাতার ইংরেজ মহলের কাছে তাঁরা আবেদনে জানান। সেই আবেদনে অনেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ৫০ জন গ্রাহক হওয়ায় ১৫০০ টাকা সংগৃহীত হয়।[১] এই টাকা মিশনারীদের ছাপার কাজে পরম সহায়ক হয়েছিল।

কিন্তু শ্রীরামপুর মিশনারীদের ঐ বিজ্ঞপ্তি তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল ওয়েলেসলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কলকাতার অদূরে ঐরূপ একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হওয়ার বিষয়টিকে তিনি মোটেই সুনজরে দেখেননি। ঐ সময় ব্রিটিশ শাসনাধীন এলাকায় সংবাদপত্র ও মুদ্রণ প্রকাশন সম্বন্ধে ওয়েলেসলী অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন এবং সেই সূত্রে তিনি অবিলম্বে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসটিকেও বন্ধ করার জন্য দিনেমার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগে উদ্যোগী হন। কিন্তু তার আগে তিনি একবার পাদ্রী ব্রাউনের কাছে মিশনারীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। ব্রাউন তখন ওয়েলেসলীকে বোঝান যে শ্রীরামপুর মিশনারীদের কোনোরূপ অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই, তাঁরা কেবলমাত্র দেশীয়দের মধ্যে ধর্মপ্রচারের মহৎ কাজেই নিয়োজিত, এমন-কি কিছুদিন আগে তাঁরা ব্রিটিশ সরকার-বিরোধী একটি পুস্তিকা ছাপতে অস্বীকৃত হন। ব্রাউন আরো বলেন যে, মিশনারীরা যে বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট ছাঁপতে উদ্যোগী হয়েছেন, ওয়েলেসলী-প্রস্তাবিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ভাষা শিক্ষার কাজে সেটি অত্যন্ত সহায়ক হবে। ব্রাউনের এই অভিমত শুনে শ্রীরামপুর মিশন ও তাদের ছাপাখানা সম্বন্ধে ওয়েলেসলীর মনোভাবও পরিবর্তিত হয় ও ধীরে ধীরে তিনি তাঁদের সম্বন্ধে এক অনুকূল মত পোষণ করতে থাকেন। বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম সংস্করণ (ফেব্রুয়ারি ১৮০১) প্রকাশিত হবার পর বাংলা ভাষাভিজ্ঞ হিসাবে কেরীর খ্যাতি সরকার ও কলকাতার ইংরেজ মহলে আরো ছড়িয়ে পড়ে এবং তারই ফলে কেরী ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে মে মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলার অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। ঐ পদে যোগদান করার সূত্র ধরেই পরিণতিতে কেরীর বহুমুখী কর্মসাধনা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ভাষাচর্চা ও প্রকাশনা পরিকল্পনা, শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রণ প্রচেষ্টা ও সর্বোপরি বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের অভিযান পরম সার্থকতা লাভ করেছিল।

কেরীর জীবনসাধনায় বাংলা বাইবেল মুদ্রণের সূত্রপাত এই নিউ টেস্টামেন্ট প্রকাশের মধ্য দিয়েই। এর পরে ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্টের আরো অনেক সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোক্তা ছিলেন কেরী। তাঁর জীবদ্দশায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে নিউ

---

১ **J. C. Marshman, *op. cit.* P. A., p. 70 : Letter from the Missionaries to the B. M. S., 15 Aug., 1800.**

টেস্টামেন্টের আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, শেষ সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে। কেরী তাঁর মিশনারী জীবনের চল্লিশ বছরের ইতিহাসে বাংলায় ওল্ড টেস্টামেন্টের পাঁচটি সংস্করণ ও নিউ টেস্টামেন্টের আটটি সংস্করণ প্রস্তুত করেন এবং তা শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হতে দেখে যান।[১] একাধারে কেরী ও তাঁর অন্যান্য মিশনারী সহযোগী এবং শ্রীরামপুর মিশন প্রেস উভয়েরই এটি এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। প্রতিটি নতুন সংস্করণে তাঁরা প্রকাশিত গ্রন্থের ভাষা ও ছাপার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করেছেন। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম সংস্করণ (১৮০১) নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় তাঁরা ঐ বছরেই এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হন। তবে তা সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশিত হয় ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে। সেইজন্যই সম্ভবত নিউ টেস্টামেন্ট—দ্বিতীয় সংস্করণের বাংলা আখ্যাপত্রে প্রকাশ সন দেওয়া আছে ১৮০৩, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা প্রকাশিত হয় ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে। এই সংস্করণের ভাষা বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়ে প্রায় একটি নতুন রূপ লাভ করে। বিশেষ করে পরিবর্তন আনা হয় এর বাক্যবিন্যাস রীতিতে। পূর্বের ইংরেজি ভাষানুগ বাক্যগঠনরীতি বর্জন করে তাকে বাংলা ভাষানুসারী করার চেষ্টা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ এর (২য় সং) ভাষার সামান্য নমুনা এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে :

বইটির প্রথম অধ্যায়— 'মঙ্গল সমাচার মাতিউরচিত' ; এর অন্তর্গত ৩য়-৪র্থ পৃষ্ঠায় পাই : 'পর্ব্ব ২ : হেরোদ রাজার কালে যখন য়িহুদার বৈতলখমে য়িশুর জন্ম ছিল তৎকালে দেখ পুর্ব্বদিগ হইতে য়িরোশলমে পণ্ডিত লোকেরা আসিয়া বলিল য়িহুদীরদের রাজা যিনি জন্মিয়াছেন তিনি কোথায় কেননা পূর্ব্ব দেশে তাহার তারা দেখিয়া আমরা তাহার পূজা করিতে আসিয়াছি।—'

'মাতিউরচিত' নামক প্রথম অধ্যায়টি শেষ হয়েছে এইভাবে : '...পরে সে একাদশ শিষ্যেরা গালিলিতে যে এক পর্ব্বত য়িশু তাহারদের জন্য নিরূপণ করিয়াছিলেন সেখানে গেল তখন তাহারা তাঁহার দর্শন পাইয়া তাঁহার ভজনা করিল কিন্তু কাহার ২ সন্দেহ হইল। য়িশু আসিয়া একথা তাহারদিগকে বলিলেন পৃথিবীর উপরে ও স্বর্গে সকল শাসন পদ আমাকে দেয়া গিয়াছে। অতএব তোমরা যাইয়া সকল দেশীয়েরদিগকে পিতা পুত্র ও ধর্ম্মাত্মার নামে ডুব দেয়াইতে এবং যাহা তোমারদিগকে আজ্ঞা দিয়াছি সে সকল মানিতে শিক্ষাইতে তাহারদিগকে শিষ্য কর এবং দেখ জগতের শেষ পর্যন্ত আমি সর্ব্বদা তোমারদের সহিত।—'

এর আখ্যাপত্রটিও পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় : "ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য। | বিশেষত | যাহা মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যশোধনার্থে প্রকাশ | করিয়াছেন।— | তাহাই | ধর্ম্ম পুস্তক | তাহার অন্ত ভাগ—। তাহা আমারদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা য়িশু খ্রীস্টের | মঙ্গল সমাচার |

---

১ George Smith, *op. cit.*, p. 189.

গ্রীক ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল। | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০৩।—' শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে এই দ্বিতীয় সংস্করণের একটি কপি রক্ষিত আছে (পুস্তক সংখ্যা A/5,6)। পঞ্চাননের কাটা হরফের নিদর্শন এতে পাওয়া যায়।

এই পরিবর্তিত সংস্করণ সম্বন্ধে কেরী তাঁর বন্ধু ফুলারকে লিখছেন : 'The alterations are great and numerous, not so much in what related to the meaning as to the construction. I hope it will be tolerably correct, as every proof-sheet is revised by us all, and compared as exactly with the original as brother Marshman and I are capable of, and subject to the opinions and animadversions of several pundits.'[১]

কিন্তু ভাষা ছাড়াও এর মুদ্রণে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পঞ্চানন কর্মকার মিশন্ প্রেসে সম্পূর্ণ নতুন এক সাট বাংলা হরফ খোদাই করেন। এই হরফ ছিল আগের তুলনায় আরো সুন্দর ধাঁচের ও আরো ছোটো আকারের। 'While engaged in cutting the Nagree punches, Punchanon···completed a fount of Bengalee, smaller in size, and of more elegant form than that which had been used in the first edition of the Bengalee New Testament.'[২] এই নতুন হরফেই বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের দ্বিতীয় সংস্করণটি ছাপা হয়। এই সংস্করণেও অবশ্য পৃষ্ঠাঙ্ক নেই। পরবর্তী সংস্করণে ভাষার আরো পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে অনুমান করে কেরী এই সংস্করণটি ১০০০ কপি মাত্র ছাপার ব্যবস্থা করেন। এতে ব্যবহৃত হরফের উচ্চতা ২.৫ মি. মি. থেকে ৩ মি. মি.-এর মধ্যে। 'গ' অক্ষরটির কোনো মাত্রা নেই, এবং তা অন্যান্য অক্ষরের চেয়ে আকারে বড়ো। আ-কার (া) সব সময় মাত্রা ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে। এর কয়েকটি বিশিষ্ট অক্ষর লক্ষণীয়, যেমন—'ং', 'জ্ঞ', 'উ', 'র', 'ভ' 'ট'।

বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের তৃতীয় ফোলিও সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে এর চতুর্থ সংস্করণ ছাপা হয় ৫০০০ কপি।

সমগ্র বাইবেলের বাংলা অনুবাদ মুদ্রণে কেরীর অক্লান্ত প্রয়াস

মূল হিব্রু থেকে বাংলায় অনূদিত ওল্ড টেস্টামেন্ট ১৮০২ থেকে ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৮০২ সালে এর প্রথম খণ্ড— Pentateuch অংশ ('মোশার ব্যবস্থা'), ১৮০৩ সালে তৃতীয় খণ্ড— 'দাউদের গীত', ১৮০৭ সালে চতুর্থ খণ্ড ('ভবিষ্যৎ

১ J. C. Marshman, *op. cit.*, Vol. I, pp. 179-180.

২ J. C. Marshman, *op. cit.*, p. 179.

বাক্য') এবং ১৮০৯ সালে এর অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ড ('য়িশরালের বিবরণ') প্রকাশিত হয়। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম খণ্ড 'মোশার ব্যবস্থা'-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

সম্পূর্ণ বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট (১ম সং) প্রকাশিত হয়ে যাবার পর শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ওল্ড টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ মুদ্রণের কাজ শুরু হয় এবং এর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে। তবে এর বাংলা আখ্যাপত্রে প্রকাশ সন দেওয়া আছে ১৮০১, সেটি ভুল। ইংরেজি আখ্যাপত্রে তারিখ যথাযথ লেখা আছে— ১৮০২। বাংলা আখ্যাপত্রটি এইরূপ: 'ধর্ম্ম পুস্তক | তাহা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য। | যাহা প্রকাশ করিয়াছেন মনুষ্যের ত্রাণ ও | কার্য্য শোধনার্থে। | তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারিবর্গ— | মোশার ব্যবস্থা। | য়িশরালের বিবরণ। | গীতাদি। | ভবিষ্যৎ বাক্য। | মোশার ব্যবস্থা | তর্জ্জমা হইল এব্রি ভাষা হইতে | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। | ১৮০১।'

এই 'মোশার ব্যবস্থা' বা 'The Pentateuch' অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম খণ্ডটি যে ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়নি, সমসাময়িক নথিপত্র থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮ই ডিসেম্বর ১৮০১ তারিখে শ্রীরামপুর মিশনারীদের পক্ষে কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ড-কর্তৃক B. M. S.-কে লেখা একটি চিঠিতে পাই: ...'The first volume of the Old Testament is nearly half printed, viz. to the thirty-third chapter of Exodus.'[১] সুতরাং ১৮০১ সালের মধ্যে যে এর মুদ্রণের কাজ শেষ হয়নি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। ১৬ই জুলাই ১৮০২ তারিখের আর-একটি চিঠিতে জানা যায়: '...The last sheet of the Pentateuch will be printed next week; and we are about to print the last volume but one of the testament, including Job and Solomon's song. One hundred copies of the Psalms and Isaiah have been ordered by the College at Calcutta.'[২]

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে জুলাইয়ের শেষে প্রথম বাংলা ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। *'Brief Review of translations and printing of the Scriptures from 1794 to close of the 10th Memoir'*[৩] নামক গ্রন্থেও দেখা যায় যে 'The Pentateuch' অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম খণ্ড ১০০০ কপি ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে ছাপা হয়েছে বলে উল্লিখিত আছে।

এই বইটিতেও কোনো পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া নেই। ডিমাই অক্টেভো, ৮.৪" × ৫" আকারের

১ *Periodical Accounts*, p. 227; সজনীকান্ত দাস, তদেব, পৃ. ১৪০।

২ *Ibid*; তদেব।

৩ *'Literary Work at Serampore'*, 6th part: no. BR 56 at Serampore College.

এই বইটিতে প্রায় চার শতাধিক পৃষ্ঠা আছে। মিশন প্রেসের আগের বইটির মতো এটিও হাতে তৈরি মোটা পাটনা কাগজে ছাপা। এতে ব্যবহৃত হরফের উচ্চতা সাধারণত ৩ মি. মি.। কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে এই বইয়ের একটি খণ্ড রক্ষিত আছে।

বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত বইটির বিষয় বিন্যাস এইরূপ :

আদি পুস্তক। | যাহা মোশা রচিল। ৫০ পর্ব্ব | মোশার দ্বিতীয় পুস্তক, যাত্রা। ৪০ পর্ব্ব | লোঈয় ব্যবস্থা। ২৭ পর্ব্ব | মোশার চতুর্থ পুস্তক—গণনা। ৩৬ পর্ব্ব | মোশার পঞ্চম পুস্তক—দ্বিতীয় বাক্য। ৩৪ পর্ব্ব।

এর ভাষা বিশেষ করে বাক্যবিন্যাস রীতি অত্যন্ত দুর্বল। ভাষার নমুনা হিসাবে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

'যাত্রা। প্রথম পর্ব্ব।
এই সকল য়িশরালের সন্তানেরদের
নাম যাহরা আইল মিছরে তাহারা ও তাহারদের
পরিজন য়াকুবের সাতে। ...যে সমস্ত প্রাণী
যাকুবের অংশে উদ্ভব হইল সর্ব্ব সমেত সত্তরি
প্রাণী কিন্তু যুসফ ছিল মিছরে তাহার পুর্ব্বে।'

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বছরের শেষ থেকেই বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় নানাবিধ পাঠ্যপুস্তক রচনা ও মুদ্রণের বিপুল আয়োজন শুরু হয়। বিশেষ করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরীর যোগদানের পর থেকেই কলেজের প্রয়োজনে এই নতুন মুদ্রণ-প্রবাহের সূচনা। কিন্তু তা সত্বেও মিশনারীরা তাঁদের মূল লক্ষ্যের কথা বিস্মৃত হননি। অন্যান্য বই ছাপার ফাঁকে ফাঁকে তাঁদের সমগ্র বাইবেল মুদ্রণের কাজও নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে এগোতে থাকে। ওল্ড টেস্টামেন্ট প্রথম খণ্ড ছাপা সম্পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা এর পরবর্তী অংশ হিসাবে তৃতীয় খণ্ডটি ছাপতে শুরু করেন। যে-কোনো কারণেই হোক দ্বিতীয় খণ্ডটি ছাপা তখনকার মতো স্থগিত থাকে, তা সর্বশেষে মুদ্রিত হয়। ওল্ড টেস্টামেন্টের তৃতীয় খণ্ড ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। এর আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ :

'দাউদের গীত।—/এবং য়িশঊীহার ভবিষ্যৎবাক্য।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০৩।'

কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে এর দুটি কপি রক্ষিত আছে। ডিমাই অক্টেভো (ষোলো পেজী), ৮$\frac{3}{4}$"×৫$\frac{1}{4}$" (২২ সেমি.×১৩.৫ সেমি) আকারের এই বইটিতে মোট ১৮২টি পাতা বা ৩৬৪ পৃষ্ঠা আছে, তবে পৃষ্ঠাগুলির কোনো ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া নেই। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রথম যুগে বাংলা বাইবেল মুদ্রণের এটি ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে বইটিতে পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া না থাকলেও এর প্রতি চার পাতা বা ৮ পৃষ্ঠা অন্তর বাংলা বর্ণে signature

দেওয়া আছে। এই বইয়ের প্রথমার্ধে (৩ পৃ. থেকে ১৯৯ পৃ.) বা 'দাউদের গীত' অংশে ১৫০টি গীত সংকলিত হয়েছে এবং এর দ্বিতীয়ার্ধ (২০০ পৃ. থেকে ৩৬৪ পৃ.) বা 'য়িশঊীহার ভবিষ্যৎ বাক্য' অংশ ৬৬টি পর্বে বিভক্ত। এতে ব্যবহৃত হরফের উচ্চতা সাধারণত ৩ মি. মি.। এখানে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর প্রতি পূর্ণ পৃষ্ঠায় ২৫টি করে পঙ্‌ক্তি ছাপা আছে। এই বই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছিল এবং প্রতিটি ৬৷৹ হিসাবে এর একশো কপি কলেজ কর্তৃপক্ষ কিনে নিয়েছিলেন। রচনার নমুনা হিসাবে এর কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত হল :

প্রথমার্ধের একটি গীত : '১ প্রথম গীত।

ধন্য সে জন যে অধর্ম্মিকেরদের পরামর্শে যায় না ও দাণ্ডায় না পাপী লোকের পথে ও নিন্দকেরদের আসনে বসে না। কিন্তু য়িহুহার ব্যবস্থায় তাহার সন্তোষ এবং তাহার ব্যবস্থায় ভাবে দিবারাত্রি। সে হইবে জলনদীনিকটস্থ রূপিত বৃক্ষের মত যাহা স্বকালে ফল ফলে তাহার পাতা ম্লান হইবে না ও যাহা ২ করে তাহাতে ভাগ্যবান হবে। অধার্ম্মিকেরদের এমন নহে কিন্তু তাহারা বাতাসে উড়নীয় ভূষির মত। অতএব অধার্ম্মিক দাণ্ডাইতে পাইবে না বিচারে ও পাপীরা প্রকৃতাথিকেরদের মণ্ডলিতে নহে। কেননা য়িহুহা জানেন প্রকৃতাথিকেরদের পথ কিন্তু অধার্ম্মিকেরদের পথ নষ্ট হবে।—'

দ্বিতীয়ার্ধের একটি পৃষ্ঠা থেকে : '১০ দশম পর্ব্ব য়িশঊীহা।— বলেন হে আমার ছীয়ন নিবাসী লোক অশোরীর ভয় করিও না সে তোমাকে লাঠি মারিবে সে সত্য ও মিছরের পন্থে তোমার বিপরিতে তাহার দণ্ড উঠাইবে কিন্তু এথন কিঞ্চিৎ কাল পরে আমার ক্রোধ ও আমার কোপ তাহারদের সংহারে সমাপ্ত হইবে। মদীনের উরব পর্ব্বতে যে ঘাত ও সমুদ্রের উপর যে দণ্ড উঠাইলেন তাদৃশ ঝাতু সৈন্যের য়িশুহা তাহার বিপরীতে উঠাইবেন বটে তিনি তাহা উঠাইবেন মিছরের মত।—'

তৃতীয় খণ্ডের পর ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে ওল্ড টেস্টামেণ্টের চতুর্থ বা শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়। তবে এর আখ্যাপত্রে যে ১৮০৫ সন ছাপা আছে, সমসাময়িক নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে তা ভুল। আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 'ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য। — | মানুষের ত্রান ও কার্য্য-শোধনার্থে | যাহা প্রকাশ করিয়াছেন। — | তাহাই | ধর্ম্ম পুস্তক। | তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারি বর্গ। — | মোশাকরণক ব্যবস্থা। | য়িশরালের বিবরণ।— | গীতাদি।— | ভবিষ্যদ্বাক্য। | তাহার চতুর্থ বর্গ ভবিষ্যদ্বাক্য এই। — | এব্রি ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০৫'

পরিশেষে ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে ২৪শে জুন ওল্ড টেস্টামেণ্টের বাকি অংশটি অর্থাৎ এর দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ : 'ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য। | বিশেষতঃ | মনুষ্যের ত্রান ও কার্য্যসাধনার্থ তিনি যাহা প্রকাশ | করিয়াছেন।— | অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তক। | তাহার প্রথম ভাগ—যাহাতে চারি বর্গ | মোশার ব্যবস্থা।— | য়িশরালের

বিবরণ।—| গীতাদি।—| ভবিষ্যদ্বাক্য।— | তাহার দ্বিতীয় বর্গ অর্থাৎ খ্রিশরালের বিবরণ এই।—| এব্রি ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল।—| শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—১৮০৯।—'

এই খণ্ডটি প্রকাশিত হওয়ার ফলে কেরীর মিশনারী জীবনের বহু বছরের স্বপ্ন ও সাধনা পূর্ণ হয়। এতদিনে অভীষ্ট সমগ্র বাংলা বাইবেল মুদ্রণের সাধনার পূর্ণতার ফলে কেরীর যে প্রচণ্ড মানসিক উত্তেজনা দেখা দেয় সম্ভবত তারই প্রতিক্রিয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঐ সময়ে তাঁকে প্রায় দু'মাসকাল জরাক্রান্ত হয়ে পড়ে থাকতে হয়। যাই হোক, ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মোট পাঁচ খণ্ডে (নিউ টেস্টামেন্ট—এক খণ্ড ও ওল্ড টেস্টামেন্ট —চার খণ্ড) সমগ্র বাংলা বাইবেল মুদ্রণ ও প্রকাশন সম্পূর্ণ করে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস এক অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হয়েছিল। বাংলা মুদ্রণের বিকাশ পর্বের মধ্যে তাঁরা এই বাইবেলের বিভিন্ন খণ্ডের একাধিক সংস্করণও প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং এই দিক থেকে বলা যায় যে মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠার যে মূল উদ্দেশ্য ছিল তা সার্থক হয়। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মিশনারীদের বাংলা অনুবাদ অত্যন্ত দুর্বল ছিল। বাংলা রচনা হিসাবে তা মোটেই সার্থক হতে পারেনি। জনৈক মিশনারী ইতিহাসকার তাই বলেছেন যে তাঁদের অনুবাদগুলি যথাযথ হয়নি, বিশেষ করে 'in language and imperfect in idiom, and some indeed were so faulty that they had to be replaced by completely new versions'.[১]

কেরী ও তাঁর সহকর্মীরা বাংলা ছাড়া আরো অন্যান্য ভারতীয় বা প্রাচ্য ভাষায় বাইবেল অনুবাদ ও তা মুদ্রিতাকারে প্রকাশ করেন। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে কেরী লিখেছেন, 'The Bible is translated or under translation in twentyfour languages of the East'.[২]

কেরীর জীবদ্দশায় শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে চীনা সহ প্রায় ৪০টি ভাষায় বাইবেল অনূদিত ও প্রচারিত হয়েছিল।

ধর্মীয় প্রচার-পুস্তিকা মুদ্রণ ও প্রচার

প্রারম্ভিক পর্বে শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানায় বাইবেল মুদ্রণের সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক ছোটো ছোটো ধর্মীয় প্রচার-পুস্তিকা (Tract) মুদ্রিত হয়েছিল। এই সব পুস্তিকা বেশিরভাগই খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হত। মিশনারীরা তাঁদের পরোক্ষ প্রচারের কাজে এই পুস্তিকাগুলিকে পরম সহায়ক বলে মনে

১ Richter, '*A History of Missions in India*', pp. 139-40.

২ B. M. S. (typed) Carey to Ryland, April 14, 1813 : Quoted by K. P. Sen Gupta, '*Christian Missionaries in Bengal*', p. 90.

করতেন। বিলেতের কমিটির কাছে তাই তাঁরা লিখে পাঠান : 'Knowledge spreads wide and fast by these means. A pamphlet atrracts, when our immediate presence, perhaps, would excite prejudice, and is read when we are employed in another way, or it may be, asleep in our beds.'[১] এই ধর্মীয় প্রচার-পুস্তিকাগুলির অধিকাংশই এখন আর পাওয়া যায় না। তবে সমসাময়িক নথিপত্রে এগুলির ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীরামপুর মিশনারীদের এই প্রচার-পুস্তিকাগুলি সাধারণত চার পৃষ্ঠা থেকে ষোলো পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। এর অধিকাংশই ছিল গদ্যে লেখা, তবে কিছু কিছু পদ্যেও রচিত হত। এগুলি ছিল সাধারণত তিন শ্রেণীর : প্রথমত ভারতীয় ধর্ম, বর্ণানুশাসন ও অন্যান্য সামাজিক রীতিনীতির প্রতি আক্রমণ এবং খ্রীস্টধর্মানুসারী জীবনদর্শন-ব্যাখ্যা সম্বলিত রচনা ; দ্বিতীয়ত খ্রীস্টানধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোচনা, তৃতীয়ত খ্রীস্টোপাসনার স্তব বা গান, ইত্যাদি।[২] বাংলা প্রচার-পুস্তিকাগুলি ছিল সাধারণত ইংরেজির অনুবাদ, অথবা বিদেশী মিশনারী বা নবদীক্ষিত দেশীয় খ্রীস্টান বা মিশনারীদের দেশীয় শুভানুধ্যায়ীদের স্বাধীন বাংলা রচনা। এর বেশিরভাগ কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখা হত এবং সেগুলি প্রায়ই মিশনারী বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হত। এই বাংলা পুস্তিকাগুলিতে মুদ্রণের তারিখ বা রচয়িতার নাম ছাপা থাকত না। ফলে সেগুলির উৎসসন্ধান প্রায়শ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্রায়ই এগুলির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হত এবং বলা যায়, তা হাজারে হাজারে বাংলা দেশের নগণ্য গ্রাম থেকে হরিদ্বারের মেলা পর্যন্ত সর্বত্র বিতরিত হত। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দের শেষে দেখা যায় যে মিশন প্রেস থেকে এরূপ চার-পাঁচটি প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং তাদের কয়েক হাজার কপি বিলি করা হয়েছে। ১৮ ডিসেম্বর ১৮০১ তারিখে কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড বিলেতে তাঁদের সোসাইটিকে পাঠানো প্রতিবেদনে লিখেছেন : 'We have also dispersed several thousand copies of four or five small tracts which we have printed ;...'[৩]

শ্রীরামপুর মিশনারীরা বছরের পর বছর এই ধরনের ছোটো বড়ো নানা ধর্মপুস্তক হাজার হাজার ছাপতেন ও পরম উৎসাহে তা প্রচার করতেন। এইরূপ প্রচারিত পুস্তকাদির মোট সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। তবে সমকালীন নথিপত্র খুঁজলে মাঝে মাঝে কিছু কিছু হিসাব পাওয়া যায়, তা থেকে মোট মুদ্রিত সংখ্যা কত হতে পারে তা মোটামুটি অনুমান করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দু-বছরের একটি হিসাবে দেখা যায় :

---

১ *B. M. S. MSS.* Carey, Marshman, Ward and others to the B. M. S. Committee, Aug. 6, 1805 : Quoted by K. P. Sen Gupta, *op. cit.*, p. 87.

২ Richter, *op. cit.* pp. 286-87 : Quoted by K. P. Sen Gupta, *op. cit.*, pp. 92-93.

৩ *Periodical Accounts.* p. 226.

মার্চ, ১৮১২ থেকে ১৯ এপ্রিল, ১৮১৪— কিঞ্চিদধিক এই ছ'বছর সময়ের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে নিম্নোক্ত বাংলা বইগুলি ছেপে বিলি করা হয়েছিল :

Pentateuch (মোশার ব্যবস্থা)	৩২৫ কপি
Historical Books (ইতিহাসাশ্রিত গ্রন্থ)	২৮৩ "
Poetical Books (কাব্যগ্রন্থ)	১৬৭ "
Testament (বাইবেল)	৩৮৮ "
Luke, etc. (a scripture selection : বাইবেল সংকলন)	১০৮৬ "
Hymns (গীত)	৮১৬২ "
Tracts (প্রচার-পুস্তিকা)	২৪৩৯৮ "
Life of Christ (যীশুখ্রীস্টের জীবনী)	৪৭৪ "
	মোট ৩৫,২৮৩ কপি

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ছ'বছরে শ্রীরামপুর মিশন থেকে তাঁদের ছাপা মোট ৩৫,২৮৩টি পুস্তিকা বিতরণ করা হয়েছিল।[১]

এইসব মুদ্রণের কাজে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের যন্ত্রগুলি সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকত। ঐ ছাপাখানার মুদ্রণের মোট পরিমাণের কথা চিন্তা করলে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। তাঁদের মুদ্রিত পুস্তকাদির সাহিত্যিক মূল্য এখানে বিচার্য নয়, বাংলা মুদ্রণের বিকাশ পর্বে তাঁদের প্রকাশনের বিপুলতাই আমাদের সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে রামরাম বসু কর্তৃক পদ্যে রচিত 'হরকরা' ('*Gospel Messenger*') ছিল শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রকাশিত প্রথম বাংলা ধর্মীয় প্রচার-পুস্তিকা। তারপরের পুস্তিকাটিও ছিল রামরাম বসুর রচনা— 'জ্ঞানোদয়'। হিন্দুধর্মের প্রতি তীব্র আক্রমণাত্মক এই রচনাটি তৎকালে বিপুল ক্ষোভ ও আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। স্বয়ং কেরী পর্যন্ত পরবর্তী কালে তা স্বীকার করে লিখেছিলেন যে এটি ছিল, 'no doubt a weak piece and full of abuse'.[২] ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'শিশুগণের পুস্তক' নামক আরেকটি বাংলা প্রচার-পুস্তিকায় পয়গম্বর মুহম্মদ ও তাঁর মুসলমান ধর্মের প্রতি আক্রমণ ও বিষোদ্গার করা হয়। এই পুস্তিকায় হিন্দু দেবদেবীদেরও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলা হয় যে যীশুখ্রীস্টের স্মরণই একমাত্র মুক্তির উপায়। মার্শম্যান কর্তৃক বাংলা পদ্যে রচিত 'ভেদাভেদ' (১৮০৭) ['*The Difference*'] নামক আরেকটি পুস্তিকায় কৃষ্ণের সঙ্গে যীশুকে তুলনা করে যীশুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে।[৩]

১ '*Brief view of the Baptist Missions and Translations*,' London, 1815. (Serampore College Library ; no. BR 56)

২ *B.M.S. MSS.* Carey to Fuller, Mar. 8, 1809 ; K. P. Sen Gupta, *op. cit.*, p. 94.

৩ K. P. Sen Gupta, *op. cit.*, p. 94.

মিশনারীরা যখনই এইসব প্রচার-পুস্তিকাগুলি বিতরণ করতে যেতেন, সব সময়ই তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে এর বিশেষ চাহিদা লক্ষ্য করতেন। তাঁরা অবশ্য ক্রমে ক্রমে বুঝতে পেরেছিলেন যে ছাপার আকারে কোনো বই দেখতে পাওয়ার আগ্রহই ছিল এর মূল কারণ। গ্রহীতাদের বেশিরভাগই ছিলেন নিরক্ষর, তবু মুদ্রিত বই চাক্ষুষ দেখা ও হাতে পাওয়ার সুযোগ সেই তাঁদের প্রথম। তাই আগ্রহও অপরিসীম। পরবর্তীকালে মিশনারীদের এমন ধারণাও হয়েছিল যে এর পিছনে দুরভিসন্ধি আছে : 'in many cases they have been sought from improper motives.'[১] এই বিতর্কিত প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও, জনসাধারণের মূল আগ্রহের কারণটি অস্বীকার করা যায় না। বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর মানুষের হাতে হাতে বাংলা হরফে ছাপা বাংলা পুস্তিকা পৌঁছে দেবার কৃতিত্ব মিশনারীদের। বাংলা মুদ্রণের বিকাশ পর্বে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের এই ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা গদ্যগ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে মিশন প্রেসের স্মরণীয় ভূমিকা

দেশীয় ভাষায় বাইবেল ও ছোটো ছোটো ধর্মীয় প্রচার-পুস্তিকা মুদ্রণ ও প্রচারই ছিল মিশনারীদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং তা চরিতার্থ করার জন্যই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাতাদের ঐ উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনাকে মিশন প্রেস পরিপূর্ণ মর্যাদায় সার্থক করে তুলতে পেরেছিল। কিন্তু এই ধর্মীয় মুদ্রণ পরিকল্পনার সীমিত গণ্ডীর বাইরেও শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের কাজ আরো বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল এবং মূলত তারই ফলে ঐ প্রেস সমকালীন বাংলা মুদ্রণের বৃহত্তর কেন্দ্রে পরিণত হতে পেরেছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রয়োজনে ও সহায়তায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে বক্ষ্যমাণ বিকাশ পর্বের কালসীমার মধ্যেই অনেকগুলি বাংলা গদ্যগ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল। এই বইগুলির প্রকাশনার ফলেই তৎকালীন বুদ্ধিজীবী বাঙালী সমাজে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস এক বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করেছিল। এইসব বইয়ের অনেকগুলি ছিল মৌলিক রচনা, আর কিছু অনুবাদ ও সংকলন। এগুলি প্রকাশের মধ্য দিয়েই যেমন প্রথম বাংলা গদ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে উঠেছিল, তেমনই বাংলা মুদ্রণের আভিজাত্য ও মর্যাদাও এই প্রথম জনমানসে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। সমকালীন বাঙালী সমাজে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের সুনামও এই বইগুলির জন্য। তবে মিশনারীরা হয়ত এর তাৎপর্য তখন সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি। তাঁরা সচেতন ভাবে ও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই মুদ্রণের কাজে উদ্যোগী হননি। প্রেসের আয় বৃদ্ধির তাগিদে ও বিশেষভাবে কলেজের প্রয়োজনে তাঁরা এই বৃহৎ মুদ্রণ কর্মে অগ্রণী হন, কিন্তু তার পরোক্ষ প্রভাবে বাংলা গদ্য তথা বাংলা মুদ্রণধারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল।

বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাসে শ্রীরামপুর মিশনারীদের এই যে মহৎ অবদান, আশ্চর্যের

১ L. M. S. *Reports*, Vol. IV, p. 68, 1824-28 ; K. P. Sen Gupta, *op. cit.*, p. 95.

কথা, তা তাঁদের সচেতন প্রয়াসের ফল নয়, বরং কিছুটা অনিচ্ছাকৃত, অপরিকল্পিত ও মিশনারী প্রচারের কাজে সম্ভাব্য বাধার আশঙ্কায় উদ্‌বিগ্ন প্রয়াসের ফল। এই সমস্ত সময়-সাপেক্ষ মুদ্রণের কাজ হাতে নিতে বাধ্য হওয়ায় সম্ভবত কেরী কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়েছিলেন, তাই তিনি অনুতপ্ত কৈফিয়তের সুরে সাটক্লিফের কাছে লেখেন : 'I have it is true been obliged to publish several things, and I can say that nothing but necessity could have induced me to do it, my situation in the college absolutely demanded it of me.'[১] কেরীর বাংলা ভাষাপ্রীতি অবশ্য অকৃত্রিম ছিল, তিনি বহুবার এই ভাষার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তাঁর বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকায় তিনি এই ভাষা সম্বন্ধে লিখেছেন : 'This language is peculiarly copious and harmonious ; and, were it properly cultivated, would be deserving a place among those which are accounted the most elegant and expressive.' কিন্তু তাঁর কাছে সবার উপরে ছিল ধর্মপ্রচারের মিশনারী আদর্শ, সেই আদর্শ রূপায়ণের পথে যে-কোনো বাধায় বা বিলম্বে তাই তিনি ক্ষুণ্ণ হতেন, বিচলিত হতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা পাঠ্যপুস্তকাদি মুদ্রণে তাই তিনি নিজেই উদ্যোগী হলেও, সেই কারণে বাংলা বাইবেল মুদ্রণে বিলম্ব ঘটলে তিনি স্বভাবতই ক্ষুণ্ণ হতেন।

আসলে, শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করে কেরীর যেন দুটি সত্তা দুই ভিন্ন পরিবেশে কাজ করত। কলেজের বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে তাঁর কলেজ-কেন্দ্রিক দ্বিতীয় সত্তাটিই সক্রিয় ছিল। কলেজের প্রয়োজনে কেরীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের আর্থিক বদান্যতায় বইগুলি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীরামপুর মিশন কেবল বইগুলির মুদ্রণের দায়িত্ব নিয়েছিল। তখনকার দিনে এই গুরুদায়িত্ব এমন আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। আপাতত এখানে আমি সেই মুদ্রণকর্মের গুরুত্ব ও ব্যাপকতাকে সম্যক উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব এবং এর পরবর্তী অধ্যায়ে ['বিকাশ পর্ব : পঞ্চম অধ্যায়'] কলেজের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে বইগুলি বা তার রচয়িতাদের সম্বন্ধে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য পরিবেশনের চেষ্টা করব।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, কেরী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অন্যান্য পণ্ডিতদের রচিত অধিকাংশ বাংলা গ্রন্থাদির কথা ইতিপূর্বে অনেকেই আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, সজনীকান্ত দাস, সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির আলোচনা উল্লেখযোগ্য। সুতরাং একই প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ যাতে

---

১ *B. M. S. MSS.* Carey to Sutcliffe, Mar. 17, 1802 ; K. P. Sen Gupta, *op. cit.*, p. 127.

না হয় সেজন্য আমি এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা থেকে বিরত হলাম। কেবলমাত্র মুদ্রণেতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় অনালোচিত বা স্বল্পালোচিত তথ্যাদির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ও আলোচ্য মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করা হল।

বক্ষ্যমাণ বিকাশ পর্বে দেখা যায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রধানত তিন শ্রেণীর বাংলা মুদ্রণ কার্যে নিয়োজিত ছিল। প্রথমত, বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মপ্রচারপুস্তিকা মুদ্রণ, দ্বিতীয়ত, রামায়ণ-মহাভারত মুদ্রণ, তৃতীয়ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকাদি মুদ্রণ। প্রথমটির আলোচনা ইতিমধ্যেই আমি বিস্তৃতভাবে করেছি। এগুলি ছিল তাঁদের নিজস্ব মূল মুদ্রণ পরিকল্পনান্তর্গত কাজ। দ্বিতীয়োক্ত বইগুলিও তাঁরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে প্রকাশ করেন। এমন অভিযোগও শোনা যায় যে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর অলীকত্ব ও অসারত্ব লোকচক্ষে তুলে ধরে সেগুলিকে হেয় প্রমাণের উদ্দেশ্যেই এর প্রকাশনে মিশনারীরা উদ্যোগী হন। সে যাই হোক, এগুলিও কলেজের পঠন-পাঠনে সহায়ক পুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হত। এছাড়া তৃতীয়োক্ত বইগুলি মূলত কলেজের প্রয়োজনে এবং নিজেদের আর্থিক সচ্ছলতা লাভের উদ্দেশ্যে মিশন প্রেসে ছাপা হয়। সর্বোপরি, কেরী কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলেই এগুলি শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা হয়েছিল।

ধর্মগ্রন্থাদি ছাড়া উপরোক্ত আর দুই শ্রেণীভুক্ত বাংলা বই প্রকাশের ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের মোট ছাপার পরিমাণের একটা হিসাব নেওয়া যেতে পারে। বক্ষ্যমাণ বিকাশ পর্বে, অর্থাৎ ১৮০০ থেকে ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য বইগুলি শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ছাপা হয়েছিল, (সঙ্গে প্রতি পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা, প্রকাশ সন ও লেখকের নাম উল্লেখ করা হল):

লেখক	পুস্তকের নাম ও প্রকাশ সন	পৃষ্ঠা সংখ্যা
রামরাম বসু	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, ১৮০১	১৫৬
" "	লিপিমালা, ১৮০২	২৫৫
উইলিয়ম কেরী	***A Grammar of the Bengalee Languge***, ১৮০১	(৬ + ১০০) ১০৬
" "	কথোপকথন, ১৮০১	(৮ + ২১৭) ২২৫
" "	ইতিহাসমালা, ১৮১২	৩২০
গোলোকনাথ শর্ম্মা	হিতোপদেশ, ১৮০২	২৪৭
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	বত্রিশ সিংহাসন, ১৮০২	২১০
" "	হিতোপদেশ, ১৮০৮	২৪৩
" "	রাজাবলি, ১৮০৮	২৯৫

লেখক	পুস্তকের নাম ও প্রকাশ সন	পৃষ্ঠা সংখ্যা
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং, ১৮০৫	১২০
চণ্ডীচরণ মুন্সী	তোতা ইতিহাস, ১৮০৫	২২৪
হরপ্রসাদ রায়	পুরুষপরীক্ষা, ১৮১৫	২৭৩
কাশীরাম দাস	মহাভারত (১ম খণ্ড), ১৮০১/১৮০২	২০৮
"	" (২য় খণ্ড), ১৮০২	২৩৮
"	" (৩য় খণ্ড), ১৮০২	৩৫৩
"	" (৪র্থ খণ্ড), ১৮০২/৩	৩৯৫
কৃত্তিবাস	রামায়ণ (১ম খণ্ড), ১৮০২/৩	৩২৮
"	" (২য় খণ্ড), "	২৬৪
"	" (৩য় খণ্ড), "	৩১১
"	" (৪র্থ খণ্ড), "	৫২৭
"	" (৫ম খণ্ড), "	৩৪২

মোট পুস্তক সংখ্যা : ২১ মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৬৪০

কেরীর বাংলা অভিধান, ১ম খণ্ড—'*Dictionary of the Bengalee Language*, Vol. I'-এর প্রথম সংস্করণ ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বইটি বড়ো বড়ো হরফে ছাপা হওয়ায় বিপুল কলেবর লাভ করে, ফলে কেরী এর প্রচার বন্ধ করে দিয়ে আরো ছোটো হরফে প্রথম খণ্ডটিই পুনশ্চ ছেপে (২য় সং) ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করেন। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে এর দ্বিতীয় খণ্ড দু'ভাগে প্রকাশিত হয়। ঐ সময় ১ম খণ্ডের (২য় সং ১৮১৮) অবিক্রীত সংখ্যাগুলির আখ্যাপত্র পরিবর্তন করে তাতে তারিখ '১৮২৫ সন' ছেপে প্রকাশ করা হয়। সুতরাং এগুলি ১ম খণ্ডের ৩য় সংস্করণ নয়।

এ ছাড়া সমসাময়িক নথিপত্র থেকে আরো দু-একটি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এগুলির অধিকাংশেরই কোনো কপির সন্ধান পাওয়া যায়নি। যেমন, ৫ই মার্চ ১৮০২ তারিখে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রথম বাংলায় রচিত ২৩টি খ্রীষ্টীয় সংগীতের (Hymns) একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সংগীতগুলির সব কটিই রামরাম বসু কর্তৃক রচিত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র সংকলন-পুস্তিকাটির কোনো কপি পাওয়া যায়নি। ['1802, 5th March : Date on which the first collection of Bengali hymns, 23 in number, was printed at Serampore ; they were all written by Ram Ram Boshu ; but no copy is extant'—E. S. Wenger, *Missionary Biographies* : Vol. I, B. M. S.

Chronology (in Mss.). ৫ই মার্চ, ১৮০২ তারিখে লেখা ওয়ার্ডের জার্নালেও এর উল্লেখ আছে : 'Ram Boshoo came up today, and brought with him some translations in bengalee verse of "Jesus, I love thy charming name", etc ; and of "He dies, the Friend of sinners dies" etc. We have now three-and-twenty hymns printed in a little book in bengalee.'—*Periodical Accounts*, II, p. 245.]

এ ছাড়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অন্যতম পণ্ডিত রামকিশোর তর্কচূড়ামণি সংস্কৃত হিতোপদেশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর 'হিতোপদেশ' ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়। রোবাক-রচিত কলেজের ইতিহাসে এর উল্লেখ পাই : 'FABLES. হিতোপদেশ by Ramukishoru Turkalunkaru, 8vo. 1808'[১] এই বইটিরও কোনো কপির সন্ধান পাওয়া যায়নি। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি কলেজ কাউন্সিলের সেক্রেটারি লকেটের নিকট লিখিত কেরীর একটি চিঠিতে (Home Miscellaneous, No. 563, pp. 67-68) জানা যায় যে, কোনো এক পণ্ডিত বাংলা ভাষায় ভগবদ্গীতার একটি টীকা প্রস্তুত করেন। কিন্তু এই টীকাগ্রন্থের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।[২]

শেষোক্ত এইসব বই যেগুলির কোনো কপি এখন আর সন্ধান করা যায় না তা বাদ দিলেও প্রথমোক্ত ২১টি বই সুনির্দিষ্ট হিসাবের আওতায় পাওয়া যায়। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত ঐ ২১টি বইয়ের মধ্যে অনেকগুলির আবার ঐ সময়ের মধ্যেই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন, কেরীর বাংলা ব্যাকরণ ২য় সংস্করণ—১৮০৫, ৩য় সং—১৮১৫, (৪র্থ সং—১৮১৮); মৃত্যুঞ্জয়-এর বত্রিশ সিংহাসন ২য় সং—১৮০৮ (৩য় সং—'লন্দনে চাপা হইল'—১৮১৬, ৪র্থ সং—১৮১৮); মৃত্যুঞ্জয়ের হিতোপদেশ ২য় সং—১৮১৪, (৩য় সং—১৮২১); মৃত্যুঞ্জয়ের রাজাবলি ২য় সং—১৮১৪; চণ্ডীচরণ মুন্সীর তোতা ইতিহাস ২য় সং—১৮০৬, (লণ্ডন থেকে ১৮১১ ও ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে দুটি সংস্করণ)। এইসব পরবর্তী সংস্করণের কথা বাদ দিলেও প্রথমোক্ত ২১টি বইয়ের কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণগুলির হিসাব নিলেই মোট মুদ্রিত পৃষ্ঠাসংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬৪০। এগুলির অধিকাংশ আবার প্রায় সহস্রাধিক করে কপি ছাপা হয়েছিল। সুতরাং মোট মুদ্রণের পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। বাংলা মুদ্রণের আদিযুগে কেবলমাত্র একটি ছাপাখানার পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ মুদ্রণের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। এ ছাড়া পূর্বেই উল্লিখিত বাংলায় খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থাদির বিপুল সংখ্যক মুদ্রণ তো আছেই। সেজন্যই বলা হয়, শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ছিল সমকালীন বাংলা মুদ্রণের বৃহত্তম কেন্দ্র।

---

১ Roebuck, '*Annals of the College of Fort William*', App. no. II, p. 29.

২ সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস', পৃ. ২১৮

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা গ্রন্থ— নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ ১৮০১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। তার কিছু পরেই ৪ঠা মে, ১৮০১ তারিখে কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ভাষার শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন ও অবিলম্বে কলেজের পঠন-পাঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত সংখ্যক বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে উদ্যোগী হন। কেরী দেশের নানা স্থান থেকে শিক্ষকদের সন্ধান করে এনে কলেজে তাঁর বিভাগে পণ্ডিত ও সহকারী পণ্ডিত হিসাবে নিযুক্ত করেন। এঁরাই ছিলেন তদানীন্তন কালে বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজের অগ্রগণ্য। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় তাঁদের বিশেষ পারদর্শিতার কথা অবগত হয়েই কেরী তাঁদের কলেজে আমন্ত্রণ করে আনেন, এবং প্রথমেই তাঁদের উপর বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন।

কেরীর পূর্বপরিচিত মুন্সী রামরাম বসু ১৮০১ সনের ৪ঠা মে থেকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগে মাসিক ৪০ টাকা বেতনে অন্যতম সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হন। কেরীর অনুরোধে তিনিই সর্বপ্রথম অল্প সময়ের মধ্যে একটি মৌলিক গ্রন্থ— 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রচনা সম্পূর্ণ করে ফেলেন এবং তা শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে ১৮০১ সনের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। এটিই ছিল বাঙালী রচিত বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থরচনার জন্য কলেজ কাউন্সিল রামরাম বসুকে তিন শত টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন এবং এই বইটি কলেজের অন্যতম বিশিষ্ট পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গৃহীত হয়।

এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৫৬। পুস্তকটির বাংলা আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ : 'রাজা প্রতাপাদিত্য | চরিত্র | যিনি বাস করিলেন যশহরের ধূমঘাটে | একব্বর বাদসাহের আমলে।— | রাম রাম বসুর রচিত।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০১—'

বইটির আরেকটি ইংরেজি আখ্যাপত্র আছে, যেটি এইরূপ : 'The / History / of / Raja Pritapadityu, / By Ram Ram Boshoo, / one of the Pundits in the college of Fort / William. / Serampore, / Printed at the Mission Press, / 1802'. সুতরাং দেখা যায়, ইংরেজি আখ্যাপত্র অনুযায়ী এর প্রকাশকাল '১৮০২', কিন্তু বাংলা আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল '১৮০১'। শেষোক্ত তারিখটিই ঠিক।[১] প্রসঙ্গত জে. সি. মার্শম্যান-এর উক্তি স্মরণীয় : 'He, therefore, employed Ram-bosoo···to compile a History of King Pritapaditya, an edition of which was published in July, 1801, at the Serampore Press, and this may be regarded as the first prose work—the laws and the tracts excepted—printed in the Bengalee Language.'[২]

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা (১ম) : রামরাম বসু', পৃ. ৩৩

২ J. C. Marshman, *op. cit.*, Vol. I. pp. 159-60.

রচনার নমুনা স্বরূপ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হল :

'ইহা শ্রবন মাত্রেই একব্বর বাদসাহ মহা ক্রোধে হুতাসনের ন্যায় দিপ্তিমান হইল সে সময় কাহার সাধ্য তাহার সমুখে স্থির হয় হোন্দোস্থানে এ মত পরাক্রন্ত বাদসাহ কখন হয় নাই মতে ফরমান রাজা তোড়লমল দুই লক্ষ ফৌজ সমেত দাউদের নিপাতার্থে গৌড়ে তাঁই হইলেন।—

'ফরমান এই। দাউদের শির ছেদন করিয়া ঝণ্ডার উপরি ভাগে টাঙ্গাইয়া দিতে সহর ও বাজার দাউদের সমস্ত ঘরগারি লুট করিয়া দিল্লিতে দাখিল করিতে রাজা তোড়ল দুই লক্ষ সেনার উপর সেনাপতি প্রবল পরাক্রমে হেন্দোস্থান হইতে বাহির হইয়া ক্রমে ২ দুই মাসে বানারসের সরহদ্দে যে স্থানে দাউদের সেনার মরচাবন্দি পৌছিলেন।' (পৃ. ২০-২১)

কেরী যে কেবলমাত্র তাঁর বিভাগীয় পণ্ডিতদের বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন তা নয়, তিনি নিজে এ কাজে উদ্যোগী হন। বাংলা বিভাগের পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রেখে তিনি কলেজে কার্যভার গ্রহণের পর অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই দু'খানি গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলেন এবং বলাই বাহুল্য, তা শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপার ব্যবস্থা হয়। বাংলা ভাষাবিষয়ক কেরীর প্রথম গ্রন্থটি ছিল— বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, '*A Grammar of the Bengalee Language*'— এবং তাঁর সংকলিত দ্বিতীয় বাংলা বই— 'কথোপকথন'; দুটি বইই মিশন প্রেস থেকে ছেপে ১৮০১ সনের মধ্যে প্রকাশিত হয়। মিশনারী প্রচারকার্যের অঙ্গ হিসাবে নিউ টেস্টামেন্টের পরেই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ওল্ড টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ ছাপার কাজ শুরু হয়। কিন্তু ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার অনেক আগেই কেরীর পূর্বোক্ত বই দুটি ছাপা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। কলেজের প্রয়োজনই ঐ সময় মিশন প্রেসের কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার লাভ করে। ১৮০১ সনের ১৫ই জুন ডঃ রাইল্যাণ্ডকে লেখা কেরীর একটি চিঠিতে জানা যায় যে ঐ সময়ের মধ্যেই বাংলা ব্যাকরণটি সংকলিত ও তার অর্ধেক মুদ্রিত হয়ে গেছে। [Mr. Carey to Dr. Ryland : Seramore, June 15, 1801 : '...When the appointment was made, I saw that I had a very important charge committed to me, and no books or helps of any kind to assist me. I therefore set about compiling a grammar, which is now half printed. I got Ram Boshu to compose a history of one of their kings, the first prose book ever written in the Bengali language; which we are also printing. Our pundit has, also, nearly translated the Sunscrit fables, one or two of which brother Thomas sent you, which we are also going to publish.][১]

১ E. Carey, *op. cit*, pp. 453-54.

কেরীর এই ব্যাকরণের ভূমিকায় অবশ্য তারিখ লেখা আছে— ২২শে এপ্রিল ১৮০১। ঐ বছর জুলাইয়ের মধ্যেই ব্যাকরণটি প্রকাশিত হয়। এটিই ছিল শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রকাশিত কেরীর বাংলা ভাষাবিষয়ক প্রথম পুস্তক। এর আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ : 'A / GRAMMAR / OF THE / BENGALEE LANGUAGE / BY W. CAREY. / PRINTED AT THE MISSION PRESS, SERAMPORE. / 1801.'

লক্ষণীয়, কেরীর এই ব্যাকরণেই প্রথম বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে 'Bengalee' শব্দ ব্যবহৃত হয়, আগে বলা হত 'Bengal Language.' এই বইটি বেশ বড়ো বড়ো হরফে মুদ্রিত হয়েছিল। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল vi + 100.[১]

সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে। [ভূমিকায় তারিখ দেওয়া আছে— ৮ই মে ১৮০৫।] এর আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 'A / GRAMMAR / of the / Bengalee Language. / The Second Edition, with Additions. / By W. Carey, / Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mehratta / Languages, in the College of Fort William. / Serampore, / Printed at the Mission Press. / 1805.' এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা vii + 184 ; আকার ৮.২" × ৫"। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এর একটি কপি রক্ষিত আছে। হালহেডের বাংলা ব্যাকরণের মতো কেরীর এই বাংলা ব্যাকরণটি মূলত ইংরেজিতে লেখা। তবে উদাহরণস্বরূপ এতে যেসব বাংলা উদ্ধৃতি দেওয়া আছে সেগুলি বাংলা হরফেই ছাপা। এইসব বাংলা হরফের উচ্চতা কম বেশি ২.৫ মি. মি. থেকে ৩ মি.মি.-এর মধ্যে। বলা যেতে পারে, এখানে অসম হরফের সমাবেশ ঘটেছে। অক্ষর সাজানো বা composing সামান্য উঁচু-নিচু ও ছাড়া ছাড়া। আধুনিক কালের composing-এর ঘন সন্নিবদ্ধ (compact) রূপ এতে ফুটে ওঠেনি। বাংলা বর্ণমালার পরিচয় দিতে গিয়ে এখানে প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণ (consonants) ও তারপরে স্বরবর্ণ (vowels) উল্লিখিত হয়েছে। শ্রীরামপুর প্রেসের প্রথম যুগের অক্ষর-বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান। আ-কার চিহ্ন (া) সব সময় মাত্রা ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে। অধিকাংশ যুক্তবর্ণই আধুনিক ধাঁচে লেখা। যেমন 'পক্ষ', 'আশ্বিন', 'মঙ্গল', 'কার্ত্তিক', 'চৈত্র', 'ক্রোশ', 'বাষট্টি', ইত্যাদি। কোথাও অবশ্য উপর-নীচে লেখা দুটি বর্ণ যুক্তবর্ণের রূপ নিয়েছে, যেমন— 'শুক্ল', 'ফাল্গুন', ছাপ্পান্ন'। এর কয়েকটি অক্ষর বিশিষ্ট ধাঁচে কাটা, যেমন— 'ট', 'ঠ', 'ক', 'ধ', 'ফ', 'ঞ', 'অ', 'ও'। লক্ষণীয়, এই ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বাংলা ব্যাকরণ রচনায় হালহেডের পথপ্রদর্শকের ভূমিকার কথা উল্লিখিত হলেও, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ওরূপ কোনো উল্লেখ নেই। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলা হয়েছে— 'Much merit is due to Mr. Halhed, except whose

১ সজনীকান্ত দাস, তদেব, পৃ. ১২৫

work no Garmmar of this Language has hitherto apperaed. I have made some distinctions and observations not noticed by him, particulary on the declension of nouns and verbs, and the use of participles.' দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এই বক্তব্যের পুনরুল্লেখ নেই।

১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে কেরীর ব্যাকরণের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় [কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে এর একটি কপি রক্ষিত আছে], এবং পুনর্মুদ্রিত চতুর্থ সংস্করণ ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য, কেরীর ব্যাকরণের এই ৪র্থ সংস্করণটি ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত '*Dialogues*' পুস্তকের ৩য় সংস্করণের সঙ্গে একত্র মুদ্রিত ও বাঁধাই হয়ে একটিমাত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ৪র্থ সংস্করণে ব্যাকরণের পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ + ১০০, তা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি হরফে ছাপা।

কেরীর ব্যাকরণে উদ্ধৃত অধিকাংশ দৃষ্টান্তবাক্য মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা থেকে গৃহীত। উদাহরণস্বরূপ, কেরীর ব্যাকরণের ২য় সংস্করণে (১৮০৫) ব্যবহৃত দু'টি দৃষ্টান্তবাক্য উল্লেখ করা যেতে পারে :

১৩১ পৃষ্ঠায় আছে : 'রাজা পণ্ডিতের পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া মন্ত্রিরদের বাক্য আদর না করিয়া পণ্ডিতকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন।' [এটি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত 'বত্রিশ সিংহাসন' থেকে গৃহীত।]

১৫০ পৃষ্ঠায় আছে : 'হে মহারাজ সকল ঋতুরাজ বসন্ত আপনকার বিলাস বিপিন সমূহে প্রবেশ করিলেন বনরাজি নবীন পল্লব ফল পুষ্প স্তবক মঞ্জরী ভারেতে পরম শোভাবিষ্ট হইয়াছেন।' [এটি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২ সং) থেকে গৃহীত। উদ্ধৃতাংশে কেবল একটি শব্দে পার্থক্য ঘটেছে। মূলে 'শোভাবিশিষ্ট,' এখানে হয়েছে 'শোভাবিষ্ট'। এটি মুদ্রণ-প্রমাদও হতে পারে।]

কেরীর দ্বিতীয় পুস্তক ও মিশন প্রেস প্রকাশিত বাংলা ভাষা সাহিত্য বিষয়ক কলেজ পাঠ্য তৃতীয় পুস্তক ইংরেজিতে '*Dialogues*' বা বাংলায় 'কথোপকথন' নামে পরিচিত। এটি কেরীর নিজস্ব রচনা নয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের বাংলা ভাষা আয়ত্তের সুবিধার্থে কেরী এই বইটি সংকলন ও সম্পাদন করেন এবং ১৮০১ সনের আগস্ট মাসে (ভূমিকায় উল্লিখিত তারিখ ৪ঠা আগস্ট, ১৮০১) তা শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

বইটির আখ্যাপত্রটি (১ম সং) ছিল এইরূপ : 'DIALOGUES, / intended / To facilitate the acquiring / of / The Bengalee Language. / Serampore, / Printed at the Mission Press. / 1801.' কেরী লিখিত ভূমিকায় জানা যায় যে এটি তাঁরই সংকলিত। গ্রন্থারম্ভে (পৃষ্ঠা ৯) বইটির আরেকটি নাম দেওয়া আছে 'Colloquies'। এর পরবর্তী পৃষ্ঠায় (পৃ. ১০) পাই বাংলা নাম— 'কথোপকথন' ও ১১ পৃষ্ঠায়

'Conversation'.। বইটিতে বাংলা মৌখিক ভাষা বা কথোপকথনের ভাষা ও তৎসহ তার ইংরেজি অনুবাদ সংকলিত হয়েছে। বইটির বামদিকের পৃষ্ঠায় বাংলা ও তার বিপরীতে ডানদিকের পৃষ্ঠায় ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া আছে। যেমন, প্রথম প্রসঙ্গ— 'চাকর ভাড়া করন'— ১০ পৃষ্ঠায়, ও তার বিপরীতে— page 11—'Hiring Servants'। প্রথম সংস্করণের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ + ২১৭। ২য় সংস্করণে (১৮০৬) পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ + ২১১। এর ৩য় সংস্করণ, কেরীর ব্যাকরণ-এর ৪র্থ সংস্করণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়— তাতে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ + ২১৩। আলোচ্য বইটিতে (১ম সং) পৃষ্ঠাঙ্ক বাংলা ও ইংরেজিতে পরপর দেওয়া আছে। ১ম সংস্করণে হরফের উচ্চতা সাধারণত ৩ মি. মি.। হরফগুলি বেশিরভাগই সুন্দর ছাঁদে কাটা, প্রায় সবই আধুনিক ধাঁচের। এগুলি মিশন প্রেসে পঞ্চানন কর্মকারের কাটা হরফ বলে মনে হয়।

'কথোপকথন'-এর ভাষার নমুনা স্বরূপ এর কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

'স্ত্রী লোকের হাট করণ।
হাটে যাবা গো।
যাবগো। তোর কি আনিতে হবেতে।
মোর বুন একটু সুতা হইয়াছে তাই বিচিব
বেচে যা হয় তা আনিব।
তোর বুন এই কায বই নয়। মোর অনেক কায।
মর। তোর হাটেই এতই কি কায।
ও জান না মোর অনেক কায। গাঁর সিকি লোক
বুন মোকে সুতা বিচিতে দিয়াছে সে সকল সুতা
মোকে বিচিতে হবে আর নুন নেই তেল নেই তা
নিতে হবে মাচ তরকারি আন্তে হবে।' (পৃ. ১২৬)

সমসাময়িককালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত আরেকটি বই— গোলোকনাথ শর্মা রচিত 'হিতোপদেশ'। শ্রীরামপুর মিশন পত্তনের শুরু থেকেই অল্প যে ক'জন দেশীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে মিশনারীদের ঘনিষ্ঠতা ছিল, গোলোকনাথ শর্মা তাঁদের অন্যতম। রামরাম বসুর মতো গোলোকনাথেরও প্রাক্-শ্রীরামপুর যুগ থেকেই টমাস ও কেরীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত মহীপাল দিঘির কাছাকাছি কোনো জায়গায় গোলোকনাথের নিবাস ছিল। সেখানে ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে জন টমাস বাংলা ও সংস্কৃত শেখার জন্য তাঁকে পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। তখন থেকে শুরু করে ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত টমাস ও কেরীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বজায় ছিল। তাঁরই ভাই কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে কেরীর পণ্ডিত হিসাবে নিযুক্ত হন। মালদহ পরিত্যাগ করে কেরী যখন শ্রীরামপুর চলে আসেন, গোলোকনাথও তাঁর সঙ্গে আসেন। সেখানে তিনি কেরীর অনুরোধে ১৮০১

সনে সংস্কৃত ভাষা থেকে হিতোপদেশের গল্প বাংলায় অনুবাদ করেন এবং কেরী তা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহারার্থে মিশন প্রেস থেকে ছাপার ব্যবস্থা করেন। গোলোকনাথ কিন্তু কোনোদিনই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গেই তাঁর বরাবরের সম্পর্ক। ১৮০১ সনের ১৫ই জুন তারিখে ডঃ রাইল্যাণ্ডকে লেখা কেরীর যে চিঠির কিয়দংশ আমি ইতিপূর্বে উদ্‌ধৃত করেছি, তাতে 'our Pundit' বলতে কেরী গোলোকনাথের কথাই উল্লেখ করেছেন।[১] ঐ চিঠি থেকেই জানা যায় যে ১৮০১ সনের জুনের মধ্যে গোলকনাথ পণ্ডিত কর্তৃক সংস্কৃত গল্পের অনুবাদের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছিল। গোলোকনাথ শর্মার এই পরিচয় উদ্ধার করে সজনীকান্ত দাস লিখেছেন '১৮০১ সনেই এই গল্পগুলি প্রকাশিত হয় এবং ইহাই গোলোকনাথ শর্মার "হিতোপদেশ"।'[২] কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে গোলোকনাথের 'হিতোপদেশ' ১৮০২ সনে প্রকাশিত হয়।[৩] শ্রীরামপুর মিশনারীদের '*Tenth Memoir*'-এ এই প্রকাশ সন উল্লিখিত আছে : 'A previous translation into Bengali by "Goluk Nath Pundit" was published at Seramore in 1802.'[৪]

গোলোকনাথের 'হিতোপদেশ' বইটির একটি কপি কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে। বইটির দুটি আখ্যাপত্র। বাংলা আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 'হিতোপদেশ। / সংগ্রহ ভাষাতে। / গোলোকনাথ শর্ম্মনা ক্রিয়তে। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। / ১৮০১'। কিন্তু এর ইংরেজি আখ্যাপত্রে আছে : 'HEETOPADESHU, / OR / Beneficial Instructions, / Translated from the original Sangskrit, / BY GOLUK NATH, Pundit, / SERAMPORE, / PRINTED AT THE MISSION PRESS, / 1802.' এই শেষোক্ত প্রকাশ সন '১৮০২' তারিখটিই ঠিক।

এই বইটির পরবর্তী কোনো সংস্করণের কথা জানা যায়নি। অক্টেভো আকারের এই বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৭। এর হরফের উচ্চতা ৩ মি. মি. র সামান্য কম। সমসাময়িক-কালে মিশন প্রেসে মুদ্রিত অন্যান্য বইয়ে এই একই হরফ ব্যবহৃত হয়েছিল। এর অক্ষর-সাজানো ছিল সামান্য উঁচুনিচু, অক্ষরগুলি সামান্য ছাড়া ছাড়া।

সমসাময়িক বাংলা গদ্যের মানের তুলনায় গোলোকনাথের ভাষা ছিল অপেক্ষাকৃত সরল। 'হিতোপদেশ' থেকে তাঁর রচনার সামান্য নমুনা এখানে উদ্‌ধৃত হল :

---

১ ২৩৮ পৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত

২ সজনীকান্ত দাস, তদেব, পৃ. ১৮৭

৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা (১ম), ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত' পৃ. ১১

৪ *Indian Antiquary for 1903*, p. 241 ff.

'কান্যকুব্জ দেশে বীরপুরনাম্নি নগরে রাজা বীরসেনের পুত্র তুরঙ্গবন নামে রাজপুত্র আছেন তিনি অতি ধনবান প্রোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহা গুনবান পরম সুন্দর পুরুষ সভ্য ভব্য নানা প্রকারে ভাল। একদিন তিনি ইচ্ছাক্রমেতে নগরে বেড়াইতে ২ নবযৌবনা লব্যানবতী বনিক পুত্র বধুকে দেখিলেন অতি সরূপা সুকেশা সুনাসা সুহাসা মধ্যক্ষীনা মৃগবরনয়না হংসগমনা নিবিড় নিতম্বা তাহার সদৃশা সুন্দরী রাজপুত্র কখন দেখেন নাহি। তাহাকে দেখিয়া রাজপুত্র নিজালয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া এক কুট্টনীকে তাহার স্থানে পাঠাইলেন লাবন্যবতীও রাজপুত্রকে দেখিয়া স্মরজর্জ্জরিত হৃদয়া হইয়া আসিয়াছেন।' (পৃ ৬৮)

গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' ছাড়া আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্যগ্রন্থ ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। সেই হিসাবে এই বছরটিকে, বা ব্যাপকভাবে মিশন প্রেসের প্রথম দু-তিন বছর, অর্থাৎ ১৮০১-১৮০৩— এই সময়কালকে বলা যায় তাদের সকল সময়— সুফলা, রত্নপ্রসবা। ওল্ড টেস্টামেণ্ট— প্রথম খণ্ডের বিলম্বিত আবির্ভাব ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু এটি বাদ দিলে ঐ সময়ে আর যে-কটি বই প্রকাশিত হয় তা মূলত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা মেটানোর তাগিদেই মুদ্রিত। রামরাম বসুর দ্বিতীয় গদ্যগ্রন্থ 'লিপিমালা' ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রথম সফল গদ্যরচনা 'বত্রিশ সিংহাসন' মিশন প্রেস থেকে ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া সমসাময়িককালের বিশিষ্ট বাংলা প্রকাশন কাশীরাম দাসের মহাভারত চার খণ্ড ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচ খণ্ড ১৮০২ থেকে ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মিশন প্রেস থেকে সর্বপ্রথম মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়।

'লিপিমালা'য় মোট চল্লিশটি লিপি বা চিঠি সংকলিত হয়েছে। এগুলি সবই রামরাম বসুর স্বকীয় গদ্যরচনার নিদর্শন। তাঁর পূর্ববর্তী রচনা 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-এর গদ্য অপেক্ষা এখানকার গদ্যে ফারসী শব্দের বোঝা অনেকটা কমেছে ও সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার প্রসাদগুন ও রূপবৈচিত্র্য পরিস্ফুট হয়েছে। এই পুস্তকের বাংলা আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ : 'লিপি মালা | পুস্তক। | রামরাম বসুর রচিত | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। | ১৮০২।' এর ইংরেজি আখ্যাপত্রে পাই : LIPI MALA, / or The Bracelet of Writing ; / being a series of Letters on different subjects./By Ram Ram Boshoo,/One of the Pundits in the College of Fort William,/Serampore :/Printed at the Mission Press,/1802.' কলকাতায় ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এর একটি কপি রক্ষিত আছে। অক্টোভো ৮$\frac{1}{2}$" × ৫$\frac{1}{2}$" আকারের এই বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৫। এতে পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া আছে। বইটিতে ব্যবহৃত হরফের উচ্চতা দেখা যায় ৩ মি.মি.। মিশন প্রেসের প্রথম যুগের অক্ষরবৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান। অনুস্বরের দুই রূপই (শূন্য ও শূন্যের নীচে ইলেক) এতে পাওয়া যায়। এর আরো কয়েকটি বিশিষ্ট অক্ষর বা যুক্তাক্ষর লক্ষণীয়, যেমন— 'জ' 'অ' 'চ' 'উ' 'র' 'কু' 'ন্ত' 'ক্ষ' 'ক্র' 'ষ্ট' 'দ্ব'। বেশিরভাগ যুক্তাক্ষরই আধুনিক ধাঁচে লেখা।

এতে ব্যবহৃত হরফগুলি হালকা face-সম্বলিত। অক্ষর সাজানো কিছুটা ছাড়া ছাড়া, ফলে এর মুদ্রিত রূপ জমাটবাঁধা নয়। বইটি দেশীয় পাটনা কাগজে ছাপা, অধুনা তা বিবর্ণ হয়ে গেছে। 'লিপিমালা'র পরবর্তী আর কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

'লিপিমালা'র ভাষার নমুনা স্বরূপ এর কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

'পিতা পুত্রকে এবং পুত্র তুলা সমস্তকে।—
প্রাণ প্রতিম শ্রীযুত অমুক পরম কল্যাণবরেষু

চিরকালগত ওখানকার সমাচার পত্রদ্বারা জ্ঞাত হইলাম রঘুনাথের আত্মবিস্মৃত কারণ লিখিতে লিখিয়াছিলা তাহার বিশেষ লিখিতেছি অবগত হইবা পূর্ব্বকালে সত্যযুগে সূর্য্য-বংশীয় রাজা অম্বরীশ নামে মহা পুণ্যবান দাতা সত্যবাদী পরম বৈষ্ণব ছিলেন আপনি লক্ষ্মী তাহার কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিলেন তাহার নাম- শ্রীমতী পরমসুন্দরী পদ্মিনী কন্যা তাহার রূপের প্রতিযোগিতা পৃথিবীতে কাহার সহিত ছিল না রাজা অতিথি ভক্ত বড় প্রতি দিবস যত অতিথি আইসেন বিশিষ্টরূপে সকলের সেবা করেন ব্রাহ্মণ অতিথির পদ প্রক্ষালনের জল শ্রীমতী অনিয়া দেন…' (পৃ ১৯১-১৯২)।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ 'বত্রিশ সিংহাসন' ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কেরীর বিশেষ অনুরোধে মৃত্যুঞ্জয় এই বইটি রচনা করেন। এটি তাঁর মৌলিক রচনা নয়, সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ। তবে এতেই প্রথম তাঁর নিজস্ব মৌলিক বাংলা গদ্যরীতি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম সচেতন শিল্পী হিসাবে তিনি সর্বজন স্বীকৃত ও সমাদৃত হয়েছেন। তাঁর বত্রিশ সিংহাসন কলেজের অন্যতম পাঠ্যপুস্তক রূপে গৃহীত হয়েছিল এবং এজন্য পারিশ্রমিক স্বরূপ কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে দুশো টাকা দিয়েছিলেন।

বইটির প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ : 'বত্রিশ সিংহাসন।—/ সংগ্রহ ভাষাতে।—/ মৃতুঞ্জয় শর্ম্মনা ক্রিয়তে।—/ শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—/ ১৮০২।—' ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এর দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র : 'বত্রিশ সিংহাসন। / সংগ্রহ ভাষাতে। / মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মনা ক্রিয়তে। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। / ১৮০৮'। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে 'মৃতুঞ্জয়' নামটির বানান ভুল লক্ষণীয়। এটি সম্ভবত মুদ্রণপ্রমাদ। তবে উল্লেখ্য, ঐ সময়ে মিশন প্রেসে ছাপা বইগুলিতে মুদ্রণপ্রমাদ খুব কমই দেখা যেত। বাংলা মুদ্রণের আদিযুগের পক্ষে এটি নিঃসন্দেহে গৌরবের কথা। 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর পূর্বোক্ত দুটি সংস্করণের কপিই কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে। প্রথম সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২১০, দ্বিতীয় সংস্করণে তা দাঁড়ায় ১৯৮। অপেক্ষাকৃত ছোটো হরফে ও স্বল্প পরিসরে বই ছাপতে পারাই ছিল তখন মুদ্রণের অগ্রগতির অন্যতম লক্ষণ।

এবিষয়ে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের সদাজাগ্রত দৃষ্টি ও নিরলস প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে যখন ঐ প্রেস বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে তখন তার পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪৪। 'লন্দন মহা নগরে চাপা' বত্রিশ সিংহাসন-এর অপর একটি সংস্করণ ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে 'শ্রীবিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুত্তলিকা সিংহাসন সংগ্রহ বাঙ্গালা ভাষাতে' নামে প্রকাশিত হয়।

বইটির (১ম সং, ১৮০২) আকার ছিল—৭.৫"×৫", এবং এর হরফের উচ্চতা ৩ মি.মি.। এর অধিকাংশ যুক্তাক্ষরই আধুনিক ধাঁচে কাটা। শ্রীরামপুরের আদিযুগের অক্ষরবৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে : 'স্থ' 'শু' 'গুরু,' 'চ্ছ', 'স্মরণ', 'নিল্লর্জ্জ', 'উ', 'ট', 'জ্ঞ' ইত্যাদি। এর অক্ষর সাজানো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অক্ষর ও শব্দগুলি সামান্য ছাড়া ছাড়া, ফাঁক ফাঁক। বইটিতে পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া আছে। তা ছাড়া প্রতি ৪ পাতা বা ৮ পৃষ্ঠা অন্তর বাংলা বর্ণে signature দেওয়া আছে। প্রতি পূর্ণ পৃষ্ঠায় ১৭টি করে লাইন ছাপা হয়েছে। ব্লটিং কাগজের মতো মোটা খসখসে পাটনা কাগজে বইটি ছাপা হয়েছিল, কালের গতিতে অধুনা তা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

'বত্রিশ সিংহাসন'-এর ভাষার নমুনা স্বরূপ এর ১ম সংস্করণ (১৮০২) থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

'দ্বিতীয় পুত্তলিকার কথা।—

শ্রীভোজরাজা অন্য এক দিবস নিরূপন করিয়া অভিষেক কারণ সপরিবারে সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে সিংহাসনের দ্বিতীয় পুত্তলিকা কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য যার মহত্ব থাকে সে এই সিংহাসনে বসিতে পারে। রাজা কহিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ব কিরূপ। পুত্তলিকা কহিলেন রাজা শুন শুন। অবন্তি নগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজ্য করেন এক দিবস আশ্চর্য্য দেখিবার জন্য রাজা ভৃত্যবর্গেরদিগে নানা দেশে প্রেরণ করিলেন ভৃত্যবর্গেরা নানা দেশে ভ্রমন করিয়া রাজার নিকটে আসিয়া কহিল হে মহারাজ নিবেদন করি চিত্রকূট পর্ব্বতে দেবতার এক মন্দির তার নিকট এক পুষ্পোদ্যান আছে এবং মন্দিরের সম্মুখে এক নদী আছে সেই নদীতে নিষকলঙ্ক পুণ্যবান লোক যদি স্নান করে তবে তাহার শরীরে সেই জল দুগ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হয় যদি কেহ পাপী সকলঙ্ক লোক স্নান করে তবে তাহার শরীরে সেই জল কাজ্জলের সমান দৃষ্ট হয়।' (পৃ ৪১-৪২)

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের আদিযুগের অন্যতম স্মরণীয় বাংলা প্রকাশন মহাভারত (আদি পর্ব) চার খণ্ড ও রামায়ণ (সপ্তকাণ্ড) পাঁচ খণ্ড। অথচ বাংলা সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টিতে এগুলি এতকাল উপেক্ষিত হয়ে এসেছে, তাঁদের সমালোচনা গ্রন্থে এগুলির বিশেষ কোনো আলোচনাও হয়নি। উইলিয়ম কেরী সর্বপ্রথম এগুলির মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করে বাঙালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বলা যেতে পারে, এগুলিকে অবলম্বন করেই বাঙালীর সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের সুযোগ এসেছিল। রামায়ণ মহাভারতের যে

চিরন্তন রসভাণ্ডার এতকাল পুঁথির সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল, ধর্মাপ্লুত রসপিপাসু বাঙালীর ঘরে ঘরে তাকে প্রথম মুদ্রিতাকারে পৌছে দিয়ে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস নিঃসন্দেহে এক অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হতে পেরেছে। বর্তমানে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের যে বিভিন্ন মুদ্রিত সংস্করণ বাজারে পাওয়া যায় তার অধিকাংশই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস সংস্করণের আদর্শে মুদ্রিত। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে দ্বিতীয়বার পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংশোধিত হয়ে কৃত্তিবাসী সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ১৮৩০-৩৪ খ্রীস্টাব্দে ও দুখণ্ডে কাশীদাসী মহাভারত ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

মিশন প্রেস প্রকাশিত রামায়ণ মহাভারতের প্রথম সংস্করণের বইগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত ছোটো আকারের— মহাভারত প্রতি খণ্ড ৬" × ৪" আকারের, রামায়ণ প্রতি খণ্ড ৬.৮" × ৪" আকারের। এগুলির আকার এখনকার অনেক পেপার-ব্যাক পকেট সংস্করণের মতো। বইগুলির আখ্যাপত্রে অপেক্ষাকৃত বড়ো আকারের হরফ— ৭.৫ থেকে ৮ মি. মি. উচ্চতা— ও ভিতরের অংশে ছোটো হরফ— ২.৫ থেকে ৩ মি. মি. উচ্চতা ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানাতেই সর্বপ্রথম ছোটো ও বড়ো মুদ্রাক্ষর একই বইয়ে ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত হয়। এর আগে আখ্যাপত্রে ও বইয়ের ভিতরে সর্বত্র একই উচ্চতার হরফ ব্যবহৃত হত। রামায়ণ মহাভারত সবগুলি খণ্ডই তখনকার প্রচলিত পাটনা কাগজে ছাপা, ইদানীং তা হলদেটে বিবর্ণ হয়ে গেছে। মূলত দেশীয় কর্মচারীদের সহায়তায় এর compo-sing, মূল পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে তার প্রুফ সংশোধন ও তা ছাপার কাজ সম্পন্ন করা হয়। কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে প্রথম সংস্করণ রামায়ণ ও মহাভারতের সবগুলি খণ্ডই রক্ষিত আছে।

রামায়ণ মহাভারতের মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় সেগুলিও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা পঠন পাঠনের সহায়ক পুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হত। তখন এগুলিই ছিল একমাত্র পদ্যে রচিত মুদ্রিত বাংলা পুস্তক, বাকি সবই ছিল বাংলা গদ্যগ্রন্থ। সুতরাং কলেজের ছাত্রদের কাছে তখন এগুলিই ছিল মুদ্রিত বাংলা পদ্যের একমাত্র আদর্শ।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মহাভারতই প্রথম ছাপা শুরু হয়, রামায়ণ তার পরে। মহাভারত, ১ম খণ্ডের আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ : 'মহাভারত / ব্যাসোক্ত।—/ পদাবলী ছন্দে। / কাশীরাম দাস বিরচিত।—/ শ্রীরামপূরে ছাপা হইল।—/ ১৮০১।' লক্ষণীয়, এর 'মহাভারত' শব্দটি মাত্র বড়ো হরফে (৭.৫ মি.মি.) ছাপা, বাকি সবই বইয়ের ভিতরের অংশের মতোই, ছোটো মুদ্রাক্ষরে (২.৫ মি. মি. থেকে ৩ মি.মি.) ছাপা। [এখানে 'শ্রীরামপুর' শব্দে 'পূ' লেখা হয়েছে। এটি মুদ্রণ-প্রমাদ। চতুর্থ খণ্ডে এই একই ভুল আছে। কিন্তু অন্যান্য খণ্ডে তা নির্ভুল।] মহাভারতের এইটিই ছিল প্রথম বই বা প্রথম খণ্ড। তবে আখ্যাপত্রে কিছু লেখা নেই, কেবল বইয়ের শেষে লেখা আছে— 'প্রথম বই সমাপ্ত'। পরবর্তী খণ্ডগুলির আখ্যাপত্রে অবশ্য 'volume' বা 'বহি' উল্লিখিত আছে।

প্রথম খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৮। এর মুদ্রাক্ষরগুলি একটু মোটা face-এর, ছাপা কিছুটা ধ্যাবড়া মনে হয়। এর অক্ষরবৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় : 'র', 'ং', 'উ', 'জ', 'ট' ইত্যাদি। যুক্তাক্ষরগুলি আধুনিক ধাঁচের : 'ন্দ', 'গ্ন', 'শ্ব', 'পঞ্চাশ', 'সিন্ধু', 'হস্তী', 'মন্ত্রী', 'বৃক্ষ', 'স্থিতি' ইত্যাদি। এর অক্ষর-সাজানো বেশ ঝরঝরে— প্রতি শব্দ ও প্রতি পঙ্‌ক্তির মধ্যে বেশ ফাঁক রেখে সমান্তরাল রেখায় সাজানো। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪টি করে পঙ্‌ক্তি ছাপা আছে।

রচনার নমুনা হিসাবে এর কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল :

'সুত বলে অবধান শুন মুনিগণ।
যেই হেতু হইল পূর্ব্বে সমুদ্র মথন।
ব্রহ্মারে কহিল পূর্ব্বে দেব বিশ্বেশ্বর
দেবাসুরগণ লইয়া মথহ সাগর।
অমৃত উৎপতি হইবে সাগর মথনে
দেবগণ অমর হইবে সুধা পানে।
যত মহৌষধি আছে পৃথিবী ভিতরে
মন্দার লইয়া মথ ফেলিয়া সাগরে।
বিষ্ণুর পাইয়া আজ্ঞা যত দেবগণ
মন্দার পর্ব্বত যথা করিল গমন।' [আদি পর্ব্ব ॥ পৃ ২৮]

মহাভারত ২য় খণ্ডের আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ : 'মহাভারত ব্যাসোক্ত।—/পদাবলি-ছন্দে।—কাশীরাম দাস বিরচিত।—/দ্বিতীয় বহি।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—/১৮০২। —' বইয়ের শেষে লেখা আছে— 'দ্বীতিয় বই সমাপ্ত।' এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৮। এখানে ব্যবহৃত হরফের বৈশিষ্ট্য ও এর অক্ষর সাজানোর পদ্ধতি প্রথম খণ্ডের অনুরূপ। রচনার নমুনা হিসাবে এর কিছু অংশ উদ্ধৃত হল :

'সত্য করি কন্যা লইয়া দিবা জনকেরে
আজি হইতে সত্যবতী নাম কন্যা ধরে।
ভীষ্মে প্রতিজ্ঞা শুনি কৈবর্ত্তের প্রতি
ভীষ্মে আনি কন্যা নিবেদিল সত্যবতী।
সত্যবতী দেখি ভীষ্ম বলে যোর হাতে
নিজ গৃহে চল মাতা চড় আসি রথে।
রথে চড়াইয়া লইয়া করিল গমন।
হস্তিনা নগরে প্রবেশিল ততক্ষণ।
ব্রাহ্মন ক্ষেত্রিয় তথা যত রাজা ছিল
অপূর্ব্ব শুনিয়া তবে দেখিতে আইল।

ধন্য ২ বলিয়া ডাকয়ে সর্ব্বজনে
ভীষ্ম ২ বলি সব হইল ভুবনে।
কন্যা লইয়া দিল ভীষ্ম বাপের গোচরে
দেখিয়া সান্তনু হৈল বিস্ময় অন্তরে।
তুষ্ট হইয়া বর তবে দিলেন নন্দনে
ইচ্ছা মৃত্যু হইও তুমি মোর বরদানে।
ভীষ্ম জন্ম কর্ম্ম আর গঙ্গার চরিত্র
অপূর্ব্ব ভারত কথা ত্রৈলোক্য পবিত্র।
এ সব রহস্য কথা যেই নর শুনে
শরীর নির্ম্মল হয় জ্ঞান ততক্ষণে।
ব্যাসের রচিত চিত্র অপূর্ব্ব ভারত
কাশীরাম দাস কহে পাচাঁলির মত।' [পৃ ১৭৪-১৭৫]

মহাভারত, ৩য় খণ্ডের আখ্যাপত্রে পাই: 'মহাভারত/ব্যাসোক্ত।—/কাশীরাম দাস বিরচিত।—/তৃতীয় বহি। / শ্রীরামপুর ছাপা হইল—/১৮০২।' এর সঙ্গে যে ইংরেজি আখ্যাপত্র আছে, তা এইরূপ: 'THE MAHABHARUT,/A POEM : /BOOK THE FIRST, / IN FOUR VOLUMES./Translated from the Original Sangskrit, / By KASHEE RAM DASS./VOL. III. / SERAMPORE : / PRINTED AT THE MISSION PRESS/1802.' তৃতীয় খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৩। কাগজ, হরফ ও অন্যান্য মুদ্রণ বৈশিষ্ট্যে এটি অপর খণ্ডগুলির অনুরূপ। রচনার নমুনা হিসাবে এর কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল:

'কবরি বেড়িয়া দিব্য কুসুমের মালে।
মাণিক প্রবাল মোতি হার তার গলে।
বসন ভূষণ দিব্য নূপুর কঙ্কন
স্বর্গ বিদ্যা ধরি মোহে নবীন জৌবন।
প্রিয় ভাবে যেন পতি পত্নি কথা কহে
দেখিয়া হিড়িম্ব ক্রোধ পায় অতিশয়ে।
ভগ্নি প্রতি ডাক দিয়া বলয়ে হিড়িম্ব
এই হেতু এতক্ষণ তোমার বিলম্ব।
ধিক তোর জীবন কুলের কলঙ্কিনী
মানুষ ভাতার লোভ করিলি পাপিনী।
মোর ক্রোধ তোমার হইল পাসরন
মোর ভক্ষ বিঘ্নতো করিলি তেকারণ।

এই হেতু আগে তোরে করিব সংহার।
পশ্চাত এ সব জনে করি ছারখার।
এত বলি চলিল হিড়িম্বা মারিবারে
নয়ন লোহিত দন্ত কড় মড় করে।
ভীম বলে রাক্ষসার বদনে লাজ নাই
যুবা ভগ্নি পাঠাইলি মানুষের ঠাঁই।' [পৃষ্ঠা ২০২-২০৩]

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রকাশিত মহাভারত আদি পর্বের শেষ বা চতুর্থ খণ্ডের প্রকাশ সন বাংলা আখ্যাপত্র অনুযায়ী '১৮০৩', কিন্তু ইংরেজি আখ্যাপত্রানুসারে '১৮০২'। আখ্যাপত্র দুটি ছিল এইরূপ: 'মহাভারত/ব্যাসোক্ত।/পদাবলী ছন্দে।—/কাশীরাম দাস বিরচিত।—/চতুর্থ বহি।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—/১৮০৩।'—'THE MAHA-BHARUT,/A POEM : /BOOK THE FIRST,/IN FOUR VOLUMES./ Translated from the Original Sangskrit,/BY KASHEERAM DASS,/VOL. IV./SERAMPORE, /PRINTED AT THE MISSION PRESS, /1802'. এই চতুর্থ খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯৫। বইয়ের শেষে লেখা আছে— 'ইতি শ্রীমহাভারতের আদি পর্ব্ব/সমাপ্ত হইল।' মুদ্রণ বৈশিষ্ট্যে এটি আগের খণ্ডগুলিরই অনুরূপ।

রচনার নমুনা হিসাবে এর কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

'দুর্য্যোধন আজ্ঞাতে যতেক সহোদর
হাতে গদা করি সব ধাইল সত্বর।
ব্যাঘ্রের সম্মুখে যাইতে ছাগে যেন শঙ্কা
দেখি ধায় বৃকোদর সদা রণ রঙ্গা।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ দাঁড়াইল মধ্যখানে
আপনা আপনি তাত দ্বন্দ কর কেনে।
আগুপাছু বন্ধি সাম্ব আমার গৃহেতে
বুঝিয়া ইহার দ্বন্দ করিব পশ্চাতে।
দুর্য্যোধনে বলে তাত কৃষ্ণের এ সুত
শ্রুতমাত্রে যদু বলে আসিবে অচ্যুত।
ইহারে এক্ষণ যদি প্রাণেতে মারিবে
গোবিন্দ করিলে ক্রোধ অনর্থ হইবে।
যুদ্ধ করি গোবিন্দে করিব পরাজয়
তবেত মারিব ইহায় ঘরেতে আছয়।
শুনি ধর্ম্মরাজ বলে ভাল ২ বলি
দুর্য্যোধন বলে দেহ চরণে সাঞ্জলি।

চরণে নিগূঢ় দিয়া লৈল গুরু দ্রোণ
নিজ ২ গৃহে সভে করিল গমন।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।' (পৃ ৩০২-৩০৩)

১৮০২-০৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে কৃত্তিবাস বিরচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঁচ খণ্ডে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। মিশন প্রেসের রীতি অনুযায়ী এর প্রায় প্রতি খণ্ডেই বাংলা আখ্যাপত্রের সঙ্গে আরেকটি করে স্বতন্ত্র ইংরেজি আখ্যাপত্রও ছাপা আছে। ইংরেজি আখ্যাপত্রগুলিতে তারিখ ছাপা আছে '১৮০২', কিন্তু সব কটি খণ্ডের বাংলা আখ্যাপত্রে প্রকাশ সন দেওয়া আছে '১৮০৩'। এ ছাড়া ইংরেজি আখ্যাপত্রগুলিতে 'volume' (অর্থাৎ 'খণ্ড') সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু তার অনুষঙ্গী বাংলা আখ্যাপত্রে 'খণ্ড' উল্লিখিত না হয়ে কেবলমাত্র কোন 'কাণ্ড' তা লেখা হয়েছে, এবং যে খণ্ডে একাধিক 'কাণ্ড' ছাপা হয়েছে, সেক্ষেত্রে নামপত্রে কেবলমাত্র প্রথম 'কাণ্ড'টিই উল্লেখিত হয়েছে। এতে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। সেই হিসাবে বলা যায়, বাংলার তুলনায় এর ইংরেজি আখ্যাপত্রগুলি অধিক প্রাঞ্জল।

'মহাভারত' যে হরফে ছাপা, 'রামায়ণ'-এর পাঁচটি খণ্ডও সেই একই হরফে ছাপা। আগের মতোই, 'রামায়ণ'-এ বইয়ের ভিতরের অংশে ছোটো হরফ (উচ্চতা ৩ মি.মি.) ও আখ্যাপত্রে ছোটো (৩ মি.মি.) ও বড়ো (৮ মি.মি.) দুই আকারের হরফই ব্যবহৃত হয়েছে। হরফগুলি কিছুটা মোটা face সম্বলিত। অক্ষর সাজানোর পদ্ধতি সুষম, ফাঁক ফাঁক। প্রতি পূর্ণ পৃষ্ঠায় ১৮টি করে পঙ্‌ক্তি ছাপা আছে। এর অধিকাংশ অক্ষরই আধুনিক ধাঁচের। কয়েকটি বিশিষ্ট উদাহরণ : 'জ', 'র', 'ট', 'ং', 'ক', 'গঙ্গা' 'উদ্ধারিল', 'লক্ষ্মী', ইত্যাদি। রামায়ণ-এর সব কটি খণ্ডই পাটনা কাগজে ছাপা, অধুনা তা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

রামায়ণ-এর প্রথম খণ্ডের ইংরেজি ও বাংলা আখ্যাপত্রগুলি যথাক্রমে এইরূপ : 'THE RAMAYUNU,/A POEM :/IN FIVE VOLUMS./Translated from the original Sangskrit,/BY KIRTEE BASS./Vol. I. / SERAMPORE, / PRINTED AT THE MISSION PRESS,/1802'—

'বাল্মীকিকৃত / রামায়ণ / মহা কাব্য। / কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিল।—/প্রথম কাণ্ড। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— / ১৮০৩'।

প্রথম খণ্ডে কেবলমাত্র প্রথম কাণ্ড, অর্থাৎ 'আদ্যকাণ্ড' বর্ণিত হয়েছে। এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৮। রচনার নমুনা হিসাবে এর কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

রাবণ বলে পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে
সকল তীর্থের জল আন মোর কাছে।

বোলমাত্র বলিতে বিলম্ব হৈয়া গেল
সকল তীর্থের জল সমুখে যোগাইল।
তীর্থের জলেতে রাবণ করিলেক স্নান
ব্রাহ্মণের তরে রাজা স্থবর্ণ করে দান।
যতেক কাঞ্চন দিল নাম লব কত
গো দান শিলা দান করে শত শত।
দানপুন্য করিয়া বসিল দশানন
রাবণ বলে অমর হৈনু নাহিক মরণ।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিলক্ষণ
রামের পীরিতে হরি বল সর্ব্ব জন।' [পৃ ২১৬]

দ্বিতীয় খণ্ডের ইংরেজি ও বাংলা আখ্যাপত্র দুটি প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্রগুলিরই অনুরূপ। এর ইংরেজি আখ্যাপত্রে লেখা— 'Vol II…1802', কিন্তু বাংলায়—'দ্বিতীয় কাণ্ড…১৮০৩'। আসলে এই দ্বিতীয় খণ্ডে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাণ্ড, অর্থাৎ 'অযোধ্যা কাণ্ড' ও 'অরণ্য কাণ্ড' বর্ণিত হয়েছে। এই খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৪। এর রচনার নমুনা :

'বিস্তর দূর নাহি রাক্ষসী আইল নিকটে
সুন্দর শরীর তোমরা পড়িলা শঙ্কটে।
মায়া পাতিয়া জিজ্ঞাসেন নিশাচরী।
রাক্ষসির মায়া রাম বুঝিতে না পারি।
সরল হৃদয় রাম পরিচয় করি
দশরথের পুত্র আমি রাম নাম ধরি।
ভাইর নাম লক্ষণ মোর সীতা নামে স্ত্রী
সত্যের কারণে মোরা বনে ২ ফিরি।
বাপের সত্য পালিতে হইলাম বনবাসী
চৌদ্দ বৎসর বনে থাকিব হৈয়া তপস্বী।
পরম স্থন্দরী তুমি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
একেশ্বর বনে বেড়াও হইয়া যুবতী।
এতেক পুছেন রাম সরল হৃদয়
আপনার রাক্ষসী তবে করে পরিচয়।
শূর্পনখা বলে আমি রাবণের ভগিনী
নানা দেশে ভ্রমি হৈয়া কামাচারিনী।
দেশে ২ বেড়াই আমি কারে নাই ডর
তোমার স্ত্রী হইতে আইলাম তোমার গোচর।' [পৃ ১৮৪]

আগের খণ্ড দুটির আদর্শে তৃতীয় খণ্ডের ইংরেজি আখ্যাপত্রে লেখা আছে—'Vol III... 1802' কিন্তু এর বাংলা আখ্যাপত্রে—'...চতুর্থ কাণ্ড... ১৮০৩'। আসলে এই তৃতীয় খণ্ডে চতুর্থ কাণ্ড ও পঞ্চম কাণ্ড, অর্থাৎ 'কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড' ও 'সুন্দর কাণ্ড' বর্ণিত হয়েছে। এই খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১১; কিষ্কিন্ধা কাণ্ড— ১ থেকে ১৮২ পৃষ্ঠা ও সুন্দর কাণ্ড— ১৮৩ থেকে ৩১১ পৃষ্ঠা। সুন্দর কাণ্ড, অর্থাৎ পঞ্চম কাণ্ড শুরু হবার আগে এই মর্মে আরেকটি sub-title page মুদ্রিত আছে। এই খণ্ডের রচনার নমুনা:

'জিতেন্দ্রিয় বানর আমি পাপে নাই মন
উলঙ্গ উন্মত্ত যত করে নিরীক্ষণ।
সীতা চাহি অৰ্দ্ধ রাত্রি করিল জাগরণ
অনেক ভ্রমণে বীর না পায় অন্যাসন।
বল বুদ্ধি বিক্রম মোর প্রভুর ভকতি।
সকল নষ্ট করিল পক্ষিরাজ সম্পাতি।
তার বাক্যে ভর করি লঙ্ঘিলাম সাগর
সীতা চাহি বেড়াইলাম লঙ্কার ভিতর।
লঙ্কায় হইতে নাহি করিব গমন।
এই লঙ্কা পুরে আমি ত্যজিব জীবন।
কান্দিতে কান্দিতে বীর ছাড়িল নিশ্বাস
শুন্দর কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীৰ্ত্তিবাস।' [পৃ ২১৮]

আগের খণ্ডগুলির আদর্শে চতুর্থ খণ্ডের ইংরেজি আখ্যাপত্রে লেখা— 'Vol. IV... 1802', কিন্তু বাংলায় লেখা—'...ষষ্ঠ কাণ্ড ...১৮০৩'। এই চতুর্থ খণ্ডে সম্পূর্ণ কাণ্ড, অর্থাৎ 'লঙ্কা কাণ্ড' বর্ণিত হয়েছে। এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫২৭। এখান থেকে কিছু রচনার নমুনা উদ্ধার করা যেতে পারে:

সূৰ্য্যকে বলিলাম গোঁসাঞি কর অবিরাম
তোমার বংশে পড়িয়াছেন ঠাকুর শ্রীরাম।
ওষধি লইয়া যাই পর্ব্বতশেখর
রাম লক্ষণ জীবেন আর সকল বানর।
যত বলিলাম না শুনিল দিনপতি
আনিলাম সূৰ্য্য গোঁসাঞি না পোহায় রাতি।
শুনিয়া রামের তরে লাগে চমৎকার
রাত্রি না পোহায় এই হেতু অন্ধকার।
তোমার বিক্রম দেখি আমার লাগে ভয়
এড়িয়া দেহ সূৰ্য্য গিয়া করুন উদয়।

সূর্য্যের উদয় হইলে অন্ধকার প্রকাশ
তোমার প্রসাদে হইল অন্ধকার নাশ।
রামের বচনে হনুমান বীর হাসে,
এড়িয়া দিল সূর্য্য গিয়া উঠিল আকাশে।
মিথ্যা হইল যত যুদ্ধ করিল ইন্দ্রজিত
কীর্ত্তিবাস রচিল লঙ্কার অর্দ্ধেক গীত।' [পৃ ২১৮]

রামায়ণ-এর শেষ অর্থাৎ পঞ্চম খণ্ডের বাংলা আখ্যাপত্রটিও আগের খণ্ডগুলির আদর্শে ছাপা : 'বাল্মীকিকৃত / রামায়ণ / মহাকাব্য / কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিল। — / সপ্তম কাণ্ড / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। — / ১৮০৩।' এই পঞ্চম খণ্ডে শেষ অর্থাৎ সপ্তম কাণ্ড— 'উত্তর কাণ্ড' বর্ণিত হয়েছে। এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪২। রচনার নমুনা হিসাবে এর কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে :

'ভদ্র বলে রঘুনাথ যাই যথা তথা
সকল ঠাঁই শুনি প্রভু সীতার নিন্দাকথা।
দেবাসুর নাহি করে যেবা সব রণ
সীতা উদ্ধারিলা রাম মারিয়া রাবণ।
দোষগুণ না বুঝিয়া সীতা আনিলে ঘরে
এই অপযশ বলে তোমার তরে সংসারে।
এতেক বলিল যদি ভদ্র দুর্ম্মুখে
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে রামের সম্মুখে।
রামের নিকটে আছে যত পাত্রগণ
রাম বলেন কহ পাত্র সত্য বচন।
রামের আজ্ঞা পাইয়া বলে পাত্র বর্দ্ধ
সকল সত্য হয় গোসাঞি যে বলিল ভদ্র।
শুনিয়া রঘুনাথ ছাড়িল নিশ্বাস
উত্তর কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস। [পৃ ২০০]

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের আদিযুগে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের মুদ্রণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। লক্ষ্য করা গেছে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা বইগুলির বাংলা আখ্যাপত্রে সাধারণত লেখা হত 'শ্রীরামপুরে ছাপা হইল'— কিন্তু তাদের ইংরেজি আখ্যাপত্রগুলিতে, এমন-কি যখন একই বইয়ে ইংরেজি ও বাংলায় দুটি আখ্যাপত্র ছাপা হত সে সব ক্ষেত্রেও, সাধারণত লেখা হত— 'SERAMPORE : Printed at the Mission Press'। উদাহরণস্বরূপ, আলোচিত রামায়ণ ও মহাভারত-এর বিভিন্ন খণ্ড ও সমসাময়িককালে ছাপা তাদের অন্যান্য বাংলা বইয়ের কথা

উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, ছাপাখানার নাম উল্লেখে এই পার্থক্য কেন? বাংলা আখ্যাপত্রগুলিতে 'মিশন প্রেস' বলে উল্লেখ থাকত না কেন? ইংরেজি ও বাংলায় দুই ভিন্ন রীতি অনুসৃত হত কেন? এর সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে অনুমান করা যেতে পারে, 'মিশন প্রেস' নাম দেখলেই হিন্দু বা মুসলমান বাঙালী পাঠক ধর্মীয় সংস্কারবশত বইটি খোলা মন নিয়ে গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারেন— সম্ভবত এইরূপ কোনো আশঙ্কার বশবর্তী হয়েই মিশনারীরা ইংরেজি-অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকের কাছে বইটি 'শ্রীরামপুরে ছাপা' কেবলমাত্র এই পরিচয়টুকু দিয়ে সামান্য ছদ্মবেশের আড়াল নিতে চাইতেন। প্রকাশকের পরিচয় যাতে পাঠকের কাছে বইয়ের বক্তব্য উপস্থাপনে বাধাস্বরূপ হয়ে না দাঁড়ায় সে বিষয়ে মিশনারীরা সম্ভবত সজাগ ছিলেন।

প্রসঙ্গত, মিশন প্রেসের মুদ্রণ বৈশিষ্ট্যের আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। তাদের ছাপা অধিকাংশ বাংলা বইয়েরই দুটি করে আখ্যাপত্র ছাপা হত— একটি বাংলায়, অপরটি ইংরেজিতে। সাধারণত দেখা গেছে, ঐরূপ একই বইয়ের বাংলা আখ্যাপত্রে ও ইংরেজি আখ্যাপত্রে দুটি ভিন্ন ভিন্ন তারিখ বা প্রকাশ সন ছাপা হত। যেমন, হয়ত বইটির বাংলায় প্রকাশ সন লেখা হয়েছে— '১৮০৩', কিন্তু তার ইংরেজি আখ্যাপত্রটিতে লেখা হয়েছে— '1802'। উদাহরণস্বরূপ, 'মহাভারত' ৪র্থ খণ্ডের প্রকাশ সন— বাংলা আখ্যাপত্রে ১৮০৩, কিন্তু তা ইংরেজি আখ্যাপত্রানুসারে, '1802'। সাধারণত দেখা যেত, ইংরেজি তারিখটি আগের, বাংলা তারিখটি তার পরবর্তী বছরের। তবে সব ক্ষেত্রে তা নয়। অনেক বইয়ে বাংলা তারিখটি আগের ও ইংরেজি তারিখ তার পরবর্তী বছরের। যেমন, গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ'-এর বাংলা আখ্যাপত্রে তারিখ ১৮০১, কিন্তু ইংরেজি আখ্যাপত্রে '1802'। আবার এমন দৃষ্টান্তও আছে, যেখানে ইংরেজি ও বাংলা উভয় আখ্যাপত্রে একই তারিখ দেওয়া আছে। যেমন, 'মহাভারত', ৩য় খণ্ড—1802 / ১৮০২। ইংরেজি ও বাংলা আখ্যাপত্রের তারিখে এইরূপ বৈষম্য বা সাদৃশ্যের কোনো নির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করা যায় না। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের বক্তব্য: 'ব্যাপার আর কিছুই নয়। বাঙ্গালা নামপত্র লইয়া মুদ্রণ আরম্ভ হইত, সুতরাং নামপত্রে মুদ্রণারম্ভের তারিখ থাকিত। মুদ্রণ শেষ হইতে বৎসর ঘুরিয়া গেলে শেষে মুদ্রিত ইংরেজি নামপত্রে তখনকার তারিখ দেওয়া হইত।'[১] স্বভাবতই, এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নয়। কারণ এর আগেই আমি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেছি, অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজি তারিখটিই আগের, বাংলা তারিখ তার পরবর্তী বছরের। মূল কথা, যখনই কোনো বইয়ের মুদ্রণারম্ভ ও মুদ্রণ শেষে তার প্রকাশন একই বছরে হত না তখনই এই প্রকাশ সন সংক্রান্ত বৈষম্য দেখা দিত। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে সাধারণত ইংরেজি ও বাংলা composing-এর দায়িত্ব আলাদা আলাদা কর্মীদের উপর ন্যস্ত ছিল।

---

১ সুকুমার সেন, 'বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্য' (৩য় সং), পৃ. ২৮

ইংরেজি আখ্যাপত্রগুলি যখনই আগাম ছেপে ফেলা হত, তখন সেই তারিখটি হত আগের, আর যখন তা সমগ্র গ্রন্থের মুদ্রণ শেষ হবার পর ছাপা হত, তখন সেই তারিখটি হত বাংলায় ছাপা তারিখের পরবর্তী বছরের। আর যে-সব বইয়ের সমগ্র মুদ্রণকার্য একই বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হত, সে-সব ক্ষেত্রে স্বভাবতই তারিখের কোনো বৈষম্য দেখা দিত না। তবে সব ক্ষেত্রে নির্বিবাদে শেষ তারিখটিকেই বইটির প্রকৃত প্রকাশ সন বলা যায় না— এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। উদাহরণস্বরূপ রামরাম বসু রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বইটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এর ইংরেজি আখ্যাপত্রে প্রকাশ সন ১৮০২ লেখা থাকলেও বাংলা আখ্যাপত্রে পাই ১৮০১ এবং এই শেষোক্ত বছরটিই বইটির প্রকৃত প্রকাশ সন। সমস্যা এখানেই। এসব ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যাখ্যা— মিশন প্রেসে মুদ্রণকার্যের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগরক্ষাকারী সজাগ তত্ত্বাবধানেও মাঝে মাঝে ত্রুটি ঘটে যেত এবং তারই ফলে এই প্রকাশ সন সংক্রান্ত বিভ্রাটের সৃষ্টি।

১৮০২-০৩ সালের পর শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে বাংলা বই প্রকাশনের কাজে কিছু শৈথিল্য বা সাময়িক বিরতি দেখা দেয়। একটি বন্ধ্যা বছর পেরিয়ে ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে মিশন প্রেস থেকে আবার দুটি বই প্রকাশিত হতে দেখি : একটি, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচিত 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং', অপরটি, চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস'। এই দুটি বইই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রূপে ব্যবহৃত হত। উভয় গ্রন্থকারই কলেজের বাংলা বিভাগে সহকারী পণ্ডিত ছিলেন।

১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত রাজীবলোচন রচিত পুস্তকের আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ : 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং।—শ্রীযুত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়েন রচিতং।—

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ ধরনীর মাজ
যাহার অধিকারে নবদ্বীপ সমাজ।
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যত করিয়া প্রচার
কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র পরে কহিব বিস্তার।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— ১৮০৫।'

এই সম্পূর্ণ বাংলা গদ্যগ্রন্থটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১২০, আকার ৮"×৫"। দেশীয় পাটনা কাগজে ছাপা, অধুনা তা বিবর্ণ হয়ে গেছে। কলকাতায় ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে এর এক খণ্ড রক্ষিত আছে, কিন্তু তার নামপত্রটি ছেঁড়া। পরবর্তীকালে একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর থেকে এটি একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে। এ ছাড়া ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে এটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এর প্রথম সংস্করণে ব্যবহৃত হরফের উচ্চতা ছিল ৩ মি. মি.। এগুলি ছিল পাতলা 'face'-সম্বলিত ও নয়ন-শোভন ; যুক্তাক্ষরগুলি আধুনিক ধাঁচের।

বইটির প্রতি পূর্ণ পৃষ্ঠায় ১৭টি করে পঙ্‌ক্তি আছে। প্রতি দুটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে অনেকখানি ফাঁক বা space দেওয়া আছে। ফলে সারা পৃষ্ঠাব্যাপী সজ্জিত ও বিন্যস্ত অক্ষরগুলি বা composed matter খুব পরিষ্কার ও নয়ন-স্নিগ্ধকর মনে হয়। যথোচিত বিরাম চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায় না। বিভিন্ন বাক্যের শেষে প্রয়োজনীয় পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়নি। তবে অক্ষর সাজানোর পদ্ধতি নিখুঁত। পঙ্‌ক্তিগুলি সমান্তরাল রেখায় বিন্যস্ত, কোথাও উঁচুনিচু নেই। বইটির প্রতি আট পৃষ্ঠা অন্তর 'ক', 'খ' 'গ' প্রভৃতি বাংলা বর্ণে signature দেওয়া আছে।

রাজীবলোচনের ভাষা অনেকটা প্রাঞ্জল ও বাক্যগঠনরীতি মোটামুটি সরল। রচনার নমুনা হিসাবে এর কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

'রাজা প্রতাপাদিত্যকে ধরিতে ঢাকার বাদসা রাজা মানসিংহকে আজ্ঞা করিলেন তুমি যাইয়া রাজা প্রতপাদিত্যকে ধরিয়া আন তাহাতে রাজা মানসিংহ যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন পশ্চাৎ রাজা মানসিংহ অন্তঃকরনে বিবেচনা করিলেন রাজা প্রতাপাদিত্য বড় দুর্ব্বৃত্ত আমাকে আনিতে সুবা আজ্ঞা করিলেন কিন্তু সেই দেশীয় একজন উপযুক্ত মনুষ্য পাইলে ভাল হয় ইহার পূর্ব্বে ভবানন্দ রায় মজুমদার রাজা মানসিংহের নিকট যাতায়াত করিতেছেন তাহাতেই রাজা মানসিংহ ভবানন্দ রায় মজুমদারকে জ্ঞাত ছিলেন স্মরণ হইল যে ভবানন্দ রায় মজুমদার সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং গৌড় নিবাসী অতএব বঙ্গাধিকারীকে কহিয়া রায় মজুমদারকে লইব ইহাই স্থির করিয়া বঙ্গাধিকারীকে রাজা কহিলেন তোমার চাকর ভবানন্দ রায় মজুমদারকে আমাকে দেহ আমি সঙ্গে লইয়া যাইব।' [পৃ ৯-১০]

১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত অপর গ্রন্থ চণ্ডীচরণ মুন্সী রচিত 'তোতা ইতিহাস'। এটি চণ্ডীচরণের স্বাধীন রচনা নয়, মূল ফারসী 'তুতিনামা' থেকে অনূদিত হিন্দী 'তোতা-কাহানী'র বাংলা অনুবাদ। এতে মোট ৩৫টি কাহিনী আছে। এর আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ : 'তোতা ইতিহাস।— / বাঙ্গালা ভাষাতে / শ্রীচণ্ডীচরণ মুনশীতে রচিত।— / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— / ১৮০৫।—'

প্রথম সংস্করণের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২২৪। পরবর্তীকালে এর অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এর দ্বিতীয় সংস্করণের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২১৪। ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত এর একটি সংস্করণের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৮। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত অপর একটি সংস্করণের (১৮২৫) পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৪০। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে এর একটি পুরনো বিচিত্র সংস্করণ আখ্যাপত্রহীন অবস্থায় পাওয়া যায় ; এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪০ ; প্রতি পৃষ্ঠায় দুটি কলাম, ডানদিকে বাংলা ও বামে ইংরেজি।[১] এ ছাড়া সমকালীন বহু সংকলন গ্রন্থেও তোতা ইতিহাসের নানা

১ সজনীকান্ত দাস, তদেব, পৃ. ২১৪

কাহিনী স্থান লাভ করেছে। যেমন G. C. Haughton কর্তৃক সংকলিত '*Bengali Selections*' (লণ্ডন ১৮২২) গ্রন্থে তোতা ইতিহাসের দশটি কাহিনী ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশিত হয়েছে। এই সব বিভিন্ন সংস্করণ ও সংকলন দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে সেকালে 'তোতা ইতিহাস' খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। হয়ত এর কাহিনীর গুণেই তা সম্ভব হয়েছিল। এর ভাষাও অবশ্য অপেক্ষাকৃত সহজ ও প্রাঞ্জল ছিল। প্রথম সংস্করণ থেকে তার কিছু নমুনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

'বলক নামে এক সহরে চারিজন বন্ধু ধনবান ছিল তাহারদের অত্যন্ত প্রীতি ছিল। কতক কাল পরে সেই চারিজন দুঃখী হইয়া বহুশাস্ত্রজ্ঞ এক পণ্ডিতের নিকটে যাইয়া আপনারদের দশার বিস্তারিত কহিলেন সেই পণ্ডিত তাহারদিগকে অনুগ্রহ করিয়া সেই চারি জনকে চারি মণি দিয়া কহিলেন যে এই চারি মণি তোমরা চারি জনে আপন ২ মস্তকে রাখিয়া প্রস্থান কর। কিন্তু যাহার মস্তক হইতে মণি যে স্থানে পড়িবেক সেই ভূমি খনন করিলে যাহা বাহির হইবেক সে ব্যক্তি তাহাই লইবেক। পণ্ডিত এই রূপে সকলকে বিদায় করিলে তাহারা পণ্ডিতের আজ্ঞানুসারে কিছু দূরে গমন করিতে এক জনের মস্তকের মণি খুলিয়া ভূমিতে পড়িলে ঐ ব্যক্তি সেই স্থান খনন করিয়া তাম্র দেখিয়া আর তিন জনকে কহিল যে আমার প্রাক্তনে তাম্র ছিল তাহা বাহির হইল অতএব আমি এ তাম্রকে স্বর্ণ হইতে উত্তম জানিয়া লইলাম যদি তোমরা চাহ তবে এই স্থানে থাক।…' [পৃ ১০৮]

১৮০৫ সালের পরে বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনে আবার সাময়িক বিরতি। মিশন প্রেস তখন ধর্মপুস্তকাদি মুদ্রণেই অধিকতর ব্যাপৃত দেখা যায়। ১৮০৮ সালে পৌছে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে পুনশ্চ দুটি উল্লেখযোগ্য বাংলা পাঠ্যপুস্তক আত্মপ্রকাশ করে। দুটিই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত— একটি 'হিতোপদেশ' ও অপরটি 'রাজাবলি'। বই দুটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গৃহীত হয়েছিল।

'হিতোপদেশ', প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ : 'পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত।/ মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধি।/ এতশ্চতুষ্টয়াবয়ব বিশিষ্ট হিতোপদেশ।—/ বিষ্ণু শর্ম্মকর্ত্তৃক সংগৃহীত।/ বাঙ্গালা ভাষাতে।/ মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মনা ক্রিয়তে।/ শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—/ ১৮০৮।—' এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৪৩। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯৭।

'হিতোপদেশ' মৃত্যুঞ্জয়ের স্বাধীন রচনা নয়। বিষ্ণুশর্মা রচিত সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্র' থেকে এটি বাংলায় অনূদিত। মূল গ্রন্থের প্রভাবে এখানে মৃত্যুঞ্জয়ের বাংলা বিশেষভাবে সংস্কৃত-ঘেঁষা হয়ে উঠেছে। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে গোলোকনাথ শর্মার অনুবাদ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ 'পঞ্চতন্ত্র' অবলম্বনে দশটিরও বেশি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদই বিদ্বজ্জন সমাজে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। রচনার নমুনা হিসাবে এর কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

'নর্ম্মদাতীরে এক অতিবড় শাল্মলি বৃক্ষ থাকে সেই তরুতে আপন চঞ্চুকরণক নির্ম্মিত নীড়মধ্যে পক্ষিরা বর্ষাতেও সুখেতে বাস করে। অনন্তর নীলবর্ণ ছবির তুল্য মেঘসমূহেতে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইলে পরে স্থুল ধারাতে অতিবড় বৃষ্টি হইল সেই তরুতলেতে বানরেরদিগকে আর্দ্রীভূত শীতার্ত কম্পিত কলেবর দেখিয়া করুনাপ্রযুক্ত পক্ষিরা কহিল ওহে বানরেরা শুন আমারদিগের কর্ত্তৃক চঞ্চুমাত্রেতে আহৃত তৃণকরণক নীড় নির্ম্মিত হইয়াছে পানি পাদাদিবিশিষ্ট তোমরা কেন এই প্রকারে অবসন্ন হইতেছ তাহা শুনিয়া জাতক্রোধ বানরেরা আলোচনা করিল বায়ুরহিত নীড় মধ্যে অবস্থানপ্রযুক্ত সুখী পক্ষিরা আমারদিগকে নিন্দা করিতেছে ভাল বৃষ্টির উপশম হউক। তাহার পর জলবর্ষন নিবৃত্তি হইলে সেই মর্কটেরা বৃক্ষ আরোহন করিয়া সকল বাসা ভাঁগিল তাহারদিগের অণ্ডসকলও নীচেতে ফেলাইয়া দিল। [পৃ. ৮৭-৮৮]

১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয়ের অপর গ্রন্থ 'রাজাবলি'র আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ : 'রাজাবলি।—/ সংগ্রহ ভাষাতে।—/ মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মনা ক্রিয়তে।—/ শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—/ ১৮০৮—' এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৯৫। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এর দ্বিতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ২২১।

'রাজাবলি'র আখ্যাপত্রে 'সংগ্রহ ভাষাতে' দেখে অনুমান করা যেতে পারে এটিও সম্ভবত অনুবাদের আশ্রয়ে রচিত, যার মূল ছিল কোনো সংস্কৃত বা অন্য প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থ। তবে বাংলা সাহিত্যে এর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, এটিই বাংলা ভাষায় রচিত সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস। গদ্যশিল্পী হিসাবে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁর উচ্চ শিল্পাদর্শের প্রসাদগুণসমন্বিত ভাষার নমুনা হিসাবে এর কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত হল :

'যে সিংহাসনে কোটি কোটি লক্ষ স্বর্ণদাতারা বসিতেন সেই সিংহাসনে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার্থী অনায়াসে বসিল। যে সিংহাসনে বিবিধপ্রকার রত্নালঙ্কারধারিরা বসিতেন সে সিংহাসনে ভস্মবিভূষিতসর্ব্বাঙ্গ কুযোগী বসিল। যে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারি রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগম্বর রাজা হইল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের সম্মুখে অঞ্জলীকৃত হস্তদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া লোকেরা দাঁড়াইয়া থাকিত সেই সিংহাসনের রাজা স্বয়ং উর্দ্ধবাহু হইল।' [পৃ ১৩৪]

বক্ষ্যমাণ 'বিকাশ' পর্বে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত আরো দুটি বিশিষ্ট গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত উইলিয়ম কেরী সম্পাদিত 'ইতিহাস-মালা' ও অপরটি ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে হরপ্রসাদ রায় রচিত 'পুরুষপরীক্ষা'। হরপ্রসাদ রায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অস্থায়ী পণ্ডিত ছিলেন এবং স্বয়ং কেরী বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই আশা করা যায়, দুটি পুস্তকই কলেজের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত

ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, কেরীর 'ইতিহাসমালা'র সন্ধান কলেজের পুস্তক তালিকায় [কলেজের Proceedings বা কার্য-বিবরণীতে মাঝে মাঝে এইরূপ কলেজ কর্তৃক মুদ্রিত, ক্রীত বা সংগৃহীত পুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হত] বা রোবাকের গ্রন্থে ['*Annals of the College of Fort William*'] প্রকাশিত ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকায় পাওয়া যায় না। লঙ-এর পুস্তক তালিকায়ও এর নামোল্লেখ নেই। এমন-কি দশটি *Serampore Memoirs*-এ মিশন প্রেসে মুদ্রিত যে সব পুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হয় সেখানেও এর স্থান নেই। এর সম্ভাব্য কারণ হিসাবে মনে হয়, ১৮১২ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের শুরুতেই 'ইতিহাসমালা' প্রথম প্রকাশিত হয়, কিন্তু ঐ বছরের ১১ মার্চ শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয় তাতে বইটির অধিকাংশ কপিই ভস্মীভূত হয়ে যায়। ফলত, 'ইতিহাসমালা' আর কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারেনি। কিন্তু সুখের কথা সর্বগ্রাসী আগুনের হাত এড়িয়ে এর কয়েক খণ্ড আজও অক্ষত রয়ে গেছে। কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে এর একটি খণ্ড রক্ষিত আছে।

বইটির আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ : 'ইতিহাসমালা। OR / A COLLECTION/ OF/STORIES/IN/BENGALEE LANGUAGE./ COLLECTED FROM VARIOUS SOURCES./By W. CAREY, D. D./ Teacher of Sungskrit, Bengalee and Mahratta Languages,/in the College of Fort William./ SERAMPORE :/ Printed at the Mission Press/1812.' অক্টেভো, ৮" × ৪½" আকারের এই বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২০। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত ও অনূদিত নানা বিষয়ের ১৫০টি বাংলা গল্প (যেগুলি অবশ্য কোনোমতেই ইতিহাসের বিষয় নয়) এই বইয়ে সংকলিত হয়েছে। কেরী সম্ভবত গল্পগুলির সংকলক বা সম্পাদক মাত্র, অনুবাদক নন। সুতরাং 'ইতিহাসমালা'র ভাষা কেরীর নিজস্ব রচনা বলে মনে হয় না। এর ভাষা যথেষ্ট উন্নত, বিশুদ্ধ ও সাবলীল। মিশন প্রেসে বাংলা গদ্যগ্রন্থ মুদ্রণের সূত্রপাত থেকে বারো বছরের মধ্যে বাংলা গদ্যের এই উন্নতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তবে এখানেও যথোচিত পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার লক্ষিত হয় না। ভাষার নমুনা হিসাবে এর কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

'১৩ ত্রয়োদশ কথা।—

গৌড় দেশে সঞ্জীবক নগরের পথিমধ্যে এক ব্যাঘ্র অনেক কালাবধি বদ্ধ আছে সেই পথেতে এক জন বৃদ্ধ পথিক যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া সে ব্যাঘ্র কহিল হে পথিক তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ এবং ধার্ম্মিক আর তোমাকে পরোপকারি দেখিতেছি আমি এই পিঞ্জরে অনেক দিবসাবধি বদ্ধ হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত হইতেছি অতএব তুমি সদয় হইয়া এই পিঞ্জর হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া রক্ষা কর।' [পৃ ২৯]

'ইতিহাসমালা'র বহুল প্রচারিত কৌতুকাবহ ছড়া জাতীয় শেষ গল্পটি থেকেও এখানে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে :

…'মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা চিলে নিলে ছু গণ্ডা বাকী রহিল ষোল তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল তবে থাকিল আট ছুইটায় কিনিলাম ছুই আটি বাট তবে থাকিল ছয় প্রতিবাসিকে চারিটা দিতে হয় তবে থাকিল ছুই তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই তবে থাকিল এক ঐ পাত পানে চাহিয়া দেখ এগন হইস যদি মানুষের পো তবে কাঁটাখান খাইয়া মাছখান খো আমি যেই মেয়ে তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে'…

বারো বৎসরের ব্যবধানে মিশন প্রেসের মুদ্রণের মানও যে উন্নত হয়েছে এই গ্রন্থ তার সাক্ষ্য বহন করে। মিশন প্রেসের নিজস্ব বিশিষ্ট হরফের পরিচয় এতেও পাওয়া যায়। যেমন: 'উ', 'ধ', 'ট', 'ক', 'অ', 'চ' বা আধুনিক ধাঁচের যুক্তাক্ষর— 'ব্রাহ্মণ', 'কর্ম্মোপযুক্ত', 'খাস্ত সামগ্রী' ইত্যাদি। হরফের উচ্চতা ৩ মি.মি.। এর মুদ্রিত পৃষ্ঠায় প্রতিটি পঙ্‌ক্তি ফাঁক ফাঁক করে সাজানো। ছাপা পরিচ্ছন্ন। প্রতি আট পৃষ্ঠা অন্তর 'ক', 'খ', 'গC',… 'ঙE', 'ছG', 'নT', 'পU', প্রভৃতি signature ব্যবহৃত হয়েছে। দেশী পাটনাই কাগজে বইটি ছাপা হয়, কালের প্রভাবে অধুনা তা হলদেটে হয়ে গেছে।

১৮১৫ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি প্রকাশিত 'পুরুষপরীক্ষা' বইয়ের আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ: 'শ্রীযুক্ত বিদ্যাপতি পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংস্কৃত বাক্যে সংগৃহীতা।/পুরুষ পরীক্ষা।—/ শ্রীহরপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে রচিতা।—/শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—/১৮১৫।'

এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৭৩। 'পুরুষপরীক্ষা' বহুল প্রচারিত পুস্তক। পরবর্তীকালে এর একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত একটি সংস্করণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত এর একটি সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪২। পরবর্তীকালে ১২৫৮ সালে (১৮৫১ খ্রীঃ) কলকাতা 'জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে যন্ত্রিত' এর অপর একটি সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৮৬। [লঙ লিখেছেন, বিশপ টার্নারের (Turner) প্রস্তাবানুযায়ী মহারাজ কালীকৃষ্ণ এর একটি ইংরেজি অনুবাদ ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করেন।]

বিদ্যাপতি রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের এই বঙ্গানুবাদে পুরুষের বিভিন্ন লক্ষণ-বিবরণ ও লক্ষণ-নির্দেশক ৪৪টি গল্প আছে। এর ভাষা কিছুটা সংস্কৃতানুসারী। ভাষার নিদর্শন স্বরূপ এর কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল:

'ইতি নিস্পৃহকথা।

জীবের আশাত্যাগ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয় অর্থাৎ মোক্ষসাধক জ্ঞান হয় কিন্তু কেবল উত্তম কর্ম্ম করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না যে পর্য্যন্ত মনেতে চাঞ্চল্য থাকে ও অর্থাভিলাষ থাকে এবং যাবৎ কন্দর্পের আবির্ভাব থাকে আর যাবৎ সকল জীবেতে সমজ্ঞান না হয় ও যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন-রহিত মিত্রতা না হয় তাবৎ পরমেশ্বর নিবিড় বনের ন্যায় থাকেন অর্থাৎ জীবের জ্ঞানের অগোচর থাকেন যখন বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি হয় তখন তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই তত্ত্বজ্ঞানেতে ঈশ্বরদর্শন হইয়া জীবের মুক্তি হয়।'

বক্ষ্যমাণ বিকাশ পর্বে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রকাশিত এইসব বিভিন্ন বাংলা বই— ধর্ম-পুস্তক বা বাইবেলের বাংলা অনুবাদ, খ্রীস্টধর্ম সংক্রান্ত নানা প্রচার-পুস্তিকা, রামায়ণ মহাভারত এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে বা প্রয়োজনে রচিত বিভিন্ন বাংলা পাঠ্য-পুস্তকাদি সম্বন্ধে আলোচনা মোটামুটি এখানেই শেষ করা যেতে পারে। বাংলা মুদ্রণের বিকাশ পর্বে শ্রীরামপুর মিশনের মতো একটিমাত্র কেন্দ্রে বাংলা মুদ্রণের যে অবিশ্বাস্য বিপুল কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই পর্যন্ত আলোচনায় তার ঐতিহাসিক পটভূমিকা সহ বিস্তৃত পরিচয় দানের চেষ্টা করা হয়েছে। মিশন প্রেসের প্রচেষ্টায় বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডারে যে ফসল সংগৃহীত হয়েছিল আমি তার শ্রেণীবিন্যাস ও সংখ্যা নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাহিত্য-মূল্য ও মুদ্রণ বৈশিষ্ট্য বিচারের চেষ্টাও করেছি। বাংলাদেশে মুদ্রণেতিহাসের আদিযুগে মিশন প্রেসের এই একক প্রয়াস, কৃতিত্ব ও সাফল্য নিঃসন্দেহে আমাদের সশ্রদ্ধ বিস্ময় উদ্রেক করে।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের মুদ্রণ সরঞ্জাম

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রকাশিত বাংলা বইয়ের এই আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের ঐ বৃহৎ মুদ্রণ-কর্মে যেসব মুদ্রাযন্ত্র, কাগজ, কালি, হরফ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছিল সে সম্বন্ধে বা যাঁরা এই মুদ্রণকর্মে প্রধান উদ্যোক্তা বা কর্মী ছিলেন তাঁদের বিষয়েও আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

মুদ্রাযন্ত্র ও মুদ্রণালয়

এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, উড্‌নীর বদান্যতায় প্রাপ্ত একটিমাত্র কাঠের মুদ্রাযন্ত্র সম্বল করে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস যাত্রা শুরু করেছিল। নিউ টেস্টামেণ্টের বাংলা অনুবাদ প্রথম ঐ কাঠের মুদ্রাযন্ত্রেই ছাপা হয়।

এর পরে মিশন প্রেসের কাজের চাপ ও পরিধি ক্রমশই বাড়তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তার ছাপাখানার আয়োজনও দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। একের পর এক নতুন মুদ্রাযন্ত্র সংগৃহীত হয়েছে। সম্ভবত প্রথম বছর অর্থাৎ ১৮০০ সাল শেষ হবার আগেই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে একাধিক মুদ্রাযন্ত্র সংগৃহীত হয়। কারণ মিশনারীদের লেখা তখনকার কাজের বিবরণী থেকে জানা যায় যে ঐ সময় মিশন প্রেসে নিযুক্ত দেশীয় কর্মচারীদের মধ্যে চারজন ছিলেন মুদ্রাযন্ত্র চালক : '...We kept four pressmen constantly employed.'[১] [অবশ্য অপর এক বিবরণীতে জানা যায়, প্রথম বছর মিশন প্রেসে মুদ্রাযন্ত্র চালকের সংখ্যা ছিল পাঁচ : '...have five pressmen, one folder, and one binder' : *Ward's*

---

১ **George Smith, *op. cit.*, p. 187.**

Journal, August 1, 1800][1] এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে মিশনারীরা তাঁদের ছাপাখানার শক্তিবৃদ্ধির জন্ম সর্বদাই তৎপর ছিলেন। অল্প কয়েক বছরে তাঁদের ছাপাখানায় মুদ্রাযন্ত্রের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দের ১১ই মার্চ শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তাতে বহু মূল্যবান বই, পাণ্ডুলিপি, কাগজ, হরফ ও ছাপাখানার অন্যান্য সরঞ্জাম ভস্মীভূত হয়ে যায়। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, কিছু কিছু মূল্যবান জিনিস আশ্চর্যজনকভাবে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাও পায়। যেমন মুদ্রাযন্ত্র, হরফ তৈরির পাঞ্চ, ছাঁচ, ইত্যাদি। মিশনারীদের লেখা ঐ অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ঐ সময় মিশন প্রেসে মোট যে পাঁচটি মুদ্রাযন্ত্র ছিল সেগুলি সম্পূর্ণ অক্ষত থেকে যায়: 'The five presses too were untouched.'[2] অবশ্য ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকার (১৯ মার্চ, ১৮১২) প্রতিবেদনে জানা যায়, অগ্নিকাণ্ডের সময় মিশন প্রেসে আটটি মুদ্রাযন্ত্র ছিল এবং সেগুলি সবই আগুনের হাত থেকে বেঁচে যায়।[3]

অগ্নিকাণ্ডের অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই মিশনারীরা ছাপাখানার ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে নতুন উৎসাহে আবার ছাপার কাজ শুরু করে দেন। তখন ছাপাখানার শক্তি পূর্বের চেয়েও বৃদ্ধি পায়। অগ্নিকাণ্ডের তেরো মাস পরে (১৪ এপ্রিল, ১৮১৩) ডঃ রাইল্যাণ্ডকে লেখা কেরীর একটি চিঠিতে জানা যায়, মিশন প্রেসে তখন আটটি মুদ্রাযন্ত্র অবিরাম পূর্ণোদ্যমে কাজ করছে। শুধু তাই নয়, তাঁরা শীঘ্রই আরো দুটি নতুন মুদ্রাযন্ত্র বসাতে চলেছেন। ['Carey informed Ryland in 1813, that "We are going to set up two more presses" in the priting establishment which already had "eight presses constantly at work".' (B. M. S., typed : Carey to Ryland, April 14, 1813.[4]

ছাপাখানার মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা বাড়াবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে কেরী যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তা অবিলম্বে কার্যকরী হয়। ফলে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রাযন্ত্রের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় দশ। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে মিশনারীদের প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই তথ্যটি সমর্থিত হয়: 'The premises occupied··· a printing-office, in which ten presses are constantly employed ;'[5] সুতরাং দেখা যায়, বক্ষ্যমাণ বিকাশ পর্বেই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা এক থেকে বেড়ে দাঁড়ায় দশ। বছরে

১ *Ibid.*, p. 92.

২ *Ibid*, p. 198.

৩ H. D. Sandeman, '*Selections from Calcutta Gazettes*', Vol. IV, pp. 265-66.

৪ K. P. Sen Gupta, *op. cit.*, p. 88.

৫ '*Brief View of the Baptist Missions and Translations*', London, 1815 : (Serampore College Library : no. BR 56)

বছরে এই সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে থাকে। যেমন, ১৮২০ সালে তাদের মুদ্রাযন্ত্রের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭। ১৮২০ সালে সংকলিত শ্রীরামপুর মিশনারীদের *Seventh Memoir*-এ এর উল্লেখ পাওয়া যায় : 'The labour of twenty years has also formed a Printing establishment comprising Seventeen Presses, and Workmen, of every description ;'[১] বাংলাদেশে মুদ্রণপর্বের আদিযুগে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানে মুদ্রাযন্ত্রের এই ক্রমবর্ধমান সংখ্যা নিঃসন্দেহে তাদের মুদ্রণপ্রচেষ্টার দ্রুত অগ্রগতির পরিচয় বহন করে।

ছাপাখানা ঘরের বর্ণনা

শ্রীরামপুর মিশন পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ছাপাখানাও চালু হয়। এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের প্রথম ছাপাখানার কাজ শুরু হয় তাঁদের প্রথম বসত বাড়ির একাংশে লাগোয়া দুটি ঘরের মধ্যে। পরের বছর ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে অক্টোবর মাসে তাঁদের ঐ বসত বাড়ির পাশের সুন্দর বড়ো বাড়িটিতে ছাপাখানা ও দপ্তরীখানা স্থানান্তরিত হয়।[২] অপর এক সূত্রে জানা যায় ১৮০৫ সালে একশ ফুট দীর্ঘ এবং পঁয়তাল্লিশ ফুট বিস্তৃত নিকটবর্তী একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকায় ছাপাখানাটি স্থানান্তরিত হয়।[৩]

১৮১২ সালের ১১ই মার্চ মিশন প্রেসে যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে তার যে সব বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা পাওয়া যায়, তা থেকেও ঐ সময়কার শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানা সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা পাওয়া সম্ভব। ছাপাখানা বাড়িটি ছিল ২০০ ফুট লম্বা। এর লম্বা অফিস ঘরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত প্রথম ঘর দুটি ছিল সেখানকার কর্মাধ্যক্ষ ওয়ার্ডের অফিস। দক্ষিণ প্রান্তের ঘরগুলিতে কাগজ মজুত থাকত, তা ছাড়া ছাপা সীটগুলোও সেখানে জমা করা হত। লম্বা আকারের ছাপাখানায় ২৪টি জানলা ছিল। অফিস ঘরের পাশে যে হরফ-সাজানোর ঘর (composing বা 'type room') ছিল সেটিও বেশ লম্বা। একটি আলাদা লম্বাটে ধাঁচের ঘরে মুদ্রাযন্ত্রগুলি বসানো ছিল। অগ্নিকাণ্ডের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ঐগুলিকে বসানো হয়েছিল। তাই তা আগুনের হাত থেকে বেঁচেছিল। কাগজকলটি ছিল ছাপাখানা বাড়ির কাছেই।

মার্চের সন্ধ্যায় ছাপাখানা বাড়িটি আগুনে প্রায় সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যাবার পর মিশনারীরা পরের দিন থেকেই যখন আবার তা পুনর্গঠনের কাজে লাগেন, তখন ওয়ার্ডের অফিসের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত পামার এণ্ড কোম্পানীর সদ্য ছেড়ে দেওয়া খালি বাড়িটিতে

---

১ K. S. Diehl, '*Early Indian Imprints*', Introduction.

২ J. C. Marshman, *op. cit.*, Vol. I, p. 141. '*Periodical Accounts*' (II), p. 228 : Letter from Carey, Marshman & Ward to B. M. S., dt. 18 Dec, 1801.

৩ মুহম্মদ সিদ্দিক খান, 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা', পৃ. ১০১

ছাপাখানা সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপরে মিশনারীদের সমবেত অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই ছাপাখানাটিকে আবার সম্পূর্ণ নতুন রূপে গড়ে তোলা হয় এবং ধীরে ধীরে তার কলেবর ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ছাপাখানার পরিচালক ও কর্মীবৃন্দ

শ্রীরামপুরে ছাপাখানার যত কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তার সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থাও গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। সব মিলিয়ে সেদিনকার শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ছিল একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান। এটি ছিল একাধারে মুদ্রণ ও প্রকাশন সংস্থা। শুধু তাই নয়, সব দিক দিয়ে এটিকে স্বয়ংনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মিশনারীরা অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব হরফ ঢালাইখানা, কাগজকল, কালি তৈরির ব্যবস্থা, ছাপাখানা, দপ্তরী-বিভাগ প্রভৃতি সবই গড়ে তুলেছিলেন। এমন-কি গ্রন্থরচনা বা অনুবাদের জন্য বিরাট একদল দেশীয় পণ্ডিতকেও তাঁরা নিযুক্ত করেছিলেন। এই সব বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সেখানে নির্দিষ্ট কর্মী ও কর্মবিভাগ বা শ্রমবণ্টন ব্যবস্থা চালু ছিল। আর সবার উপর শক্তহাতে পরিচালকের হাল ধরে ছিলেন দক্ষ মুদ্রাকর উইলিয়ম ওয়ার্ড।

উইলিয়ম ওয়ার্ড

উইলিয়ম ওয়ার্ড (William Ward) ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর চারজনের একটি ছোটো মিশনারী দলের সঙ্গে প্রথম শ্রীরামপুরের মাটিতে পদার্পণ করেন। ৩০ বছরের যুবক ওয়ার্ড সুদূর ইংলণ্ড থেকে সেদিন বাংলাদেশে এসেছিলেন কেরীর সঙ্গে মিশনারী কাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন দক্ষ মুদ্রাকর ও সাংবাদিক হিসাবে তাঁর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য : তা সবই নিঃশেষে নিয়োজিত করেছিলেন শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের গোড়াপত্তন ও শ্রীবৃদ্ধির কাজে। মিশন প্রেসের প্রথম দিন থেকে শুরু করে দীর্ঘ ২৩ বছর তিনি এর বহুমুখী মুদ্রণকর্মধারাকে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করার পর ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের ৭ই মার্চ মৃত্যুমুখে পতিত হন। শ্রীরামপুর মিশনের বিখ্যাত ত্রয়ীর তিনি ছিলেন অন্যতম। জশুয়া মার্শম্যান যেমন মূলত শিক্ষাবিস্তার ও মিশনারী প্রচারকার্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন এবং উইলিয়ম কেরী ভাষাচর্চা, বাইবেল অনুবাদ, গ্রন্থরচনা ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতা সহ মিশনের সর্বময় কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, উইলিয়ম ওয়ার্ড তেমনি প্রধানত মুদ্রণ ও প্রকাশনার গুরু দায়িত্ব দক্ষ হাতে গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলাদেশে পদার্পণের অনেক আগে, ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে বিলেতে ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটিতে যোগদানেরও আগে, উইলিয়ম ওয়ার্ড ইংলণ্ডে একজন দক্ষ মুদ্রাকর ও গণতন্ত্রপ্রিয় বিদ্রোহী সাংবাদিক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। বিচিত্রমুখী কর্মচাঞ্চল্যে তাঁর প্রথম যৌবন উদ্বেলিত ছিল। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২০শে অক্টোবর ইংলণ্ডের ডার্বিতে

উইলিয়ম ওয়ার্ডের জন্ম। পিতা জন ওয়ার্ড ছিলেন ছুতোর ও রাজমিস্ত্রী। শৈশবাবস্থায় পিতার মৃত্যু হওয়ায় মাতার তত্ত্বাবধানেই উইলিয়মের পড়াশুনা চলতে থাকে। বাল্যকালে ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি ছিলেন পড়াশুনায় মনোযোগী, শান্ত ও চিন্তাশীল। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হতে তিনি ডার্বি শহরের এক বিখ্যাত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কর্মাধ্যক্ষ ড্রুরীর (Mr. Drury) অধীনে শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ঐ প্রেসে প্রুফ-সংশোধনকারীর পদে উন্নীত হন। চিন্তা ও বুদ্ধির প্রাখর্যের সঙ্গে তিনি দ্রুত অর্জন করলেন বাগ্মীতা ও ভাষার উপর অদ্ভুত দখল। তাই তাঁর শিক্ষানবীশের কাল শেষ হতেই কর্তৃপক্ষ তাঁকে '*Derby Mercury*' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব দেন। তাঁর অধ্যবসায়ের গুণে ও প্রতিভার স্পর্শে পত্রিকাটি শীঘ্রই খুব জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত ওয়ার্ড সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য এবং গণতন্ত্রের পূজারী হয়ে ওঠেন এবং দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেই আদর্শ প্রচারে উদ্যোগী হন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় যে ওয়ার্ড ছিলেন 'a fearless, somewhat democratic man, fond of work, slightly opinionated, (and) with a capacity for organisation.' [J. C. Marshman, '*Life and Times of Carey, Marshman and Ward*,' p. 444.][১]
প্রচলিত রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি তিনি প্রায়ই তুলে ধরতেন। ফলে তিনি রাজনৈতিক দল ও বিতণ্ডায় জড়িত হয়ে পড়েন, এমন-কি রাজরোষে পড়ে অভিযুক্তও হন। পরে অবশ্য তা থেকে অব্যাহতি পান। একবার তিনি চার্চে বিনানুমতিতে প্রবেশ করে গণতন্ত্রবাদী বক্তাদের নিয়ে রাজনৈতিক বক্তৃতার আয়োজন করেন। ফলে বিপুল বিক্ষোভ দেখা দেয়, জনতার আক্রমণে চার্চের দরজা-জানালা আসবাবপত্র চূর্ণ হয়, সভাও পণ্ড হয়ে যায়। এর কিছুকাল পরে ওয়ার্ড ডার্বি থেকে স্টাফোর্ডে চলে এসে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে আবার সেখান থেকে চলে যান হাল (Hull) শহরে—'*Hull Advertiser*' পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিয়ে। এইভাবে তিনি ছবছর কাল সম্পাদনার কাজে কাটান। কিন্তু তারপরেই আসে তাঁর নাটকীয় পরিবর্তন। দীক্ষা নিয়ে মিশনারী কাজে আত্মোৎসর্গ করেন। সাংবাদিকতা ও রাজনীতিচর্চা পরিত্যাগ করে আর্তের সেবা ও খ্রীস্টের বাণী প্রচারে ব্রতী হন। মুদ্রাকর ও সাংবাদিক হিসাবে এতদিনের জ্ঞান-অভিজ্ঞতাকে তিনি এবার ধর্মপুস্তকাদি মুদ্রণ ও প্রচারের কাজে নিয়োজিত করতে মনস্থ করেন। ঠিক এমনই একজন লোকের সন্ধানে কেরী তখন বাংলাদেশে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। ওয়ার্ড আর কালবিলম্ব না করে শ্রীরামপুর অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে পৌছে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের জয়যাত্রার ছন্দে মিশনারী কার্যে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ দক্ষ মুদ্রাকর ও সাংবাদিক ওয়ার্ডের জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। এই সময়

---

১ E. D. Potts, '*British Baptist Missionaries in India*', p. 21.

ফুলারকে লেখা একটি চিঠিতে কেরী সহকর্মী ওয়ার্ড সম্বন্ধে তাঁর প্রাথমিক ধারণার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন : 'Brother Ward is the very man we wanted ; he enters into the work with his whole soul'[১]

একবার নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সুন্দরবন পরিভ্রমণকালে এও ফুলারকে লেখা একটি চিঠিতে ওয়ার্ড নিজেই লিখেছেন : …'The whole business of the printing office, containing about 30 workmen, I have to manage…' [*B. M. S. MSS.*, Ward to Andrew Fuller, 'Sunderbans', 7 Oct. 1805.][২] এই চিঠিতে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের যে সময়ের কথা ওয়ার্ড লিখেছেন তা ছিল ১৮০৫ সাল। ছাপাখানায় তখন ৩০ জন কর্মী কাজ করছেন, সবাই দেশীয়, এবং সেখানকার সর্বময় কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব ওয়ার্ড-এর।

ছাপাখানার দেশীয় কর্মী

ছাপাখানার শুরুতে অবশ্য কর্মীসংখ্যা কম ছিল। যেমন, ১৮০০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে, যখন বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট ছাপা পুরোদমে চলেছে, সেই সময় মূল ছাপাখানায় দেশীয় কর্মী ছিলেন ৭ জন। অক্ষর-সাজানোর কাজ ওয়ার্ড, ফেলিক্স কেরী ও ব্রান্সডন নিজেরাই করতেন। মিশন প্রেসের যাত্রারম্ভে এই তিনজন মিশনারীই প্রত্যক্ষভাবে ছাপাখানার কাজে যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়াও অবশ্য ছিলেন উলিয়ম কেরী নিজে। মূলত প্রুফ সংশোধনের কাজ তিনি করতেন। ফেলিক্স কেরীই ছিলেন ওয়ার্ডের প্রধানতম সহকারী। মুদ্রণের সর্ববিধ কাজে তিনি ক্রমশই পারদর্শী হয়ে ওঠেন। পরম আত্মতৃপ্তির সঙ্গে ওয়ার্ড তাই একবার তাঁর জনৈক বন্ধুর কাছে লিখেছিলেন : 'I am happy to think that, if I die, Felix Carey will be able to print.'[৩] ওয়ার্ডের এই বিশ্বাস পরবর্তী কালে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। দক্ষ মুদ্রাকর হিসাবে ফেলিক্সের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। মাঝে অবশ্য তিনি ব্রহ্মদেশে মিশনারী ও রাজকর্মচারী হিসাবে কিছুকাল কাটান। তবে তিনি পুনশ্চ শ্রীরামপুরে ফিরে আসেন। বাংলাভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থরচনা ও মুদ্রণের কাজে তখন ফেলিক্স উদ্যোগী হন। রামকমল সেনের অভিধান মুদ্রণের দায়িত্বও সেই সময় তিনি নেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঐ সময়ে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। জন ক্লার্ক মার্শম্যান তখন ওয়ার্ডের সহযোগী হন।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে এইসব মিশনারী পরিচালকবৃন্দ ছাড়া আর সবাই ছিলেন দেশীয় কর্মচারী। এবং যতই প্রেসের কলেবর বেড়েছে, তাঁদের সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

১ **George Smith, *op. cit.*, p. 92.**

২ **E. D. Potts, *op. cit.*, p. 22**

৩ **J. C. Marshman, *op. cit.*, Vol. I, p. 141.**

মুদ্রণ বিস্তার তাঁদের জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ নিঃসন্দেহে মিশনারী পরিচালকবৃন্দের কাছেই পাওয়া। তথাপি প্রেসের সামগ্রিক সাংগঠনিক চেহারায় ও সেখানকার মুদ্রণ ও প্রকাশনার বৃহৎ কর্মকাণ্ডে দেশীয় কর্মীবৃন্দের ভূমিকা উপেক্ষা করা চলে না। যেমন, চীনা হরফ তৈরি ও মুদ্রণের কাজে মিশন প্রেসে প্রথমে বারোজন বাঙালী কর্মীর সাহায্য গ্রহণ করা হয়। ঐ বাঙালী কর্মীরা কাপড়ের উপর সুন্দর ও জটিল নক্সা কাটার কাজে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় যে নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন তাই চীনা ভাষায় ব্লক তৈরির কাজে প্রযুক্ত হয়। [*B. M. S. MSS.*, MSS. copy of 'Second Memoir Respecting Translations,' Serampore, 1809][১] পরে অবশ্য ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে সঙ্কালনযোগ্য চীনা হরফ তৈরি শুরু হয় ও পরের বছর লসনের আগমনে তা আরো উন্নত হয়। চীনা ভাষায় বাইবেল মুদ্রণের বিষয়ে আরেকটি প্রতিবেদনে জানা যায় : 'In translating, preparing the types, and printing the Chinese Scriptures, sixteen men are employed'.[২] কিন্তু এই সব দেশীয় কর্মীদের যথোচিত স্বীকৃতি ও তাঁদের পরিচিতি মিশনারীদের লেখায় বিশেষ পাওয়া যায় না। শুধু ছাপাখানার কাজেই বা কেন, আনুষঙ্গিক প্রকাশনার ব্যাপারে জড়িত রচনা ও অনুবাদের কাজেও দেশীয় পণ্ডিতদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছাড়া শ্রীরামপুর মিশনেই একসময় ৩০ জন পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন।[৩] প্রধানত অনুবাদ ও প্রুফ সংশোধনের গুরু দায়িত্ব তাঁরা পালন করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁদের পরিচিতি অজ্ঞাত রয়ে গেছে। কেরী তাঁর বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনুবাদের কাজে কলেজের দেশীয় পণ্ডিতদের সাহায্য নিতেন, এমন-কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুবাদই দেশীয় পণ্ডিতরা করে দিতেন, কেরী তারপর তা মূলের সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন করতেন। যেমন, বাইবেলের মারাঠী বা ওড়িয়া অনুবাদ মূলত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মারাঠী ও ওড়িয়া পণ্ডিতদের দ্বারাই করা, পরে তা কেরী কর্তৃক সংশোধিত হয়েছে। কলেজের সহকারী প্রভোস্ট ক্লডিয়াস বুকাননের লেখায় এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়।[৪] কিন্তু সহ-অনুবাদক হিসাবে দেশীয় পণ্ডিতদের নাম কেরীর কোনো লেখায় স্বীকৃতি পায়নি। E. D. Potts তাঁর লেখায় প্রসঙ্গটির সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন : 'Carey and his fellows made free use of Indian Pandits who, at a minimum, should have been publicly credited for being co-translators. They rarely were....'[৫]

---

১ E. D. Potts, *op. cit*, p. 110.

২ '*Brief View of the Baptist Missions and Translations*', London, 1815 : শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে রক্ষিত।

৩ W. Ward, '*Farewell Letters*', p. 18.

৪ Claudius Buchanon, '*The College of Fort William in Bengal*', London, 1805 : p. 230.

৫ E. D. Potts, *op. cit.*, p. 82.

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের যে সব বিভিন্ন বিভাগ ছিল, যেমন, মুদ্রাযন্ত্র সহ ছাপাখানা ঘর (machine room), হরফ সাজানোর ঘর (composing room), অনুবাদক ও প্রুফ সংশোধকদের ঘর, ছাপা কাগজ সাজিয়ে রাখার ঘর, বাঁধাইয়ের জন্য দপ্তরীখানা, কাগজের গুদাম, হরফ ঢালাইখানা, কালি তৈরির কারখানা, কাগজকল প্রভৃতি সব জায়গায় আলাদা আলাদা কর্মী নিযুক্ত ছিল। এইরূপ নির্দিষ্ট কর্ম-বন্টন পরিকল্পনার সাহায্যে মিশন প্রেসের বিরাট কাজ চালিত হত। ১৮১২ সালে মিশন প্রেসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের অল্প কিছুদিন আগে লেখা একটি চিঠিতে ওয়ার্ড এর বর্ণনা দেন এইভাবে : 'As you enter you see your cousin in a small room, dressed in a white jacket reading or writing, and looking over the office, which is more than 170ft long. There you find Indians translating the scriptures into the different tongues, or correcting proof sheets. You observe, laid out in cases, types in Arabic, Persian, Nagari, Telegu, Punjabi, Bengali, Marhatti, Chinese, Oriya, Burmese, Kanarese, Greek, Hebrew and English. Hindus, Musulmans and Christian Indians are busy, composing, correcting, distributing. Next are four men throwing off the Scripture sheets in the different languages, others, folding the sheets and delivering them to the large store-room and six Musulmans do the binding. Beyond the office are varied type-casters, besides a group of men making ink ; and in a spacious open walled round place, our paper mill for we manufacture our own paper'.[১] এই বর্ণনা থেকে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, ঐ সময়েও প্রেসে বাঁধাইয়ের কাজ করতেন ৬ জন মুসলমান কর্মী। বাংলাদেশে দপ্তরীখানার কাজে মুসলমান কর্মীদের আধিপত্যের ধারা বোধ করি সেই আদি যুগ থেকেই শুরু, আধুনিককাল পর্যন্ত তা সমানে চলে এসেছে।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে নিযুক্ত কর্মীদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে একজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে এটি একটি বিশেষ স্মরণীয় নাম। মিশন প্রেসের সঙ্গে যুক্ত আর দুজন স্মরণীয় বাঙালী পঞ্চানন কর্মকার ও মনোহর কর্মকার : এঁদের কথা পূর্বেই কিছু উল্লিখিত হয়েছে, পরে আরো আলোচনার সুযোগ রয়েছে। আপাতত স্মরণ করা যেতে পারে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের কথা, যিনি

১ Pearce Carey, *op. cit.*, p. 283.

মিশন প্রেস পত্তনের শুরু থেকেই তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন একজন কম্পোজিটর হিসাবে। দুঃখের কথা, মিশনারী নথিপত্রে তাঁর নামের কোনো স্পষ্ট উল্লেখ পাই না। বিভিন্ন পরোক্ষ উক্তি থেকে তার পরিচয় আমাদের উদ্ধার করতে হয়েছে।

গঙ্গাকিশোর আমাদের কাছে প্রায় বিস্মৃত ব্যক্তি। অথচ তিনি এমন একজন বাঙালী, হয়ত বা প্রথম বাঙালী, যিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মুদ্রণকার্যে অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য অর্জন করে তার দ্বারা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে জীবিকার্জনে ব্রতী হন। বলা যেতে পারে, তিনি প্রথম বাঙালী মুদ্রণ ব্যবসায়ী, মুদ্রাকর-প্রকাশক-পুস্তকব্যবসায়ী, ও গ্রন্থকার-সাংবাদিক। এতগুলি অভিধায় যাঁকে বিভূষিত করা চলে সেই কৃতী বঙ্গসন্তান আরো এক বিষয়ে স্মরণীয়। তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত, স্বাধীনচেতা, উদ্যোগী পুরুষ। ১৮০০ সালের কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিনে একজন শিক্ষিত বাঙালী ব্রাহ্মণের পক্ষে বিদেশী খ্রীস্টান মিশনারীদের খ্রীস্টধর্মপ্রচার ও বাইবেল মুদ্রণার্থে স্থাপিত ছাপাখানায় যোগদান সংস্কারমুক্তি না ঘটলে সম্ভব ছিল না। জীবিকা উপার্জনের তাগিদে হয়ত বা তিনি এই কাজে এসেছিলেন, তথাপি তৎকালীন গ্রামবাংলায় প্রচলিত কুসংস্কার ত্যাগ করতে না পারলে তিনি বহড়া গ্রাম থেকে শ্রীরামপুর মিশনে পৌঁছতে পারতেন না। তিনি স্বাধীনচেতাও ছিলেন, তাই অল্প কিছুদিনের মধ্যে মিশনারী সাহেবদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তিনি চাকরি ছেড়ে দিলেন। আর উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন বলেই মুদ্রণের স্বাধীন ব্যবসায়ে ভাগ্যান্বেষণের জন্য কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতায় অপরের প্রেস থেকে ছাপিয়ে অনেকগুলি বই প্রকাশ করেছিলেন, পরে নিজস্ব ছাপাখানাও খুলেছিলেন। ত্রৈমাসিক ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালী— 'the first who conceived the idea of printing works in the current language as a means of acquiring wealth. To ascertain the pulse of the Hindoo public, he printed several works at the press of a European for which having obtained a ready sale, he established an office of his own, and opened a bookshop. For more than six years, he continued to print in Calcutta various works in the Bengalee Language...'[১] গঙ্গাকিশোর ছিলেন প্রথম বাঙালী যিনি কলকাতায় 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামক সংবাদপত্র মুদ্রণ প্রকাশনে অগ্রণী হন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থরচনাও করেন। আবার পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবসায়েও তিনি জড়িত ছিলেন। মুদ্রণ ও প্রকাশন ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত ধনোপার্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালে জীবনের শেষভাগে গঙ্গাকিশোর কলকাতা থেকে

---

১ 'On the effect of the Native Press in India' : *Friend of India* (Qly.), Sept. 1820.

তাঁর ছাপাখানা তুলে নিয়ে এসে নিজগ্রাম বহড়ায় স্থাপন করেন ও সেখান থেকেই মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ অব্যাহত রাখেন। তাই বলছিলাম, বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য একটি স্মরণীয় নাম।

কেরীর জীবনীকার জর্জ স্মিথ গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে লিখেছেন : 'The first Bengali who, on his own account, printed works in the vernacular on trade principles, was Gunga Kishore, whom Carey and Ward had trained at Serampore'.[১] সুতরাং একথা স্পষ্ট যে কেরী বা ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসেই প্রথম গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য মুদ্রণবিদ্যায় শিক্ষালাভ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। গঙ্গাকিশোরের আদি নিবাস ছিল বহড়া গ্রামে। সেখান থেকেই এসে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে তিনি প্রথম মিশন প্রেসে একজন কম্পোজিটর হিসাবে যোগদান করেন। কর্মজীবনের শেষভাগে তিনি পুনশ্চ এই বহড়া গ্রামেই ফিরে যান। মিশন প্রেসে প্রথম বছর অর্থাৎ ১৮০০ সালে নিউ টেস্টামেণ্টের বাংলা অনুবাদ মুদ্রণের কাজ চলে। এর অক্ষর সাজানো বা composing-এর কাজ গঙ্গাকিশোর শুরু করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে, সম্ভবত জুলাই মাস (১৮০০) নাগাদ গঙ্গাকিশোর মিশন প্রেস ছেড়ে দেওয়ায় ওয়ার্ড ও ফেলিক্স কেরী composing-এর বাকি কাজটা শেষ করেন। এই প্রসঙ্গটি মিশনারীদের বর্ণনায় পাই এইভাবে : 'This day we have finished composing the *New Testament*. For about a month at first we had a brammhan compositor ; but we were quite weary of him. Then brother B., Felix and I did it. Brother B. being taken ill, Felix and I made shift ourselves. We kept our pressmen constantly employed, and God has honoured us with finishing it.' [From Ward's Journal (communicated to Mr. Fuller) dt. Feb. 7, 1801.][২] এই 'ব্রাহ্মণ কম্পোজিটর' নিঃসন্দেহে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, তবে তিনি যে কেন মিশনারীদের বিরাগভাজন হন সে কথা জানা নেই। আগেই বলেছি, এই প্রসঙ্গটি আর-একবার ওয়ার্ড তাঁর দিনলিপিতে (১ আগস্ট, ১৮০০) উল্লেখ করেছেন : 'Our compositor having left us, we do without' ;[৩] গঙ্গাকিশোর যে স্বেচ্ছায় মিশন প্রেস ছেড়ে চলে আসেন সে কথাটি অবশ্য এখানে সুস্পষ্ট। তাঁর কর্মজীবনের পরবর্তী অধ্যায় প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করা হল। [বিকাশ পর্ব, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ও বিস্তার পর্ব, ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।]

---

১ George Smith, *op. cit.*, p. 203.

২ *Periodical Accounts*, p. 132 ; also refd. by George Smith, *op. cit.*, p. 187. ['B' সম্ভবত Brunsdon.]

৩ George Smith, *op. cit.*, pp. 92-93.

পঞ্চানন কর্মকার : মনোহর কর্মকার

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের গোড়ার দিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে, অর্থাৎ হরফ খোদাই ও ঢালাইয়ের কাজে যে দেশীয় কর্মী, বা বলা উচিত 'শিল্পী'র সহায়তা মিশনারীরা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি পঞ্চানন কর্মকার। পঞ্চাননের তিরোধানের পর সেই একই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর শিষ্য ও জামাতা মনোহর কর্মকার। কেরী শ্রীরামপুরে পৌছবার দু মাসের মধ্যেই,[১] অর্থাৎ মার্চ মাসের গোড়ার দিকেই (১৮০০) পঞ্চানন কর্মকার শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে যোগদান করেন। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চাননের পরিচালনাতেই মিশন প্রেসের হরফ ঢালাইখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কালক্রমে সেটি দেশীয় ভাষার হরফ নির্মাণে এশিয়ার বৃহত্তম হরফ ঢালাইখানায় পরিণত হয়।

মিশন প্রেসে যোগদানের পূর্বেই পঞ্চানন কর্মকার একজন দক্ষ মুদ্রাক্ষরশিল্পী হিসাবে তৎকালীন সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে চার্লস উইলকিন্সের নির্দেশনায় হালহেডের ব্যাকরণের জন্য বাংলা হরফ খোদাই করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে বাংলা মুদ্রণজগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে যান সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেদিন থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সূত্রে তিনি কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে হরফ নির্মাণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর কর্মজীবনের এই পর্বের ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাবই তার মূল কারণ। তবে যুক্তিসঙ্গত কারণেই অনুমান করা যায়, এই দীর্ঘ ২২ বছর তিনি নিশ্চয়ই হরফ নির্মাণের চর্চা ও কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। সেরূপ হয়ে থাকলে কেরী নিশ্চয়ই তাঁকে মিশন প্রেসে গ্রহণের জন্য এত আগ্রহী হতেন না, বা তিনিও মিশন প্রেসে যোগদান করে সেখানকার হরফ ঢালাইখানাকে এমন আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে গড়ে তুলতে পারতেন না। হুগলীর সফল প্রয়াসের পরই পঞ্চানন চলে যান কলকাতায় ও সেখানে উইলকিন্সের তত্ত্বাবধানে কোম্পানীর প্রেসে যোগ দেন। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে উইলকিন্সের ভারত ত্যাগের পর সম্ভবত পঞ্চাননের উপরই কোম্পানী প্রেসের হরফ নির্মাণের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে কর্নওয়ালিস কোডের বাংলা অনুবাদ ছাপার জন্য যে নতুন এক সাট বাংলা হরফ ব্যবহৃত হয় তা সম্ভবত পঞ্চাননের তৈরি। পঞ্চাননের এই সৃষ্টির সূত্রে তখন থেকেই কেরী তাঁর কথা শুনে আসছেন। মনে হয় এর আরো কিছুকাল পরে পঞ্চানন কোম্পানী প্রেস ত্যাগ করে স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দের শুরুতে কলকাতায় যে দেশীয় ভাষার হরফ নির্মাণের কারখানা স্থাপনের সংবাদে কেরী উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন, তার সঙ্গে পঞ্চাননের যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়। জে. সি. মার্শম্যানের বর্ণনায় এর স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় : 'At the beginning of 1798 it was announced in the papers that

১ S. P. Carey, '*William Carey*', p. 198.

a "letter foundry had been established in Calcutta for the country languages"; but all trace of the author or the result of this project has been lost, except the fact that the punches were cut by the workman whom Sir Charles Wilkins had trained up. Mr. Carey immediately placed himself in communication with the projector of the scheme, and relinquished all idea of obtaining Bengalee types from England.'[১] কেরী কলকাতার এই হরফ নির্মাতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে যান এবং তাঁর বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় হরফ সরবরাহের দায়িত্ব তাঁদেরই দেন। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই কেরীর জন্য প্রয়োজনীয় হরফ তাঁরা প্রস্তুত করে ফেলেন এবং শেষ পর্যন্ত ঐ হরফই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে প্রথম ছাপা বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের জন্য ব্যবহৃত হয়। পূর্ববর্তী আলোচনা সূত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে ঐ হরফের সঙ্গে পঞ্চানন কর্মকারের তৈরি মিশন প্রেসের নিজস্ব প্রথম দিকের হরফের মৌল পার্থক্য বিশেষ ছিল না। কেবল 'র' প্রভৃতি দু' একটি হরফে বা তাদের আকারে (size) কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু হরফের মূল ধাঁচ বা ঢঙ পরিবর্তিত হয়নি। এর থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে কলকাতার ঐ হরফ ঢালাইখানায় নির্মিত হরফেও পঞ্চাননেরই হাতের স্পর্শ ছিল। পঞ্চাননের সঙ্গে কেরীর সেখানেই সাক্ষাত আলাপ স্থাপিত হয় ও তাঁর নৈপুণ্যে কেরী বিশেষ মুগ্ধ হন। পরে শ্রীরামপুর মিশন স্থাপিত হলে সেখানে পঞ্চানন ও কেরী স্বভাবতই পূর্বেকার পারস্পরিক আকর্ষণের প্রভাবে পুনশ্চ মিলিত হতে পেরেছিলেন। পঞ্চানন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মিশন প্রেসে চাকরির সন্ধানে গেছিলেন অথবা কেরীই তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন সে প্রশ্ন তাই গৌণ। মিশনারীদের কাছে এই যোগাযোগ ছিল ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ। এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত '*Memoir Relative to the Translation*' নামক মিশনারীদের স্মৃতিকথায় ঘটনাটি এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: 'Soon after our settling at Serampore the providence of God brought to us the very great artist who had wrought with Wilkins in that work, and in a great measure imbibed his ideas. By his assistance we erected a letter foundry; and although he is now dead, he had so fully communicated his art to a number of others, that they carry forward the work of type casting, and even of cutting the matrices, with a degree of accuracy which would not disgrace European artists.'[২]

১ J. C. Marshman, *op. cit.*, Vol. I, pp. 79-80.

২ George Smith, *op. cit.*, p. 181.

স্পষ্ট নামোল্লেখ না থাকলেও, এখানে পঞ্চাননের কথাই বলা হয়েছে। ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দের এই বর্ণনায় জানা যায়, পঞ্চানন তার আগেই মারা গেছেন, সম্ভবত, ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দের শেষে তাঁর মৃত্যু হয়। পঞ্চানন কর্মকার বছর তিনেক মাত্র শ্রীরামপুর মিশনে কাজ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য ও জামাতা মনোহর কর্মকার মিশন প্রেসের হরফ ঢালাইখানার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও পরবর্তী চল্লিশ বৎসর কাল সেখানে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে বাংলা, দেবনাগরী, আরবী, ফারসী প্রভৃতি নানা ভাষার হরফ তৈরি করেন। পঞ্চানন মিশন প্রেসে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় এক সাট দেবনাগরী হরফ নির্মাণের কাজ শুরু করেন এবং ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে তা সম্পূর্ণ হয়। পঞ্চাননের এই সৃষ্টিই ছিল ভারতে তৈরি প্রথম সঞ্চালনযোগ্য দেবনাগরী হরফ।[১] এই দেবনাগরী হরফ নির্মাণের ফাঁকে ফাঁকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পঞ্চানন এক সাট নতুন বাংলা হরফও তৈরি করেন। এইটিই ছিল মিশন প্রেসে তৈরি বাংলা হরফের প্রথম সাট। বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম সংস্করণে (১৮০১) ব্যবহৃত হরফের তুলনায় এগুলি ছিল আকারে আরো ছোটো ও দেখতেও সুন্দর। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাংলা নিউ টেস্টামেন্টের যে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা শুরু হয় তাতে এই নতুন হরফ ব্যবহৃত হয়। পঞ্চাননের কাটা ছোটো ও সুন্দর বাংলা হরফে কেরী রামায়ণ মহাভারতের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। তা ছাড়া ১৮০১ থেকে ১৮০৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত মিশন প্রেসের বিভিন্ন বাংলা প্রকাশনায় পঞ্চাননের সৃষ্টির ছাপ বিদ্যমান। পঞ্চানন ও তারপর মনোহরের উদ্যোগে ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে দুটি বা তিনটি সাটের বাংলা হরফ কাটা সম্পূর্ণ হয়েছিল। এ ছাড়া ১৮০৭ সালেই আবার মনোহরের উদ্যোগে এক সাট নতুন বাংলা হরফ তৈরির কাজ শুরু হয়। অক্ষরের স্পষ্টতা পুরো বজায় রেখেও তাঁরা হরফগুলিকে আরো ছোটো করে কেটে এমন আকারে আনতে চাইলেন যাতে বই ছাপার পর আগের তুলনায় তার পৃষ্ঠা সংখ্যা এক চতুর্থাংশ কমে আসে ও ফলত কাগজের খরচ বহুলাংশে কমে যেতে পারে। ১৮০৭ সালের মধ্যে এক সাট নতুন দেবনাগরী হরফও কাটা হয়, সারা ভারতে তখন তা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে দেবনাগরী হরফের এই নতুন সাটের জন্য একক ও সংযুক্ত অক্ষর মিলিয়ে প্রায় ১০০০টি হরফ কাটা হয়। প্রয়োজনীয় ধাতু ও তা ঢালাইয়ের খরচ বাদ দিয়েও কেবল ঐ অক্ষরের ছাঁচগুলি কাটতেই খরচ পড়ে ১৫০০ টাকা।[২]

পঞ্চানন কর্মকার যে মিশন প্রেসে যোগদান করেই দেবনাগরী হরফ কাটার কাজে

---

১ J. C. Marshman, *op. cit.*, Vol. I, pp. 178-79.

২ 'Memoir Relative to the Translation, 1807' : Quoted by George Smith, *op. cit.*, p. 181.

উদ্যোগী হন, তার মূলে হয়ত পঞ্চানন কর্মকারের সঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ এইচ. টি. কোলব্রুকের (H. T. Colebrooke) পূর্ব-পরিচয়ের সম্পর্ক ছিল। কোলব্রুকের কাছেই হয়ত পঞ্চানন সংস্কৃত হরফ কাটার প্রাথমিক চর্চা শুরু করেন। কোনো কোনো মহলে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে কোলব্রুক তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণ মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় হরফ তৈরির উদ্দেশ্যে পঞ্চানন কর্মকারকে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি তাঁর কলকাতার উপকণ্ঠস্থিত গার্ডেনরীচের বাসভবনে পঞ্চাননকে এনে রাখেন ও সেখানেই সংস্কৃত হরফ কাটার উদ্যোগ চলতে থাকে। এই সময় কোলব্রুকের বাসভবন এলাকায় পঞ্চানন কর্মকার একরূপ প্রায় নজরবন্দী ছিলেন, অর্থাৎ কোলব্রুকের বিনা অনুমতিতে পঞ্চানন তখন বাইরে কোথাও যাতায়াত করতে পারতেন না। তার কারণ কোলব্রুকের আশঙ্কা ছিল, পঞ্চাননের মতো দক্ষ শিল্পীকে ছেড়ে দিলে অন্য কেউ তাঁর শিল্পনৈপুণ্যকে কাজে লাগাতে পারে, ফলত কোলব্রুকের নিজস্ব কাজ ব্যাহত হওয়া সম্ভব। অপরদিকে কেরীও বুঝেছিলেন, শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের নিজস্ব হরফ ঢালাইখানা প্রতিষ্ঠা করতে হলে পঞ্চাননের সহায়তা অপরিহার্য, কারণ তাঁর মতো প্রতিভাবান মুদ্রাক্ষরশিল্পী সেকালে দুর্লভ ছিল। সুতরাং পঞ্চাননকে কোলব্রুকের অধিকার থেকে ছিনিয়ে মিশন প্রেসে নিয়ে আসার জন্য কেরী কিছু ছল চাতুরী বা সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতারণা ('pious fraud') অবলম্বন করেছিলেন। সাধারণ্যে প্রচলিত এই কাহিনীটির মূল উৎস ছিল প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কিছুকালের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নোটবই ; এই নোটবই অবলম্বন করে ১৯১৬ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে পঞ্চানন সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য পরিবেশিত হয়।[১] কেরীর অভিনব প্রতারণার কাহিনীটি ছিল এইরূপ : অনেক আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও কোলব্রুক পঞ্চাননকে মিশন প্রেসের জন্য ছেড়ে দিতে সম্মত না হওয়ায়, কেরী গোপনে পঞ্চাননের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে অধিক বেতন ও উন্নতির প্রলোভন দেখিয়ে শ্রীরামপুরে যোগদানের জন্য প্ররোচিত করেন। কিন্তু কোলব্রুকের কড়া নজরের ফলে পঞ্চাননের পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও গার্ডেনরীচ থেকে বেরোন অসম্ভব। কেরী তখন পঞ্চাননকে শুধু একবারটি দেখবার জন্য অল্প কয়েকদিনের জন্য ছেড়ে দিতে কোলব্রুককে অনুরোধ করেন। কোলব্রুক সরল বিশ্বাসে তাতে সম্মত হয়ে পঞ্চাননকে কয়েকদিনের জন্য শ্রীরামপুরে যেতে দেন, কিন্তু কেরী পঞ্চাননকে আর কোলব্রুকের চাকরিতে ফেরত পাঠাননি। অবশ্য পঞ্চাননের সম্মতিক্রমেই কেরী তাঁকে শ্রীরামপুরে আটক রেখে হরফ ঢালাইখানার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। এই কাজে শ্রীরামপুর দিনেমার কর্তৃপক্ষের প্রশ্রয় ও সাহায্যের ফলে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ কোলব্রুক কলকাতার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বা লণ্ডনের সরকারী মহলের কাছে

---

১ 'The Secretary's Notes', by S. C. Sanial : *Bengal, Past & Present*, July-Dec. 1916 : pp. 140-41.

প্রতিকারের আবেদন জানিয়েও কিছু করতে পারলেন না। কেরীর তত্ত্বাবধানে ১৮০০ সালের মার্চ মাস থেকে পঞ্চানন শ্রীরামপুরেই স্থায়ীভাবে রয়ে গেলেন। এ সম্বন্ধে কেরীর চিন্তা ছিল খুব স্পষ্ট। 'Carey said that Colebrooke should not be allowed to keep a monopoly of a man who was the only artizan of the kind in all India, etc.'[১] পঞ্চানন ছিলেন তখন একমাত্র দেশীয় মুদ্রাক্ষর শিল্পী। সুতরাং তাঁর উপর কোলব্রুকের একচ্ছত্র অধিকার মেনে নেওয়া যায় না।

কিন্তু এই কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ রয়ে গেছে। মিশনারীদের কোনো লেখা, চিঠিপত্র বা দলিলে এর সমর্থন মেলে না। তা ছাড়া এই ঘটনার পরেও কেরী-কোলব্রুকের পারস্পরিক অক্ষুণ্ণ প্রীতি-সৌহার্দ্য-সহযোগিতার কথা স্মরণ করে মনে হয় না তাঁদের মধ্যে কখনও এই ধরনের তিক্ত সম্পর্ক উদ্ভব হয়েছিল। দেখা গেছে, পূর্বোক্ত ঘটনার চার বছর পরেই কোলব্রুক নিজে উদ্যোগী হয়ে শ্রীরামপুর মিশন ও কেরীর জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। স্থির হয়েছিল, সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ যুগ্মভাবে প্রাচ্যভাষার যে-কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদককে ৫০০ টাকা করে সাহায্য দেবেন। এই ব্যবস্থা অনুসারেই কেরী বেদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদে উদ্যোগী হন। কোলব্রুকের '*A Grammar of the Sanskrit Language*' গ্রন্থের প্রথম ভাগ কেরীর তত্ত্বাবধানে ১৮০৫ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়। কোলব্রুক সম্পাদিত ও আংশিক অনূদিত 'অমরকোষ' ১৮০৮ সালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়। কোলব্রুক বরাবরই শ্রীরামপুর প্রেসের যথাসাধ্য পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ১৮১২ সালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে যখন মিশন প্রেসের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয় কোলব্রুক তখন অকৃত্রিম সহানুভূতিতে কেরীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কেরী ও কোলব্রুক উভয়ে একই সঙ্গে অনেককাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতা করেন, তখন তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল। এই সব ঘটনা থেকে মনে হয় কেরী-কোলব্রুকের এই দীর্ঘকালব্যাপী প্রীতির সম্পর্কের মধ্যে শম্ভুচন্দ্রের নোটবুকে বর্ণিত তিক্ত ঘটনার কোনোরূপ অবকাশ ছিল না। তবে পঞ্চানন কর্মকারের পক্ষে প্রাক্-শ্রীরামপুর পর্বে প্রথম ইউরোপীয় সংস্কৃত বিশারদ কোলব্রুকের সঙ্গে দেবনাগরী হরফ কাটার কাজে ব্যাপৃত থাকা যে অসম্ভব ছিল তা বলা যায় না।

যাই হোক, ১৮০০ সালের প্রারম্ভে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে যোগদানের পর দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রবীণ বাঙালী মুদ্রাক্ষরশিল্পী পঞ্চানন কর্মকার জীবনের যে শেষ তিনটি বছর সেখানে কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটান, সেই সময় তিনি একাধারে দু-তিন সাট নতুন বাংলা, দেবনাগরী প্রভৃতি হরফ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় 'পাঞ্চ' (Punch) কাটা, ছাঁচ তৈরি, অক্ষর ঢালাই

---

১ *Ibid.*

প্রভৃতি সব রকমের কাজ করে ও সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক বাঙালী শিল্পীকে মুদ্রাক্ষরশিল্পে প্রশিক্ষণ দান করে সামগ্রিকভাবে বাংলা মুদ্রণের বনিয়াদকে সুদৃঢ় করে গড়ে দিয়ে যান। পঞ্চানন-মনোহরের পরিচালনায় শ্রীরামপুরের হরফ ঢালাইখানায় কেবলমাত্র যে তাঁদের নিজেদের প্রয়োজন মতো হরফ তৈরি হত তা নয়, ওখানকার তৈরি হরফ বাইরের বহু ছাপাখানায় বিক্রি হত। নিজেরাই হরফ তৈরি করে নেওয়ায় মিশন প্রেসের ছাপার খরচও অনেক কমে এসেছিল। লণ্ডন থেকে তখন ঐ সব হরফ তৈরি করিয়ে আনাতে হলে মিশনারীদের খরচ স্বভাবতই অনেক বেড়ে যেত। এ সম্বন্ধে জোশুয়া মার্শম্যান বলেছেন : 'In the course of the first ten years of their labours the differences between the expense of their own foundry and the sum which would have been required for the preparation of the founts in London, fell little short of £ 2000.'[১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নোটবই থেকে জানা যায়, মনোহর কর্মকার প্রতিটি 'পাঞ্চ' তৈরি বাবদ দু'টাকা করে মজুরি পেতেন। তবে গোড়ার দিকে পঞ্চানন কর্মকার সম্ভবত আরো বেশি হারে এই মজুরি পেতেন। একটি হিসাবে জানা যায় মনোহরের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রী দিনে ৮/১০টি পর্যন্ত 'পাঞ্চ' তৈরি করেছেন। অভিজ্ঞ পঞ্চাননও যদি সেই হারে কাজ করে থাকেন তা হলে অনুমান করা যায় তাঁর দৈনিক আয় ছিল প্রায় ২৫ টাকা, অর্থাৎ মাসিক আয় প্রায় ৭০০/৭৫০ টাকা। পঞ্চানন-মনোহর প্রভৃতির শিল্পনৈপুণ্য যে-কোনো ইউরোপীয় শিল্পীর নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলনীয় ছিল।

পঞ্চাননের তৈরি নতুন সাটের অক্ষরগুলো সম্পর্কে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজপত্র থেকে অনেক খুঁটিনাটি তথ্য ও বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথমদিকে শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত্যে ব্যবহৃত স্বর ও ব্যঞ্জন চিহ্নগুলো আলাদাভাবে কাটার ফলে মূল অক্ষর থেকে তাদের ব্যবধান থাকত অনেক। কিন্তু পঞ্চানন তাঁর শিল্পনৈপুণ্যের গুণে এইসব অক্ষর ও আনুষঙ্গিক চিহ্নগুলি এত সূক্ষ্মভাবে কেটে ঢালাই করতে সমর্থ হন যে ঐ ব্যবধান অনেক কমে আসে, ফলে হাতের লেখা ও ছাপার মধ্যে সম্ভাব্য পার্থক্য দূরীভূত হয়ে যায়। বাংলা হরফের এই উন্নতি সাধন ছাড়াও পঞ্চানন কর্মকার এক হাজার টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন সংযোজক চিহ্ন সহ এক সাট ওড়িয়া হরফ তৈরি করান। এরপর তিনি এক সাট মারাঠি ভাষার হরফ তৈরির কাজ হাতে নেন। কিন্তু তা সমাপ্ত হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে তাঁর উত্তরাধিকারি মনোহর কর্মকার তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার নেন।[২]

---

১ Joshua Marshman, '*A History of the Serampor Mission*', London, 1859 : p. XXX ; মুহম্মদ সিদ্দিক খান, 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা', পৃ. ১২০

২ *Home Misc.*, Vol. 559 ; G. Smith *op. cit.*, pp. 181-82 ; মুহম্মদ সিদ্দিক খান, তদেব, পৃ. ১২৯।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি (সূচনা পর্ব, প্রথম অধ্যায়) পঞ্চানন কর্মকার ছিলেন হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার অধিবাসী। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণাগ্রন্থে[1] উল্লেখ করা হয়েছে, বাঁশবেড়িয়ার জমিদার (গড়বাড়ির) রাজা পূর্ণেন্দুনারায়ণ দেবরায় মহাশয়ের কাছ থেকেই উইলকিন্স প্রথম পঞ্চাননের সন্ধান পান ও তাঁকে হুগলীতে হালহেডের ব্যাকরণ ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় হরফ তৈরির কাজে নিয়োগ করেন। পঞ্চানন কর্মকারের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার জিরাট বলাগড়ে। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে ভ্রাতৃবিরোধের ফলে সেখান থেকে পঞ্চাননের পিতা শম্ভুনাথ বাঁশবেড়িয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে কেরীর সংস্পর্শে এসে পঞ্চানন ও তাঁর আত্মীয় বংশধরেরা শ্রীরামপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। শ্রীসরস্বতী প্রেসের শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়ের সহায়তায় পূর্বোক্ত গ্রন্থের লেখিকা এই সব তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগৃহীত তথ্য থেকে আরো জানা যায়, পঞ্চাননের জ্যেষ্ঠভ্রাতা গদাধর ও জামাতা মনোহরের বংশের অনেকেই এখনো জীবিত আছেন ও তাঁরা শ্রীরামপুরে বসবাস করছেন। ১৯৭৪ সাল নাগাদ পঞ্চাননের আদিভিটা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমিও শ্রীরামপুরে গদাধরের প্রপৌত্র রামচন্দ্র কর্মকারের বাড়ির সন্ধান পাই। [ঠিকানা : ৬১৮, জি. টি. রোড, শ্রীরামপুর।] রামচন্দ্র ১৯৭০ সালে মারা গেছেন। তাঁর পুত্র অমরচন্দ্র, বিমানচন্দ্র ও অন্যান্যরা তখন সেখানে বাস করতেন। ইদানীং তাঁরা তাঁদের পরিবারের আদি 'মল্লিক' উপাধি ব্যবহার করেন। পঞ্চাননের কোনো পূর্বপুরুষ নবাব আলিবর্দীর কাছ থেকে এই 'মল্লিক' উপাধি পান। সম্ভবত তাঁর পূর্বপুরুষেরা রাজদরবারে বেতন ভোগী লিপিকর ছিলেন, অস্ত্রশস্ত্রে নামাঙ্কন বা তাম্র-রৌপ্যপটে দানপত্রাদি লিখনই তাঁদের পেশা ছিল। পঞ্চাননের জ্যেষ্ঠভ্রাতা গদাধরের প্রপৌত্র শ্রীরামপুর নিবাসী রামচন্দ্র মল্লিকের কাছ থেকে তাঁদের বংশের একটি বংশপীঠিকা সংগ্রহ করে সবিতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর বইয়ে প্রকাশ করেছেন। রামচন্দ্রের পিতা অধরচন্দ্রের নামে 'অধর ফাউণ্ড্রী' এককালে কলকাতায় (৫২ কেশব সেন স্ট্রীটে) বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।

পঞ্চাননের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য মনোহর কর্মকার শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের হরফ ঢালাইখানার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অপুত্রক পঞ্চানন তাঁর একমাত্র কন্যা লক্ষ্মীমণির সঙ্গে প্রিয় শিষ্য মনোহরের বিবাহ দিয়েছিলেন। মনোহর ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শ্রীরামপুর মিশনে ঢালাইকরের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মনোহরের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রীও দীর্ঘকাল শ্রীরামপুর মিশনে কাজ করেন। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ফলে মনোহর শিল্পনৈপুণ্যে পঞ্চাননকেও অতিক্রম করে যেতে পেরেছিলেন। তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও সততা এতই সুবিদিত ছিল যে তা একরূপ প্রবাদে দাঁড়িয়ে যায়। ইষ্টদেবতাকে সামনে রেখে তিনি

১ সবিতা চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক', পৃ. ১৪১-৪০।

সর্বদাই নিজের একটি নির্দিষ্ট আসনে বসে নিবিষ্ট মনে কাজ করে যেতেন। মনোহর প্রসঙ্গে একথা বলতে গিয়ে জর্জ স্মিথ লিখেছেন : 'In 1839…the Rev. James Kennedy saw him…cutting the matrices or casting the types for the Bibles, while he squatted below his favourite Idol, under the auspices of which alone he would work. Serampore continued down till 1860 to be the principal Oriental typefoundry of the East.'[১] গোঁড়া হিন্দু হয়েও মনোহর দীর্ঘকাল মিশনারীদের সঙ্গে কাজ করে যান, এবং তাঁর পরিশ্রমের ফলে বাংলা তথা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সাহিত্য ও তার মুদ্রণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারাভিযানের পক্ষেও অশেষ উপকার সাধিত হয়েছিল। কঠিনতম চীনা ভাষা সহ মনোহর মোট পনেরোটি ভাষায় হরফ তৈরি করেছিলেন। শোনা যায়, চীনা ভাষায় তিনি মোট ৪৩,০০০ হরফ খোদাই করেছিলেন। ১৮১২ সালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মিশন প্রেসের বহু ভাষার অসংখ্য মুদ্রাক্ষর নষ্ট হয়ে যাবার পর মনোহর ও তাঁর সহকর্মীরা আশ্চর্য দ্রুততা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে সেগুলি পুনশ্চ তৈরি করে দেওয়ায় মনোহরের খ্যাতি ও গুরুত্ব আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মনোহরের মুদ্রাক্ষরশিল্পে নৈপুণ্যের নমুনা কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস আধুনিক কাল পর্যন্ত সযত্নে রক্ষা করে এসেছিলেন। মনোহরের সময়ে তৈরি কিছু হরফের প্রতিলিপি ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের সৌজন্যে মুহম্মদ সিদ্দিক খান তাঁর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন।[২]

পঞ্চানন-মনোহরের সাহায্যার্থে বাংলা অক্ষরের আদর্শ নমুনা সরবরাহের জন্য কেরী মিশন প্রেসে কুশলী হস্তাক্ষরবিদদেরও নিয়োগ করেছিলেন। শোনা যায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার ও হস্তলিপিবিদ কালীকুমার রায়ের হস্তাক্ষরের আদর্শে পঞ্চানন-মনোহর শ্রীরামপুরে উন্নত মানের বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন।

পঞ্চানন কর্মকার বা মনোহর কর্মকার মিশন প্রেসের কর্মীমাত্র ছিলেন না, যথার্থ গুণী শিল্পী হিসাবেই সেখানে তাঁদের বিশেষ সমাদর ছিল। প্রসঙ্গত একটি ছোটো ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ফেলিক্স কেরী বর্মা থেকে ফিরে একবার যখন কলকাতায় সার্কুলার রোডস্থ মিশনারী ভবনে অবস্থান করছিলেন সেইসময় একদিন মনোহর কর্মকার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। বাড়ির দরজায় দরোয়ান তাঁর গতিরোধ করলে কিছু বচসার সৃষ্টি হয়, সেই শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ফেলিক্স বারান্দায় এসে মনোহরকে নীচে দেখতে পান। তৎক্ষণাৎ ফেলিক্স সাদর অভ্যর্থনায় তাঁকে ভিতরে নিয়ে যান। 'সাহেবে'র কাছে একজন দেশীয়ের এই অপ্রত্যাশিত সমাদর দেখে নিঃসন্দেহে সেদিন দরোয়ানটি খুব অবাক হয়েছিল।[৩]

---

১ George Smith, *op. cit.*, p. 182.

২ মুহম্মদ সিদ্দিক খান, তদেব, পৃ. ১০০ ও পরিশিষ্ট।

৩ Pages from the Secretary's Notes : *Bengal, Past & Present*, July-Dec. 1916.

জন লসন

বাংলা মুদ্রণশিল্পের আদিপর্বে বাঙালী প্রতিভার এই সম্মান ও প্রতিষ্ঠা কর্মকার পরিবারেরই অবদান। মূলত এঁদের শিল্পনৈপুণ্যের উপর ভিত্তি করেই সেদিন শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের হরফ ঢালাইখানাটি গড়ে উঠেছিল ও তা বাংলা মুদ্রণের ধারাকে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছিল। তবে শ্রীরামপুর মিশনের হরফনির্মাণ শিল্পের ধারায় মাঝে মাঝে দু-একজন বিদেশী শিল্পীর অবদানও যুক্ত হয়েছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জন লসন (John Lawson)। ইংলণ্ডে থাকাকালীন লসন একজন অভিজ্ঞ পেশাদার মুদ্রাক্ষরশিল্পী ('professional typecutter')[১] হিসাবে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশে মিশনারীদের মুদ্রণকার্যে সহায়তার উদ্দেশ্যে তিনি এদেশে আসেন এবং শ্রীরামপুর ও কলকাতার মুদ্রণজগতে সচিত্র গ্রন্থপ্রকাশ এবং ধাতুখোদাই ব্লক ও হরফ নির্মাণের ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দের ১০ই আগস্ট জন লসন প্রথম কলকাতায় পদার্পণ করেন এবং এদেশে কর্মব্যস্ত তেরোটি বছর কাটাবার পর ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের ২২শে অক্টোবর মারা যান। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে তিনি যখন শ্রীরামপুর মিশনে যোগদান করেন জে. সি. মার্শম্যান তখন সেখানে চীনা হরফ নির্মাণের কাজে নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন।[২] লসন এসেই ধাতুনির্মিত সঞ্চালনযোগ্য চীনা হরফ নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অবিলম্বে ছোটো আকারের এক সাট চীনা হরফ তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলেন। এই চীনা হরফ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে সেগুলি ছিল 'of a small and convenient size,' তবে 'not so elegant, uniform and purely native as could be wished.'[৩] এ ছাড়া শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ব্যবহৃত অন্যান্য দেশীয় ভাষার হরফগুলিকেও ছোটো আকারে কাটার কাজে তিনি মনোযোগ দেন। বিশেষ করে ছোটো আকারের বাংলা হরফ কাটার কাজে তিনি উদ্যোগী হন। অক্ষরের সকল গুণ, বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য বজায় রেখেও ছোটো আকারের নিখুঁত হরফ তৈরি যে সম্ভব তা তিনি নিজ হাতে কাজ করে দেখাতে ও এদেশীয় শিল্পীদের সে বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে প্রয়াসী হন। এমন-কি তাঁর উদ্যোগেই শ্রীরামপুরে ভারতের মধ্যে প্রথম হরফনির্মাণ কৌশল বা সামগ্রিকভাবে মুদ্রাক্ষরশিল্পে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। বিশেষ করে ছোটো আকারের দেশীয় ভাষায় হরফ তৈরির কলাকৌশল বিষয়ে শিক্ষাদানই ছিল লসনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অবদান। তিনি চেয়েছিলেন যাতে ছোটো হরফের সাহায্যে সমগ্র বাইবেলের বাংলা অনুবাদ পাঁচ-ছয় খণ্ডের পরিবর্তে এক খণ্ডেই ছাপা যায়। এ ছাড়া নানা শিক্ষামূলক গ্রন্থ ও

---

১ E. D. Potts, *op. cit.*, p. 111.

২ *B. M. S. MSS.*, Ward to John Ryland : quoted by E. D. Potts, *op. cit.*, p. 110.

৩ W. H. Medhurst, '*China : Its State and Prospects*' (Lond. 1838), p. 553 ; E. D. Potts, *op. cit.*, p. 111.

পাঠ্যপুস্তকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে হলে মুদ্রণের প্রসারের যে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল সে জন্যও ছোটো আকারের হরফ প্রবর্তন তখন অপরিহার্য ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে লসনের অবদান বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিল। ছোটো আকারের হরফ কাটা ছাড়াও প্রথম ধাতুখোদাই ব্লক তৈরি করে চিত্রশোভিত গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ লসনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। পরবর্তীকালে (১৮২৮) প্রকাশিত 'পশ্বাবলী' (লসন কর্তৃক সংগৃহীত ও পীয়ার্স কর্তৃক অনূদিত) গ্রন্থে তাঁর এই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রয়ে গেছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার আগে (১৮১৯-২৩) যখন এগুলি খণ্ডাকারে 'সিংহের বিবরণ' (১৮১৯) ও অন্যান্য নামে বা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে 'পশ্বাবলী' মাসিক পত্রাকারে (১৮২২) একে একে প্রকাশিত হতে থাকে তখন সেগুলিতে সিংহ, গণ্ডার প্রভৃতি বিভিন্ন পশুর অনবদ্য ছবিগুলি লসনের তৈরি ব্লকে ছাপা হত। বাংলাদেশে আগমনের পর বেশ কয়েক বছর লসন শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে কলকাতায় ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হলে লসন সেখানকার মুদ্রণবিভাগের দায়িত্ব নেন। লসনের এদেশে আগমনের কিছুকাল পরে একবার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বৈধ অনুমতিপত্র ব্যতীত যেসব বিদেশী এখানে রয়েছেন তাঁদের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন ও অবিলম্বে তাঁদের ভারতত্যাগের নির্দেশ দেন। লসনের নামও এই তালিকাভুক্ত হয়। কিন্তু ঐ সময়ে ক্ষুদ্রাকৃতি দেশীয় মুদ্রাক্ষর নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ কাজে লসনের সাহায্য ও সেই কারণে এদেশে তাঁর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় বলে সরকারের কাছে আবেদন করা হলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে এদেশে থাকার বিশেষ অনুমতি দেন, কিন্তু তাঁর বন্ধু ডঃ উইলিয়ম জন্‌স্‌কে (Dr. William Johns) ভারত ত্যাগ করে চলে যেতে হয়।[১]

এদেশে থাকাকালীন লসন বাংলাভাষা চর্চাতেও বিশেষভাবে মনোযোগ দেন। ফলে তিনি যথাযথ বাংলা বলতে ও লিখতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। বাংলাভাষায় দু-একটি খ্রীস্টধর্ম-প্রচারমূলক পুস্তিকাও তিনি রচনা করেছিলেন, যেমন, 'ফটিকচাঁদের জীবনী' ও 'দুঃখী জোশেফ' (কলিকাতা ব্যাপটিস্ট মিশনারী ট্রাক্ট সোসাইটি, ১৮১৮)। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন বাংলা গ্রন্থরচনা তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র নয়। বাংলা হরফ ও ব্লক নির্মাণের কাজেই তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কালি তৈরির সার্থক প্রয়াস

পুরনো বাংলা পুঁথিতে কালি তৈরির একটি মোক্ষম ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায়:

তিল ত্রিফলা সিমুল ছালা
ছাগ দুগ্ধে করি মেলা

---

১ লসনের মৃত্যুর পর ডঃ উইলিয়ম ইয়েটস রচিত (৩০ অক্টোবর, ১৮২৫) অন্ত্যেষ্টিভাষণে উল্লিখিত: K. S. Diehl, '*Early Indian Imprints*', Introduction, pp. 40-41.

লৌহপাত্রে লোহায় ঘসি
ছিঁড়ে পত্র না ছাড়ে মসি।[১]

এই ছড়ার প্রচলন থেকে অনুমান করা চলে, প্রাচীনকালে এ দেশে কালি তৈরির চর্চা ছিল। পুঁথি লেখার কাজে এই কালি ব্যবহৃত হত। তবে উপযুক্ত ছাপার কালি এদেশে তৈরি হত কিনা বলা শক্ত। শ্রীরামপুর মিশনারীরা এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেন।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস মুদ্রণ প্রকাশনের ব্যাপারে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠেছিল। কেবলমাত্র নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্রে বই ছেপেই তাঁরা ক্ষান্ত ছিলেন না, মুদ্রণ প্রকাশনের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার উপকরণ বা সরঞ্জাম তাঁরা নিজেরাই তৈরি করে নেবার চেষ্টা করতেন। বাংলাদেশে মুদ্রণের ইতিহাসে এইসব উপকরণ তৈরির চেষ্টা সবই প্রায় নতুন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাই মিশনারীরাই ছিলেন তাদের প্রথম প্রবর্তক। তাঁরা নিজস্ব হরফ ঢালাইখানা গড়ে তুলেছিলেন— সেখানে নিজেদের কর্মী শিল্পীরাই হরফ তৈরি করতেন। নিজেদের কাগজকলও স্থাপন করেছিলেন। দপ্তরীখানাও ছিল নিজস্ব। সেখানে কর্মীরা দিনরাত বাঁধাইয়ের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এমন-কি ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় কালিও তাঁরা ক্রমে ক্রমে নিজেরা তৈরি করতে শুরু করেন, ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকতেন না। অন্তত ১৮১১ খ্রীস্টাব্দের আগে থেকেই যে তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে ছাপার কালি তৈরি শুরু করেন, মিশনারীদের লেখা চিঠিপত্রে তার উল্লেখ আছে।[২] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৮১২ সালের অগ্নিকাণ্ডের কিছু আগে লেখা ওয়ার্ডের একটি চিঠিতেও মিশন প্রেসে কালি তৈরির বিষয়টি এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :…'Beyond the office are the varied type-casters, besides a group of men making ink ;'…ছাপার কালি, বিশেষ করে বই ছাপার কালো কালি তৈরির জন্য তিসির তেল বা Linseed oil অন্যতম প্রধান উপাদান। শ্রীরামপুরে মিশনারীরাও তাঁদের কালি তৈরির জন্য এই তিসির তেল ব্যবহার করতেন। ১৮১২ সালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে তাঁদের প্রেসের যে বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি হয় তার তালিকা থেকে দেখা যায় যে ঐ সময়ে প্রেসের একস্থানে রাখা ছিল— 'A large jar of Linseed oil for making ink'.[৩] এই তেল জ্বাল দিয়ে একপ্রকার ঘন চটচটে varnish তৈরি হত, তাতে প্রয়োজনীয় কালো রঙ ও আরো দু-একটি উপকরণ, যেমন Drier (যাতে ছাপার সঙ্গে সঙ্গে কালি শুকিয়ে যায়) ইত্যাদি মিশিয়ে

১ ইন্দ্রমিত্র, 'পঞ্চাৎপট'।

২ *B. M. S. MSS.* Joshua Rowe to John Sutcliffe : Serampore, 6 Jan. 1811 ; quoted by E. D. Potts, *op. cit.*, p. 111.

৩ Monthly circular letter of the Serampore Missionaries, March 1812 : quoted by K. S. Diehl.

কালি তৈরি হত। মুদ্রণসংক্রান্ত অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো এদেশে আধুনিক পদ্ধতিতে ও বৃহৎ আকারের কালি তৈরির ব্যবস্থাও সম্ভবত শ্রীরামপুর মিশন প্রেসেই প্রথম প্রবর্তিত হয়।

কাগজ শিল্প

শ্রীরামপুর মিশনের আরেকটি বড়ো অবদান যন্ত্রচালিত আধুনিক কায়দায় বাংলাদেশে প্রথম কাগজ উৎপাদন শুরু। তাঁদের মুদ্রণকার্যের দ্রুত প্রসারের ফলে যে বিপুল পরিমাণ কাগজের প্রয়োজন দেখা দিতে থাকে তা যথাযথ মেটাবার জন্য প্রথমাবধি তাঁরা একটি নিজস্ব কাগজকল স্থাপনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। সেই সময় কলকাতায় যা কিছু হাতে তৈরি দেশীয় কাগজ পাওয়া যেত তার মান মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। বিশেষ করে সেই কাগজের ছাপার উপযুক্ততা ও তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নানা সংশয় দেখা দিয়েছিল। বাজার থেকে কাগজ কেনার জন্য বইয়ের মোট উৎপাদন খরচও বেড়ে যেত। অপর পক্ষে বিদেশ (মূলত ইংল্যাণ্ড) থেকে কাগজ আমদানি করতে হলে যেমন অনেক সময় লাগত, খরচও তেমনি অনেক বেশি পড়ত। সুতরাং নিজেদের প্রয়োজন মতো ভালো মানের কাগজ নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারলে অনেক সমস্যারই সুরাহা হয়। তাতে যেমন সময়মত কাগজ সরবরাহের চিন্তা থাকে না, খরচও অনেক কমে যায়। সেইজন্য মিশনারীরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শ্রীরামপুরে একটি কাগজকল স্থাপনে উদ্যোগী হন এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক শেষ হবার আগেই তাঁদের নিজস্ব কাগজ উৎপাদনের কাজ শুরু হয়ে যায়। দ্বিতীয় দশকের শেষে সেই কাজ আরো অগ্রসর ও উন্নত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা একটি পরিপূর্ণ আধুনিক বাষ্পচালিত কাগজকল স্থাপনে সমর্থ হন। সুতরাং বক্ষ্যমাণ 'বিকাশ পর্বে'র কালসীমার বাইরেও তাঁদের এই কাগজকল স্থাপনের ইতিহাস বিস্তৃত। কিন্তু আলোচনার সুবিধার্থে আমি এখানেই সেই পুরো ইতিহাস— তার পটভূমি ও রূপরেখাটি বর্ণনার চেষ্টা করব।

কাগজশিল্প এদেশের অন্যতম প্রাচীন শিল্প। অনেককাল থেকেই ভারতে কাগজ তৈরির প্রথা চালু ছিল। তবে স্বভাবতই মুদ্রণের প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত তার ব্যবহার তেমন ব্যাপক ছিল না। হাতে লেখা পুঁথি, দলিল-দানপত্রাদি, চিত্রাঙ্কন বা চিঠি লেখার কাজেই কাগজের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও যন্ত্রচালিত কাগজকল প্রবর্তনের পূর্বে হাতে তৈরি কাগজই প্রচলিত ছিল। এমন-কি বাংলাদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের পরেও বেশ কিছুকাল হাতে তৈরি দেশীয় কাগজ মুদ্রণের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা মুদ্রণের আদিযুগে বিদেশ থেকে আমদানি করা যন্ত্র-নির্মিত কাগজ ও হাতে তৈরি দেশীয় কাগজ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর শেষ পর্যায়ে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এদেশে তৈরি যন্ত্রনির্মিত কাগজের ব্যবহার। বাংলাদেশে এই শেষোক্ত পর্যায়ের কাগজ ও তার মুদ্রণ প্রবর্তনের গৌরব শ্রীরামপুর মিশনের প্রাপ্য।

এখন পর্যন্ত যেসব তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় প্রথম কাগজ

প্রস্তুত হয় চীনদেশে। তন্তুময় বস্তু থেকে কাগজ তৈরির কৌশল চীনাদেরই আবিষ্কার। আনুমানিক ১০৫ খ্রীস্টাব্দে চীনরাজসভার সঙ্গে যুক্ত ৎসাই লুন (Tsai Lun) নামক জনৈক পদস্থ চীনা রাজকর্মচারী প্রথম কাগজ তৈরি করেন। তাঁকে সাধারণত কাগজ প্রস্তুত-কারকদের দেবতা ('God of papermaking') বলা হয়ে থাকে। একটি চীনা দলিল থেকে জানা যায় যে তিনি প্রথম পুরনো মাছধরার জাল ও ছেঁড়া কম্বল থেকে মণ্ড প্রস্তুত করে তা থেকে কাগজ উৎপাদন করেন। পরে তিনি ও অন্যান্য চীনা শিল্পীরা উদ্ভিজ্জ তন্তুর মণ্ড থেকেও কাগজ তৈরি শুরু করেন। ১৯০৪ সালে Sir Aurel Stein তুর্কীস্তানে (Turke-stan) চীনের বিখ্যাত প্রাচীরের অন্যতম চূড়ার (tower) ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে কয়েকটি পুরনো চিঠি উদ্ধার করেন। পরীক্ষা করে দেখা যায় যে ঐ চিঠিগুলি ছিল কম্বলের মণ্ড থেকে তৈরি করা কাগজে লেখা এবং তা প্রথম কাগজ আবিষ্কারের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে লেখা বলেই মনে হয়। ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রক্ষিত কিছু পুরনো কাগজের নমুনা দেখে অনেকে বলেন চীনে তৈরি প্রথম যুগের কাগজের মান বেশ উন্নত ছিল, এমন-কি আধুনিক কালে তৈরি কাগজের গুণাগুণের সঙ্গে তার অনেক মিল আছে।[১]

কাগজ তৈরির গোপন কৌশল অনেক কাল চীনাদেরই একচেটিয়া অধিকারে ছিল। তবে তাঁদের দেশ থেকে প্রতিবেশী দেশসমূহে কিছু কিছু কাগজ রপ্তানী হত। ৭৫১ খ্রীস্টাব্দে চীন মধ্য-এশিয়ায় আরব অধিকারভুক্ত সমরকন্দ আক্রমণ করতে গিয়ে পরাস্ত হলে আরবদের হাতে কিছু চীনা সৈন্য বন্দী হন। ঐ বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন কাগজশিল্পে অভিজ্ঞ, তাঁদের সাহায্যে অষ্টম শতাব্দীতে সমরকন্দে প্রথম কাগজ শিল্প গড়ে ওঠে। ৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদে হারুন-অল-রশীদের রাজত্বকালে একটি কাগজপ্রস্তুতকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। ক্রমে ক্রমে কাগজশিল্প সমগ্র আরব উপনিবেশে বা সারা মধ্য প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বাগদাদের পর কাগজশিল্পের পরবর্তী কেন্দ্র গড়ে ওঠে দামাস্কাসে। সেখান থেকে এই শিল্প পশ্চিমের পথে মিশর হয়ে মরক্কোয় গিয়ে পৌঁছয়। পরবর্তীকালে সেখান থেকেই কাগজশিল্প স্পেন হয়ে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ সমূহে প্রসারিত হয়। আনুমানিক ১১০০ খ্রীস্টাব্দে মরক্কো থেকে মুররা (Moors) ইউরোপে কাগজের প্রচলন করেন। ইংলণ্ডে হার্টফোর্ডশায়ারে (Hartfordshire) প্রথম কাগজ প্রস্তুত হয় ১৪৯০ খ্রীস্টাব্দে। ভারতেও প্রধানত আরব ও পারসীকদের মারফতই ব্যাপকভাবে কাগজ আসা শুরু হয় ও তারপর থেকে ধীরে ধীরে এদেশে কাগজশিল্প গড়ে ওঠে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বাংলায় প্রচলিত 'কাগজ' শব্দটি আরবী শব্দ, যা মূলত চীনা 'কায়গদ' শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

কাগজের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'পেপার' (paper) শব্দের উৎপত্তি 'প্যাপিরাস' (papyrus)

---

১ *'Paper Making'*, **pub. by the Tech. Sec. of the British Paper and Board Makers' Assen., London, 1965. pp. 2-3.**

থেকে। প্যাপিরাস ছিল মিশরে নীল নদের তীরে জলা অঞ্চলে জাত হোগলার মতো একপ্রকার তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদের সরু সরু লম্বা ফালি জুড়ে যে ঘন সন্নিবিষ্ট পাত্‌লা চাদর (sheet) তৈরি হত, এককালে মিশর দেশে লেখবার উপকরণ হিসাবে তার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। নবম শতাব্দীতে মিশরে কাগজশিল্পের অনুপ্রবেশের ফলে সেখানে তিন হাজার বছরের পুরনো এই প্যাপিরাসের কদর কমে আসে। মিশর থেকে গ্রীস ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশেও প্যাপিরাস প্রচলিত হয়েছিল। এটি শস্তা ও সহজলভ্য হওয়ায় লেখার কাজে তৎপূর্বে প্রচলিত তামার পাত বা বাচ্চা ছাগল ভেড়া বা বাছুরের চামড়া থেকে তৈরি পার্চমেন্টের ব্যবহার সেখানে কমে আসে। বই-বাঁধাই প্রভৃতি কাজে অবশ্য পার্চমেন্টের ব্যবহার চালু থাকে। কালক্রমে পাশ্চাত্য দেশেও প্যাপিরাসের পর্ব শেষ হয়ে যায়, তার পরিবর্তে শুরু হয় মধ্য প্রাচ্য থেকে আসা কাগজের ব্যবহার।[১]

ভারতে পুঁথিপত্র লিখনের আদিপর্বে এদেশে সহজলভ্য তালপাতা ও ভূর্জপত্র দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। তা ছাড়া মাড় মাখানো কাপড়ও লেখার কিছু কিছু কাজে ব্যবহৃত হত। তবে সপ্তম অষ্টম শতাব্দী থেকেই তিব্বত নেপাল মারফত ভারতে কিছু কিছু কাগজ আসতে শুরু করে। হয়ত বা চীন থেকেও এদেশে কাগজ আমদানী হত। আরো কিছু পরে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার নানা দেশ থেকেও এখানে কাগজ এসেছে। ভারতে প্রথম সম্ভবত কাশ্মীরে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাগজ তৈরির সূত্রপাত। তারপর পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে কাগজশিল্প গড়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে মুঘল আমল থেকেই ভারতে কাগজশিল্প প্রতিষ্ঠা ও কদর লাভ করতে থাকে। কিন্তু কাগজের সঙ্গে সঙ্গে ভূর্জপত্র ও তালপাতার ব্যবহারও অক্ষুণ্ণ থাকে। পরিশেষে তার সমাপ্তি ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে মুদ্রণের প্রসার ও কলে তৈরি কাগজের প্রবর্তনের ফলে। মুদ্রণ ও কাগজের যৌথ জয়যাত্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক নবজাগরণ শুরু হয়।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, ভারতে আধুনিক কাগজশিল্পের সূত্রপাত শ্রীরামপুরে। ব্রিটিশ ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের উদ্যোগে সেখানেই প্রথম কলে (Paper Mill) কাগজ তৈরি হয়। তার আগে এদেশে হাতে তৈরি কাগজই বহুল প্রচলিত ছিল। কাগজকলের প্রবর্তনের পরেও অবশ্য অনেককাল এদেশে হাতে তৈরি কাগজের উৎপাদন ও ব্যবহার অক্ষুণ্ণ ছিল। ক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বাংলাদেশে ভাগীরথীর উভয় তীরে ও ভারতের অন্যান্য

---

১ দুটি উল্লেখযোগ্য আকরগ্রন্থ :

(1) '*Paper Making*', pub. by the Technical Section of the British Paper and Board Makers Association. London, 1965.

(2) '*Handbook of Pulp and Paper Technology*', ed. by Kenneth W. Britt. New York, Reinhold, 1965.

স্থানে আধুনিক কাগজকলের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটতে থাকায় হাতে তৈরি কাগজের ব্যবহার ও কদর কমতে থাকে।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতে মিশনারী প্রচারকার্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায়, শ্রীরামপুরে কাগজকল স্থাপনের অনেক আগে অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে দক্ষিণ ভারতের ত্রাঙ্কবরে (Tranquebar) ভারতের প্রথম কাগজকল স্থাপনের উদ্যোগ হয়। দিনেমার মিশনারী বার্থোলেমিউ জিগেনবাল্গ্ (Bartholemew Ziegenbalg) এর নেতৃত্বে অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশক থেকেই ত্রাঙ্কবরে প্রোটেস্টান্ট মিশনারী কার্যকলাপ শুরু হয়। জিগেনবাল্গের উদ্যোগে সেখানে প্রথম মুদ্রণের প্রবর্তন হয়, মালাবার-তামিল অক্ষরে বাইবেলের অনুবাদ মুদ্রিত হয়। ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে জিগেনবাল্গের ভারত আগমনের পর থেকে নয় দশ বৎসরের মধ্যে তাঁর ও অন্যান্য সহযোগী মিশনারীদের লেখা চিঠিপত্র সম্বলিত '*Propagation of the Gospel in the East*'-নামক গ্রন্থে ত্রাঙ্কবরে ঐ সময়কার মিশনারী কার্যকলাপের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐ সময় দিনেমার মিশন ধর্ম-প্রচারার্থে মুদ্রণের উদ্দেশ্যে ত্রাঙ্কবরে নিজস্ব ছাপাখানা ও হরফ ঢালাইখানা গড়ে তুলেছিলেন। এরই সঙ্গে বিদেশ থেকে কাগজ আমদানী করার পরিবর্তে তাঁরা নিজস্ব কাগজকল স্থাপনেও উদ্যোগী হন। কাগজকল সম্বন্ধে তাঁদের চিন্তাভাবনার প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় ২৭ সেপ্টেম্বর ১৭১৪ তারিখে লেখা তাঁদের একটি চিঠিতে : 'The scarcity of paper has hindered us from pursuing the Impression to the End of the Epistles : For of the 75 ream of the largest paper you were pleased to send us last year, only six remain ;...For the setting up of a Paper Manufacture here, though we do not think it altogether impracticable, yet our perpetual want of money has not permitted us hitherto to attempt any such thing...'[১] এর কিছুকাল পরে ত্রাঙ্কবর থেকেই ১৬ জানুয়ারি, ১৭১৬ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে Grundler জানান যে তাঁরা কাগজকল স্থাপনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন : 'We are now very busie in building a Paper Mill, for the benefit of the Mission. Our Honourable Governor defrays half the expense, and I, on the Mission's account, the other half. The timber-work belonging to this Fabrick is finished and a few after we begin the Edifice itself. If this Design under God meets with success, it will be very advantageous both to this Mission and to all

১ '*Propagation of the Gospel in the East*', 3rd ed., Lond., 1718 ; A. K. Priolkar, '*Printing Press in India*'-গ্রন্থে উদ্ধৃত।

India'.[১] [মুহম্মদ সিদ্দিক খান লিখেছেন[২] যে ত্রাঙ্কবরে প্রথম কাগজকল স্থাপিত হয় ১৭০৬ সালে। এ তারিখ ঠিক নয়। ১৭১৬ খ্রীস্টাব্দের আগে নিশ্চয়ই ঐ কাগজকল স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি।]

ত্রাঙ্কবরের কাগজকল সম্বন্ধে এ ছাড়া আর বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। উনবিংশ শতকে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশনের কাগজকলের চেয়ে দিনেমার মিশন প্রতিষ্ঠিত ত্রাঙ্কবরের এই কাগজকলটি অনেক পূর্ববর্তী হলেও সারা ভারতের কাগজশিল্পে এর প্রভাব তেমন অনুভূত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় কাগজ শিল্পে আধুনিক যান্ত্রিকতার প্রবর্তন শ্রীরামপুর থেকেই। সেখানকার কাগজকলের ধারা অনুসরণ করেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কাগজকল প্রসারিত হতে থাকে।

শ্রীরামপুরে কাগজকল প্রবর্তনের আগেও অবশ্য এদেশে যথেষ্ট পরিমাণ কাগজ উৎপাদন হত। তবে তা সবই ছিল হাতে তৈরি কাগজ। পুঁথিপত্র থেকে আরম্ভ করে চিঠিপত্র, দলিল, দানপত্র ইত্যাদি এই কাগজেই লেখা হত। [প্রাক-মুদ্রণ পর্বে এইরূপ হাতে লেখা কাগজের পুঁথি অবশ্য খুবই মহার্ঘ ছিল। ওয়ার্ড এর বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, তখন হিন্দুদের পুঁথি-নকলকারীদের প্রতি ৩২,০০০ অক্ষরের জন্য বারো আনা থেকে এক টাকা মজুরী দিতে হত, তার উপর ছিল কাগজের মূল্য। ফলে হাতে লেখা বইয়ের (পুঁথির) দাম তখন খুবই বেশি পড়ে যেত। ঐ হিসাবে এক কপি মহাভারতের দাম দাঁড়ায় ষাট টাকা, রামায়ণ চব্বিশ টাকা, শ্রীমদ্ভাগবত আঠারো টাকা, ইত্যাদি।][৩] বাংলাদেশে মুদ্রণের প্রথম যুগেও এই হাতে তৈরি কাগজে ছাপার কাজও চলত। তুলো থেকে তৈরি তুলোট কাগজ সে সময় এদেশে খুবই জনপ্রিয় ছিল। এই তুলোট কাগজের কদর কাগজকল প্রবর্তনের পরেও অনেক কাল অব্যাহত ছিল। তবে শ্রীরামপুর মিশনারীরা তাঁদের মুদ্রণের প্রথম পর্বে পাটনাই কাগজ (Patna Paper) নামে এক ধরনের হাতে তৈরি কাগজ ব্যবহার করতেন। পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশের পাটনা, গয়া, সাসারাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে তখন এই কাগজ কলকাতার বাজারে আসত। এই কাগজ সাধারণত একটু অমসৃণ মোটা ধরনের হত। ব্লটিং কাগজের মতো তা কিছুটা সচ্ছিদ্র (porous) পুরু খসখসে ছিল। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা প্রথমদিকের কিছু বই, যেমন, 'ধর্ম্মপুস্তক' (১৮০১), কেরী সম্পাদিত 'কথোপকথন' (১৮০১), রামরাম বসুর 'লিপিমালা' (১৮০২), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২) প্রভৃতি এই হাতে তৈরি পাটনাই কাগজে ছাপা। তবে এই দেশী কাগজের স্থায়িত্ব,

---

১ *Ibid.*

২ মুহম্মদ সিদ্দিক খান, তদেব, পৃ. ১৩৮।

৩ William Ward, *'A view of the history, literature and mythology of the Hindoos'*, Vol. I; 2nd ed., 1818, p. 599.

উৎকর্ষ বা কার্যকারিতা সম্বন্ধে হয়ত মিশনারীরা সন্দিহান ছিলেন, তাই তাঁরা অনেক সময় তাঁদের এইসব বইয়ের কিছু সংখ্যক কপি বিদেশ থেকে আমদানী করা উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপতেন, বাকি অংশ দেশী কাগজে ছাপতেন। যেমন, তাঁরা বাংলা নিউ টেস্টামেণ্টের প্রথম সংস্করণ (১৮০১) ৩০০ কপি বিদেশী কাগজে ও ১৭০০ কপি দেশী কাগজে ছেপেছিলেন। প্রসঙ্গটি কেরী, ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারীরা বিলেতে সোসাইটিকে প্রকাশনা শেষ হবার আগেই লিখে জানান : 'We print seventeen hundred on Bengali paper and three hundred on the English paper sent ; so that we have all this Bengali paper to purchase as we want it'...[From the Missionaries to the Society, Serampore, October 10, 1800.][১]

তবে এইসব হাতে তৈরি দেশী কাগজ কি সত্যিই খুব খারাপ ছিল ? বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাগারে শ্রীরামপুর মিশনের প্রথম পর্বে ছাপা যে কয়টি বইয়ের সন্ধান আজও পাওয়া যায় তাদের কয়েকটিতে ব্যবহৃত কিছু কিছু দেশীয় কাগজের গুণাবলী দেখে বিস্মিত হতে হয়—প্রায় পৌনে দুশো বছরের নির্মম ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে সেগুলি এখনো যতটা অক্ষত উজ্জ্বল আছে তা দেখে মনে হয় তখনকার এ দেশীয় হাতে তৈরি কাগজশিল্পের মান নিতান্ত অনুন্নত ছিল না।

শ্রীরামপুর মিশনারীরা তাঁদের বিভিন্ন প্রতিবেদনে সমসাময়িককালের হাত তৈরি দেশী কাগজের নানা কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা দিয়ে গেছেন। তা থেকে ঐ সময়কার কাগজ শিল্পের নানা সমস্যা, হাতে তৈরি দেশী কাগজের বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি, আরো উন্নত ধরনের কাগজের চাহিদা, কাগজকল স্থাপনের আশু প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে তাঁদের চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। কেরীর জীবনীকার জর্জ স্মিথ প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে লিখেছেন যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের পত্তনকালে বাজারে যে একমাত্র দেশী পাটনাই কাগজ পাওয়া যেত তা ছিল বিবর্ণ, সচ্ছিদ্র, খসখসে ; কিন্তু এই কাগজেই তাঁদের বাংলা নিউ টেস্টামেণ্ট ইত্যাদি ছাপা শুরু করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, কারণ তখন কলকাতার বাজারে বিদেশ থেকে আমদানী করা কাগজের সরবরাহ ছিল অত্যন্ত অনিয়মিত, আর তার দামও অত্যন্ত চড়া। দেশী কাগজের আরো একটি বড়ো অসুবিধা ছিল। এগুলিতে ভাতের ফ্যানের ('rice paste') যে মাড় বা কলপ ('size') মাখানো হত, তার ফলে সহজেই নানা ধরনের পোকামাকড় এতে আকৃষ্ট হত ও অচিরে কাগজগুলিকে নষ্ট করে ফেলত। এমন-কি অনেক বই ছাপতে গিয়ে দেখা গেছে তার শেষ পৃষ্ঠাগুলি ছাপা সম্পূর্ণ হতে না হতে প্রথম দিকে ছাপা কাগজগুলি পোকায় কেটে ফেলেছে। ['At first Carey was compelled to print his Bengali Testament on a dingy, porous, rough substance

---

১ **Eustace Carey,** ***op. cit.*****, p. 404.**

called Patna paper. Then he began to depend on supplies from England, which in those days reached the press at irregular times, often impeding the work, and was mostly costly. This was not all. Native paper, whether mill or hand made, being sized with rice paste, attracted the book-worm and white ant, so that the first sheets of a work which lingered in the press were sometimes devoured by these insects before the last sheets were printed off.'[১]

দেশী কাগজের রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থায়িত্বের এইসব সমস্যা মিশনারীদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল। পোকার হাত থেকে কাগজকে বাঁচাবার জন্য কেরী তাঁর লেখার কাগজে আর্সেনিক মিশ্রিত এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে নিতেন। [মিশনারীদের ব্যবহারের আগে থেকেই অবশ্য এ দেশীয় হিন্দুরা তাঁদের পুঁথি লেখার কাজে ব্যবহৃত তুলোট কাগজে এইরূপ আর্সেনিক মিশ্রিত রাসায়নিক পদার্থ ও তেঁতুল বীচির রস মেশাতেন। হিন্দুদের রীতিনীতি ঐতিহ্য সম্বন্ধে লেখা উইলিয়ম ওয়ার্ডের বিখ্যাত বইয়ে এর উল্লেখ আছে। ওয়ার্ড লিখেছেন: 'The paper on which books are writteen, called toolat, is coloured with a preparation composed of yellow orpiment and the expressed juice of tamarind seed, to preserve it from insects'.[২] এই 'yellow orpiment' এক ধরনের হলদে রঙের আর্সেনিক পদার্থ, যার রাসায়নিক পরিচয়— 'trisulphide of arsenic'।] এতে কাগজের ('arsenicated paper') রঙ অনেকটা হলদেটে হয়ে যেত বটে, কিন্তু তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হত। কেরীর হাতে লেখা বহুভাষিক অভিধানের ('Polyglot Dictionary') যে কয়টি খণ্ড এখনো শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে, তার কাগজগুলি আজও তাই অক্ষত রয়েছে। দেশী কাগজকে উপযুক্তভাবে রক্ষণের সমস্যা ছাড়াও এর খসখসে মোটা গড়ন, এর বিবর্ণতা বা ছিদ্রবহুলতা, ইত্যাদি ত্রুটিগুলি নিয়েও মিশনারীরা অনেক চিন্তা করেন এবং মুদ্রণের উপযোগী আরো উন্নত ধরনের কাগজ তৈরির জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে থাকেন। পরিশেষে তাঁরা তাঁদের নিজেদের প্রয়োজনীয় কাগজ নিজস্ব যন্ত্রচালিত কলে তৈরি করতে সমর্থ হন।

নিজস্ব বাষ্পচালিত কাগজকল স্থাপনের আগে থেকেই শ্রীরামপুর মিশনারীরা তাঁদের ছাপাখানার কাজের সঙ্গে সঙ্গে কাগজ উৎপাদনও শুরু করেন। প্রথমত তাঁরা দেশীয় কাগজী বা কাগজশিল্পীদের নিয়োগ করে তাঁদের সাহায্যে দেশীয় পদ্ধতিতেই কাগজ উৎপাদন শুরু

---

১ George Smith, *op. cit.* pp. 182-83.

২ William Ward, *op. cit.*, p. 599 : quoted by K. S. Diehl,' '*Early Indian Imprints*' Introduction.

করেন। কেবল দেশীয় পদ্ধতিতে ছিদ্রবহুলতা দূর করার জন্য বা মসৃণতা আনয়নের জন্য কাগজের উপর যে গম বা ভাতের ফ্যান ('conjee or rice gruel') জাতীয় মাড় ('sizing') ব্যবহার করা হত, মিশনারীরা তা বন্ধ করে দেন। পোকার হাত থেকে কাগজকে রক্ষা করার জন্যই মিশনারীরা এই চালের মাড় ব্যবহার তুলে দেন, অবশ্য এতে অভিপ্রেত সাফল্য পুরোপুরি হয়নি। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারী, পরবর্তীকালের প্রখ্যাত লেফটেন্যান্ট গভর্নর Thomason এদেশে কাগজ তৈরির ইতিহাস সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কেরীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে প্রত্যুত্তরে কেরী তাঁকে যে প্রতিবেদন পাঠান তা থেকেই পূর্বোক্ত তথ্যগুলি জানা যায়। দেশীয় পদ্ধতিতে কাগজ তৈরির বর্ণনা দিয়ে কেরি লেখেন যে প্রথমে পাট বা শণকে চুন বা ক্ষারমিশ্রিত জলে ভালো করে ভিজিয়ে নিয়ে ঘাসের উপর বিছিয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হত। তারপর সেগুলিকে ঢেঁকিতে কুটে তন্তুগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তা থেকে সহজেই মণ্ড (pulp) প্রস্তুত হত। পরে এই মণ্ড একটি গামলায় জলে গুলে নেওয়া হত। এইভাবে যে থকথকে তরল ক্বাথ পাওয়া যেত, তা থেকেই কাগজ প্রস্তুত হত। কাগজের অভিপ্রেত মাপ অনুযায়ী বাঁশের বা মাদুরের সরু সরু কাঠি দিয়ে তৈরি ছাকনির মতো 'মীর' ('lifting mat') সহ 'খানসী'টিকে ('paper lifting frame') এরপর ডুবিয়ে দেওয়া হত ঐ গামলায়।[১] সারা 'মীরের' (ছাকনির) উপর কাগজের ক্বাথ সমভাবে বিস্তৃত হয়ে লেগে যেত, তখন 'খানসীটি' তুলে ঘাসের ওপর রেখে ধীরে ধীরে খানসী ও মীর তুলে নিয়ে কাঁচা কাগজ রোদে শুকিয়ে নিলেই পাতলা চাদরের আকারে শক্ত কাগজ পাওয়া যেত। মিশন প্রেসে দেশীয় কাগজ প্রস্তুত প্রণালী এই পর্যন্তই অনুসৃত হত। কিন্তু দেশীয় কাগজীদের মূল পদ্ধতি অনুযায়ী এরপরেও আরো কিছু কাজ বাকি থাকত। সেটি হল কাগজে মাড় বা কলপ মাখানো (sizing),— মূলত কাগজের ছিদ্রবহুলতা (porosity) কমানো ও মসৃণতা ('glaze') বাড়ানোই এর উদ্দেশ্য। কাগজের কয়েকটি চাদরকে একসঙ্গে কোণের দিকে ধরে ভাতের ফ্যান ('conjee') জাতীয় মাড়ের মধ্যে ডুবিয়ে তুলে নেওয়া হত, তারপর সেগুলিকে শুকিয়ে ভাঁজ করে, দুটি পাটাতনের মাঝখানে রেখে উপর থেকে ভারী পাথরের চাপ দেওয়া হত। তারপর কাগজগুলিকে বার করে নিয়ে প্রয়োজন মতো ঘষে (মসৃণ পাথর, বড়ো কড়ি বা শাঁখের সাহায্যে) মসৃণ করাও হত। [উইলিয়ম কেরীর মূল প্রতিবেদনে প্রসঙ্গটি বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে : 'A quantity of 'Sunn', viz. the fibres of Crotalaria Juncea, was steeped repeatedly in lime water, and then exposed to the air by spreading it on the grass ; it was also repeatedly pounded by the 'dhenki' or pedal, and

১ কাগজশিল্পের এই সব বিশেষ বাংলা পরিভাষাগুলি পঙ্কজকুমার দত্ত লিখিত 'ভারতে কাগজের প্রচলন ও কাগজ তৈরীর ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধে [গ্রন্থাগার, আষাঢ়-ভাদ্র ১৩৭৪] ব্যবহৃত হয়েছে।

when sufficiently reduced by this process to make a pulp, it was mixed in a 'gumla' with water, so as to make it of the consistence of thick soup. The frames with which the sheets were taken up were made of mat of the size of a sheet of paper. The operator sitting by the 'gumla' dipped this frame into the pulp, and after it was drained gave it to an assistant, who laid it on the grass to dry : this finished the process with us ; but for the native market this paper is afterwards sized by holding a number of sheets by the edge and dipping them carefully in 'conjee' so as to keep the sheets separate. They are afterwards dried, folded, and pressed by putting them between two boards, the upper board of whtch is loaded with one or many large stones'.][১]

এই দেশী কাগজ প্রস্তুত প্রণালী ব্রিটিশ মিশনারীদের তত্ত্বাবধানে, মূলত উইলিয়ম ওয়ার্ডের নির্দেশে, আরো কিছু উন্নত ও দ্রুতগতিসম্পন্ন করা হয়। ব্রিটিশ পদ্ধতিতে কাগজের মণ্ডকে যন্ত্রচালিত কলের সাহায্যে তৈরি করা হত। ঐ মণ্ডকে বড়ো চৌবাচ্চা বা 'হাউজে'র (cistern) মধ্যে ফেলে ক্বাথ তৈরি হত। তারপর সরু তারের জাল দিয়ে তৈরি ছাকনিতে (মীর সহ খানসীতে) ঐ ক্বাথ তুলে মোটামুটি শুকিয়ে নেওয়া হত। শুকনো কাগজের চাদরগুলিকে তখন পাশাপাশি ঝুলিয়ে সম্পূর্ণ শুকিয়ে ফেলা হত ও তারপর প্রয়োজন হলে উপযুক্ত মাড় লাগানো হত। পরবর্তীকালে শ্রীরামপুরে যখন বাষ্পচালিত যন্ত্রের কাগজকল চালু হয়, তখন যন্ত্রের সাহায্যেই দ্রুত কাগজের মণ্ড তৈরি হত, তারপর তরলাকারে সেটি সরু তারের জালের উপর দিয়ে প্রবাহিত করানো হত। সঙ্গে সঙ্গে সেটি পাশাপাশি সাজানো কয়েকটি ঘূর্ণায়মান গোলাকৃতি আধারের (cylinder) উপর দিয়ে চালিত হত এবং বাষ্পের দ্বারা উত্তপ্ত শেষ আধারটি (cylinder) অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে শুকনো পাতলা কাগজের চাদর কলের শেষ প্রান্ত থেকে নির্গত হত। এইভাবে তরল কাগজের মণ্ড থেকে ব্যবহারোপযোগী শুকনো কাগজের চাদর তৈরি হতে সময় লাগত মাত্র মিনিট দুয়েক।

শ্রীরামপুরে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নিজস্ব কাগজ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার ইচ্ছা মিশনারীদের গোড়া থেকেই ছিল। মূলত বিদেশ থেকে আমদানী করা কাগজের দাম অত্যন্ত চড়া ও তার সরবরাহ অনিয়মিত অনিশ্চিত হওয়ায় এবং অপরদিকে দেশী কাগজের মান মুদ্রণের পক্ষে সন্তোষজনক না হওয়ায় মিশনারীরা অল্প খরচে নিজেদের প্রয়োজন মতো মুদ্রণের উপযোগী কাগজ নিজেরাই তৈরি করে নিতে উদ্যোগী হন। সেই উদ্দেশ্যে ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কেরী ও তাঁর সহযোগীরা বিলেতে ব্যাপটিস্ট

১ George Smith, *op. cit.*, pp. 231-32,

মিশনারী সোসাইটিকে (B.M.S.) অনুরোধ করে লেখেন যাতে একজন মিশনারীকে কাগজ-শিল্পে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে অবিলম্বে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়।[১] কিন্তু বিলেত থেকে তাঁরা এমন কোনো কাগজশিল্পে অভিজ্ঞ মিশনারীকে শ্রীরামপুরে পাঠাতে পারেননি। কেরী অবশ্য তাতে কিছুমাত্র দমলেন না। তিনি আবার পরের বছরেই, ২২শে আগস্ট ১৮০৫ তারিখে, বিলেতে সাটক্লিফকে চিঠি লিখে পাঠালেন, যাতে অন্তত কাগজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি শ্রীরামপুরে পাঠানো হয়।[২] এই ধরনের অবিরাম প্রচেষ্টা চালাবার পর অবশেষে ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা জোশুয়া রো (Joshua Rowe) নামক জনৈক ব্রিটিশ ব্যাপটিস্ট মিশনারীর সহায়তায় শ্রীরামপুরে প্রথম কাগজ উৎপাদন শুরু করেন। বছর দুয়েকের মধ্যে তাঁদের এই কাগজকল আরো সম্প্রসারিত হয়। ১৮১১ খ্রীস্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি জোশুয়া রো সাটক্লিফকে একটি চিঠিতে জানান যে শীঘ্রই তাঁরা বই বাঁধাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় মোটা স্তরিত বোর্ড (laminated paste board) নিজেরাই তৈরি করবেন, ফলে নিজেদের তৈরি ছাপার কালির মতো এগুলোও আর আমদানীর সমস্যা থাকবে না।[৩] শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানার সকল বিভাগের মতো এই কাগজকলেরও সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন উইলিয়ম ওয়ার্ড। উন্নততর মানের কাগজ নির্মাণের জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, শ্রীরামপুর মিশনারীরা কাগজে মাড় দেওয়ার (sizing) সমস্যা নিয়ে খুবই বিব্রত ছিলেন। দেশীয় প্রথায় ভাতের ফ্যানের মাড় দেওয়ায় কাগজে তাড়াতাড়ি পোকা লাগার সম্ভাবনা থাকায় তাঁরা অন্য কোনো মাড় (size) উদ্ভাবনের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে থাকেন। ১৮১১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ওয়ার্ড *Calcutta Post* পত্রিকায় প্রকাশার্থে সম্পাদকের কাছে একটি চিঠিও লেখেন, তাতে তিনি কাগজে লাগানো যেতে পারে এমন উপযুক্ত কার্যকরী স্বচ্ছ মাড় সম্বন্ধে পাঠকদের নতুন কোনো প্রস্তাব (suggestion) বা মতামত জানানোর জন্য অনুরোধ করেন।[৪] পরিশেষে ১৮১১ খ্রীস্টাব্দের শেষ নাগাদ তাঁরা কাগজের মাড় (size) সংক্রান্ত সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে বার করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার আনুষঙ্গিক সমস্যা, অর্থাৎ কাগজের বিবর্ণতা রোধের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান তখনও করা সম্ভব হয়নি। শ্রীরামপুর মিশনে সে বিষয়ে ও কাগজ

---

১ *B. M. S. MSS.*, Carey and others to B. M. S., Serampore, 25 September, 1804 ; E. D. Potts, *op. cit.*, p. 111.

২ *B. M. S. MSS.*, Carey to John Sutcliffe, Calcutta, 22 August, 1805 ; E. D. Potts, *ibid*, p. 111.

৩ *B. M. S. MSS.*, Joshua Rowe to John Sutcliffe, Serampore, 6 Jan. 1811 ; E. D. Potts, *op. cit.*, p. 111

৪ *B. M. S. MSS.* copy, Ward to the Editor of the *Calcutta Post*, n. p. 28 Jan. 1811 ; E. D. Potts, *op. cit.*, p. 111.

উৎপাদনের আরো অন্যান্য সমস্যা নিয়ে— মূলত সস্তায় উন্নত মানের কাগজ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। শ্রীরামপুর অঞ্চলে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও শ্রম-মজুরী সস্তা হওয়ায় মিশনারীরা কাগজশিল্প নিয়ে গবেষণার কাজে উৎসাহিত হতে পেরেছিলেন। মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রায় বারো বছর ধরে প্রচেষ্টা চালাবার পর ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে মিশনারীদের সপ্তম স্মৃতিকথায় (*7th Memoir*, 1820) দাবি করা হয় যে শ্রীরামপুরে যন্ত্রচালিত কাগজকল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেখানে সম্পূর্ণ দেশীয় কাঁচামাল থেকে যে কাগজ উৎপাদন হয় তা বিদেশী কাগজের মতোই নানা গুণসম্পন্ন, তা পোকায় নষ্ট হয় না এবং তা বেশ মজবুত, তবে রঙ ততটা শুভ্র নয়। [···'Paper equally impervious to the worm with English paper, and of a firmer texture, though inferior in colour, is now made of materials the growth of India. In these various experiments, however, including a steam engine and paper mill, full fifty thousand rupees have been expended···'][১] তবে অবশ্য সমসাময়িক কিছু কিছু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিবেদনে বলা হয়, শ্রীরামপুর মিশনের তৈরি কাগজের মান বিদেশী কাগজের মানের তুলনায় কোনোদিনই খুব উন্নত হতে পারেনি। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়ম এডাম (William Adam) বলেন মিশনের তৈরি সুন্দর হরফগুলি নিম্নমানের কাগজে ছাপার ফলে অনেকটা ম্লান হয়ে পড়ে।[২] ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি কমিটিও এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে এলে পিটার গর্ডন তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে মিশনের তৈরি কাগজ ছিল সাধারণত মোটা খসখসে ও নিম্নমানের।[৩]

যাই হোক, কাগজের মান নিয়ে এইরূপ মতান্তর থাকলেও শ্রীরামপুর মিশনই যে ভারতে যান্ত্রিক উপায়ে কাগজ উৎপাদনে পথ প্রদর্শক ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁদের ছাপাখানার পাশেই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটি জায়গায় এই কাগজকল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে সৌভাগ্যক্রমে এই কাগজকলটি বেঁচে যায়। মিশনারীরা যান্ত্রিক উপায়ে কাগজ তৈরির জন্য প্রথম যে 'কল' বা 'trade-mill' বসিয়েছিলেন তাতে কাঁচামাল জোগান দেবার জন্য পর্যায়ক্রমে চল্লিশ জন দেশীয় কর্মী কাজ করতেন। পায়ে চালিত ঐ কলে (হলাণ্ড থেকে আনীত পেষণযন্ত্রে) কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত তন্তুময় বস্তুকে কুটে বা পিষিয়ে কাগজের মণ্ড তৈরি করা হত। একবার এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় এই যন্ত্রে একজন শ্রমিকের মৃত্যু হওয়ায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ভবিষ্যতে এইরূপ দুর্ঘটনা

---

১ *Seventh Memoir*, 1820 ; K. S. Diehl, '*Early Indian Imprints*', Introduction.

২ Adam and Roy, '*Correspondence*', p. 74 ; E. D. Potts, *op. cit.*, p. 111.

৩ *Parliamentary Papers* (House of Commons) 1831, V. 128, testimony of Peter Gordon before a Select Committee on the Affairs of the East India Co., 24 March, 1831 ; E. D. Potts, *op. cit.*, p. 111.

এড়াবার কথা চিন্তা করতে গিয়ে পরিশেষে মিশনারীরা উইলিয়ম জোন্‌স নামক জনৈক বিশেষজ্ঞের (ইনিই প্রথম রানীগঞ্জে কয়লাখনির কাজ চালু করে বিখ্যাত হন) পরামর্শক্রমে বাষ্পচালিত যন্ত্রের (Steam-engine) সাহায্যে কাগজকল চালানোর প্রথা প্রচলন করেন। বোল্টনের Thwaites and Rothwell কোম্পানী নির্মিত বারো অশ্বশক্তি সম্পন্ন একটি স্টীম ইঞ্জিন বিলেত থেকে আমদানী করে প্রথম শ্রীরামপুরে বসানো হয় কাগজকল চালানোর কাজে। পেষণযন্ত্র চালানো ও কাগজ শুকাবার কাজে বাষ্পচালিত যন্ত্রটিকে ব্যবহার করা হত। বহু ঐতিহাসিকের মতে, এইটিই ছিল ভারতবর্ষে ব্যবহৃত প্রথম স্টীম ইঞ্জিন।[১] ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে মার্চ তারিখে শ্রীরামপুরে প্রথম এই স্টীম ইঞ্জিন চালিত কাগজকল চালু হয়। মিশনের ইতিহাসে ঐ তারিখটি ছিল একটি স্মরণীয় দিন। কৌতূহলী অসংখ্য দেশীয়দের ভিড় জমে গেছিল এই অভিনব যন্ত্রটিকে দেখতে। তাঁরা মুখে মুখে এর নাম দিয়েছিলেন 'আগুনের যন্ত্র' ('machine of fire')। এদেশবাসী বহু ইউরোপীয়ও সেদিন এসেছিলেন এই অদৃষ্টপূর্ব যন্ত্রটিকে দেখতে। তাঁরা এর অনুকরণে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। যে বিদেশাগত যন্ত্রবিদ্‌ এটি চালানোর জন্য এসেছিলেন, কৌতূহল ও প্রশ্নের আলোড়নে তিনি যেন অধীর হয়ে পড়েন। এইভাবে এক অননুভূত রোমাঞ্চ ও উত্তেজনাময় পরিবেশে সেদিন শ্রীরামপুরে ভারতবর্ষের কাগজনির্মাণ ইতিহাসের আধুনিক পর্বের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়। সেদিন থেকে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামপুরের ঐ কাগজকলটিই ভারতবর্ষে আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাগজনির্মাণের একমাত্র উৎস ছিল। অবশ্য ততদিনে মিশনারীরা বিদায় নিয়েছিলেন, কিন্তু কাগজকলটি অব্যাহত ছিল। বন্দুকের টোটা তৈরির কাজে ব্যবহৃত যে চর্বিযুক্ত কাগজকে উপলক্ষ করে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল, সেই বিতর্কিত কাগজও তৈরি হত এই শ্রীরামপুরের কাগজকলে। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে হাওড়া জেলার বালিতে দি রয়্যাল পেপার মিল কোম্পানী স্থাপিত হলে শ্রীরামপুর কাগজকলের যন্ত্রপাতি সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। এর ৩৮ বছর পরে টিটাগড় পেপার মিলস্‌ বালি পেপার মিলের স্বত্ব কিনে নিলে শ্রীরামপুরের ঐ ঐতিহাসিক যন্ত্রাদি টিটাগড়ে স্থানান্তরিত হয়। যাই হোক, সে অনেক পরের কথা।

প্রসঙ্গত একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রথম স্টীম ইঞ্জিন ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুরে কাগজকল চালানোর কাজেই প্রথম ব্যবহৃত হয়— বহুকাল প্রচলিত সর্বস্বীকৃত এই ধারণা সম্বন্ধে ইদানীং সন্দেহের অবকাশ দেখা দিয়েছে। Commonwealth Relations Office-এ রক্ষিত ভারত সরকারের সেনা বিভাগীয় পুরনো হস্তলিখিত

১ 'This was the first ever erected in India, and it was a purely missionary locomotive'. (George Smith, *op. cit.*, p. 183.) জে. সি. মার্শম্যানও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। (J. C. Marshman, *op. cit.*, Vol. II, p. 225.)

দলিল [২৭শে মার্চ ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল মিণ্টো কর্তৃক লণ্ডন বোর্ডে প্রেরিত প্রতিবেদন : *C. R. O. MSS* ; 'Bengal Letters Received', Vol. 54, letter in the Military Dept. from the Governor General in Council (Minto) to the Court of Directors, Fort William, 27th March 1809.] উদ্ধার করে জানা যায় যে ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষে সরকারী সেনাবিভাগের কাজে স্টীম ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়েছিল।[১] অবশ্য এই তথ্যোদ্ধারের ফলে ভারতবর্ষে স্টীম ইঞ্জিন চালিত প্রথম আধুনিক কাগজকল প্রবর্তনের কৃতিত্বের যে গৌরব শ্রীরামপুর মিশনারীদের প্রাপ্য তা অক্ষুণ্ণই থাকে।

১৮১২ সালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

বাংলা মুদ্রণের বিকাশ পর্বে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের বহুধা বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের যে পর্যালোচনা এতক্ষণ করা হল তার পরিশেষে সেই ছাপাখানার ইতিহাসের এক ভয়াবহ দুর্যোগের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। নিছক কোনো ঘটনা বর্ণনা বা ঐতিহাসিকতার স্বার্থে যে তা প্রয়োজন এমন নয়, সেদিনকার ঐ দুর্যোগের আকস্মিকতা ও ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে তাকে দুর্জয় শক্তিতে অতিক্রমণের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে মিশন প্রেস সেদিন যে বিপুল প্রাণ-শক্তির পরিচয় দিয়েছিল তার সম্যক তাৎপর্য উপলব্ধির জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা প্রয়োজন।

১৮১২ সালের ১১ই মার্চ নিদাঘ পীড়িত সন্ধ্যায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে যখন কর্মবিরতির শ্রান্তি নেমে এসেছে, তাদের ছাপাখানা-দপ্তরীখানা-হরফ ঢালাইখানা-কালি ও কাগজকলের দেশীয় কর্মী ও পণ্ডিতেরা যখন সবাই ঘরে ফিরে গেছেন, কর্মাধ্যক্ষ ওয়ার্ড কেবল উত্তরদিকে নিজের অফিসঘরে স্তিমিত আলোয় বসে হিসাবের খাতাপত্র নিরীক্ষণ করছেন, সেই সময় অকস্মাৎ দক্ষিণদিকের ঘরগুলি থেকে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া উঠতে থাকে। আতঙ্কিত ওয়ার্ড ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে দেখলেন হরফ-কাগজ-ছাপা বইপত্তরে ভর্তি ঘরগুলিতে তখন আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। নিরুপায় দর্শকের ভূমিকা ছাড়া তখন আর কিছুই করার নেই—মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বিস্তৃত আগুনের তাণ্ডবলীলায় মিশনারীদের বহু বছরের সাধনা ও পরিশ্রমে গড়ে তোলা ছাপাখানা, তার বহু অমূল্য সম্পদ ও প্রায় পুরো বাড়িটি ভস্মীভূত হয়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যায় কেরী শ্রীরামপুরে ছিলেন না। পরদিন ঘটনাস্থলে ছুটে এসে সজল নয়নে ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে তিনি ক্ষয়ক্ষতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করেন। এইরূপ নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি ও ভয়াবহ দুর্যোগ যে-কোনো প্রতিষ্ঠানকে, বিশেষ করে বাংলাদেশে মুদ্রণের আদিযুগে নানা প্রতিকূল পরিবেশে গড়ে ওঠা বারো বছরের একটি শিশু মুদ্রণ-প্রতিষ্ঠানকে

১ E. D. Potts, *op. cit.*, p. 112.

নিশ্চিহ্ন করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু শ্রীরামপুর মিশন প্রেস সেদিন কেবলমাত্র আপন প্রাণশক্তির অধিকারে বিপুল উন্মাদনায় এই দুর্যোগকে কাটিয়ে উঠে আবার নব কলেবরে জেগে উঠেছিল। তাদের এই নবজাগৃতির ইতিহাস আমাদের অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছে। যে-কোনো বাধা বা দুর্যোগ কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা জাতির জীবনে নতুন পথ বা সৃষ্টির সুযোগ এনে দিতে পারে। কেবল প্রয়োজন, নতুনকে আহ্বান করে নেবার সাহস ও ভবিষ্যতের 'চ্যালেঞ্জ' বা মোকাবিলা গ্রহণ করার দৃঢ়তা। শ্রীরামপুর মিশনারীরা এই সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। তাই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে তাঁদের মুদ্রণপ্রচেষ্টা স্তব্ধ হয়ে যায়নি, বরং আরো নতুন নতুন পথে তা বিস্তৃত হয়েছিল। বাংলা মুদ্রণের নব বিস্তৃতির অনেক তথ্যের সন্ধান এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে পাওয়া গেছে। বাংলা হরফের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের তাগিদে মনোহর কর্মকার সেদিন অল্প কিছুকালের মধ্যেই যেভাবে নতুন নতুন হরফ তৈরি করে দিতে পেরেছিলেন তাতে মনে হয় ঐ দুর্ঘটনাই তাঁর প্রতিভার সম্যক বিকাশের সুযোগ এনে দিয়েছিল। ফলশ্রুতি হিসাবে সমগ্র বাংলা মুদ্রণ-প্রয়াসই উপকৃত হয়েছিল। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে অনেক পুরনো বইয়ের সংশোধিত নতুন সংস্করণ ছাপা হয়েছিল। সেদিনকার ঐ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ও তার ক্ষয়ক্ষতির খুঁটিনাটি বর্ণনা কেরী, ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রমুখ অনেক মিশনারীই লিপিবদ্ধ করে গেছেন— ঐ সব বর্ণনা সমকালীন মুদ্রণেতিহাস রচনায় আমাকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে। শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানার অনেক তথ্যবহুল পরিচয়, সেখানে ব্যবহৃত মুদ্রণযন্ত্র, মুদ্রাক্ষর, কাগজ, কালি, কাগজকল ইত্যাদি বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য ঐ অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধে মিশনারীদের মাসিক প্রতিবেদন বা সমসাময়িক পত্রিকাদিতে (যেমন 'ক্যালকাটা গেজেট') প্রকাশিত বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করা যায়। এই সব নানা কারনে ঐ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি মুদ্রণেতি-হাসের আলোচনায় গুরুত্ব অর্জন করেছে।

শ্রীরামপুর মিশনারীদের মার্চ (১৮১২) মাসের প্রতিবেদনে (Monthly Circular Letter, March 1812) অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ পাওয়া যায়। তা থেকে জানা যায় যে ভস্মীভূত ছাপাখানা বাড়িটির দাম ছিল প্রায় ৮০০০ টাকা এবং দ্রব্যমূল্যে মিশনারীদের সমগ্র ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৭৫০০ পাউণ্ড বা ৬০,০০০ টাকা। [১৯শে মার্চ ১৮১২ তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ বলা হয়, ঐ ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৭০,০০০ টাকা।][১] এ ছাড়া ক্যালকাটা বাইবেল সোসাইটির প্রায় সাড়ে আট হাজার টাকা মূল্যের (৮২৮ রীম) বিদেশী কাগজও ভস্মীভূত হয়েছিল। ছাপাখানার গুদামে ঐ সময়ে কয়েকশো রীম ইংলণ্ড থেকে আমদানী করা বিভিন্ন প্রকারের উৎকৃষ্ট কাগজ (যার দাম ছিল রীম প্রতি ২০ থেকে ৭০ টাকা), ৫০ রীম পাটনাই কাগজ ও ১০০ রীম অন্যান্য দেশী কাগজ

---

১ H. D. Sandeman, '*Selections from Calcutta Gazettes*', Vol. IV., pp. 265-66,

মজুত ছিল। তা সবই ভস্মীভূত হয়। বই বাঁধাইয়ের জন্য রক্ষিত প্রচুর পরিমাণ মার্বল কাগজ, নীল কাগজ প্রভৃতিও নষ্ট হয়। তাঁদের নিজস্ব ছাপা যে বহু সংখ্যক বই নষ্ট হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলা বই ছিল ৪০০ কপি সেণ্ট লুক, ২৪ কপি বাংলা ব্যাকরণ, ২৪ কপি কথোপকথন, ২৪ কপি রাজাবলী, ১২ কপি বত্রিশ সিংহাসন, ইত্যাদি। তাঁদের ছাপা সকল বইয়ের পুরো এক সেট যত্ন করে বাঁধিয়ে সোনার জলে নাম লিখে রাখা ছিল, সেটিও ভস্মীভূত হয়। এটি রক্ষা পেলে পরবর্তীকালে মিশন প্রেসে ছাপা বইয়ের পূর্ণ তালিকা রচনা অনেক সহজ হত। ছাপার জন্য প্রস্তুত ৭০০০ টাকা মূল্যের মূল্যবান পাণ্ডুলিপিও নষ্ট হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, কেরীর বহুভাষিক অভিধান, যার হাতে লেখা কয়েকটি মাত্র পৃষ্ঠা অক্ষত থেকে আজও শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে। এছাড়া কেরীর বাংলা অভিধানের পাণ্ডুলিপি, অনুবাদ ও রামায়ণের তিনটি সুন্দর পুঁথির ক্ষয় উল্লেখযোগ্য। বাংলা অভিধান ছাপা শুরু হয়েছিল, তাও ভস্মীভূত হয়।

অগ্নিকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির মধ্যে ছিল বিভিন্ন প্রাচ্যভাষার বহু সংখ্যক ছাপার হরফ। তার মধ্যে ছিল বারো সাট বাংলা ছাপার হরফ। [১৫টি ভারতীয় ভাষার ১৫ সাট ছাপার হরফও এই আগুনে নষ্ট হয়েছিল বলে ক্যালকাটা গেজেটের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।][১] ২২৯টি টাইপ সাজাবার আধার বা কেস ও আরো অন্যান্য মুদ্রণ সরঞ্জামও আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মিশন প্রেসের ছাপার হরফগুলি ছিল ধাতুর তৈরি, আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপে সেগুলি গলে গিয়ে গলিত ধাতু জলের স্রোতের মতো মেঝে দিয়ে গড়িয়ে বাইরে চলে এসেছিল। আগুন নিভে গেলে গলিত ধাতুপিণ্ডকে তাঁরা পুনশ্চ টাইপ তৈরির কাজেই ব্যবহার করেছিলেন। [এই বর্ণনার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করে এখনো অনেকে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে মিশন প্রেসে কাঠের তৈরি ছাপার হরফ ব্যবহৃত হত!] তবে সৌভাগ্যের কথা প্রাচ্যভাষার হরফ কাটার জন্য ইস্পাতের তৈরি 'পাঞ্চ' ও ছাঁচগুলি অক্ষত ছিল। তাঁদের দশ বছরের পরিশ্রমের ফসল এই হাজার চারেক 'পাঞ্চ' ও ছাঁচ রক্ষা পাওয়ায় অতি দ্রুত তাঁরা আবার নতুন করে প্রয়োজনীয় হরফ ঢালাই করে নিতে পেরেছিলেন। মনোহরের নেতৃত্বে ছ' মাসের মধ্যেই তাঁরা প্রাচ্যভাষার হরফের সমুদয় ক্ষতি পূরণ করে ফেলেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ আগে ছাপাখানার পাঁচটি[২] মুদ্রণযন্ত্রকে একটি আলাদা ঘরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ফলে আগুনের হাত থেকে সেগুলি সবই বেঁচে যায়। বাংলা মুদ্রণের পক্ষে তা ছিল পরম সৌভাগ্যের বিষয়। ছাপাখানার সন্নিহিত কাগজকল ও হরফ ঢালাইখানাটিও আগুনের হাত থেকে রক্ষা পায়। তবে ছাপাখানার গুদাম ঘরে রক্ষিত পঞ্চান্ন হাজার সীট বা ফর্মা ছাপা কাগজ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

---

১ *Ibid.*

২ ক্যালকাটা গেজেটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে আটটি মুদ্রণযন্ত্র : *ibid.*

ফলত আগের ছাপা প্রায় সব বইই নিঃশেষিত হয়ে যায়। মিশনারীরা নতুন উদ্যমে অল্প সময়ের মধ্যেই অবশ্য তাঁদের সংশোধিত সংস্করণ পুনশ্চ প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং ঐ অগ্নিকাণ্ড শাপে বর হয়েছিল বলা যায়। 'The fire, in truth,…had given birth to revised editions'.[১]

ধ্বংসস্তূপের হাত থেকে নতুন করে মিশন প্রেস জেগে উঠেছিল। মিশনারী ও দেশীয় কর্মীদের অদম্য উৎসাহ ও অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে অবিলম্বে পামার এণ্ড কোম্পানীর পরিত্যক্ত বাড়িতে ছাপাখানা ঘরের বন্দোবস্ত করা, প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহ করা, বিভিন্ন ভাষার ছাপার হরফ নির্মাণ (ছ' সপ্তাহে তিন সাট নতুন হরফ নির্মাণ), চার মাসের মধ্যে সাতটি ভারতীয় ভাষায় দ্বিগুণ গতিতে মুদ্রণকার্য শুরু, প্রভৃতি পুনরভ্যুত্থানের বিভিন্ন কাজ অচিরে শ্রীরামপুর মিশনে প্রত্যক্ষ করা গেল। তদুপরি মিশনের সাহায্যার্থে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে বহু মানুষ মুক্তহস্তে দান নিয়ে এগিয়ে এলেন। ফলে ছ'মাসের মধ্যেই ক্ষয়ক্ষতির সমপরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়ে গেল। শুরু হল নতুন উদ্যমে মিশন প্রেসের জয়যাত্রা। রাতারাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল শ্রীরামপুর মিশনের নাম।

---

১ George Smith, *op. cit.*, p. 200.

পঞ্চম অধ্যায়

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ : বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক

কলেজ প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলা দেশের সংস্কৃতিচর্চার ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তার বহুবিধ কারণের মধ্যে অন্যতম হল, বাংলা গদ্যসাহিত্যের জন্ম ও প্রসারের মূলে এই কলেজের গৌরবময় অবদান। কলেজ তার নিজস্ব উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল তার পরোক্ষ ফল হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব প্রেরণা, সুযোগ, শক্তি ও তৎপরতা দেখা দিয়েছিল। এবং তারই প্রভাবে বাংলা গদ্যের জন্ম ও তার ক্রমপরিণতিতে বুদ্ধিজীবী বাঙালীর মনোভূমিতে নবজাগরণের অঙ্কুরোদ্গম। সুতরাং বলা যেতে পারে, নব্যবঙ্গে রেঁণেশাসের প্রথম ঢেউ উঠেছিল লালদিঘির প্রান্ত ছুঁয়ে— ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পরোক্ষ প্রভাবে।

উনিশ শতকের প্রথম পাদে বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার প্রধানতম পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলা মুদ্রণের কাজে কলেজ সহায়তা করেছিল। কলেজের নিজস্ব কর্মসূচীর প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ইংরেজ সিভিলিয়ানরা বাংলা ভাষা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল এবং তার পরোক্ষ ফল হিসাবে প্রথম বাংলা গদ্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণের কাজ ত্বরান্বিত হয়েছিল। প্রাচ্যবিদ্যা ও প্রাচ্যভাষা আয়ত্ত করতে না পারলে নবাগত তরুণ ইংরেজ সিভিলিয়ানদের পক্ষে যে ভারত-শাসনের বনিয়াদকে সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে না একথা দক্ষ প্রশাসক ওয়েলেসলির দূরদৃষ্টিতে সর্বাগ্রে ধরা পড়েছিল। তিনি তাই প্রথমাবধি ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষাশিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং প্রথম সুযোগে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বয়ং গভর্নর-জেনারেলের উৎসাহ, আগ্রহ ও সাহায্যের ফলে অচিরে এই প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যবিদ্যা ও প্রাচ্যভাষা চর্চার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। বিভিন্ন দেশীয় ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষাও ছিল এখানকার পাঠক্রমের অন্যতম প্রধান বিষয়। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মতো স্বভাবতই সেখানে বাংলা ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনে বাংলা পাঠ্যপুস্তকেরও আশু প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রাক্‌কালে বাংলা গদ্যভাষায় কোনো পাঠ্যপুস্তক ছিল না। সুতরাং অবিলম্বে পাঠ্যপুস্তকের

প্রয়োজন মেটাতে বাংলা গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণে সাহায্য ও উৎসাহ দিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ দৃঢ়পদে এগিয়ে আসেন। কেরীর অক্লান্ত পরিচালনায় বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও তার দ্রুত মুদ্রণের ব্যাপক আয়োজন গড়ে ওঠে।

ওয়েলেস্‌লি প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রথম কাজ শুরু হয় ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর। প্রকৃতপক্ষে ঐ তারিখটিই ছিল কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস। অবশ্য গভর্নর-জেনারেল ওয়েলেস্‌লি তাঁর ভারতীয় কাউন্সিলে ৯ই জুলাই, ১৮০০ তারিখে সর্বপ্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পেশ করেন এবং ঐ সভাতেই সকল সদস্যের অনুমোদনক্রমে তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে ওয়েলেস্‌লি টিপু সুলতানের রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টম ('Seringapatam') দখলের তারিখটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ৪ঠা মে, ১৮০০ তারিখ থেকে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল বলে ঘোষণা করেন। ডিরেক্টরদের সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই কলেজ প্রতিষ্ঠার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করে ১৮ই আগস্ট, ১৮০০ তারিখে ওয়েলেস্‌লি কর্তৃপক্ষের দরবারে কলেজ-প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত তাঁর বিখ্যাত 'মিনিট' উপস্থাপিত করেন। এর মাস দুয়েক পর থেকেই কলকাতার বর্তমান 'রাইটার্স বিল্ডিং' ভবনে কলেজের নিয়মিত কাজ শুরু হয়ে যায়।

১৮ই আগস্ট, ১৮০০ তারিখে ওয়েলেস্‌লির বিখ্যাত 'মিনিটে' কলেজ প্রতিষ্ঠার কারণ ঘোষণা করে বলা হয়: 'A College is hereby founded at Fort William in Bengal, for the better instruction of the junior civil servants of the Company, in such branches of literature, science and knowledge as may be deemed necessary to qualify them for the discharge of the duties of the different offices constituted for the administration of the government of the British possessions in the East Indies. [Minute in Council at Fort William, by His Excellency Marquis Wellesley : dated the 18th August 1800][১]

কলেজের পাঠক্রমের একটি প্রধান অংশ ছিল দেশীয় ভাষাশিক্ষা। এর আগে নবাগত ইংরেজ কর্মচারীরা নিজের নিজের ইচ্ছামত পণ্ডিত বা মুন্সী নিয়োগ করে দেশীয় ভাষায় তালিম নিতেন এবং সেই মুন্সীর বেতন বাবদ সরকারের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের মাসিক বরাদ্দ ভাতা পেতেন। এতে সরকারী তহবিল থেকে যে বিপুল পরিমাণ খরচ হত, তার অধিকাংশ হত অপব্যয়, আর ভাষাশিক্ষার কাজও তেমন এগোত না। ওয়েলেস্‌লি এই প্রথা রদ করে পুরোপুরি সরকারী তত্ত্বাবধানে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেই ভাষাশিক্ষার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলেন এবং স্থির হয় প্রতি সিভিলিয়ান ছাত্র আলাদাভাবে মুন্সী-

১ Rev. C. Buchanon, *'The College of Fort William in Bengal'* (London, 1805), p. 25.

ভাতার পরিবর্তে কলেজে ছাত্র থাকাকালীন মোট তিনশ টাকা মাসিক ভাতা পাবেন। এই প্রসঙ্গে ওয়েলেস্‌লির 'মিনিটে' বলা হয়: 'An establishment of moonshees and native teachers of languages under the control of the collegiate officers at Fort William, will be attached to the new college, and the young men will be supplied from this establishment, instead of being left (as at present) to exercise their own discretion, in hiring such moonshees as they can find at Calcutta or in the provinces.'[১]

এইরূপ কার্যক্রম অনুসারেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দেশীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা সুসংহতভাবে গড়ে ওঠে। ইতিমধ্যে আরো একটি কারণে সরকারী কর্মীদের কাছে দেশীয় ভাষাশিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি বেড়ে যায়। ওয়েলেস্‌লির এক আদেশ বলে ঘোষণা করা হয় যে ১লা জানুয়ারি, ১৮০১ থেকে যে-কোনো সরকারী পদের যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেশীয় ভাষায় জ্ঞান আবশ্যিক বলে বিবেচিত হবে। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি এই মর্মে পাবলিক ডিপার্টমেন্টের একটি ইস্তাহার জারি হয়—'... from and after the 1st January 1801, no servant will be deemed eligible to any of the offices hereinafter mentioned, unless he shall have passed an examination (the nature of which will be hereafter determined) in the laws and regulations and in the languages, a knowledge of which is hereby declared to be an indispensable qualification'.[২]

এই 'language' অর্থে ফারসী, হিন্দুস্থানী, প্রভৃতির সঙ্গে প্রথমাবধি বাংলাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওয়েলেস্‌লির সরকারী নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অন্যত্র বলা হয়—'...it is necessary that the students destined to exercise high and important functions in India should be able to speak the Oriental languages with fluency and propriety.'[৩] সুতরাং দেখা যায়, গভর্নর-জেনারেল ওয়েলেস্‌লির চিন্তা আদর্শ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশীয় ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেই ভাষাশিক্ষার ব্যাপক আয়োজন গড়ে ওঠে। বাংলা ছিল কলেজের পাঠক্রমে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ভাষা। কলেজের বিদেশী ছাত্ররা প্রথমাবধি বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দেও কলেজের কার্যবিবরণীতে দেখা যায় বিদেশী ছাত্রদের বাংলা ভাষার প্রতি সেই সর্বাধিক আগ্রহ বজায় রয়েছে। ২০শে সেপ্টেম্বর

---

১ *Ibid.*, p. 38.

২ সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস', পৃ. ১০০।

৩ Rev. C. Buchanon. *op. cit.*, p. 51.

১৮১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজের দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিদর্শক (Visitor) লর্ড মিন্টোর বক্তৃতায় প্রসঙ্গটির উল্লেখ পাওয়া যায়: '...The Bengalee Language appears also to be an object of attention, fourteen out of eighteen having applied themselves to that study...The Persian, Hindoostanee and Bengalee Languages are those which qualify the students for the civil offices of those Provinces...'[১] কেরীর পরিচালনায় ১৮০১ সালের মে মাস থেকে কলেজে বাংলা বিভাগের কাজ শুরু হয়। সেই বিভাগে বাংলা পঠন-পাঠনের প্রয়োজন মেটাতে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা ও মুদ্রণের কাজ ত্বরান্বিত হয় এবং সেই কাজে কলেজ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস উত্তরোত্তর প্রসারিত হতে থাকে এবং সেখানেই কলেজের অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রিত হয়।

•

বাংলা মুদ্রণ প্রসারে কলেজের ভূমিকা

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় পঠন-পাঠনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশীয় ভাষায় মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ চলতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলা মুদ্রণের প্রসারের পথে এইভাবেই এক নতুন সম্ভাবনার স্বর্ণদ্বার খুলে যায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, দেশীয় ভাষায় মুদ্রণের কাজে উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যক দেশীয় শিল্পী ও দেশীয় ছাপাখানা নিয়োজিত হতে থাকে। এ বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের সব সময়েই সজাগ ও সাগ্রহ দৃষ্টি ছিল। কলেজের বার্ষিক সভার কার্যবিবরণীগুলিতে এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮০৪ তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভায় কলেজের পরিদর্শক (Visitor) ওয়েলেস্‌লি দেশীয় ভাষায় মুদ্রণের অগ্রগতি লক্ষ্য করে বলেন: 'Great improvements have been introduced in the art of printing the Oriental characters, by native artists; and several of the learned natives are employed in publishing various works of Oriental literature, under the aid derived from the improved art of printing'.[২] ঐ একই বক্তৃতায় ওয়েলেস্‌লি কলেজে বাংলা পঠন-পাঠনের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করে বলেন— 'A commendable proficiency has been made by those students who have applied their attention to the vernacular language of Bengal; a more general attention to the study of that language is, however, desirable;

---

১ T. Roebuck, '*The Annals of the College of Fort William*', pp. 359-360.

২ Rev. C. Buchanon, *op. cit.*, pp. 135-36.

and I recommend this subject to the consideration of the officers and students of the College.'[১]

পরবর্তী বার্ষিক সভায় ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮০৫ তারিখে একই প্রসঙ্গে ওয়েলেসলি পুনশ্চ বলেন, 'At the last disputation, I expressed my desire, that a more general attention should be paid to the study of the vernacular language of Bengal, I observe with pleasure, that···the study of that useful attainment is now prosecuted by many of the students with diligence and success···The compilation and publication of useful works in the Oriental languages have proceeded with unabated spirit,···'[২]

কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম চার বছরের মধ্যেই কলকাতা ও তার আশেপাশের বিভিন্ন ছাপাখানায় কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশীয় ভাষার যে শতাধিক পুস্তক মুদ্রিত হয়েছিল তার সপ্রশংস উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, 'The publication of an hundred original volumes in the Oriental languages and literature in the term of four years (1800-01 to 1804-05), is no inconsiderable proof of the flourishing state of the College of Fort William as a literary institution.'[৩]

বাংলা গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণে কলেজের পৃষ্ঠপোষকতা

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাংলা গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণে প্রথমাবধি উৎসাহ দিয়ে এসেছে। বলা যেতে পারে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই বাংলা গদ্য সাহিত্যের জন্ম ও বিকাশ। কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রধানত দু ভাবে বাংলা গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনে সাহায্য করেছেন : প্রথমত, তাঁরা দেশীয় পণ্ডিতদের পুস্তক রচনায় উৎসাহিত করার জন্য নগদ আর্থিক পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন ও দ্বিতীয়ত, পুস্তক মুদ্রণের ব্যয় নির্বাহে সাহায্যকল্পে তাঁরা পূর্ব আশ্বাস মতো গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার অনেকগুলি কপি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একশো কপি, কলেজ লাইব্রেরির জন্য নগদ মূল্যে কিনে নিতেন। দেশীয়দের স্বদেশী ভাষায় গ্রন্থরচনায় উৎসাহ দেবার ব্যাপারে কলেজ কাউন্সিল তাঁদের একটি সভায় স্পষ্ট সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। তাঁদের ৭ই জুলাই ১৮০১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে তা দেখা যায় : 'Resolved that Premiums shall be proposed to the learned Natives for encouraging literary works in the Native languages.'[৪]

১ *Ibid*, p. 131.

২ *Ibid*, p. 146.

৩ *Ibid*, p. 156.

৪ Proceedings of the College of Fort William (PCFW), Home Miscellaneous Series, No, 559, p. 6 ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১ম খণ্ড)।

বাংলা গ্রন্থরচনা ও প্রকাশনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতার প্রমাণস্বরূপ কিছু কিছু তথ্য এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে :

১. গোলোকনাথ শর্মা কলেজের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলেও শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত তাঁর 'হিতোপদেশ' (১৮০২) গ্রন্থের প্রকাশনার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ আর্থিক সাহায্য করেন।[১]

২. 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) গ্রন্থ রচনার জন্য কলেজ কাউন্সিল রাম-রাম বসুকে তিনশো টাকা পারিতোষিক দান করেন। একই সময় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২) গ্রন্থ রচনার জন্য দুশো টাকা পুরস্কার পান। এই সব পুরস্কারের সুপারিশ করে কেরী কলেজ কর্তৃপক্ষকে যে চিঠি লেখেন তা ১৮ই জুলাই ১৮০৩ তারিখে কলেজ কাউন্সিলের অধিবেশনে পঠিত হয়। কেরীর চিঠিটি ছিল এইরূপ :

To Charles Rothman Esqr.
Secretary to the Council of the College.

Sir,

In consequence of the Council of the College having offered rewards to learned natives for literary works, which may be useful to the Institution, I beg leave to represent to the Council that Mritoonjoy, Head Pundit of the College, has translated from the Shanscrit Language into classical Bengalee Prose the Butteesee Singhasun which is a very useful class book—and also that Ram Ram Bose has composed a History in the same language called Pritapeadytta—which is used by the students. They are works of considerable merit and such as deserve remuneration. Mritoonjoy was eleven months employed on his work and Ram Ram Bose one year, six months.

I am, Sir,
Your most obedient Servant,
W. Carey, Bengalee Teacher.

P. S. Mritoonjoy the head Pundit in the Bengalee Department translated the Butteessee Singhasun into the Bengalee Language, which is an excellent class book. Ram Ram Bose also wrote the History of Raja Pritapaditya (the first prose work ever written in the language and an

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' (১ম) : 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত', পৃ. ৭।

authentic history of the government of Bengal from the beginning of the reign of Achber to the end of that of Johangeer) and another book called Lippi Mala—which are also very useful class books. They have applied for rewards. I think about 400 Rupees will be a remuneration for Mritoonjoy, and about 600 for Ram Ram Bose.

Resolved that the sum of 200 Sicca Rupees be presented to the Head Pundit Mritoonjoy and 300 sicca Rupees to Ram Ram Bose as rewards for their respective works recommended by Mr. Carey.[১]

৩. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে 'প্রবোধচন্দ্রিকা' রচনা করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের অনুরোধে ৫ই জানুয়ারি ১৮১৯ তারিখে কলেজ কর্তৃপক্ষকে লেখা একটি চিঠিতে[২] কেরী এই গ্রন্থের জন্য মৃত্যুঞ্জয়কে ৩০০ টাকা পারিতোষিক দানের সুপারিশ করেন। ঐ সময় শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে বইটি ছাপা হচ্ছিল। কলেজ কাউন্সিল ছাত্রদের ব্যবহারার্থে বইটির ৫০ খণ্ড (প্রতি খণ্ডের সম্ভাব্য মূল্য ৮ টাকা হিসাবে) কিনে লেখককে উৎসাহ দানে স্বীকৃত হন।[৩] কিন্তু এর কয়েক মাসের মধ্যেই মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হওয়ায় বইটি তখন আর প্রকাশিত হয়নি। পরে ১৮৩৩ সালে তা প্রকাশিত হয়।

৪. চণ্ডীচরণ মুন্সী তাঁর অনূদিত গ্রন্থ 'তোতা ইতিহাসের' (১৮০৫) জন্য ১০০ টাকা পুরস্কার পান। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কেরীর সুপারিশ পত্র সহ ১৬ই জানুয়ারি ১৮০৪ তারিখে কলেজ কাউন্সিলের সভায় উপস্থাপিত হয়। কেরীর পত্র ও কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ছিল এইরূপ :

Sir,…Accompanying this is a translation of the Toteenama from Persian into Bengalee by one of the Pundits of this class, Chundeechurn. I will thank you to present it to the Council of the College. It is rendered into very plain and good Bengalee, and very fit for a class book. Should the Council order him any reward for his labour, it will be gratefully recived by him, and as he is a poor man will be a great help to him. W. Carey.

---

১ P.C.F.W.—Home Misc., Vol. No. 559, pp. 263-64. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, 'রামরাম বসু', পৃ. ৩১-৩৪।

২ চিঠিটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে।

৩ P.C.F.W.—Home Misc, No. 565, pp. 288-89 ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার', পৃ. ২৩-২৪।

AGREED that the sum of one hundred Rupees be allowed to the Pundit Chundeechurn for his translation of the Toteenama in Bengalee.[১] [লক্ষণীয়, এখানে এই পুরস্কার যেমন চণ্ডীচরণের সার্থক অনুবাদ ও পরিশ্রমের জন্য, তেমনই একজন গরীব মানুষের প্রতি আর্থিক সাহায্য হিসাবেও তা সুপারিশ করা হয়েছে। অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রে মূলত গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দান হিসাবেই এই ধরনের পুরস্কার দেওয়া হত।] নগদ আর্থিক পুরস্কার ছাড়াও 'তোতা ইতিহাস'-এর একশোটি কপি কলেজ কর্তৃপক্ষ কিনে নেন।

চণ্ডীচরণ-কৃত আরো একটি গ্রন্থ ভগবদ্গীতার পয়ার ছন্দে বঙ্গানুবাদ (১৮০৪)-এর জন্য কেরীর সুপারিশক্রমে কলেজ কাউন্সিল ১২ই নভেম্বর ১৮০৪ তারিখের অধিবেশনে তাঁকে ৮০ টাকা পুরস্কার দানের সিদ্ধান্ত নেন। অবশ্য এই অনুবাদ শেষ পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

একই সময়, সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়কে তাঁর 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫) নামক গ্রন্থের জন্য ১০০ টাকা পুরস্কার দান ও এর একশো কপি কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সম্পর্কিত কেরীর সুপারিশ পত্র ও কাউন্সিলের সিদ্ধান্তটি নীচে উদ্ধৃত হল :

To the Council of the College of Fort William

Gentlemen,

In consequence of the encouragement given to literary merit by this institution Rajeeb Lochun, a Pundit in the Bengalee Department has lately composed an history of Raja Krishnu Chunder Roy (late of Krishnnagur) in the Bengalee Language.

Chundee Churn, another Pundit in the same Department, has, with the help of some learned Brahmuns, translated the Bhagvut Geeta into Bengalee.

I have examined these works and think them to be worthy the patronage of the College, and recommend the writers as deserving some raward for their labours.

Accompanying this I send the manuscripts of these two works, which

---

১ Home Misc., No. 559, p. 304. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত', পৃ. ২৩।

with the translation of the Tooteh numah, by Chundee Churn I recommend to be printed for the use of the Bengalee class.

I am, Gentlemen,

College Your most obedient humble servant,

5th October, 1804. W. Carey.

Resolved that 100 copies of the History of Rajah Krishna Chunder Roy in the Begalee Language, and 100 copies of the translation of the Toote namah into the Bengalee Language be subscribed for by the College.

ORDERED that a fair copy of each of the foregoing works be made in order to be deposited in the Library of the College.

RESOLVED that a premium of Sicca Rupees 100 be awarded to Rajeeb Lochun Pundit for his History of Rajah Krishna Chunder Roy in the Bengalee Language. That a premium of Sicca Rupees Eighty be awarded to Chundee Churn Pundit for his translation of the Bhagbut Geeta into the Bengalee Language.— [*Home Misc.*, No. 559, pp. 384-85.][১]

৫. কেরীর সুপারিশক্রমে ৩০শে মার্চ ১৮১৫ তারিখের অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলেজ কাউন্সিল হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা' (১৮১৫) গ্রন্থের একশো কপি (প্রতি কপি দশ টাকা হিসাবে) প্রকাশমাত্র কিনে নিতে স্বীকৃত হন। [*Home Misc.*, No. 563, p. 343.]

৬. কলেজের বাংলা বিভাগের অন্যতম সহকারী পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ৭ই ডিসেম্বর ১৮২০ তারিখে তাঁর 'পদার্থকৌমুদী' গ্রন্থের মুদ্রণের ব্যাপারে সাহায্যের আশায় কলেজ কর্তৃপক্ষকে এর একশো কপি কিনবার অনুরোধ জানিয়ে পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ সহ আবেদন করেন। অবেদনপত্রটি ছিল এইরূপ :

মহামহিম শ্রীযুত কালেজ কৌন্সলের সাহেবান বরাবরেষু

কালেজের পণ্ডিত শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের নিবেদনমিদং আমি ন্যায়দর্শনের ভাষাপরিচ্ছেদ পুস্তকের গৌড়দেশীয় সাধুভাষাতে সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রভৃতি টীকার অনুসারে স্পষ্টরূপে অর্থপ্রকাশ করিতেছি যে শাস্ত্রের অতি কাঠিন্যপ্রযুক্ত অর্থপ্রকাশ করনে অদ্যাপি

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, : 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত', পৃ. ২৬-২৭।

কোন পণ্ডিত প্রবৃত্ত হয়েন নাই—মেস্তর পিয়র সাহেবের মুদ্রাগৃহে এই পুস্তকের মূলসহিত মুদ্রাকরণে পঞ্চশত মুদ্রা ব্যয় হইবেক পুস্তকের মূল্যে শ্রীযুতেরদিগের বিবেচনায় নির্ভর করিয়া দৃষ্টি করিবার নিমিত্তে পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সমর্পন করিতেছি এইরূপ বিংশতি ভাগ হইবেক তাহাতে শ্রীযুতেরা অনুগ্রহপূর্ব্বক এক শত পুস্তক গ্রহণ করিলে পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে ও আমার পরিশ্রম সফল হয় এবং কালেজের পাঠাধি সাহেবদিগের অল্লায়াসে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে বিদ্যা ও বাঙ্গালাভাষাতে নৈপুণ্য হইতে পারে অতএব নিবেদন যে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই প্রতিপাল্য ব্যক্তির প্রতি সফলা আজ্ঞা হয়, ইতি ১৮২০ সাল তারিখ ৭ দিসম্বর

শ্রীকাশীনাথ শর্মনঃ[১]

এই চিঠির সঙ্গে কেরীও কাশীনাথের অনুবাদের প্রশংসা করে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। কলেজ কাউন্সিল বইটির দশ কপি ৫০ টাকা মূল্যে কিনতে স্বীকৃত হন। এই বই ১৮২১ সালে ক্যালক্যাটা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক কলকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়।

৭. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্রীমদ্ভাগবত' (১৮৩০) প্রকাশকালে কলেজের সাহায্য-প্রার্থী হয়েছিলেন। তিনি অবশ্য সরকারী সাহায্য পাননি।[২] জোড়াসাঁকো রাজবাড়ির রাজা শিবচন্দ্র রায়ের অর্থানুকূল্যে ভবানীচরণ সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে এটি মুদ্রিত করেন।

৮. এক সময় রামমোহন রায় তাঁর গ্রন্থপ্রকাশের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হন এবং তিনি তা পেয়েছিলেন।[৩]

৯. নীলরতন হালদার যখন ১৮২০ সালে 'বহুদর্শন' নামে বহু ভাষার একটি প্রবাদ সংকলন করে কলেজের সাহায্য চেয়েছিলেন, কেরী সেই বইটিকে বহু দোষ সত্বেও প্রবাদ সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হিসাবে প্রশংসা করেন এবং কলেজ সেই গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করেন।[৪] 'বহুদর্শন' ১৮২৬ সালে প্রকাশিত হয়।

১০. লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়লঙ্কার তাঁর 'দায়াধিকারী সংগ্রহ' নামক গ্রন্থমুদ্রণে সরকারী অর্থানুকূল্য প্রার্থনা করে এর একশো কপি কেনার অনুরোধ জানিয়ে ১৮২২ সালে কলেজ কাউন্সিলের কাছে একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। তাঁর এই চিঠি কেরী কাউন্সিলের কাছে পাঠান এবং সরকার এই গ্রন্থের একশো কপি কিনেছিলেন।

১৮২২-এর ২রা সেপ্টেম্বরের কলেজ কাউন্সিলের কার্যবিবরণীতে লক্ষ্মীনারায়ণের আবেদনপত্রটি পাওয়া যায়। পত্রটি ছিল এইরূপ :

---

১ তদেব, পৃ. ৪২।

২ শিশিরকুমার দাশ, 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কয়েকটি বাংলা আবেদনপত্র' : দেশ, ৯ই জুন, ১৯৭৩।

৩ ঐ।

৪ ঐ।

শ্রীশ্রী গুরবে নমঃ।

মহামহিম শ্রীযুত কালেজ কৌসলের সাহেবান বরাবরেষু—

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়লঙ্কারের—

নিবেদন আমি গৌড় রাজ্য প্রচলিত দায়ভাগ প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্র অবলোকন এবং বিবেচনা ও বহুকাল পরিশ্রম করিয়া সংস্কৃত পদ্যবন্দে এবং কালেজের অভিনব বিদ্যার্থী সাহেবলোকের শীঘ্র অর্থবোধ হওনার্থে বাঙ্গলা ভাষাতে সুললিত শ্লোক প্রবন্ধে দায়াধিকারী সংগ্রহ নামে মন্বাদিবচন প্রমাণযুক্তে এক গ্রন্থ সংক্ষেপে প্রস্তুত করিয়াছি শ্রীযুত সাহেবলোকেরা বহু পরিশ্রমে যে শাস্ত্রার্থ অবগত হয়েন সেই অর্থ এই গ্রন্থের সপ্রমাণ সংস্কৃত কবিতা এবং ভাষাশ্লোক দ্বারা অত্যল্পকালে অনায়াসে জ্ঞাত হইবেন অতএব শ্রীযুক্ত রিবিরণ্ড ডাকতর উলিয়েম কেরি সাহেবের সম্মতিক্রমে আমি ঐ পুস্তক ছাপাইবার মনস্থ করিয়াছি ঐ পুস্তকে ন্যূনাধিক পঞ্চাশত পৃষ্ঠা হইবেক প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য দুই টাকা নিরূপণ হইল ইহার ছাপা হওন যোগ্য অর্থ ব্যয়ের অসঙ্গতি প্রযুক্ত আমার প্রার্থনা ও নিবেদন এই যে এই পুস্তক ছাপা হওনের আনুকূল্য নিমিত্ত অনুগ্রহ পূর্বক একশত পুস্তক সরকারে ক্রয় হইবার আজ্ঞা হয় এ কারণ এই নিবেদন পত্রের সহিত এই পুস্তকের প্রথমকার দুইপত্র দর্শনার্থে দিতেছি দৃষ্টিপূর্বক প্রার্থিতানুকূল্যের আজ্ঞা হয় নিবেদনমিতি ১২২৯ সাল তারিখ ২০ শ্রাবণ।[১]

১১. তারিণীচরণ মিত্র ও কলেজের অন্যান্য আরো কয়েকজন পণ্ডিত মৌলবী কর্তৃক বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় অনূদিত 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট' (১৮০৩) গ্রন্থটি কলেজ-কর্তৃপক্ষের উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়। এর তারিণীচরণ-কৃত বাংলা অংশ সমেত সমগ্র বইটিই রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়।

কলেজের প্রয়োজনে কোম্পানী প্রেসের পুনর্বিন্যাস ও মুদ্রণ প্রয়াস

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নিজস্ব কোনো ছাপাখানা ছিল না। কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র কলেজের প্রয়োজনেই সরকার আর নতুন করে কোনো ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন-নি। কলেজ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই কলকাতায় যে সরকারী ছাপাখানাটি ছিল সেটিকেই সরকার নতুন করে সাজিয়ে নেন এবং সেইখানেই কলেজের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু কিছু বই ছাপা হয়। ঐ সব বইয়ের কোনো কোনোটিতে বাংলা মুদ্রণের নিদর্শনও পাওয়া যায়।

কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সরকারী ছাপাখানাটির প্রতি সরকার যে আবার নতুন করে আগ্রহশীল হয়ে ওঠেন, তার কারণ দ্বিবিধ : প্রথমত, নানাবিধ সরকারী কাগজ-

১ ঐ।

পত্র-দলিল-কর্ম ও গ্রন্থাদি মুদ্রণের, বিশেষ করে দেশীয় ভাষায় মুদ্রণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো, দ্বিতীয়ত, এই সরকারী ছাপাখানার আয় থেকে সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলেজের খরচ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল অর্থের অন্তত কিছুটা মেটানো। ছাপাখানাটিকে তাই লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে যত্নবান হন ও এর পরিচালন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করেন। কলেজের খরচ চালাবার জন্য কর্তৃপক্ষ যে বিভিন্ন সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন, সরকারী ছাপাখানার লভ্যাংশ তার অন্যতম। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে ১৮ই আগস্ট ১৮০০ তারিখে লেখা গভর্নর জেনারেল ওয়েলেস্‌লির বিখ্যাত মিনিটে এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়: 'The expenses of the institution will be provided for by···the profits to be derived from a new arrangement of the government printing press'.[১]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই পুনর্বিন্যস্ত সরকারী ছাপাখানায় মুদ্রিত কিছু কিছু গ্রন্থের সন্ধান আজও পাওয়া যায়। ইংরেজি ও কয়েকটি দেশীয় ভাষা সহ বাংলাতেও মুদ্রণের নিদর্শন এগুলিতে পাওয়া গেছে। উদাহরণ স্বরূপ, অনারেবল কোম্পানীর প্রেস থেকে ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের রচনাদি সম্বলিত গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বইটির আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ: 'Essays by the students of the College of Fort William in Bengal. To which are added the Theses pronounced at the Public Disputations in the Oriental Languages on the 6th February 1802./ CALCUTTA :/ Printed at the Honorable Company's Press./ 1802'. [বইটি কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।] অক্টেভো আকারের ২২৮ + ১৬ + ৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই বইটি মূলত ইংরেজিতে ছাপা হলেও, এর কিছু কিছু অংশ হিন্দী, ফারসী ও বাংলাতে ছাপা। ১৮৫ পৃষ্ঠা থেকে ১৯৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অংশটি বাংলায় ছাপা। ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮০২ তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজের বাংলা বিতর্কসভায় পঠিত W. B. Martin-এর বাংলা রচনাটি এখানে বাংলা হরফে মুদ্রিত হয়েছে। বিতর্কের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এশিয়াবাসীরাও ইউরোপীয়দের সমতুল উচ্চ সভ্যতার অধিকারী হওয়ার যোগ্য—'The Asiaticks are capable of as high a degree of civilization as the Europeans'. মার্টিন এর সপক্ষে বক্তব্য পেশ করেন। এই বাংলা মুদ্রিত অংশে কোম্পানীর প্রেসের অষ্টাদশ শতকীয় বাংলা মুদ্রণের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি বিদ্যমান। অষ্টাদশ শতকে ছাপা কিছু পূর্বতন বাংলা বই, যেমন ১৭৮৫ সালে কোম্পানীর প্রেসে ছাপা ডানকান-কৃত ইম্পে কোডের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থের বাংলা হরফ বা

---

১ Rev. C. Buchanon, '*The College of Fort William in Bengal*' (London, 1805), p. 37.

১৭৮৪ সাল থেকে প্রকাশিত ক্যালকাটা গেজেটের বাংলা বিজ্ঞপ্তিগুলিতে ব্যবহৃত হরফের সঙ্গে ১৮০২ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের বাংলা হরফের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এর অক্ষরগুলির উচ্চতা ৩.৫ মি. মি.। এর অনেক অক্ষর বা যুক্তাক্ষর আধুনিক ধাঁচের হলেও, কিছু কিছু ব্যতিক্রমও লক্ষণীয়; ঐসব অক্ষর প্রাক-শ্রীরামপুর যুগের লক্ষণাক্রান্ত। এর অক্ষর-বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে : র (পেট-কাটা ব), উ (মাথায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি ইলেক্-সহ), ট (মাথার ইলেক্ মাত্রার নীচে নামানো), ং (ইলেক্-বিহীন শূন্য), অথবা 'কু' (প্রাচীন হস্তাক্ষরের ধাঁচে কাটা) এবং উপর-নীচে লেখা যুক্তাক্ষর 'ন্দ-ধ,' 'ন-থ', 'ষ-ট', আবার আধুনিক ধাঁচের 'স্ব', ইত্যাদি। কোম্পানীর প্রেসের পুরনো হরফগুলি এখানেও ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য বইয়ের শেষে একটি Design (নক্শা বা ছবি) ছাপা আছে। উল্লেখ্য, ঠিক এই Design-টিই ১৮০২ সালে প্রকাশিত ফরস্টারের *Vocabulary* (২য় খণ্ড)-এর শেষেও ছাপা আছে। সুতরাং দেখা যায়, একই সময় দুটি প্রেসে—Honorable Company's Press ও Ferris and Company-র প্রেসে একই Design ব্যবহৃত হয়েছে। Design-টি ছিল এইরূপ : একটি পতাকাদণ্ডের শীর্ষভাগ হেলান অবস্থায় রয়েছে, তাতে জড়ানো পতাকার কাপড়—যার উপরে লেখা FINIS, এ ছাড়া পতাকাদণ্ডের সঙ্গে রয়েছে একটি পল্লব।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রগণ কর্তৃক দেশীয় ভাষায় লিখিত ও কলেজের বার্ষিক বিতর্কসভায় পঠিত রচনার আরো দুটি সংকলন—PRIMITIÆ ORIENTALES : Vol. II & Vol. III যথাক্রমে ১৮০৩ ও ১৮০৪ সালে প্রকাশিত হয়। বই দুটিতে প্রকাশক ও মুদ্রাকরের নাম না থাকলেও, এর মুদ্রণবৈশিষ্ট্য বিচার করে সহজেই অনুমান করা যায় যে এগুলিও কোম্পানীর প্রেসে ছাপা। ১৮০২ সালে ছাপা বইটির মতো এগুলিও মূলত ইংরেজিতে লেখা হলেও এর কিছু কিছু অংশ আরবী, ফারসী, হিন্দুস্থানী, সংস্কৃত ও বাংলায় ছাপা। বাংলায় ছাপা অংশের অক্ষরগুলির আকার ও গঠন বৈশিষ্ট্য বিচার করে দেখা যায় যে ১৮০৩ ও ১৮০৪ সালে ছাপা বই দুটিতে একই সাটের বাংলা হরফ ব্যবহৃত হয়নি। কোম্পানী প্রেসের অক্ষর বৈশিষ্ট্য বিচারের ক্ষেত্রে এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য বিষয়। ১৮০২ থেকে ১৮০৪ সালের মধ্যে দুই ভিন্ন সাটের হরফের ব্যবহার দেখা যায়। ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে ছাপা বইয়ে (PRIMITIÆ ORIENTALES-Vol. III,) ব্যবহৃত হরফগুলি ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে ছাপা বইয়ের (PRIMITIÆ ORIENTALES-Vol. II) হরফগুলি থেকে ভিন্নতর, সেগুলি বরং ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে ছাপা বইয়ের ('Essay by the Students of the College of Fort William') অক্ষরের সমতুল। ১৮০৪ সালে ছাপা হরফের উচ্চতা ৩.৫ মি. মি. (১৮০২-এ ছাপা হরফের উচ্চতাও ৩.৫ মি. মি.), কিন্তু ১৮০৩ সালে অপেক্ষাকৃত ছোটো হরফ ব্যবহৃত হয়— তার উচ্চতা ৩ মি. মি.। ১৮০২ বা ১৮০৪ সালের ছাপায় কোনো ছেদচিহ্নের ব্যবহার নেই, কিন্তু ১৮০৩ সালে ছাপা বইটিতে

কমা (,), সেমিকোলন (;) প্রভৃতি দু'একটি ছেদচিহ্নের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তবে সেখানে পূর্ণচ্ছেদের (।) ব্যবহার শুরু হয়নি। কিছু কিছু অক্ষর বা যুক্তাক্ষরের ধাঁচে ১৮০২ ও ১৮০৪ সালের ছাপায় সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, আবার ১৮০৩ সালের ছাপায় ভিন্নতর রূপ দেখা যায়। ১৮০২ ও ১৮০৪ সালে যে উপরে-নীচে লেখা 'দ-ধ,' ১৮০৩ সালের ছাপায় তা 'দ্ধ'। ১৮০২-এর মতো ১৮০৪ সালেও পাই উপরে নীচে লেখা 'ন-থ'। ১৮০২ সালের সাটে যে 'র্ম্ম' ('কর্ম্ম') ১৮০৩ সালে তার রূপ দাঁড়ায় 'ম্ম'। অবশ্য দু'একটি যুক্তবর্ণ, যেমন, উপরে-নীচে লেখা 'ষ-ট' ('নষ্ট,' 'চেষ্টা')—১৮০২-০৩-এ একই, 'ক্ষ' ('ক্ষতি', 'পক্ষ') ১৮০৩-০৪-এ একই। বিশেষভাবে লক্ষণীয় 'র'-এর প্রাচীন রূপ অর্থাৎ পেট-কাটা ব ('ৰ') —১৮০২-এর সাটে যেমন পাই, ১৮০৪ সালের সাটেও পাই ; শেষোক্ত সাটে 'র'—এই আধুনিক রূপ দেখা যায় না। অপরপক্ষে, ১৮০৩ সালের সাটে 'র' এই আধুনিক রূপেই উপস্থিত, প্রাচীন 'ৰ' দুর্লভ। তবে প্রাচীন ধাঁচের ং ('ং'), উ প্রভৃতি সর্বত্র বিদ্যমান। সুতরাং বলা যেতে পারে, ১৮০২ ও ১৮০৪ সালে ছাপা বইয়ে কোম্পানীর প্রেসের হরফের অষ্টাদশ শতকীয় প্রাচীন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বিদ্যমান, অপরপক্ষে ১৮০৩ সালে ছাপা বইয়ের হরফে পুরনো ধাঁচের সঙ্গে কিছু কিছু আধুনিক ধাঁচের সংমিশ্রণ ঘটেছে এবং তা আকারে অপেক্ষাকৃত ছোটো।

১৮০৩ সালে ছাপা অক্টেভো আকারের বইটির আখ্যাপত্র ছিল এইরূপ: 'PRIMITIAE ORIENTALES/ VOL. II./ CONTAINING THE/ THESES/ IN THE ORIENTAL LANGUAGES :/ PRONOUNCED/ AT THE PUBLIC DISPUTATIONS/ ON THE 29th MARCH, 1803/ BY/ STUDENTS OF THE COLLEGE OF FORT WILLIAM/ IN BENGAL./ WITH TRANSLATIONS./ CALCUTTA./ 1803.' [বইটি কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।] ৫৪ + ৮১ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির ৬৮ পৃষ্ঠা থেকে ৭৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অংশ বাংলায় ছাপা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিতর্কসভায় পঠিত জেম্‌স হাণ্টার লিখিত রচনাটি এখানে বাংলায় মুদ্রিত হয়েছে। রচনার প্রতিপাদ্য বিষয় : 'হিন্দু লোকেরা ভিন্ন ২ জাতি এই প্রযুক্ত তাহারদের বিদ্যা বুদ্ধির হানি হয়।'

রচনার নমুনা স্বরূপ এখানে কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে : 'দেখ ব্রাহ্মণ হইয়া যদি নীচ বৃত্তি করে তবে তাহার নীচত্ব প্রাপ্তি হয় এবং অন্যোন্য যাবৎ জাতি সমস্তই এইমত ইহাতে সমস্ত লোক আপন ২ জাতি রক্ষণার্থে স্বধর্মনিষ্ঠ থাকে তাহার অন্যথা করে না ; ইহাতে জানা যায় যদি কোন লোক আপন জাতির বিশেষ কর্ম্ম জন্মাবধি না করে, তবে তাহার সুখ্যাতির হানি হয় কাহার কিছু ক্ষতি হয় কাহার কিছুই থাকে না সুখ্যাতি গেলে কোন বিদ্যাতে ইচ্ছা হয় না কেননা সুখ্যাতি ও জাতি পুনর্ব্বার হইতে পারে না এমন

লোক ও পূর্ব্ব বন্ধু দেখিলে মনঃ পীড়া পায় এবং সেই লোক ও আপন পূর্ব্ব বন্ধু আপন সমান করিতে সত্ত্বান্থ ক্রমে চেষ্টা পায়'

১৮০৪ সালে বেশ মোটা কাগজে ছাপা অক্টেভো আকারের অপর বইটির আখ্যাপত্র ছিল এইরূপ : 'PRIMITIAE ORIENTALES/ VOL. III./ CONTAINING THE/THESIS/IN THE ORIENTAL LANGUACES:/PRONOUNCED/ AT THE PUBLIC DISPUTATIONS/ON THE 20th September, 1804/BY/ STUDENTS OF THE COLLEGE OF FORT WILLIAM/IN BENGAL./ WITH TRANSLATIONS./ CALCUTTA./ 1804'. [বইটি কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে : Vol. II ও III একত্রে বাঁধানো।] ৪ + ৪০ + ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই বইটির ৪৯ পৃষ্ঠা থেকে ৫৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অংশ বাংলায় ছাপা। কলেজের বার্ষিক বিতর্কসভায় পঠিত A. B. Tod প্রণীত বাংলা রচনাটি এখানে ছাপা হয়েছে। এর প্রতিপাদ্য বিষয় : 'প্রথম। মূল সংস্কৃত গ্রন্থ চলিত ভাষাঁতে তরজমাতে বিদ্যা প্রচার হয় এবং লোকেরদের নীতজ্ঞতাচরণ দ্বারা উপকার হয়।'

রচনার নমুনা স্বরূপ এখানে কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে : 'সংস্কৃত শাস্ত্র অত্যন্ত দীর্ঘ কালাবধি আছে ইহা সকলেই বলে—অতএব অনেক হিতকারী ও সুখকারী অতি সুন্দর জ্ঞান তাহার মধ্যে পাওয়া যায় ইহা আমরা স্থির করি এবং সর্ব্বদেশীয় জ্ঞানি ও বিজ্ঞানিরদের সন্তোষ সেই বিচারে হয় অতএব সংস্কৃত শাস্ত্র চলিত ভাষাতে তরজমা করিলে তাহার মধ্যে বিদ্বান লোকেরদের চেষ্টিত যে যে উত্তম কথা আছে তাহাও তাহারা অনায়াসে পাইতে পারিবেন—'

দেশীয় ভাষার ছাপাখানা প্রতিষ্ঠায় কলেজের উৎসাহ ও সাহায্য

কোম্পানীর প্রেসে ছাপা এইসব বাংলা প্রকাশন ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে তার দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আর যে-সব বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তার অধিকাংশ মুদ্রিত হয় শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে এবং অবশিষ্টাংশ কলকাতার অন্যান্য দেশীয় ভাষার ছাপাখানায় মুদ্রিত। এইসব সমসাময়িক প্রকাশন-উদ্যোগের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলা মুদ্রণে সাহায্য করেছে। দেশীয় ভাষার ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার কাজেও কলেজ উৎসাহ ও সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে সংস্কৃত প্রেসের কথা। দেশীয়দের উদ্যোগে কলকাতায় ১৮০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্কৃত প্রেসকে কলেজ প্রথমাবধি সাহায্য করেছে এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ, অভিধান ও দেশীয় ভাষার অন্যান্য প্রকাশনার কাজে তাদের উৎসাহ দিয়েছে। ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজের সপ্তম বার্ষিক বিতর্কসভায় 'ভিজিটর' লর্ড মিণ্টো তাঁর ভাষণে সংস্কৃত প্রেস সম্বন্ধে সপ্রশংস উক্তি করেন : 'A printing press

has been established by learned Hindoos, furnished with complete founts of improved Nagree types of different sizes, for the printing of books in the Sunskrit language. This press has been encouraged by the College to undertake an edition of the best Sunskrit Dictionaries, and a compilation of the Sunskrit Rules of Grammar…It may be hoped, that the introduction of the art of printing among the Hindoos, which has been thus begun by the institution of a Sunskrit Press, will promote the general diffusion of knowledge among the numerous and very ancient people,…'[১]

কলেজের অষ্টম বার্ষিক বিতর্কসভায় (১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮০৯) লর্ড মিণ্টোর ভাষণে সংস্কৃত প্রেসের বিভিন্ন প্রকাশনায় কলেজের পৃষ্ঠপোষকতার আরো উল্লেখ পাওয়া যায়: 'The native proprietors of the Sunskrit Press have, with the improved Nagree Types, which were noticed on a former occasion, printed several popular works,…At the recommendation of the Council of the College, those publications have received encouragement from Government, and the publisher has been able to afford them at so moderate a price as to furnish a strong confirmation of the hope entertained that the press may be rendered instrumental to the general diffusion of knowledge among the natives of the country. The songs of Juedev and the Bhagvutgeeta… are among the works already published.'[২]

কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় এইরূপ আরো অনেক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ও সেখানে বিভিন্ন প্রাচ্যভাষায় মুদ্রণের ব্যাপক আয়োজন গড়ে ওঠে। কলেজ কর্তৃপক্ষের উৎসাহে গিলক্রিস্ট (Gilchrist) ও হাণ্টার (Hunter) ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুস্থানী প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজের আর্থিক সাহায্যে ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে ম্যাথু লামসডেন (Mathew Lumsden) প্রতিষ্ঠিত ফারসি ছাপাখানার (Persian Press) কাজ শুরু হয়। বাবুরামের সংস্কৃত প্রেসও মূলত কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এদেশে মুদ্রণ ও প্রকাশনের প্রসারের ক্ষেত্রে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অবদান প্রসঙ্গে David Kopf-এর উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে: 'It was the College of Fort William that made printing and publishing in the classical and vernacular tongues possible in India on a large scale. The development…was

১ T. Roebuck, *op. cit.*, p. 155.

২ *Ibid*, pp. 211-12.

possible because it possessed the requisite financial resources. Within its first decade of operation, Fort William had created an array of peripheral and satellite institutions that fostered an atmosphere conducive to the expansion of the communicative arts'.[১] সুতরাং দেখা যায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বিভিন্ন প্রাচ্যভাষায় শিক্ষাদানের পরিকল্পনাকে সফল করে তোলার অন্যতম উপায় স্বরূপ শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, হিন্দুস্থানী প্রেস, ফারসি প্রেস, সংস্কৃত প্রেস প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় ভাষার ছাপাখানার প্রধান পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ফলে কার্যত বাংলা, উর্দু, হিন্দুস্থানী, সংস্কৃত, মারাঠী, ওড়িয়া প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণ ও প্রকাশনের ধারাকে বিকাশের পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

কলেজের মুদ্রণ-প্রকাশন পরিকল্পনা ও আনুষঙ্গিক ব্যয়

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠক্রমের বিভিন্ন বিভাগ নির্দিষ্ট হয়েছিল, এর মধ্যে দেশীয় ভাষা-শিক্ষা ছিল একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু সেই সময় দেশীয় ভাষার কোনো পাঠ্যপুস্তক না থাকায় কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রথমাবধি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণের কাজে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হয়েছিল। এই বাবদ বেশ মোটা অঙ্কের খরচও বরাদ্দ হয়েছিল। হিসাবে দেখা যায়, প্রথম বছরেই (২৪শে নভেম্বর ১৮০০ থেকে ৩১শে অক্টোবর ১৮০১ পর্যন্ত) কর্তৃপক্ষ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও ক্রয় সহ কলেজের বিভিন্ন বিভাগের জন্য মোট ৬,৩০,০০০ টাকা (৭৮৭৫০ পাউণ্ড) খরচ করেছিলেন।[২] কলেজে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং ১৮০১ সালে সেই কাজে নিযুক্ত অধ্যাপকদের মোট মাসিক বেতন দেওয়া হত ২৬০০ টাকা (৩২০ পাউণ্ড)। তাঁদের সহকারী পণ্ডিত মুন্সীদের এক একজনের মাসিক বেতন ধার্য হয়েছিল ৪০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত।[৩] ১৮০১ সালের ৪ঠা মে থেকে কলেজের বাংলা বিভাগ চালু হয়, সেই সময় এর শিক্ষক (Teacher) নিযুক্ত হন উইলিয়ম কেরী, মাসিক বেতন ৫০০ টাকা। (১৮০৭ সাল থেকে তিনি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ও মারাঠী ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন, মাসিক ১০০০ টাকা বেতন)। এ ছাড়া তখন বাংলা বিভাগে আর যাঁরা যোগদান করেন তাঁদের মোট মাসিক বেতন দেওয়া হত ৫৪০ টাকা, যেমন, প্রধান পণ্ডিত : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (মাসিক ২০০ টাকা), দ্বিতীয় পণ্ডিত : রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি (মাসিক ১০০ টাকা) এবং ছ'জন সহকারী পণ্ডিত : শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র শর্মা, রাজীবলোচন (মুখোপাধ্যায়), কাশীনাথ

---

১ David Kopf, '*British Orientalism and the Bengal Renaissance*', pp. 114-15.

২ P.C.F.W., Home Misc, Oct. 31, 1801 ; David Kopf, *op. cit.*, p. 62.

৩ P.C.F.W., Home Misc., April 24, 1801 ; David Kopf, *op. cit.*, p. 62.

(মুখোপাধ্যায়), পদ্মলোচন চূড়ামণি, রামরাম বসু (প্রত্যেকে মাসিক ৪০ টাকা)। অন্যান্য ভাষা-বিভাগেও এইরূপ ব্যয় ধার্য হয়। কলেজের ছাত্রদের মাসিক ৩০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া ছাড়াও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হত এবং বার্ষিক সভায় কৃতী ছাত্রদের যে পুরস্কার দেওয়া হত তার কোনো কোনোটির মূল্য ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ছিল। এইসব কারণে কলেজের বার্ষিক খরচ বেশ মোটা রকমের হত, তবে তার ফলে কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা সসম্ভ্রম গুরুত্ব অর্জন করেছিল।

কলেজের এই মোট ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন ব্যাপারে কলেজের পৃষ্ঠপোষকতা বাবদ একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ধার্য ছিল। ১৮০৪ সালের একটি হিসাবে দেখা যায় সেই সময় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস মুদ্রণ বাবদ বছরে ৩৭,৯৬৬ টাকা খরচ করত।[১] ঐ সময় কলেজের অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কাজ মিশন প্রেস মারফত হত, সুতরাং পরোক্ষভাবে এই মুদ্রণ ব্যয়ের অধিকাংশ কলেজই বহন করত বলা যায়। এই অর্থের একটা মোটা অংশ কেবলমাত্র বাংলা মুদ্রণের জন্যই ব্যয় হত। কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় ঐ সময় আরো যে দু-চারটি ছাপাখানা গড়ে উঠেছিল, তাদের মুদ্রণ ক্ষমতা, সাজসরঞ্জাম ও নৈপুণ্য মিশন প্রেসের তুলনায় অনেক নিম্নমানের ছিল। সুতরাং মিশন প্রেসই তখন কলেজের মুদ্রণ-প্রকাশন পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার কাজে প্রধান সহায়ক ছিল।

প্রসঙ্গত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দেশীয় ভাষাচর্চাদি ('literary patronage') খাতে বার্ষিক খরচের একটা হিসাব নেওয়া যেতে পারে। ওয়েলেস্‌লির অনুপ্রাণিত আদর্শে ও পরিচালনায় কলেজের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে প্রথম কয়েক বছর কর্তৃপক্ষ বেশ উদার হস্তে কলেজের প্রয়োজনে, বিশেষ করে দেশীয় ভাষাশিক্ষার কারণে, খরচ করতেন। ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে অবশ্য এই প্রবাহে কিছুটা ভাঁটা পড়ে ও কলেজের প্রভাবও কিছু হ্রাস পায়। ঐ বছর ইংলণ্ডের হেইলিবারীতে (Haileybury) নতুন কলেজ স্থাপিত হয় এবং নবনিযুক্ত ইংরেজ সিভিলিয়ানদের ভারতে প্রেরণের পূর্বে সেখানেই ইউরোপীয় ভাষায় পাঠক্রমের মূল অংশ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। কেবলমাত্র প্রাচ্যবিদ্যা ও দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের দায়িত্ব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উপর ন্যস্ত থাকে। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে (১৮১৭-১৮ খ্রীস্টাব্দে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ও ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হলে) কলেজের প্রভাব আরো হ্রাস পেতে থাকে। এর পরে ৪ঠা মে ১৮৩০ তারিখে গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্কের নতুন শিক্ষানীতি চালু হলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রয়োজন ফুরিয়ে আসে। পরিশেষে ১লা মার্চ ১৮৩১ তারিখ বেন্টিঙ্ক কলেজ কাউন্সিল ভেঙে দেন এবং কেরীও কলেজ থেকে বিদায় নেন।

---

১ Baptist Society-কে লেখা কেরীর চিঠি, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮০৪ : Carey Letters, Box 3 : David Kopf, *op. cit.*, p. 77.

কলেজের প্রভাব প্রতিপত্তির এই উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই দেশীয় ভাষাচর্চাদি সহ অন্যান্য সকল খাতে কলেজের বার্ষিক অর্থব্যয়েরও তারতম্য ঘটতে থাকে। কলেজের প্রথম বছরে যখন ৬,৩০,০০০ টাকা খরচ করা হয়, সেই তুলনায় ১৮১০ খ্রীস্টাব্দের একটি প্রস্তাবে দেখা যায় পরিচালকবর্গ (Court of Directors) কলেজকে বাৎসরিক ১,৫০,০০০ টাকা খরচের অনুমতি দেন।[১] হিসাবে দেখা যায়, প্রাক্-হেইলিবারী পর্বে ১৮০৫ ও ১৮০৬ সালে ভাষা-সাহিত্যচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা ('literary patronage') বাবদ কলেজ বার্ষিক ৪৮,০৯২ টাকা খরচ করে।[২] তবে হেইলিবারীতে কলেজ প্রতিষ্ঠার পরেও ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কলেজ দেশীয় ভাষাচর্চার প্রয়োজনে প্রায় ঐ একই রকম অর্থব্যয় করে যায়।[৩] দেখা যায়, ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কলেজ ছাত্রদের পুরস্কার দান, দেশীয় ভাষা-চর্চায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রাচ্যবিদ্যা ও সংস্কৃতচর্চা, অনুবাদ প্রভৃতি বাবদ প্রায় একই হারে খরচ অব্যাহত রাখে। স্বভাবতই এই অর্থ বরাদ্দের একটা মোটা অংশ দেশীয় ভাষায় মুদ্রণ ও প্রকাশন বাবদ খরচ হত।

প্রসঙ্গত, ১৮১২ থেকে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কলেজের মোট বার্ষিক খরচ, দেশীয় ভাষা সাহিত্যচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা ('literary patronage') বাবদ খরচ এবং মোট খরচের তা কত শতাংশ তার একটি হিসাব নীচে দেওয়া হল :

বছর	মোট খরচ	দেশীয় ভাষাসাহিত্য-চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা বাবদ খরচ	মোট খরচের শতাংশ
১৮১২	১৮১,০৬৮ টাকা	২৮,০১৮ টাকা	১৫.৫
১৮১৩	২০৩,০১৪ ,,	৩৫,৪০৯ ,,	১৭.৪
১৮১৪	১৯৭,১৮৩ ,,	২৬,৬০২ ,,	১৩.৫
১৮১৫	১৯১,১২৪ ,,	৪১,০১১ ,,	২১.৫
১৮১৬	১৫৮,৬১৯ ,,	১৪,৯৮১ ,,	৯.৪
১৮১৭	১৪৭,৫১৬ ,,	১৫,১২১ ,,	১০.৩
১৮১৮	১৫৬,৬৪৯ ,,	১৭,৭৪৫ ,,	১১.৩
১৮১৯	১৩৫,৫০৪ ,,	১৩,৬৬৮ ,,	১০.১

---

১ P.C.F.W., Home Misc. No. DLXI (Sept. 9, 1810), pp. 220-23 ; D. Kopf, *op. cit.*, p. 104.

২ *Ibid*, DLX (April, 1806, Accounts), pp. 143-44.

৩ *Ibid*, DLX IV (Oct. 16, 1816), pp. 199-201.

বছর	মোট খরচ	দেশীয় ভাষাসাহিত্য-চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা বাবদ খরচ	মোট খরচের শতাংশ
১৮২০	? টাকা	১৯,৮২৯ টাকা	?
১৮২১	১২৩,৩৩১ ,,	?	?
১৮২২	১৩৬,৭৬৪ ,,	৯,১১৪ ,,	৬.৭
১৮২৩	১২৮,১১৪ ,,	?	?
১৮২৪	১১৬,৪৭৩ ,,	৪,৯৯০ ,,	৪.৩
১৮২৫	১৩৫,৪৯৭ ,,	২১,১৮৫ ,,	১৫.৬
১৮২৬	১২৬,৫০০ ,,	৮,৩৩০ ,,	৬.৬
১৮২৭	১৩৯,৬৩৬ ,,	৭,৭২২ ,,	৫.৫
১৮২৮	১৩৫,৪৬০ ,,	৫,৭৭৫ ,,	৪.৩
১৮২৯	১১৭,৮৮৪ ,,	১১,৭৮১ ,,	১০.০
১৮৩০	৮২,৫৯৭ ,,	৬,৬১১ ,,	৮.০
১৮৩১	৭১,৮৮২ ,,	(শূন্য)	(শূন্য)

(কেরীর বাংলা অভিধানের জন্য খরচ করা হয় ১০,০০০ টাকা।) ['Home Miscellaneous : Proceedings of the College of Fort William' থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে উপরোক্ত তালিকা সংকলিত হয়েছে। 'শতাংশে'র হিসাব ছাড়া বাকি অংশ উদ্ধৃত হয়েছে David Kopf, '*British Orientalism and the Bengal Renaissance*' গ্রন্থের পৃষ্ঠা ২২০/পৃ. ২৩৪ থেকে। 'শতাংশের' হিসাব আমার নিজস্ব সংযোজন।]

কলেজের পণ্ডিত লেখকগোষ্ঠী ও তাঁদের রচিত বাংলা গ্রন্থ

বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের বিকাশের কাজে স্বভাবতই কলেজের বাংলা বিভাগই বিশেষভাবে জড়িত ছিল। শিক্ষক হিসাবে কেরীর নেতৃত্বে ১৮০১ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মে যখন এই বিভাগের পত্তন হয় তখন এর ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩, কিন্তু বাংলা ভাষায় পঠন-পাঠনের জন্য প্রয়োজনীয় একটিও পাঠ্যপুস্তক ছিল না। সুতরাং প্রথমাবধি স্বয়ং কেরী ও তাঁর বিভাগীয় অন্যান্য বাঙালী পণ্ডিত মুন্সী ও সহকারী পণ্ডিত, কলেজ গ্রন্থাগারের বাঙালী গ্রন্থাগারিক—প্রভৃতি অনেকেই বাংলা গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হন। কেরীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের আর্থিক আনুকূল্যে বাঙালী পণ্ডিতেরা যেসব বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় সেগুলি দ্রুত মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়। এরই ফল স্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সামগ্রিকভাবে বাংলা মুদ্রণের বিকাশের পথ সুগম হয়ে ওঠে।

বাংলা মুদ্রণের বিকাশ পর্বে (১৮০০-১৮১৬) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যে-সব অধ্যাপক, পণ্ডিত, মুন্সী, সহকারী পণ্ডিত বা কর্মী বাংলা গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হন তাঁদের নাম ও রচিত গ্রন্থের তালিকাটি এইরূপ দাঁড়ায় :

উইলিয়ম কেরী : বাংলা ব্যাকরণ (শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮০১),
(১৭৬১-১৮৩৪) কথোপকথন (শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮০১),
ইতিহাসমালা (" " " ১৮১২)।

রামরাম বসু : রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮০১),
(১৭৫৭-১৮১৩) লিপিমালা (শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮০২)।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার : বত্রিশ সিংহাসন (শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮০২),
(১৭৬২-১৮১৯) হিতোপদেশ (" " " ১৮০৮),
রাজাবলি (" " " ১৮০৮)।

তারিণীচরণ মিত্র : ওরিয়েন্টাল-ফেবুলিষ্ট (কলিকাতা, হরকরা অফিস, ১৮০৩)।
(১৭৭২—)

চণ্ডীচরণ মুন্সী (—১৮০৮) : তোতা ইতিহাস (শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮০৫)

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় : মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮০৫)।

মোহনপ্রসাদ ঠাকুর : বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষ (হিন্দুস্থানী প্রেস, ১৮১০)।

হরপ্রসাদ রায় : পুরুষপরীক্ষা (শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮১৫)।

উইলিয়ম কেরীর অপর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাংলা-ইংরেজি অভিধান' (শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮১৫-২৫) এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অপর দুটি গ্রন্থ 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' (কলিকাতা, গভর্নমেন্ট গেজেট প্রেস, ১৮১৭) ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮৩৩) বক্ষ্যমাণ বিকাশ পর্বের (১৮০০-১৮১৬) পরবর্তীকালে প্রকাশিত বলে উপরোক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে নিছক প্রকাশ সনের হিসাব বাদ দিলে এই বইগুলিকেও স্বচ্ছন্দে বিকাশ পর্বের লক্ষণাক্রান্ত বলা চলে।

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচন্দ্রিকা ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও তা এর অনেক আগেই, আনুমানিক ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত। কেরীর অনুরোধে কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে এটি রচিত হয়। কিন্তু নানা কারণে তার প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে মৃত্যুঞ্জয় কলেজের কাজ ত্যাগ করে সুপ্রীম কোর্টে জজ পণ্ডিত হিসাবে যোগদান করেন। সেইজন্য হয়ত প্রকাশনের কাজ শুরু হতে কিছুটা বিলম্ব ঘটে। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের শুরুতে কেরীর একটি চিঠিতে জানা যায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস এটি মুদ্রণে উদ্যোগী হয়। কিন্তু ঐ বছরের মাঝামাঝি সময় তীর্থভ্রমণকালে মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হলে পুনরায় প্রকাশনের কাজ ব্যাহত হয়। পরিশেষে ১৮৩৩ সালের মে মাসে এটি শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

১২৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত এর প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ : 'প্রবোধ চন্দ্রিকা। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক ফোর্ট উলিয়ম কালেজের ছাত্রেরদের নিমিত্ত রচিত। শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১৮৩৩।' দীর্ঘকাল পাঠ্যপুস্তক হিসাবে এটি সমাদৃত ছিল, পরবর্তীকালে এর একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই রচনার স্বীকৃতি স্বরূপ মৃত্যুঞ্জয়কে পুরস্কার দানের জন্য কেরী কলেজ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিলেন। প্রবোধচন্দ্রিকা মৃত্যুঞ্জয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। সাধু, মৌখিক ও সংস্কৃতরীতির বাংলা গদ্যের সার্থক প্রয়োগ এখানে দেখা যায়।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অপর গ্রন্থ 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' ইংরেজি অনুবাদ সহ ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা সরকারী গেজেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এর আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ : 'An Apology for The Present System of HINDO WORSHIP. Written in the Bengalee Language, and accompanied by an English Translation. Calcutta : Printed by A. G. Balfour, at the Government Gazettee Press, No. 1, Mission Row. 1817'. বইয়ের কোথাও গ্রন্থকার হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের নাম নেই। অনেকে ভুলক্রমে এটি রামমোহনের রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত 'রামমোহন রচনাবলীতে' (প্রধান সম্পাদক : অজিতকুমার ঘোষ। কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩) এই আখ্যাপত্রটি মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু এটি রামমোহনের রচনা নয়। রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫) ও 'বেদান্ত সার' (১৮১৫) প্রকাশিত হবার অল্পকাল পরেই মৃত্যুঞ্জয় 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' (১৮১৭) প্রকাশ করে প্রমাণ করেন যে বাংলা ভাষাতেও বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে দুরূহ শাস্ত্রীয় বিচার করা সম্ভব। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' যে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা সে সম্বন্ধে দু'একটি পরোক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত করা যায় :

১. ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক (১৮১৯-২০ খ্রীঃ) কার্যবিবরণীর দ্বিতীয় পরিশিষ্টে (Appendix No. II) দেশীয় ছাপাখানায় মুদ্রিত দেশীয় ভাষার বইয়ের তালিকা দেওয়া আছে। এর মধ্যে বাংলা বইয়ের তালিকায় উল্লেখ আছে :

> '34 Vedanta-chondrika : on the Vedant system (in defence of Hindoo Idolatry, against the observations of Rammohun Roy)—Mrityonjoy Bidyaloncar.'

২. ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে *Calcutta Review* পত্রিকায় 'Vedantism—What is it ?' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে মৃত্যুঞ্জয় ও তাঁর 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে, তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে : '...It was published, in 1817, anonymously ; and the following are the only scanty particulars which we have been enabled to glean concerning the author and his work. His name was Mrityunjoya Vidyalankara.

He was head Pundit of the College of Fort William ; and afterwards Pundit of the Supreme Court under Sir Francis Macnaghten. He died, about 1820, at Moorshedabad, on his return from Benaras ; bearing universally the character of a very learned man in all the Darsans or systems of Sanskrit learning and philosophy…Of the work itself two hundred and fifty copies were originally struck off ; and there has been no second edition, it has long been difficult if not impossible to obtain a copy ;…' (pp. 44-45)[১]

উইলিয়ম কেরীর বাংলা-ইংরেজি অভিধান এই সময়কার আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে তিন অংশে (প্রথম খণ্ড ও দু ভাগে বিভক্ত দ্বিতীয় খণ্ড) সমাপ্ত এই বৃহৎ অভিধান [পৃ. ৬১৬ + ১৫৪৪ (১-৪৬৪ পৃ., ৪৬৫-১৫৪৪ পৃ.)] মুদ্রণের কাজ বক্ষ্যমাণ বিকাশ পর্বে শুরু হলেও তা সম্পূর্ণ হয় ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে। প্রকৃতপক্ষে এর প্রথম খণ্ডটি মুদ্রিত হয় ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড়ো হরফে ছাপা সেই প্রথম খণ্ডটির কলেবর দেখে সমগ্র অভিধানটি একত্রে যে বিপুল আকার ধারণ করতে পারে তা আশঙ্কা করে কেরী ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণটি আর প্রকাশ করেন না। তখন প্রধানত এই অভিধানের জন্যই এক সাট নতুন ছোটো হরফ তৈরি করিয়ে পুনশ্চ প্রথম খণ্ডটি ছাপা হয় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে। এইটিই প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ হিসাবে পরিচিত, এবং এর অবিক্রীত কপিগুলির আখ্যাপত্র পরিবর্তন করে পুনর্মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত হয় ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে। ঐ একই বছর প্রথম খণ্ডের ২য় সংস্করণের সঙ্গে একত্রে বাঁধিয়ে প্রকাশিত হয় অভিধানটির দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগ (১৮২৫)। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগও ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কেরীর এই বাংলা অভিধান সম্বন্ধে পরবর্তী পর্বে (বিস্তার পর্বে) আরো আলোচনা করা হল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ও লেখক গোষ্ঠী রচিত বিকাশ পর্বের পূর্বোক্ত গ্রন্থ-তালিকাভুক্ত বইগুলির মধ্যে কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের দ্বিতীয় মুন্সী, পরে প্রধান মুন্সী তারিণীচরণ মিত্রের বাংলা অনুবাদ সহ 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' (*The Oriental Fabulist*) বইটি পুরোপুরি রোমান হরফে মুদ্রিত। সেই হিসাবে এটি বক্ষ্যমাণ বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আলোচনার পরিধি বহির্ভূত। [রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের সহযোগে তারিণীচরণ মিত্রের অপর অনূদিত বাংলা গ্রন্থ 'নীতিকথা' ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়ে ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়।] পূর্বোক্ত তালিকা-ভুক্ত বইগুলি ছাড়াও সমসাময়িক আরো কিছু কিছু বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। রোবাকের

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' (১ম), 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার', পৃ. ২২।

গ্রন্থে কলেজের বাংলা বিভাগের অন্যতম পণ্ডিত (১৮০৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে নিযুক্ত) রামকিশোর তর্কচূড়ামণি প্রণীত ও ১৮০৮ সালে প্রকাশিত অক্‌টেভো আকারের 'হিতোপদেশ' গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোথাও বইটির সন্ধান করা যায়নি। [রোবাক অবশ্য ভুলক্রমে গ্রন্থকর্তার নাম রামকিশোর তর্কালঙ্কার (Ramkishoru Turkalunkaru) বলে উল্লেখ করেছেন।[১]] আগেই বলেছি, চণ্ডীচরণ মুন্‌সী 'ভগবদ্গীতা'র বঙ্গানুবাদ (১৮০৪) করেছেন বলে জানা যায়, কিন্তু আদৌ বইটি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা সঠিক বলা যায় না। ৫ই অক্টোবর, ১৮০৪ তারিখে কলেজ কাউন্সিলকে লেখা কেরীর সুপারিশপত্র থেকে জানা যায় যে কেরী চণ্ডীচরণের ঐ বঙ্গানুবাদের পাণ্ডুলিপিটি কলেজের বাংলা বিভাগের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে মুদ্রণের প্রস্তাব করে কাউন্সিলের কাছে পাঠান।[২] কাউন্সিল ওটি মুদ্রণের জন্য অনুমোদন করেন। ২০শে সেপ্টেম্বর ১৮০৪ তারিখে কলেজের কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য পুস্তকের যে তালিকা পাওয়া যায়, তাতেও 'Ready for the press' এই শিরোনামায় ৩ ও ৪ সংখ্যক পুস্তক হিসাবে উল্লেখ আছে :

'(3) Translation of the Bhagwut Geeta, from the Shanscrit into Bengalee, by Chunder Churun Moonshee.

(4) Translation of the Tootanameh, from the Persian into Bengalee, by the same'.[৩]

চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাস' যথারীতি ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই একটি সূত্রে অনুমান করা যেতে পারে, 'ভগবদ্গীতা'র বঙ্গানুবাদটিও হয়ত অচিরে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সমসাময়িককালে বাংলা ভাষায় প্রণীত ভগবদ্গীতার আরো একটি টীকার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮১৪ তারিখে লেখা কেরীর একটি চিঠিতে জানা যায় যে কোনো এক পণ্ডিত ভগবদ্গীতার এক উল্লেখযোগ্য বাংলা টীকা প্রস্তুত করেছেন। কলেজ কাউন্সিলের সেক্রেটারি এ. লকেটের কাছে লেখা ঐ চিঠিতে কেরী টীকাকারকে অন্তত ৫০ টাকা পুরস্কার দানে উৎসাহিত করার অনুরোধ জানান এবং তিনি নিজ ব্যয়ে মূল সংস্কৃত গীতা সহ ঐ বাংলা টীকা ছাপার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কেরী লেখেন : 'A Pundit has written in the Bengalee language a commentary on the Bhagvut Geeta which is well executed and highly deserving of a reward, it being calculated to

---

১ T. Roebuck, *op. cit.*, Appendix, p. 29.

২ Home Misc., Vol. 559, pp. 384-85.

৩ Rev. C. Buchanon, '*The College of Fort William in Bengal*' (1805), pp. 228-29. এই তালিকা 'Primitioe Orientales', Vol. III (1804)., গ্রন্থেও মুদ্রিত আছে।

combine the study of the Bengalee language with a valuable piece of assistance in the study of Sanskrit. I therefore request that a small reward, not less than Rs. 50, be given him for the work. At the same time I propose to print the Geeta in Sanskrit with this commentary in the Bengalee language at my own private expence, if the College Council have no objection to its being thus made public'.[১] এই টীকাকার পণ্ডিতের সঠিক পরিচয় বা কেরীর অভীষ্ট এই প্রকাশনের সন্ধান পাওয়া যায় না।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বিভিন্ন প্রাচ্যভাষার অভিধান বা শব্দকোষ সংকলনে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। কর্তৃপক্ষের উৎসাহে কলেজের বাঙালী গ্রন্থাগারিক মোহনপ্রসাদ ঠাকুর কর্তৃক সংকলিত বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষ ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুস্থানী প্রেসে ছাপা হয়। মোহনপ্রসাদের আরেকটি শব্দকোষ, ওড়িয়া-ইংরেজি, ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে একটি সংস্কৃত-বাংলা শব্দকোষ প্রকাশিত হয়। হিন্দুস্থানী প্রেসে ছাপা এই সংস্কৃত-বাংলা অভিধানটির (১৮০৯) আখ্যাপত্রে গ্রন্থকর্তার নাম পাওয়া যায় না। তবে এটি পরবৎসর ছাপা মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের বাংলা-ইংরেজি অভিধানের (১৮১০) আদর্শে সংকলিত ; উভয় গ্রন্থে শব্দবিন্যাস, শব্দসংখ্যা বা পৃষ্ঠাসংখ্যা একই। সেই হিসাবে অনুমান করা যেতে পারে এটিও মোহনপ্রসাদের রচনা। এর আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 'সংস্কৃত শব্দাঃ বঙ্গদেশীয় ভাষাচ। Vocabulary/Sunskrit/and/Bengalee/Calcutta/Printed by Thomas Hubbard,/Hindoostanee Press/MDCCCIX/' [1809], পৃষ্ঠাসংখ্যা ১+২০০, আকার ২২ × ১৪ সে.মি.।[২]

এই অভিধানটির সংস্কৃত শব্দ দেবনাগর অক্ষরে ও বাংলা শব্দ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। উদাহরণ স্বরূপ, এর কয়েকটি সংস্কৃত শব্দ (বঙ্গাক্ষরে) ও তার বাংলা অর্থ নীচে উদ্ধৃত হল :

স্রষ্টা—সৃষ্টিকর্তা (পৃ. ১) ধূম্রকেতুঃ—ধূমকেতু (পৃ. ৩) বিন্দুঃ—ফোটা, বুঁদ (পৃ. ৯)

শস্ত্রম—অস্ত্র (পৃ. ৩১) তক্রপিংডঃ—পনীর (পৃ. ৫১) হংডি—হাঁড়ি (পৃ. ৫৭)

কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে এই অভিধানের একটি করে কপি রক্ষিত আছে। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির তালিকায় এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে : 'Vocabulary, Sanskrit and Bengalee (and Oriya), pp. 200. 24 × 15 c.m. Calcutta. 1809'. লঙ-এর তালিকাতেও এই গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় : 'The same year (i.e. 1809) a Dictionary of 3600 Sanskrit words used in Bengali with their meanings, pp. 200 ; was published at the Hindustani Press'.

---

১ Home Misc., No. 563, pp. 67-68 ; সজনীকান্ত দাস, তদেব, ২১৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, 'বাংলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়', পৃ. ১৯।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে সংস্কৃত-বাংলা শব্দ সংগ্রহের উল্লেখ রয়েছে। ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৮০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম বার্ষিক সাধারণ বিতর্কসভায় পরিদর্শক (Visitor) লর্ড মিণ্টো তাঁর ভাষণে বলেন: '...a Vocabulary in Persian and Hindoostanee, and another in Sunskrit and Bengalee, have been prepared, and will be printed and circulated, for the purpose of being filled up by competent persons with the corresponding terms in other languages in use in India. The printed Vocabularies will be soon completed...'.[১] পর বৎসর, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮০৯ তারিখে কলেজের ৮ম বার্ষিক সাধারণ বিতর্কসভায় মিণ্টোর ভাষণে জানা যায় যে পূর্বোক্ত সংস্কৃত-বাংলা শব্দকোষ ছাপার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে: '... Vocabularies, Persian and Hindoostanee, and Sunskrit and Bengalee,... have been completed, and are in course of circulation....'[২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮০৮ সালে প্রদত্ত পূর্বোক্ত ভাষণে লর্ড মিণ্টো বলেন যে ফরস্টার প্রণীত দ্বিতীয় গ্রন্থ ছিল সংস্কৃত-বাংলা অভিধান, এবং তখন তা সমাপ্তপ্রায় ও তার প্রকাশ আসন্ন: '...Mr. (H. P.) Forster's second work, which is nearly ready for the press, consists of a Dictionary, in the Sunskrit and Bengalee languages. The words are arranged alphabetically; with a translation into English. The etymologies are pointed out, and where necessary, confirmed and illustrated by examples.'[৩] এটি মুদ্রিত হয়েছিল কিনা সঠিক জানা যায় না।

১৮০৯ সালে প্রদত্ত মিণ্টোর পূর্বোক্ত ভাষণে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দসংগ্রহের উল্লেখ পাই। তিনি জানান, কোলব্রুকের নির্দেশনায় দেশীয় পণ্ডিত-মুন্সীগণ সংস্কৃত অভিধান অমরকোষের আদর্শে বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দুস্থানী, মারাঠী, গুজরাটী, তেলেগু, প্রভৃতি বারোটি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় একটি তুলনামূলক শব্দকোষ সংকলনের কাজ সম্পূর্ণ করেছেন: 'In the meantime, comparative Vocabulary of twelve principal languages, to the same extent, and in the same order with the Sunskrit Dictionary, termed the Umur Kosh, has been compiled, by persons employed for that purpose by Mr. Colebrooke; and a copy of it has been prepared to be deposited in the Library of the College. The languages comprized in the compilation are those of Bengal, Orissa, Tirhoot, Hindoostan, Punjab

১ T. Roebuck, *op. cit.*, p. 157.

২ *Ibid*, p. 212.

৩ *Ibid*, pp. 159-60.

and Kashmeer, Nepal, Guzrat, Kunara, and Telingana, with the Muhratta and Tamool or Malabar...'[১] এই তুলনামূলক শব্দকোষটি মুদ্রিত হয়েছিল, কিনা জানা যায় না।

লঙ-এর তালিকায় জানা যায়, পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'শব্দসিন্ধু'— সংস্কৃত অভিধান 'অমরকোষ'-এর বাংলা শব্দসংকলন ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়; 'In 1809 Pitambar Mukherjea of Uttarpara, published the Shabda Sindhu, or meaning in Bengali of the Amara Kosh, a Sanskrit Dictionary.'

কিন্তু এই তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি ও জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় অনূদিত 'শব্দসিন্ধু'র প্রকাশকাল দেখা যায় ১২২৪ সাল, বা ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দ। এর আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 'ভগবান অমরসিংহ কৃত অভিধান অকারাদি ক্রমে ভাষায় বিবরণ করিয়া শব্দসিন্ধু নাম রাখিয়া কলিকাতায় ছাপা হইল। সন ১২২৪ সাল।' পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৯২।

কলেজে পাঠভ্যাস কালে ইংরেজ ছাত্ররাও কিছু কিছু বাংলা অনুবাদ করেন। তাঁদের কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ ভার্জিলের *Aeneid* ও সেক্সপীয়রের *Tempest*-এর বাংলা অনুবাদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা বিভাগের ছাত্র হেনরী সার্জেণ্ট (H. Sargent) *Aeneid* কাব্য বাংলা গদ্যে অনুবাদ করেন ও মঙ্কটন (Monckton) *Tempest*-এর বঙ্গানুবাদ করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮০৯ তারিখে অষ্টম বার্ষিক সাধারণ বিতর্কসভায় পরিদর্শক মিণ্টো এর উল্লেখ করেন : '...Mr. Sargent has qualified himself to translate four books of Virgil's Aeneid into the language of Bengal, and has performed the work in a manner to merit the highest commendation of those who are competent to judge of it...' ঐ সভায় লর্ড মিণ্টো আরো বলেন, 'Mr. Monckton has undertaken, and has been able to execute, a translation into Bengalee, of Shakespeare's tragedy of the Tempest....'[২]

দুঃখের কথা, উপরোক্ত অনুবাদ দুটির কোনোটিরও সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই অনুবাদ দুটির মধ্যে অন্তত সার্জেণ্ট অনূদিত ভার্জিলের কাব্যটি যে মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়েছিল তার উল্লেখ পাই। লঙের পুস্তক তালিকায় জানা যায় যে এর প্রথম খণ্ড ১৮০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির পুস্তকতালিকাতেও (১৮৫৫) এর উল্লেখ আছে : 'Sargent (H.), Virgil's Aeneid, 8vo, Serampore, 1810.'[৩] কিন্তু পুস্তকটি আজও কোথাও সন্ধান করা যায়নি।

---

১ *Ibid*, p. 212.

২ *Ibid*, p. 187.

৩ সজনীকান্ত দাস, তদেব, পৃ. ১৭৮।

বাংলা মুদ্রণের বিকাশ পর্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পণ্ডিত ও লেখক-গোষ্ঠির অবদানের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে এইসব লেখক ও তাঁদের বিভিন্ন রচনার কথা এতক্ষণ উল্লেখ করা হল। এ ছাড়া কলেজের নেতৃস্থানীয় পণ্ডিত ও লেখকবৃন্দের প্রধান প্রধান গ্রন্থের তালিকা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। পূর্বোক্ত ঐ তালিকাভুক্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার প্রসঙ্গে এখানে পুনশ্চ আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। ঐ তালিকাভুক্ত অধিকাংশ গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় আলোচনা আমি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে [বিকাশ পর্ব : চতুর্থ অধ্যায়] করেছি। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের এই লেখকগোষ্ঠির অধিকাংশই এখন আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে সুপরিচিত। বাহুল্যবোধে তার পুনরুল্লেখ না করে কেবল এই সব লেখকগোষ্ঠির মধ্যে একমাত্র অনালোচিত বা স্বল্পালোচিত গ্রন্থকার মোহনপ্রসাদ ঠাকুর ও তাঁর শব্দকোষ সম্বন্ধে এখানে বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে।

মোহনপ্রসাদ ঠাকুর ও তাঁর রচিত বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলা ভাষাসাহিত্য চর্চার বুনিয়াদ গঠনে যাঁদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মোহনপ্রসাদ ঠাকুর তাঁদের অন্যতম। অথচ তিনি আজ বিস্মৃতপ্রায়। তার মূল কারণ, তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি। সমসাময়িক সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন তথ্যনির্ভর ধারণা থেকেই আমাদের সমগ্র মানুষটিকে কল্পনা করে নিতে হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলা দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের নাম জড়িত। তিনি ছিলেন গ্রন্থকার ও কোষকার, বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী, সমাজসেবী, বিদ্যোৎসাহী ও একজন বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক। নব্য বাংলার প্রথম বাঙালী গ্রন্থাগারিকের দুর্লভ সম্মানে তাঁকে ভূষিত করা যায়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে একটি বিধিসম্মত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে। ভারতবর্ষে এটিই প্রথম প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক গ্রন্থাগার (Institutional Library)। প্রাচ্য ভাষায় পুঁথি ও গ্রন্থ ছিল এর উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়ম হান্টার (William Hunter)-এর গ্রন্থাগারিক ও ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মোহনপ্রসাদ ঠাকুর সহকারী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন।[১] আজ পর্যন্ত তদানীন্তনকালের যে সকল তথ্য ও দলিল পাওয়া গেছে তাতে ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দের আগের কোনো ঘটনার সূত্রে মোহনপ্রসাদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়নি। কবে কোথায় তাঁর জন্ম, কোথায় শিক্ষা, কিছুই জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায় তাঁকে যখন গ্রন্থাগারের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন তিনি শিক্ষার মান

---

১ T. Roebuck, *op. cit.*, Appendix, p. 51.

ও বয়সের মাপকাঠি উভয় দিক দিয়েই পরিণতি লাভ করেছেন। অন্যথায় কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে এই কর্মভার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতেন না। কলেজে যোগদানের সময় তাঁর বয়স ত্রিশের সীমানায় পৌছনো স্বাভাবিক, সুতরাং তাঁর জন্মকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশক নাগাদ হওয়া সম্ভব।

হান্টার গ্রন্থাগারের দায়িত্ব নেবার পর এটিকে একেবারে ঢেলে সাজাতে সচেষ্ট হন। এ কাজে মোহনপ্রসাদ ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়ক। রোবাকের গ্রন্থের শেষে উল্লেখ আছে যে কলেজে মোট তিনজন Native Librarian ছিলেন: মোহনপ্রসাদ ঠাকুর, অক্টোবর ১৮০৭ থেকে; Muoluvee Ikram Ulee, অক্টোবর ১৮১৬ থেকে ও Moonshee Ghoolam Huedar, সেপ্টেম্বর ১৮০১ থেকে।[১] [শেষের তারিখটি অবশ্য সন্দেহজনক।]

কলেজ গ্রন্থাগারের অগ্রগতির অনেক মূল্যবান তথ্য Home Miscellaneous, No. 559-565 (1802-1818); Proceedings of the College of Fort William— এই পর্যায়ের সরকারী দলিলে খুঁজে পাওয়া যায়। কলেজ গ্রন্থাগারের ক্রমবর্ধমান কাজের চাপের ফলে ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে কলেজ কাউন্সিল একজন 'adjutant librarian' নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন এবং স্থির হয়, এই পদে একজন ভারতীয়কে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে নিয়োগ করা হবে।[২] হিন্দুস্থানী বিভাগের একজন মুসলমান মৌলভীকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি মোহনপ্রসাদের অধীনে এই কাজে যোগ দেন। গ্রন্থাগার পরিচালনার মূল দায়িত্ব কার্যত মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের উপরই ন্যস্ত ছিল। তবে তৎকালীন ব্রিটিশ আমলের প্রথানুযায়ী সরকারীভাবে একজন বিদেশী রাজকর্মচারীই ছিলেন এর গ্রন্থাগারিক, এবং মোহনপ্রসাদ সহকারী গ্রন্থাগারিক।

গ্রন্থাগার পরিচালনার বিভিন্ন সমস্যা ও তা নিয়ে বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে মোহনপ্রসাদকে নিয়ত ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের কাজে, সমগ্র পুঁথি ও পুস্তকসংগ্রহের সূচীকরণের কাজে, নিত্য বই চুরির সমস্যা সমাধানের কাজে, গ্রন্থাগারকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেবার কাজে বিভিন্ন সময়ে মোহনপ্রসাদকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলেজ গ্রন্থাগারের প্রথম দিকে বই চুরির যে জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছিল তার সমাধান করতে গিয়ে বাংলাদেশে বইয়ের ব্যবসায়ের একটা নতুন পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। কলেজ গ্রন্থাগার থেকে ব্যাপক হারে বই চুরি নিরোধের জন্য ১৮০৭ থেকে ১৮১০ সালের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন আইনকানুন প্রবর্তন করতে দেখা যায়।[৩] ঐ সময় বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত যে-সব বই

---

১ *Ibid.*

২ P.C.F.W., Home Misc., DLXII (Sept. 14, 1811), p. 32.

৩ Seton-Karr, '*Selections from Calcutta Gazette,*' Vol. IV, p. 429; Home Misc., DLXI (Dec. 13, 1810), p. 420.

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠ্য ছিল স্বভাবতই তার দাম ছিল চড়া, সংখ্যায়ও অল্প। সম্ভবত বইয়ের এই দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্যই তখন চোরাই বইয়ের ব্যবসা বেশ জমে উঠেছিল। তাই দেখা গেছে, কলেজ কর্তৃপক্ষের পূর্বোক্ত নানাবিধ আইন ও সতর্কতা সত্ত্বেও গ্রন্থাগার থেকে বই চুরি বন্ধ করা যায়নি। এর প্রতিকারার্থে ঐ সময় কলেজ কাউন্সিল একটা নতুন উপায় খুঁজে বার করলেন। তাঁদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও উৎসাহে একদল আইনসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী গড়ে উঠল। তাদের মারফত প্রকাশ্যে কলেজের প্রয়োজনাতিরিক্ত বই জনসাধারণের কাছে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হল। ফলে বইয়ের চোরাকারবার স্তিমিত হল, বই চুরিও কমে এল। এইভাবেই কলেজ গ্রন্থাগারের একটা বিশেষ সমস্যা মেটাতে গিয়ে বাংলাদেশে বইয়ের ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন হয়। গ্রন্থাগারিক হিসাবে এই যুগান্তকারী ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও অন্যতম নিয়ামক ছিলেন মোহনপ্রসাদ ঠাকুর।

কলেজ গ্রন্থাগারের সঙ্গে মোহনপ্রসাদ দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা জুন পর্যন্তও যে তিনি কলেজের 'Native Librarian' হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন, রোবাকের গ্রন্থের শেষে তার উল্লেখ আছে।[১] ইতিমধ্যে অবশ্য ১৮১২-১৩ খ্রীস্টাব্দে হান্টারের মৃত্যুর পর লকেট (Lockett) কলেজের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। লকেট কলেজ কাউন্সিলের Assistant Secretaryও ছিলেন। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দ কলেজ গ্রন্থাগার তথা বাংলাদেশের গ্রন্থাগারের ইতিহাসে এক স্মরণীয় বছর। এই সময় থেকেই কলেজ গ্রন্থাগারের দ্বার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। কলকাতার প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগারের (Public Library) গৌরব সেই হিসাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গ্রন্থাগারের প্রাপ্য। এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রস্তুতি পর্বে সমসাময়িক ইতিহাসে পুনশ্চ মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের নামোল্লেখ পাই। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দেই মার্কুইস হেষ্টিংস কলেজ গ্রন্থাগারকে সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিণত করার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে মে তিনি মোহনপ্রসাদ ঠাকুরকে কলেজের যাবতীয় প্রাচ্য ভাষার পুস্তকের একটি সম্পূর্ণ সূচী (catalogue) প্রণয়নের ভার দেন।[২] ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং গভর্নর জেনারেলের দপ্তর থেকে কলেজের ইউরোপীয় ও প্রাচ্যভাষার সমস্ত গ্রন্থেরই সূচীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ আসে। বই সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে যাতে জনসাধারণকে বই ব্যবহারের অবাধ সুযোগ দেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করারও নির্দেশ আসে।[৩] বিলাতে কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর চার্লস গ্রান্টও (Charles Grant) এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন। ১৮১৮

---

১ T. Roebuck, *op. cit.* Appendix., p. 51.

২ P.C.F.W., Home Misc., DLXIV (May 30, 1816), pp. 101-106.

৩ *Ibid*, May 26, 1817, p. 404.

খ্রীস্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর কলেজ গ্রন্থাগারিক লকেট তাঁর প্রতিবেদনে ঘোষণা করেন যে কলেজের সমস্ত গ্রন্থ ও পুঁথির সূচীকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং গ্রন্থাগারের দ্বার কেবলমাত্র ইউরোপীয়ই নয়, ভারতীয় শিক্ষিত জনসাধারণের জন্যও উন্মুক্ত হোক।[১] লকেটের ঘোষণায় আরো বলা হয় যে গ্রন্থতালিকার প্রথমাংশ ছাপা সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এর অবশিষ্ট অংশ, পুঁথির সম্পূর্ণ তালিকা সহ, কয়েকদিনের মধ্যেই মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হবে।[২] প্রস্তুত গ্রন্থতালিকায় ৮৩৪১টি বই (বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী বর্গীকরণ সহ) ও দু'লক্ষ টাকা মূল্যের ২৯৯৪টি পুঁথি অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলাদেশের প্রথম বিধিবদ্ধ কলেজ ও সাধারণ গ্রন্থাগারের এই সূচীকরণ ও বর্গীকরণের বিরাট কাজে মোহনপ্রসাদের অবদান অনস্বীকার্য। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের পরে এই গ্রন্থাগারের পুঁথি-সংগ্রহ এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর হেস্টিংস লকেটের প্রতিবেদনটি পরিপূর্ণভাবে অনুমোদন করেন ও সেদিন থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গ্রন্থাগারটি রূপান্তরিত হয়ে ভারতের প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত হয়।[৩] এই ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে প্রথম বাঙালী গ্রন্থাগারিক মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

গ্রন্থাগারের কাজে তিনি ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের পরেও আর কতদিন যুক্ত ছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। তবে কিছু পরোক্ষ প্রমাণাদি থেকে মনে হয় এর কয়েক বছর পরেই তিনি অর্থসংকটে পড়েন ও কলকাতা ত্যাগ করে শ্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নলিখিত তথ্য-প্রমাণ উল্লেখ করেছেন :

'শ্রীরামপুরনিবাসী কালিদাস মৈত্র তাঁহার "বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে" (১২৬২ সাল) পুস্তকে লিখিয়াছেন— "তৎকালে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের নিয়মানুসারে মানিলোকের মান রক্ষা হওয়া অতি কঠিন হইয়াছিল, অপিচ যে সমস্ত অধমর্ণ উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিত না, তাহাদিগকে যাবজ্জীবন কারাগারে কাল যাপন করিতে হইত, সুতরাং সেই সমস্ত লোক আপন ২ মান সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্তে অন্য উপায় না থাকাপ্রযুক্ত শ্রীরামপুরে আসিয়া রক্ষা পাইত। কলিকাতায় ইন্সলবেন্ট কোর্ট (Insolvent Court) স্থাপিত হইলে পরে ঐ সমস্ত যোত্রহীন অধমর্ণগণ কলিকাতায় পুনরাগমন করিয়াছে",… (পৃ. ৯৪)

"শ্রীরামপুরে শ্রীযুত হলেনবর্গ সাহেব বিচারপতিপদে নিযুক্ত হইয়া শ্রীযুত বাবু

---

১ *Ibid*, DLXV (Nov. 24-25, 1818), p. 143.

২ কলেজের প্রাচ্যভাষায় প্রকাশ্য বিতর্কসভার সপ্তদশ অধিবেশনে (১৫ আগস্ট, ১৮১৮) মার্ক্যুইস হেস্টিংসের ভাষণেও এর উল্লেখ আছে : T. Roebuck, *op. cit.*, p. 580.

৩ *Ibid*, p. 151.

মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের সহকারে তত্রস্থ বিচারালয়ে ইষ্টাম্প কাগজ ব্যবহারের নিয়ম করিয়ছিলেন, মোহনপ্রসাদ ঠাকুরও কলিকাতা হইতে এই নগরে আশ্রয় লইয়াছিলেন।” (পৃ. ৯৫)

'হলেনবর্গ ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুরের গবর্নর হন এবং ১১মে ১৮৩৩ তারিখে মারা যান। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে মোহনপ্রসাদ যে শ্রীরামপুরে ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ।'[১]

মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের জীবনের অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে আর কোনো তথ্য জানা যায় না। সম্ভবত ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। কারণ দেখা যায় ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র করের সম্পাদনায় তাঁর বাংলা-ইংরেজি অভিধানের ৩য় সং প্রকাশিত হয়; ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে অভিধানটি প্রথম প্রকাশিত হবার পর তাঁর জীবিতাবস্থায় ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে এর ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

সমসাময়িক কালে মোহনপ্রসাদ যে একজন বিশেষ সম্মানীয় পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি হিসাবে কলকাতার সমাজে পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে। নব্যবাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে হিন্দু কলেজের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। এই হিন্দু কলেজের বিদ্যালয় বিভাগের উদ্বোধন হয় ২০শে জানুয়ারি ১৮১৭ তারিখে। এই উপলক্ষে গড়ানহাটায় ৩০৪নং চিৎপুর রোডে যে সভানুষ্ঠান হয় তাতে সমাজের বিশিষ্ট গণ্যমান্য সুধীজনেরা উপস্থিত ছিলেন। যদিও একই সময়ে কলকাতা রাজভবনে অপর একটি অনুষ্ঠান থাকায় বিশিষ্ট ইংরাজ পুরুষেরা ঐ সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি, তবে অগ্রগণ্য বাঙালী পণ্ডিতেরা অনেকেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। যেমন, রাধাকান্ত দেব, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীমোহন দেব, গোপীমোহন ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ সিংহ, প্রভৃতি। এঁদের সঙ্গে উপস্থিত ব্যক্তিদের তালিকায় মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের নামও পাওয়া যায়।[২]

একজন বিশিষ্ট কোষকার ও গ্রন্থকার হিসাবেও মোহনপ্রসাদ সুবিদিত। তিনি বিভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। কলেজে ভাষাচর্চার প্রাথমিক সোপান হিসাবে অপরিহার্য কয়েকটি মূল্যবান শব্দকোষ বা অভিধান তিনি সংকলন করেছিলেন, যেমন সংস্কৃত-বাংলা শব্দসংগ্রহ (১৮০৯), বাংলা-ইংরেজি শব্দসংগ্রহ (১৮১০) এবং ওড়িয়া-ইংরেজি শব্দসংগ্রহ (১৮১১)। তাঁর সব কটি শব্দসংগ্রহই মোটামুটি একই পরিকল্পনায় সংকলিত। বাংলা বা ওড়িয়া ভাষা শিক্ষার্থী বিদেশী ছাত্রদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে তিনি এগুলি সংকলন করেছিলেন। ফরস্টারের ইংরেজি-বাংলা (১৭৯৯) ও বাংলা-ইংরেজি (১৮০২) শব্দসংগ্রহ এবং কেরীর বাংলা-ইংরেজি অভিধানের (১৮১৫-১৮২৫) মধ্যবর্তী সময়ে

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা (১ম খণ্ড): 'মোহনপ্রসাদ ঠাকুর', পৃ. ৩৬।

২ S. C. Majumdar & G. N. Dhar, ed., 'Presidency College Register', 1927; *Calcutta Monthly Journal*, Jan. 27, 1817.

মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের বাংলা-ইংরেজি শব্দসংগ্রহটি (১৮১০) প্রকাশিত হলেও এর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এবং শিক্ষার্থী মহলে দীর্ঘকাল যাবৎ এটি সমাদর লাভ করেছিল। তাঁর শব্দকোষটি ছিল বাঙালী কর্তৃক সংকলিত প্রথম বাংলা শব্দকোষ। এছাড়া তাঁর ওড়িয়া শব্দসংগ্রহটিও ছিল ওড়িয়া ভাষার প্রথম শব্দকোষ। সুতরাং বলা যেতে পারে বাঙালী কোষকার হিসাবে মোহনপ্রসাদ পথিকৃতের সম্মানের অধিকারী।

দীর্ঘকাল তাঁর বাংলা-ইংরেজি অভিধানটির চাহিদা ছিল এবং এর একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির গ্রন্থাগারেও ছাত্রদের জন্য এই অভিধানটি রাখা হয়।[১] বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে;[২] ছাপা হয় হিন্দুস্থানী প্রেসে, যার স্বত্বাধিকারী ছিলেন কলেজ গ্রন্থাগারিক হান্টার। তিনি তাঁর সহকারী গ্রন্থাগারিকের ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আস্থাশীল ছিলেন বলেই তাঁর বইটি প্রকাশ করেন। জনসাধারণও তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন কারণ তাঁদের অগ্রিম চাঁদার টাকাতেই এর মুদ্রণ খরচ চালানো হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বইটির ১০০ কপি ক্রয় করেন। মোট ১৮৪ জন অগ্রিম গ্রাহকের মধ্যে মাত্র ১৪ জন বাঙালী ছিলেন : রামকমল সেন, তারিণীচরণ মিত্র, ভরতচরণ রায়, ব্রজকিশোর বসাক, বৈষ্ণবচরণ ঘোষ, কালিপ্রসাদ ঠাকুর, দত্তরাম পাকড়াশি, গোপীমোহন বড়াল, গৌরচরণ দে, হিদারাম ব্যানার্জী, জগমোহন চ্যাটার্জী, মুর্ খাঁ, রাধামোহন চক্রবর্তী, রামকানাই দত্ত। এ ছাড়া বাকি সবাই ইউরোপীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বইটির গ্রাহক তালিকায় শ্বেতাঙ্গ গ্রাহকদের নামের আগে বা পরে Mr. বা Esq. লেখা আছে, কিন্তু দেশীয় গ্রাহকদের নামের সঙ্গে এরূপ কোনো সম্মানসূচক শব্দ লেখা নেই।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ (৮+৩+১৮০ পৃষ্ঠা সম্বলিত) কলকাতার Times Press থেকে ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় ও গোবিন্দচন্দ্র করের সম্পাদনায় এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে। পুনর্মুদ্রিত ৩য় সংস্করণ (১৬৬ পৃ.) Sanders, Cones Co. কর্তৃক ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই স্বল্পালোচিত অভিধানটির ১ম সং থেকে গৃহীত প্রতিলিপি সহ বিস্তারিত আলোচনা করেন চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ('বসুমতী' : আশ্বিন ১৩৭৪)। 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রিকায় ৩য় সংস্করণের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যও তাঁর 'বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়'-এ বইটি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

অভিধানটির ১ম সংস্করণের একটি দুর্লভ কপি জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এর আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 'A/VOCABULARY,/BENGALEE AND ENGLISH,/ FOR THE USE OF/STUDENTS./BY MOHUNPERSAUD TAKOOR,/

১ Calcutta School Book Society's 3rd Report, 1820 : Appendix IV.

২ লঙের তালিকায় প্রথম সংস্করণ মুদ্রণের তারিখ দেওয়া আছে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ। এই তারিখ ভুল।

Assistant Librarian in the College of Fort William./CALCUTTA :/ PRINTED BY THOMAS HUBBARD,/At the Hindoostanee Press./1810.'

৮.৬''×৫.৬'' অক্টেভো আকারের বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০০ + ২ ('Errata')। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর কলেজে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যভাষায় নবম প্রকাশ্য বিতর্কসভা (Ninth Public Disputations in the Oriental Languages) উপলক্ষে কলেজের Visitor লর্ড মিন্টো তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন : 'In the mean time, a Vocabulary, Bengalee and English, a work useful to be committed to memory by Students commencing the study of this language, has been published by Mohun Prusad Thakoor, a learned Native attached to the College.'[১]

মোহনপ্রসাদ এই শব্দকোষটি উৎসর্গ করেছেন উইলিয়ম কেরীকে। উৎসর্গপত্রের তারিখ ১লা জানুয়ারি ১৮১০। সুতরাং দেখা যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদানের ছাব্বিশ মাসের মধ্যেই তিনি এই শব্দকোষ প্রকাশ করেন।

তাঁর এই অভিধানে সংকলিত বাংলা শব্দগুলি এক অক্ষরানুক্রমে বিন্যস্ত নয়। বিষয় অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে প্রচলিত বাংলা শব্দগুলিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি শ্রেণীর নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে : ঈশ্বর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, রোগ, চিকিৎসা, ওষুধপত্র, পাখী, মাছ, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, ধাতু ও প্রস্তর, খাদ্য, গৃহ ও আসবাবপত্র, ব্যবসাবাণিজ্য, বিচারালয়, বিদ্যালয়, মানুষের দোষগুণ, কলা ও বিজ্ঞান, ক্রিয়া, ক্রিয়া-বিশেষণ ইত্যাদি। এই সমস্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত শব্দাবলী আলাদা আলাদা অক্ষরানুক্রমে বিন্যস্ত হয়েছে। অভিধানের প্রতি পৃষ্ঠায় তিনটি স্তম্ভ বা কলাম আছে। প্রথম কলামে মূল বাংলা শব্দ, দ্বিতীয় কলামে রোমান অক্ষরে বাংলা শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ ও তৃতীয় কলামে ইংরেজি অর্থ। কলেজের বাংলা ভাষাশিক্ষার্থী ইংরেজ ছাত্রদের সুবিধার্থেই এইভাবে শব্দ সংকলন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি পৃষ্ঠার কয়েকটি শব্দ এখানে উদ্ধৃত হল :

OF TRADE AND COMMERCE 87

ডাক Dak,	Post
ডাকের খরচ Daker Khoroch,	Postage
হিসাব Hishab,	Account
জাবদা Jabda,	Waste Book
রোজনামা Rojnama,	Journal…
রওয়ানা Rowana,	Passport…

বইটিতে ব্যবহৃত হরফের উচ্চতা সাধারণত ৩ মি. মি.। এর কয়েকটি বিশিষ্ট অক্ষর

১ T. Roebuck, *op. cit.*, p. 258.

অষ্টাদশ শতকীয় ধাঁচে কাটা, যেমন— উ, র (উভয় রূপ), ঃ, চ, ছ, ট এবং 'প্' বা উপর-নীচে লেখা যুক্তাক্ষর 'স-থ' ('স্থ'-ও অবশ্য আছে), 'ন-থ', 'ন-ধ', 'স-ক', ইত্যাদি। বইটির (১ম সং) একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি গ্রন্থমধ্যে সংযোজিত হল।

অভিধানটিতে সংকলিত বিভিন্ন শব্দের বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। হিন্দি-আরবী-ফারসী ঘেঁষা শব্দ, অধুনা অপ্রচলিত শব্দ, ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত প্রাচীন শব্দ, শব্দের প্রাচীন বানান যেখানে শ | স, ষ | জ, বা ই-কার | ঈ-কারের হেরফের হয়েছে— এইরূপ বিচিত্র শব্দের সংকলন এখানে লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে: 'বাজার ভাও—Market price' (হিন্দির প্রয়োগ), 'ফারখতী— Release' (আরবী-ফারিগ্‌খতি), 'পরকলা—Glass' (ফারসী-পরকালা), 'খরিদগী-Bill of sale', 'একরার নামা—Written agreement', 'চিড়ীমার—Bird catcher' (হিন্দি-চিড়িয়া), 'পানিনালা—Drain', 'ঝরকা—Window', 'জেব—Pocket', 'কাগজ্যা—Paper-Maker', 'জিলদগর—Book binder,' ইত্যাদি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ব্যবহৃত এইসব শব্দে হিন্দী-আরবী-ফারসীর প্রভাব সুস্পষ্ট। বানানের প্রকারভেদও লক্ষণীয়: 'খামী ছাড়ন—Elopement' 'খামাই,' 'সোক', 'ভীম, 'ছবী'। শতাব্দীর পরিবর্তনে শব্দার্থও পালটেছে: 'লিখক—Clerk', 'হরিণ বাড়ী—House of correction' (জেলখানা), 'গোবরাট—Threshold', 'আবাদ—population', 'পরিভাষা—Preface', ইত্যাদি। কিছু শব্দ থেকে মনে হয় তখনও বাংলায় ইংরেজির অনুপ্রবেশ তেমন ঘটেনি: পেন্সিলের বদলে ব্যবহৃত হয়েছে 'সিসার কলম', নিবের বাংলা 'কলমের মোচ', হাসপাতালের পরিবর্তে 'তাম্বুতখানা', ইঞ্চির বদলে 'বুরুল'। মোহন-প্রসাদের অভিধানে কিছু কিছু শব্দ গঠনে নতুনত্বের আভাস পাওয়া যায়: 'মানসীব্যথা—anxiety', 'অতিসার—dysentery', 'নিরাকাঙ্ক্ষা—contentment', অঙ্কে পারদর্শী ব্যক্তি— 'অঙ্কবিদ্বান'। বাংলায় Window অর্থে এখন আমরা পর্তুগীজ শব্দ 'জানালা' ব্যবহার করি, মোহনপ্রসাদ হিন্দী শব্দ 'ঝরকা' ব্যবহার করেছেন। কালের প্রভাবে বাংলা ভাষার বিবর্তনের ধারা আলোচনার কাজে মোহনপ্রসাদের এই বাংলা-ইংরেজি অভিধানটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের অপর উল্লেখযোগ্য অভিধান— ওড়িয়া-ইংরেজি অভিধান 'A/ Vocabulary,/Ooriya and English'— ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত। অক্টেভো আকারের এই বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৪ + ৫ শুদ্ধিপত্র। মোহনপ্রসাদের বাংলা-ইংরেজি অভিধানের অনুরূপ বিষয়-বিন্যাস অনুযায়ী এখানে ওড়িয়া শব্দ সংকলিত হয়েছে। এরও প্রতি পৃষ্ঠায় তিনটি কলাম আছে: প্রথম কলামে ওড়িয়া অক্ষরে ওড়িয়া শব্দ, দ্বিতীয় কলামে রোমান অক্ষরে তার উচ্চারণ নির্দেশ ও তৃতীয় কলামে ইংরেজিতে অর্থ।

জনসাধারণের দেওয়া অগ্রিম চাঁদার টাকায় এই শব্দকোষটিও ছাপা হয়। মোট গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৬৪, তার মধ্যে বাঙালী মাত্র দু'জন— হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ-

মোহন ঘোষ। কোম্পানী কিনেছিলেন ১০০ কপি। মোহনপ্রসাদ এই বইটিও উৎসর্গ করেন কেরীকে, উৎসর্গপত্রের তারিখ ১লা জুলাই ১৮১১, স্থান— কলকাতা। বইটির যে একটিমাত্র কপি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারে, তাতে মুদ্রাকরের কোনো নামোল্লেখ পাওয়া যায় না, হয়ত সংশ্লিষ্ট পাতাটি ছিঁড়ে গেছে। জাতীয় গ্রন্থাগার প্রকাশিত একটি গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখ আছে এটি শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা।[১]

রোবাকের গ্রন্থে এর পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে : 'The Ooriya language is the vernacular dialect of the Province of Orissa ; and as no Dictionary or Vocabulary of it has been yet printed, the present work will be of considerable utility. The compiler is well qualified for his undertaking, being a good English Scholar ; besides his knowledge of several languages, Asiatic and European.'[২]

টমাস রোবাক কলেজ কাউন্সিলের Asst. Secretary হিসাবে অনেকদিন কাজ করেছেন। কিছুদিন তিনি Actg. Secretary-ও ছিলেন। সুতরাং একই স্থানে কর্মসূত্রে রোবাকের সঙ্গে মোহনপ্রসাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। মোহনপ্রসাদের বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শিতা সম্বন্ধে রোবাকের ঐ উক্তি তাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য সমসাময়িককালে একই কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর-একজন বাঙালী পণ্ডিত— মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও ছিলেন ওড়িয়া ভাষায় পারদর্শী। তথাপি প্রথম ওড়িয়া-ইংরেজি শব্দকোষ সংকলনের ভার পড়ে মোহনপ্রসাদের উপর।

অভিধান ছাড়াও মোহনপ্রসাদ ঠাকুর আর-একটি গল্প সংকলন প্রকাশ করেন। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে Times Press থেকে এটি মুদ্রিত, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৬। বইটির আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 'A choice Selection of the most amusing Tales from the Persian, with the Rules of Life, compiled from Gladwin's Persian classicks. To which is added, A Dictionary, comprising All the words contained in the Tales and Rules, with their interpretations in Bengalee, by MOHUN-PERSAUD TAKOOR, Assistant Librarian in the college of Fort William. Calcutta : Printed at the Times Press, 1816.'

এই বইটি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির আনুকূল্য লাভ করে। সোসাইটির গ্রন্থাগারে ও ছাত্রদের ব্যবহারার্থে এটি সংগৃহীত হয়।[৩]

---

১ '*Bibliography of Dictionaries & Encyclopedias in Indian Languages.*' Calcutta, National Library, 1964.

২ T. Roebuck, *op. cit.*, p. 288.

৩ Calcutta School Book Society : 2nd Report, 1819 & 3rd Report 1820, App. IV.

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা মুদ্রণে বেসরকারী ব্যবসায়িক উদ্যোগ

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সরকারী উদ্যোগ ও মিশনারী প্রচেষ্টা ছাড়াও কলকাতায় আরো কিছু কিছু দেশীয় ভাষার ছাপাখানা গড়ে উঠতে থাকে। এগুলির মধ্যে হিন্দুস্থানী প্রেস, সংস্কৃত প্রেস, ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই মুদ্রণযন্ত্রগুলি বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ও মূলত ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এগুলি পরিচালিত হত। অবশ্য একথা সত্য, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মাধ্যমে এই ছাপাখানাগুলি দেশীয় ভাষায় মুদ্রণের কাজে নানাভাবে সরকারী উৎসাহ ও সাহায্য পেত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলা মুদ্রণের বিকাশের পথকে সুগম করে তোলার কাজে এই ছাপাখানাগুলির অবদান অনস্বীকার্য। তবে প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এই দেশীয় ভাষার ছাপাখানাগুলির মালিকানা বা এদের পরিচালনার দায়িত্ব যে সব সময় তখনকার প্রথামত বিদেশীয়দেরই ছিল তা নয়। বিদেশী মালিকানা বা পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় মালিকানা বা পরিচালনাও ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। দেশীয় মালিকানা ও পরিচালনায় দেশীয় ভাষার ছাপাখানা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। বাংলা মুদ্রণের বিকাশের ধারা প্রকৃতপক্ষে সেখান থেকেই শুরু।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উৎসাহে ও সাহায্যে কলকাতায় কয়েকটি দেশীয় ভাষার ছাপাখানা গড়ে উঠেছিল। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় জন গিলক্রিস্ট (John B. Gilchrist) ও উইলিয়ম হাণ্টার (William Hunter)-এর উদ্যোগে হিন্দুস্থানী প্রেস (Hindoostanee Press) প্রতিষ্ঠিত হয়। গিলক্রিস্ট ও হাণ্টার উভয়েই প্রাচ্যভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে অধ্যাপনা ও প্রশাসনিক কাজে জড়িত ছিলেন। হাণ্টার কলেজের গ্রন্থাগারিক ও পরে সম্পাদকও নিযুক্ত হন। স্বভাবতই হিন্দুস্থানী প্রেস প্রতিষ্ঠায় কলেজের উৎসাহ ও সাহায্য তাঁরা পেয়েছিলেন। গিলক্রিস্ট ক্যালকাটা গেজেট প্রেসের স্বত্বাধিকারী ফ্রান্সিস গ্লাড্উইন (Francis Gladwin)-এর কাছ থেকে একটি মুদ্রণযন্ত্র ও কিছু প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম ধার নিয়ে প্রথম হিন্দুস্থানী প্রেসের পত্তন করেন।[১] সম্ভবত লালবাজার অঞ্চলে বা ম্যাঙ্গো

---

১ **Proceedings of the College of Fort William (P. C. F. W.), Home Misc., No. DLIX (Jan. 30, 1802), p. 57.**

লেনে এই প্রেস অবস্থিত ছিল।[১] কালক্রমে এই প্রেস প্রসারিত হয় ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে এবং ইংরেজি ও বাংলা সহ কিছু দেশীয় ভাষায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশ করে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হয়। গিলক্রিস্ট তাঁর অভীষ্ট হিন্দুস্থানী ভাষার চর্চা ও পুনরুজ্জীবনের জন্য 'ভাষাগত সংস্কার' ('linguistic reformation') ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ এই 'হিন্দুস্থানী প্রেস' মারফত করতে চেয়েছিলেন। এই প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার উত্তরাধিকারীরা মুদ্রণ-প্রকাশনের কাজে প্রভূত অর্থোপার্জন করেছিলেন। কিন্তু সর্বোপরি, ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণ ও প্রকাশনের আদিযুগে এই প্রেসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮০৪ সালে গিলক্রিস্ট ইংলণ্ডে ফিরে গেলে কার্যত হান্টার হিন্দুস্থানী প্রেসের একমাত্র স্বত্বাধিকারী হন। হান্টার ছিলেন তখন খুবই প্রতিপত্তিশালী, একাধারে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক। ফলে তাঁর প্রভাবে হিন্দুস্থানী প্রেস অনেক বড়ো বড়ো কাজের দায়িত্ব পেত। যেমন ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে ঐ প্রেস অন্যদের তুলনায় অল্প খরচে ভালো ছাপার প্রতিশ্রুতি দিয়ে '***Asiatick Researches***' পত্রিকাটি ছাপার বরাত পায়। কলেজের সহকারী গ্রন্থাগারিক মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের বিখ্যাত বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষটি হিন্দুস্থানী প্রেস থেকে ছেপে ১৮১০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। Thomas Hubbard তখন এর মুদ্রাকর ছিলেন। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে তরুণ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ ডঃ উইলসন (Dr. Horace Hayman Wilson) ও ডঃ লিডেন (Dr. Leyden) হিন্দুস্থানী প্রেসের স্বত্বাধিকারী হিসাবে হান্টারের সঙ্গে যোগদান করেন।[২] ১৮১১ খ্রীস্টাব্দের শুরুতে হান্টার ডঃ লিডেনের সঙ্গে যবদ্বীপ পরিভ্রমণে গেলে হিন্দুস্থানী প্রেসের ভার উইলসনের উপর ন্যস্ত হয়। ১৮১২-১৩ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ হান্টার ও লিডেন উভয়েই যবদ্বীপে মারা যান। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে এই সংবাদ কলকাতায় পৌঁছলে পর উইলসনই হিন্দুস্থানী প্রেসের অধ্যক্ষ বা ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ঐ সময় ক্যাপ্টেন রোবাক (Capt. Roebuck) হিন্দুস্থানী প্রেসে উইলসনের সঙ্গে যোগদান করেন। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

হিন্দুস্থানী প্রেস সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে একজন বিশিষ্ট বাঙালী মনীষীর কথাও স্মরণ করা যায়, যিনি একজন সামান্য কম্পোজিটর (compositor) হিসাবে এই ছাপাখানায় তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতের অন্যতম নেতৃস্থানীয় পুরুষ ও একজন বিশিষ্ট অভিধানকার হিসাবে সুপরিচিত হন। তিনি হলেন স্বনামধন্য রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪)। বাংলা মুদ্রণের আদিযুগে যে অল্প

১ ***Selections from Calcutta Gazette*, Vol. IV, p. 452.**

২ ২রা নভেম্বর ১৮৪৪ তারিখে লেখা উইলসনের চিঠি। প্যারীচাঁদ মিত্র, '***Life of Dewan, Ramcomul Sen***', পৃ. ৪৪-এ উদ্ধৃত।

কয়জন বাঙালী মুদ্রণ-প্রকাশনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন রামকমল সেন তাঁদের অন্যতম। কম্পোজিটর থেকে শুরু করে ম্যানেজার পর্যন্ত ছাপাখানার বিভিন্ন পদে রত থেকে তিনি স্বীয় কর্মে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। এমন-কি তাঁর নিজের বাংলা অভিধানটি যখন কলকাতায় ছাপা শুরু হয় সেই সময় সংশ্লিষ্ট প্রেসে ঐ কাজে প্রয়োজনীয় এক সাট নতুন বাংলা মুদ্রাক্ষর তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে তৈরি করান। ঐ মুদ্রাক্ষরে প্রথম প্রেসে তাঁর অভিধানটির ১১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছাপা হয়। ['One hundred and sixteen pages printed with a fount of Bengalee types prepared for the purpose under my own superintendence…': Preface.[১]]

১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে মাত্র আট টাকা মাসিক বেতনে একজন কম্পোজিটর হিসাবে রামকমল হিন্দুস্থানী প্রেসে যোগদান করেন। এই সামান্য বেতনে কর্মজীবন শুরু করলেও উত্তরজীবনে তিনি প্রভূত সম্পত্তির মালিক হন। দেওয়ান রামকমল সেন মৃত্যুকালে প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে যান।[২] হিন্দুস্থানী প্রেসে সামান্য অবস্থা থেকে তিনি দ্রুত উন্নতি করতে থাকেন। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দের শেষে যখন উইলসন ও লিডেন এসে হাণ্টারের হিন্দুস্থানী প্রেসের ব্যবসায়ে যোগ দেন, তখন দেখা যায় কার্যত রামকমলই প্রেসের পরিচালক ('managing man') হয়ে উঠেছেন।[৩] পরিচয়ের সূত্রপাত থেকেই রামকমল সেন উইলসনের খুব প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন ও তখন থেকে তাঁর ভাগ্য দ্রুত ফিরতে থাকে। ১৮১১ সালে হাণ্টার ও লিডেন যবদ্বীপ পরিভ্রমণে গেলে হিন্দুস্থানী প্রেসের সমুদয় দায়িত্ব উইলসনের উপর পড়লেও, আসলে রামকমল সেনই যে এর সমস্ত কাজ দেখাশুনা করতেন উইলসন নিজেই সে কথা বলেছেন : '…the real conductor and superintendent was Ramcoomal'.[৪] ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে রামকমল হিন্দুস্থানী প্রেসের দেশীয় 'ম্যানেজার' পদে নিযুক্ত হন। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে ঐ প্রেসের মালিকানা হস্তান্তরিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনিই এর ব্যবসায় সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ দেখাশুনো করতেন। পরবর্তীকালে রামকমল কলকাতা টাঁকশালের দেওয়ান ও 'ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের' কোষাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি, হিন্দু কলেজ, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা সংস্কৃতি-মূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। গ্রন্থকার হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ১২২৬ বঙ্গাব্দে (১৮১৯-২০ খ্রীস্টাব্দে) তাঁর 'ঔষধসার সংগ্রহ' নামক

১ Ram Comul Sen, '*A Dictionary in English and Bengalee*', 1834.

২ '*The Friend of India*', 15th August 1844 : Quoted by P. C. Mitra, '*Life of Dewan Ramcomul Sen*', p. 40.

৩ রামকমল সেনের স্মৃতিতে ২রা নভেম্বর ১৮৪৪ তারিখে লেখা ডঃ উইলসনের খোলা চিঠি : P. C. Mitra, *op. cit.*, p. 44.

৪ *Ibid.*, p. 44.

পুস্তিকাটি হিন্দুস্থানী প্রেসে ছাপা হয়। তাঁর বিখ্যাত ইংরেজি-বাংলা অভিধান ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার বলে রামকমল জীবনে যে পরম সাফল্য লাভ করেছিলেন, প্যারীচাঁদ মিত্র তার সপ্রশংস উল্লেখ করে বলেন: 'From a compositor, he raised himself by dint of industry, like Benjamin Franklin, to the foremost position among the natives of Bengal, respected by the Europeans and Natives alike.[১]

হিন্দুস্থানী প্রেসই রামকমল সেনের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এই প্রেসের আলোচনা প্রসঙ্গে রামকমল সেনের কথা অবশ্যই স্মরণীয়। বাংলা মুদ্রণের আদিযুগে হিন্দুস্থানী প্রেস যেমন একটি উল্লেখযোগ্য ছাপাখানা, রামকমল সেনও তেমনি একটি বিশিষ্ট নাম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রতিষ্ঠিত অপর দেশীয় ছাপাখানাগুলির মধ্যে সংস্কৃত যন্ত্র-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটিই ছিল প্রথম দেশীয় ছাপাখানা যা সম্পূর্ণ দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত। এদেশীয়দের মধ্যে প্রথম একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। ['The first Hindoo who established a press in Calcutta was Baboo-ram, a native of Hindoosthan'.[২]] তবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় বিশেষভাবে সাহায্য করে। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ কোলব্রুকের আনুকূল্যে ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত যন্ত্র (Sanskrit Press) প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজের সংস্কৃত বিভাগের বাবুরাম পণ্ডিত প্রথম এর পরিচালক ('Manager') নিযুক্ত হন। অনেকের মতে বাবুরামই এর প্রতিষ্ঠাতা-স্বত্বাধিকারী। ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে কলেজের কার্যবিবরণীতে বাবুরামকে সংস্কৃত প্রেসের স্বত্বাধিকারী ('Proprietor') বলে উল্লেখ করা হয়।[৩]

সংস্কৃত যন্ত্র নামে পরিচিত বাবুরামের দেবনাগরী অক্ষরের এই মুদ্রাযন্ত্রটি খিদিরপুর অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৮০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ৭ম বার্ষিক সাধারণ বিতর্কসভায় পরিদর্শক (Visitor) লর্ড মিন্টো বক্তৃতা প্রসঙ্গে সংস্কৃত যন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে বলেন: 'A printing press has been established by learned Hindoos, furnished with complete founts of improved Nagree types of different sizes for the printing of books in the Sunskrit language.

---

১ P. C. Mitra, *op. cit.*, p. 48.

২ *Friend of India* (Qly.), 1820.

৩ P. C. F. W., Home Misc., No. 561 (May 3, 1809), pp. 93-94: Quoted by David Kopf, '*British Orientalism and Bengal Renaissance*', p. 118.

This press has been encouraged by the college to undertake an edition of the best Sunskrit Dictionaries, and a compilation of the Sunskrit Rules of Grammar. The first of these works is completed, and with the second, which is in considerable forwardness, will form a valuable collection of Sunskrit Philology. It may be hoped, that the introduction of the art of printing among the Hindoos, which has been thus begun by the institution of a Sunskrit Press, will promote the general diffusion of knowledge among the numerous and very ancient people,...'[১]

বাবুরাম একাধারে এই সংস্কৃত প্রেসের স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ছিলেন। এমন-কি তিনি নিজেই বই সম্পাদনা করে ছাপতেন। ৭ই আগস্ট ১৮১১ তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজের দশম বার্ষিক সাধারণ বিতর্কসভায় সহ-সভাপতি George Hewett-এর বক্তৃতায় এর উল্লেখ পাই: 'The Siddhant Kuomoodee, a system of Sanskrit Grammars... edited by Babooram Pundit, proprietor and conductor of Sanskrit Press.'[২]

কলেজের পঠন-পাঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অধিকাংশ হিন্দী ও সংস্কৃত পুস্তক সংস্কৃত প্রেসে ছাপা হত। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অনুরূপ আর কোনো ছাপাখানা না থাকায় সংস্কৃত প্রেস অব্যাহত গতিতে এগোতে থাকে। এরপর মুদ্রণের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। কলেজের প্রয়োজনে ১৬০০ পৃষ্ঠাব্যাপী মনু সংকলিত হিন্দু আইনাবলী (*Manu's Institutes*) সংস্কৃত প্রেসে ছাপা হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ এর জন্য সংস্কৃত প্রেসকে ৩০০০ টাকা অনুদান দেয়।[৩]

সংস্কৃত যন্ত্রে ছাপা অধিকাংশ বইয়ে বাবুরামের নিজস্ব মুদ্রণরীতি ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ দেখা যেত। অলংকরণের প্রতি বাবুরামের বিশেষ ঝোঁক ছিল। যেমন, বাবুরামের অন্যতম প্রিয় নকশা (design) 'তুষারকণা' ('Snow flakes') তাঁর ছাপা অনেক বইয়ে অলংকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ১৮০৮ সালে ছাপা সংস্কৃত 'অভিধান-চিন্তামণি' গ্রন্থে বাবুরামের ঐ প্রিয় নক্সা 'তুষারকণা'র অলংকরণ পাওয়া যায়। ১৮০৭ সালেও সংস্কৃত যন্ত্রে ছাপা বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়; সেটি কোলব্রুকের আজ্ঞায় মুদ্রিত বিদ্যাকর মিশ্রের সূচিসমন্বিত সংস্কৃত 'অমরকোষ'।[৪] বাবুরাম এই বই তালপাতার পুঁথির আকারে ছাপেন। ১৮০৯ সালে প্রকাশিত সংস্কৃত 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থেও বাবুরামের 'তুষারকণা' অলংকরণ দেখা যায়। এ ছাড়া

---

১ T. Roebuck, '*Annals of the College of Fort William*', p. 155.

২ T. Roebuck, *ibid*, p. 286.

৩ P. C. F. W., Home Misc., No. 562 (July 3, 1812), p. 182.

৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' (১ম): 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য', পৃ. ৭

তারকা, পালক, পাকানো পতাকা, প্রভৃতি চিত্র বা নকশাও তিনি অলংকরণের জন্য ব্যবহার করতেন। ১৮১৪ সালে বাবুরামের ছাপা হিন্দী সপ্তশতিকা গ্রন্থ পালক-তারকায় অলংকৃত।

বাংলা মুদ্রণের আদি যুগে বাবুরাম ছিলেন এক বিচিত্র চরিত্র। অনেক বইয়ে বাবুরাম মুদ্রাকর হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন— 'বাবুরাম ব্রাহ্মণ' বলে। জানা যায়, তিনি ছিলেন উত্তর ভারতে মির্জাপুরের ত্রিলোচনঘাট নিবাসী সারস্বত ব্রাহ্মণ। [১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত লল্লুলাল কবি সংকলিত 'সভাবিলাস' নামক হিন্দী বইয়ের শেষে বাবুরামের এই পরিচয় পাওয়া যায়।[১]] কর্মোপলক্ষে বাবুরাম কলকাতায় আসেন ও মুদ্রণ ব্যবসায়ে কয়েক বছরের মধ্যে প্রভূত অর্থোপার্জন করেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন বলে শোনা যায়।[২]

খিদিরপুর অঞ্চলে বাবুরামের ছাপাখানা প্রথম স্থাপিত হয়। দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থকে পুঁথির পর্যায় থেকে আধুনিক বইয়ের স্তরে উন্নীত করার কাজে দেশীয় মুদ্রাকরদের মধ্যে বাবুরামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পুরোপুরি আধুনিক রীতিসম্মত আখ্যাপত্রের প্রবর্তন না করলেও তিনি গ্রন্থারম্ভে সাধারণত ছয় পঙ্‌ক্তিতে পদ্যাকারে গ্রন্থকার ও গ্রন্থনাম, হেঁয়ালি বা সাংকেতিক শব্দের আড়ালে প্রকাশ সন এবং মুদ্রাকর হিসাবে নিজের নাম ছাপার প্রথা চালু করেন। 'অভিধান চিন্তামণি' (১৮০৮) গ্রন্থে এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রাকর বাবুরামের আত্মপরিচয় দেওয়ার ভঙ্গিটিও অভিনব। নিজেকে কেবলমাত্র 'ব্রাহ্মণ' হিসাবে অভিহিত করা ছাড়াও গীতগোবিন্দ গ্রন্থে তিনি আত্মপরিচয়ে বলেছেন যে বাবুরাম শিক্ষিত ব্রাহ্মণকুলের অলংকার স্বরূপ। অন্যত্র নিজেকে 'সরস্বতীর বরপুত্র' বলেছেন। আবার একটি বৈষ্ণবগ্রন্থে নিজেকে 'বৈষ্ণবধর্মের দীন অনুগামী' বলে বর্ণনা করেছেন।

যতদূর জানা গেছে, বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্রে ছাপা শেষ বই 'কিরাতার্জুনীয়' (জুন ১৮১৪)। এরপর ঐ মুদ্রাযন্ত্র হস্তান্তরিত হয়। ১৮১৪।১৫ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দী বিভাগের ব্রজভাষার মুন্সী গুজরাটী ব্রাহ্মণ লল্লুলাল কবি এর স্বত্বাধিকারী হন। সম্ভবত পটলডাঙায় তখন এটি অবস্থিত ছিল। বাবুরামের আমলের মদন পাল নামে একজন সদগোপ তখনও এর মুদ্রাকর ছিলেন। লল্লুলাল কবির সংস্কৃত যন্ত্রে ছাপা প্রথম যে বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, তা নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত তুলসীদাসের বিনয়পত্রিকা, ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে (সংবং ১৮৭২) প্রকাশিত।[৩] লল্লুলাল বাংলা বইও ছাপেন। যেমন, পণ্ডিত

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ

২ K. S. Diehl, '*Early Indian Imprints*' : Introduction, by Hemendra Kr. Sircar. ত্রৈমাসিক *Friend of India* পত্রিকাতেও লেখা হয় : 'He is said to have accumulated a fortune of four lacs of Rupees, with which he has retired to that privileged city of Banares.' [Sept. 1820.]

৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য', পৃ. ৮।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রচিত 'জ্যোতিষ সংগ্রহসার' (জানুয়ারি ১৮১৭)। রামমোহনের 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' (১৮১৬) বইটিও 'সংস্কৃত ছাপাখানায় ছাপা'। লল্লুজীর উদ্যোগে রামমোহনের আরো অনেক বই প্রকাশিত হয়। লল্লুলালের সহযোগে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য রামমোহনের কিছু কিছু বই ছাপেন। [লল্লুলালের পরিচয় প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো লিখেছেন : '১৮০২ খ্রীস্টাব্দে লল্লুলাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে ব্রজভাষার মুন্সী নিযুক্ত হন। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে চাকুরি হইতে বিদায় লইয়া আগ্রা ফিরিবার সময় তিনি মুদ্রাযন্ত্রটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। গুজরাটী হইলেও তিনি স্বজনবর্গ সহ আগ্রা-গোকুলপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেন। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।'—সাহিত্যসাধক চরিতমালা (১ম) : 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য,' পৃ. ৮]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যে কয়টি দেশীয় ভাষার ছাপাখানার সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ছাপাখানা হল Press of Ferris & Co বা ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানা। এটিও সম্পূর্ণ বেসরকারী ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফরস্টারের বিখ্যাত ইংরেজি-বাংলা অভিধান, ১ম ভাগ (*'A Vocabulary, English and Bongalee, and vice versa'* : 1st part) ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে এখান থেকে প্রকাশিত হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ফরস্টারের উক্ত অভিধানের দ্বিতীয় ভাগ ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে P. Ferris-এর Post Press থেকে প্রকাশিত হয়। এই অভিধানের দুটি খণ্ডের মুদ্রণসাদৃশ্য লক্ষ্য করে অনুমান করা যায়, পূর্বোক্ত ভিন্ন নামধেয় দুটি প্রেস আসলে একই, সম্ভবত ব্যবসায়িক প্রয়োজনে একই পরিচালনাধীন প্রেসের দুটি ভিন্ন নাম হয়েছে।

এর পরেও ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস আরো দীর্ঘকাল চালু ছিল। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রাক্তন কম্পোজিটর ও প্রখ্যাত বাঙালী মুদ্রণ ব্যবসায়ী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য স্বাধীন বৃত্তির সন্ধানে কলকাতায় চলে এসে এই ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেসের সঙ্গে দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার আগে তিনি এখান থেকে কয়েকটি বাংলা বই ছেপে প্রকাশ করেন। গঙ্গাকিশোরের উদ্যোগে ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেসে ছাপা বিখ্যাত গ্রন্থ অন্নদামঙ্গল ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে দুটি ছবিও ছাপা হয়। 'অন্নদামঙ্গল'ই (১৮১৬) বাংলা মুদ্রণের আদি যুগের প্রথম সচিত্র বাংলা গ্রন্থ এবং তার প্রথম প্রকাশক হিসাবে ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস নিঃসন্দেহে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হতে পেরেছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী সম্বলিত এই 'অন্নদামঙ্গল' (১৮১৬) বাংলা মুদ্রণের আদিযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুদ্রিত বাংলা কাব্যগ্রন্থ। সম্ভবত এটিই ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ। এর আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ 'OONOODAH MONGUL,/EXHIBITING/THE/TALES/OF/BIDDAH AND SOONDER,/TO

WHICH IS ADDED,/THE/MEMOIRS/OF/RAJAH PRUTAPADITYU./EMBELLISHED/WITH SIX CUTS./CALCUTTA :/FROM THE PRESS OF FERRIS AND CO./1816.' বইটির আকার ৫½"×৮½" ও মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭+৩১৮। অপেক্ষাকৃত ছোটো হরফে বেশ পরিচ্ছন্নভাবে বইটি ছাপা, এর অক্ষর সাজানোর পদ্ধতি সুন্দর, পঙ্‌ক্তিগুলি সমান্তরাল রেখায় বিন্যস্ত। তবে এর হরফগুলির face বা সম্মুখভাগ একটু মোটা। অক্ষরগুলি উচ্চতায় ৩ মি. মি., প্রায় সবই আধুনিক ছাঁদের। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি শব্দ উল্লেখ করা যেতে পারে : 'বসুন্ধরা', 'জিজ্ঞাসা', 'স্থির', 'কিঙ্কিত', 'ভুজঙ্গ', 'বন্দনা', 'মল্লিকা'। বইয়ের শেষে একটি নকশা বা design ছাপা আছে, সেটি এইরূপ : 'একটি হেলান পতাকাদণ্ডের অগ্রভাগ থেকে ছড়ানো পতাকার উপর ইংরেজিতে লেখা 'FINIS'। উল্লেখযোগ্য, এই একই নকশা বা design ফরস্টার প্রণীত বাংলা-ইংরেজি অভিধান, ২য় খণ্ডের (P. Ferris-এর Post Press, ১৮০২) শেষে ছাপা আছে। দুটি প্রেস একই হলে, দেখা যায়, চৌদ্দ বছরের ব্যবধানেও (১৮০২ থেকে ১৮১৬) সেখানে একটি বিশিষ্ট মুদ্রণরীতি অব্যাহত রয়ে গেছে।

'অন্নদামঙ্গল' বইটিতে ছটি পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী ছবি ছাপা আছে। সবই খোদাইকরা ব্লক থেকে একরঙা কালো কালিতে ছাপা। দেড় শতাধিক বছর অতিক্রান্ত হলেও ছবিগুলি এখনো উজ্জ্বল সুন্দর রয়েছে। এগুলি woodcut নয়। ধাতুফলকের উপর etching করে খোদাই করা বা engrave করা। ছবিগুলিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লাইন ও মনোরম কারুকার্য বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষণীয়। বাংলা বইয়ে মুদ্রিত প্রথম ছবির এই উৎকর্ষ প্রশংসনীয়। ছবিগুলি সবই, অন্তত দুটি তো বটেই, রামচাঁদ রায় কর্তৃক খোদাই করা। প্রতি ছবির নীচে তার পরিচয় দেওয়া আছে এইভাবে : ১. Unno Poornah অন্নপূর্ণা (গ্রন্থারম্ভে নির্ঘণ্টের আগে), ২. Soonder, সুন্দরের বকুলতলায় বৈশন (১৫৮ পৃষ্ঠার পর), ৩. Biddah and Soonder, বিদ্যাসুন্দরের দর্শন (১৭১ পৃষ্ঠার পর), ৪. Soonder and Cotaul. সুন্দর চোর ধরা (১১৫ পৃষ্ঠার পর), ৫. Soonder সুন্দরের বর্দ্ধমানে যাত্রা (১৫০ পৃষ্ঠার পর : Engraved by Ramchaund Ray,) এবং ৬. Soonder & Durroawn সুন্দরের বর্দ্ধমান পুর প্রেবেস (Engraved by Ramchaund Ray, : ১৫২ পৃষ্ঠার পর)। মুদ্রণের ইতিহাসে সচিত্র বাংলা গ্রন্থ প্রকাশের সূত্রপাত এখানে থেকেই। ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানাও এই চিত্র-মুদ্রণের নতুন পর্বের সূচনা করে অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে।

বইটির সূচনায় সাত পৃষ্ঠাব্যাপী 'নির্ঘণ্টন' থেকে এর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা যায়। গ্রন্থারম্ভে এইরূপ সূচীপত্র বা বিষয়নির্দেশ সংযোজনের মধ্য দিয়ে বাংলা প্রকাশন শিল্পে আধুনিকতার লক্ষণ গড়ে উঠতে থাকে। 'অন্নদামঙ্গল'-এর মূল বিষয়বিন্যাস ছিল এইরূপ : 'অথ গণেশ বন্দনা, অথ শিব বন্দনা,…অথ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণন,… অথ দক্ষ যজ্ঞ নাশ,… অথ শিব বিবাহের মন্ত্রণা,…অথ রতি বিলাপ,…অথ শিব অন্নদা পূজা করেন,…

অন্নপূর্ণা ব্যাসদেবে ছলিতে যাত্রা,…ভবানন্দ মজুন্দারের জন্ম,…সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা,…বিদ্যা রূপ বর্ন্নং,…বিদ্যা সুন্দরের দর্শন,…বিদ্যা সুন্দরের বিবাহ,…সুড়ঙ্গ দর্শন,…বিদ্যাসহ সুন্দরের দেশ যাত্রা, অথ মানসিংহ মজুন্দারের বাড়ী জিজ্ঞাসা,…প্রতাপ আদিত্য যুদ্ধ,…রামায়ণ কথনং,…মজুন্দার রাজ্য শাসন,…মজুন্দার অন্নদা পূজা,…মজুন্দার স্বর্গ যাত্রা।'

এরপর ৩১৮ পৃষ্ঠাব্যাপী মূল গ্রন্থ। রচনার নিদর্শন স্বরূপ এর কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল : '—শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস। কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥ প্রত্যক্ষ হইয়া শিব ব্যাসে দিলা বর। যে স্তব করিলা ইথে বড় তুষ্ট হর॥ এই স্তব যে জন পড়িবে একমনে। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হবে সেই জনে॥ এতো শুনি বেদব্যাস পরম উল্লাস। তদবধি শিব ভক্ত হইলেন ব্যাস॥ মুছিয়া ফেলিলা হরি মন্দির তিলকে। অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটা কৈলা কপাল ফলকে॥ ছিড়িয়া তুলসী কণ্ঠী লম্বি মালা যত। পরিলা রুদ্রাক্ষ মালা শৈব অনুগত॥ ফেলিয়া তুলসীপত্র বিল্বপত্র লয়্যা। ছাড়িয়া হরির গুণ হর গুণ কয়্যা॥ ব্যাস কৈলা প্রতিজ্ঞা যে হক্ পরিণাম।৹ অদ্যাবধি আর না লইব হরিনাম॥ এইরূপে ব্যাস দেব কাশীতে রহিলা। অন্নদা মঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা॥' (পৃ ১০১)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে 'অন্নদামঙ্গল' (১৮১৬)-এর একটি কপি রক্ষিত আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আলোচ্য বইয়ের কোথাও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের নামোল্লেখ নেই। তবে গঙ্গাকিশোরই যে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এই বইটি ছাপিয়ে প্রকাশ করেন সে বিষয়ে কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮১৬ তারিখের গভর্নমেন্ট গেজেট পত্রিকায় এই বই সম্বন্ধে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় সেটি ছিল এইরূপ :

'মে' ফেরিস এন কোম্পানি সাহেবের / ছাপাখানায় সিগ্র প্রকাষ হইবেক / অন্নদা মঙ্গল ও বিদ্যা সুন্দর পুস্তক / অনেক পণ্ডিতের দ্বারা শোধিয়া শ্রীযুত / পদ্মলোচন চূড়ামনি ভট্টাচার্য্য মহাস / য়ের দ্বারা বর্ন্ন সুদ্ধ করিয়া উত্তম বাঙ্গলা / অক্ষরে ছাপা হইতেছে পুস্তকের প্রতি / উপক্ষণে এক ২ প্রতিমূর্তি থাকিবেক মূল্য / ৪ টাকা নিরূপণ হইল জাহার লইবার / ইচ্ছা হয় আপন নাম ঐ ছাপাখানায় / কিম্বা এই আপিষে শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর / ভট্টাচার্য্যের নিকট পাঠাইবেন ইতি—'

৩০শে জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকাতেও গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে লেখা হয় : 'এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে ইহা দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এত অল্প কালের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ছাপার কর্ম্মের এমত উন্নতি হইয়াছে। প্রথম যে পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার নাম অন্নদামঙ্গল শ্রীরামপুরের ছাপাখানার এক জন কর্ম্মকারক শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য তাহা বিক্রয়ার্থে প্রকাশ করেন।'

এ ছাড়া ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক (১৮১৯-২০ খ্রীঃ) প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে দেশীয় ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর যে তালিকা পাওয়া যায়

তাতে গঙ্গাকিশোর কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাবলীর মধ্যে 'অন্নদামঙ্গল' (১৮১৬)-এর উল্লেখ আছে।

ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানা থেকে গঙ্গাকিশোর তাঁর আরো কয়েকটি বই প্রকাশ করেন। যেমন, বাংলা ভাষায় ইংরেজি ব্যাকরণ '*A Grammar, in English and Bengalee*' (১৮১৬) এবং 'দায়ভাগ' (১৮১৬-১৭)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বই দুটির বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন।[১] এ ছাড়া, ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রামমোহনের প্রথম বই 'বেদান্ত গ্রন্থ' ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেসে ছাপা হয়। রামমোহনের বেদান্ত-বিষয়ক দ্বিতীয় বইটিও— 'বেদান্তসার' (১৮১৫) ঐ একই প্রেসে ছাপা হয়।

গঙ্গাকিশোরের ইংরেজি ব্যাকরণটির আখ্যাপত্র ছিল এইরূপ: 'A Grammar, in English and Bengalee ; containing what is necessary to the knowledge of the English Tongue. To which is added a Translation of. We did from one to three Syllables, laid down in a plaip and familiar way. By Gunga-kissore Bhutacharjee, Calcutta : From the Press of Ferris and Co. 1816.' বাংলায় এই ইংরেজি ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গঙ্গাকিশোর ভূমিকায় লিখেছেন : 'আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের আপনার ভাষাতে সংগ্রহ থাকিলে যে সকল বালকেরা ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিতে বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারদিগের অতি সুসাধ্য হইতে পারে এ কারণ যথাসাধ্য এক সংক্ষেপ ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের সাধু ভাষাতে সংগ্রহ করা গেল…' [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই একই বছরে অর্থাৎ ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী পণ্ডিত রামচন্দ্র রায় রচিত 'ইঙ্‌লিষ দর্পণ' নামে বাংলা ভাষায় আর-একখানি ইংরেজি ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়।] ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত প্রথমোক্ত ইংরেজি ব্যাকরণের ভূমিকায় গঙ্গাকিশোর আরো লেখেন : 'মেং ফেরিসকোম্পানি শাহেবের ছাপাখানায় যে দায়ভাগ ভাষাতে ছাপা হইতেছে তাহা প্রায় প্রস্তুত হইল। শ্রীযুৎ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যেন—পরোপকৃতয়েকৃতঃ—' এই দায়ভাগ ১৮১৬-১৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অন্যত্র উল্লেখ আছে, ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে আড়পুলির হরচন্দ্র রায়ের প্রেসে রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক দায়ভাগ ছাপা হয়।[২] এটা কি গঙ্গাকিশোর রচিত দায়ভাগ-এর দ্বিতীয় সংস্করণ? ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'ব্যবস্থা-দর্পণ' গ্রন্থের ভূমিকায় শ্যামাচরণ শর্ম্মসরকার লিখেছেন— 'বঙ্গভাষায় এ এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মশাস্ত্রীয় পুস্তক চারি খানি বই লিখিত হয় নাই, কিন্তু ঐ কএক খানই সর্ব্বপ্রকারে ক্ষুদ্র,…। তৃতীয় খানি বহোরা নিবাসি গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের লিখিত, ইহাতে দায়াধিকার অশৌচ ও প্রায়শ্চিত্ত এই তিন প্রকরণ স্থূল রূপে সঙ্খেপে লিখিত আছে।'

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য,' পৃ. ১৮-২০।

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১ম), পৃ. ৭৪।

সমসাময়িককালে আরো একটি উল্লেখযোগ্য দেশীয় ভাষার ছাপাখানার সন্ধান পাওয়া যায়। সেটি বাঙ্গালি প্রেস বা বাঙ্গালা যন্ত্র নামে পরিচিত ছিল। কয়েকটি বাংলা বই এখানে ছাপা হয়। রামমোহন কর্তৃক বাংলায় অনূদিত 'কঠোপনিষৎ' ১৬ ভাদ্র ১২২৪ (আগস্ট, ১৮১৭) তারিখে 'বাঙ্গালি প্রেস' থেকে ছেপে প্রকাশিত হয়।

বাংলা মুদ্রণের বিকাশ পর্বে বেসরকারী ব্যবসায়িক উদ্যোগে পরিচালিত দেশীয় ভাষার ছাপাখানা প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ করার আগে সমসাময়িককালে মুদ্রিত আরেকটি বিশিষ্ট বাংলা প্রকাশনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি জয়নারায়ণ ঘোষালের 'শ্রীকরুনা নিধান বিলাষ'। নানা কারণে বইটি উল্লেখযোগ্য। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত এই বইটি অন্যতম প্রাচীন মুদ্রিত বাংলা কাব্যগ্রন্থ। পুঁথির আদর্শে বইটি রচিত ও মুদ্রিত। বাংলা মুদ্রণের বিকাশের ধারা যখন মূলত বাংলা গদ্যগ্রন্থকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হচ্ছিল সেই সময় এই বাংলা কাব্যের প্রকাশ কিছুটা যেন পিছন ফিরে চাওয়া— সনাতন ঐতিহ্যকে আধুনিকতার রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করার চেষ্টা। এখানে প্রাচীন ঐতিহ্য আধুনিক মুদ্রণের সহযোগিতায় বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে এসেছে।

'করুনা নিধান বিলাষ' বাংলা মুদ্রণের প্রথম যুগে ছাপা বৈষ্ণবভাবাপন্ন বাংলা কাব্য-গ্রন্থ। কাব্য হলেও বইটি একটানা (running lines) গদ্যের আকারে ছাপা। এর পঙ্‌ক্তিগুলি পদ্যের আকারে সাজানো নয়। তবু এটি মূলত কাব্য, ছন্দে রচিত। পঙ্‌ক্তির শুরুতে রাগ, তাল প্রভৃতির উল্লেখ আছে। যেমন, 'রাগ ঝিঝট তাল আড়া ॥', 'রাগ বাহার। তাল আড়া-তেতালা ॥' 'পদাবলি। রাগিনী ধনাশ্রী। তাল বিজয়ানন্দ ॥', 'রাগিনী বাহার তাল ধামার ॥', ইত্যাদি এবং মাঝে মাঝে 'ধুয়া'।

বইটি পুঁথির আদর্শে রচিত ও মুদ্রিত। আধুনিক মুদ্রণরীতিসম্মত কোনো আখ্যাপত্র এতে নেই। সেজন্য লেখক ও বইয়ের নাম বা প্রকাশসন বা লেখকের বংশ-পরিচিতি, রচনার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু, ইত্যাদি বইয়ের গৌরচন্দ্রিকা, গুরু বা ভগবান বন্দনা, 'পীঠ বন্দন,' 'জন্মকুল বিবরণ', প্রভৃতি অংশ থেকে খুঁজে নিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের বারো বৎসর ব্যাপী গোকুল বৃন্দাবন লীলা অবলম্বনে রচিত এই কাব্যগ্রন্থের নাম ও লেখক পরিচিতি বইয়ের শুরুতেই এইভাবে দেওয়া আছে :

'জয়নারায়ন কল্পদ্রুম সংস্কৃত পুস্তকের নাম রঘুনাথ / পণ্ডিত রাখিলেন এই বাঙ্গালা ভাষা পুস্তকের নাম / শ্রীকরুনা নিধান বিলাষ ভক্তজনের আজ্ঞা মত / হইল কেবল গোকুল বৃন্দাবন লীলা বারবৎসর / যেমত শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ রচনা / কিঞ্চিত করিতে উদ্দোগ মাত্র কর্ত্তা এক / গুরু এক ভক্তজন অনেক কিন্তু ভাব এক ॥...' (পৃ. ৩-৪)

গ্রন্থশেষে আট পৃষ্ঠাব্যাপী 'নির্ঘন্ট'-এর পরিসমাপ্তিতে গ্রন্থনাম আরো সুস্পষ্ট : 'ইতি শ্রীশ্রী৺করুনা নিধান বিলাস পুস্তকের নির্ঘন্টপত্রং সমাপ্তং।'

কবি জয়নারায়ণ ঘোষাল 'জন্মকুল বিবরণে' বলেছেন, তাঁর পূর্বপুরুষ খিদিরপুরে এসে

বসতি স্থাপন করেন : 'হে প্রভো করুনানিধে পতিত পাবন। দাস অনুদাস তব জয়নারায়ন॥ গোবিন্দপুরেতে বাস দিলেন তাঁহার। গর‍্যা বেহালা খিদিরপুরে পরে নিরন্তর॥ ২১॥'

'পীঠ-বন্দনে' কবি গ্রন্থরচনার ইতিহাস সবিস্তারে বলেছেন : 'পঞ্চাশ বিগত পরে জরায় ঘেরিল। মরনের ভয় আসি অন্তরে পসিল॥ ১৪॥ চিন্তামনি কোথা পাব এই আশা করি। কাশী মধ্যে দেবালয়ে কিছুকাল ফিরি॥ ১৫॥ কৃষ্ণ রূপ মনে কিছু আদর করিল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণলীলা নকল দেখিল॥ ১৬॥ অমৃতরায়ের দ্বারা তাহা প্রকাশিল। অবিরত সেই লীলা নয়নে হেরিল॥ ১৭॥ দেখিতে দেখিতে লীলা হইল উদয়। সেইমত রচিবারে হইল নিশ্চয়॥ ১৮॥ বাঙ্গালি ভাষাতে লীলা করিতে চয়ন। রঘুনাথ ভট্ট আসি মিলিল স্বজন॥ ১৯॥ সংস্কৃত পরাকৃত নিজ শক্তি মত। আরম্ভ করিল দোঁহে হই এক চিত॥ ২০॥ বার শত বিশ সালে মাস অগ্রহায়ন। রচিতে কৃষ্ণের লীলা কৈল আয়োজন॥ ২১॥ সপনেতে দেখি যাহা লিখি সেই মত। সেইভাষা তরজমা করেন পণ্ডিত॥'

এখান থেকে গ্রন্থের রচনাকাল সুস্পষ্ট জানা যায়ঃ ১২২০ সালের অগ্রহায়ণ মাস, অর্থাৎ ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গ্রন্থরচনার সূচনা। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে গ্রন্থরচনার পরিসমাপ্তি ও তার প্রকাশ ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে বা তার পর। বইটি নিঃসন্দেহে ১৮১৪ থেকে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। লঙ-এর মতে এটি ১৮২০ সনে প্রকাশিত।[১] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বা জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত এই বইয়ের কপিতে যে প্রকাশসন ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দ বলে কালিতে বা বাঁধাইয়ের সময় লিখে রাখা হয়েছে তা ঠিক নয়। সেপ্টেম্বর, ১৮২০ তারিখে প্রকাশিত *Friend of India* (ত্রৈমাসিক) পত্রিকায় মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের যে তালিকা দেওয়া আছে তাতে 'করুনা নিধান বিলাস'-এর উল্লেখ আছে। অক্টোবর, ১৮২০ তারিখে প্রকাশিত ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে দেশীয় ভাষার ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তকের যে তালিকা দেওয়া আছে, তাতেও করুনা নিধান বিলাস-এর উল্লেখ আছে। শেষোক্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে মনে হয় খিদিরপুর-নিবাসী জয়নারায়ণ ঘোষালের এই কাব্যগ্রন্থটি লল্লুলালজীর সংস্কৃত যন্ত্রে ছাপা। অবশ্য এই বইয়ের কোথাও মুদ্রাকরের নাম উল্লেখ নেই।

আটপেজী ১১$\frac{১}{২}$" × ৮$\frac{১}{৪}$" আকারের এই বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৪ + ৮। পরিষ্কার আধুনিক ছাঁদের বড়ো বড়ো হরফে সমগ্র বইটি ছাপা। সারা বইয়ে একই আকারের হরফ ব্যবহৃত হয়েছে। এর হরফের উচ্চতা ৪ মি. মি.। হরফ সাজানোর পদ্ধতিও সুন্দর। রচনার নমুনা স্বরূপ এর কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে :

'বংশী চুরি লীলা পরে রাসের বিলাস। গোপিনীর মনোমত পুরাইল আশ॥ ১॥ কুতূহলে জল কেলি করি ব্রজরায়। নিকুঞ্জে বিরাজমান গোপী ঘেরা তায়॥ ২॥ হেনকালে এক গোপী কৈল নিবেদন। কৃপা করি নাথ কহ প্রেমের লক্ষণ॥ ৩॥' (পৃ. ২৫৯)

---

১ J. Long, *'Report on the Native Press in Bengal in 1857'* : Appendix C, p. 77.

সপ্তম অধ্যায়

রামমোহনের অভ্যুদয় ও বাংলা মুদ্রণে পর্বান্তরের সূচনা

বাংলা মুদ্রণের বিকাশ পর্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়। বাংলা সাহিত্যে যুক্তিবাদী চিন্তার চর্চা, বাংলাদেশে ধর্মের সংকীর্ণ অনুশাসন ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সর্বোপরি বাঙালীর বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন প্রধানত রামমোহন থেকেই শুরু। রামমোহনের কর্ম, চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের এই বিভিন্নমুখী প্রভাব তখনকার সমাজ-জীবনের নানা স্তরে দেখা দিয়েছিল। এমন-কি, সমসাময়িককালের বাংলা মুদ্রণের ধারাও রামমোহনের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল। রামমোহনের যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত চিন্তা ও ধর্মের ব্যাখ্যা তাঁর বিভিন্ন লেখায় মূর্ত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি দ্রুত মুদ্রিত ও প্রচারিত হতে থাকে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাঁর বিরুদ্ধবাদী চিন্তাও দেখা দেয় ও রামমোহন-বিরোধী লেখাও প্রকাশিত হতে থাকে। ফলে বাংলা সাহিত্যের আসর তখন বাদ-প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে এবং বাদী-প্রতিবাদীর বক্তব্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে বাংলা গদ্যের এক নতুন ধারার সূত্রপাত হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে, রামমোহন প্রবর্তিত নতুন চিন্তার প্রবাহ থেকেই নতুন রচনার জন্ম এবং সেই রচনাবলী প্রয়োজন মতো দ্রুত ছাপার হরফে প্রকাশিত হতে থাকায় বাংলা মুদ্রণের গতি ও প্রকৃতিও নতুন পথে মোড় নিতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থ তখন থেকে বিষয়বস্তুর গুরুত্বে আভিজাত্য পেতে শুরু করে। বাংলা গদ্যে বেদ উপনিষদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা, ধর্ম দর্শন বিষয়ক গভীর তত্ত্বালোচনা, সামাজিক ন্যায়-নীতি সংক্রান্ত তর্ক-বিতর্ক বা উত্তর-প্রত্যুত্তর, মত প্রচার ও মত খণ্ডন— এ সবই বাংলা মুদ্রণকে আশ্রয় করে ছাপার হরফের অক্ষয় বন্ধনে উপস্থাপিত হতে থাকে। ফলত জনচিত্তে বাংলা মুদ্রণের গুরুত্ব ও কদর বেড়ে ওঠে। এ সবই বাংলা মুদ্রণের বিকাশে রামমোহনের পরোক্ষ অবদান।

১৮১৪ খ্রীস্টাব্দের শেষে রামমোহন রায় কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর প্রথম বই 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশিত হয়। বাংলাভাষায় বেদান্ত-উপনিষদ চর্চার সূত্রপাত সেখান থেকেই। রামমোহনের দ্বিতীয় বই 'বেদান্তসার'ও ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তারপর থেকেই ধর্ম-দর্শন-সামাজিক সংস্কার-ভাষা-শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে রামমোহনের অবিশ্রান্ত লেখনী চালিত হতে থাকে এবং একের পর এক আশ্চর্য দ্রুততায় তাঁর বিভিন্ন বই প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮১৫ থেকে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তাঁর বাংলায় রচিত ৩২ খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। [এর মধ্যে অবশ্য

একটি 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' (১৮১৬) বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত সংস্কৃত রচনা।][১]
এই বইগুলির প্রত্যুত্তরে বা প্ররোচনা ও প্রভাবে ঐ সময়ে তাঁর বিরোধী বা সমর্থকদের রচিত সমসংখ্যক বা তারও বেশি বাংলা রচনা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এর ফলে তত্ত্বপ্রধান ও বিতর্কমূলক বাংলা গদ্যের প্রসারের মধ্য দিয়ে যেমন স্বাধীন জনচেতনার জাগরণ ঘটেছিল, তেমনই বাংলা মুদ্রণের গতি প্রকৃতিও বিকাশের পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল। বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে রামমোহনের প্রভাব তাই অনস্বীকার্য।

রামমোহনের রচনাগুলি সমসাময়িককালের বিভিন্ন নামকরা ছাপাখানায় ছাপা হয়েছিল। যেমন, ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস ('বেদান্ত গ্রন্থ' ১৮১৫), সংস্কৃত ছাপাখানা বা মুদ্রাযন্ত্র ('উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার', ১৮১৬ ; 'পথ্য প্রদান', ১৮২৩), বাঙ্গালি প্রেস ('কঠোপনিষৎ', ১৮১৭), ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস ('সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ', ১৮১৯), ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির প্রেস ('গৌড়ীয় ব্যাকরণ', ১৮৩৩), ইত্যাদি। এ ছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখ্য তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা 'ইউনিটারিয়ান প্রেস' (Unitarian Press)। তাঁর ধর্মমত বা সামাজিক আদর্শ প্রচারমূলক কোনো কোনো পুস্তিকা যখন মিশনারী প্রেস বা অন্য কোনো দেশীয় প্রেস ছাপতে অসম্মত বা দ্বিধান্বিত হয় তখন তিনি কিছুমাত্র দমে না গিয়ে বরং দ্বিগুণ উৎসাহে নিজেই উদ্যোগী হয়ে প্রায় রাতারাতি কলকাতায় ধর্মতলা স্ট্রীটে তাঁর ইউনিটারিয়ান প্রেস প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন এবং সেখান থেকে তাঁর কিছু কিছু বই ও পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে এটি এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রামমোহন রচিত '*Bengalee Grammar in the English Language*' বইটি ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে ইউনিটারিয়ান প্রেসে ছাপা হয়।

ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিবেদনের (১৮২০) দ্বিতীয় পরিশিষ্টে দেশীয় ছাপাখানায় মুদ্রিত বাংলা বইয়ের যে তালিকা দেওয়া আছে তা থেকে জানা যায় যে রামমোহনের অধিকাংশ বইয়ের প্রকাশক ছিলেন লল্লূজী। সম্ভবত তাঁর সংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্র বা ছাপাখানায় রামমোহনের ঐ বইগুলি ছাপা হয়। লল্লূজী তাঁর প্রতিটি বই সাধারণত ৫০০ বা ৬০০ কপি করে ছাপতেন। খ্রীস্টান মিশনারীদের অনুপ্রেরণায় রামমোহনের অধিকাংশ ধর্মপ্রচারমূলক পুস্তিকা বিনামূল্যে বিতরণ করা হত। লল্লূজী প্রকাশিত রামমোহনের বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে পাঁচ খণ্ড উপনিষৎ— তলবকার উপনিষৎ বা কেনোপনিষৎ (১৮১৬), ঈশোপনিষৎ (১৮১৬), কঠোপনিষৎ (১৮১৭), মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (১৮১৭) ও মুণ্ডকোপনিষৎ (১৮১৯) এবং 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' (১৮১৭), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'গায়ত্রীর অর্থ' (১৮১৮) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মিশনারীদের সঙ্গে রামমোহনের প্রথমদিকে খুবই হৃদ্যতা ছিল। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস তাঁর

১ রামমোহন রচনাবলী, অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত ; হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩ : পৃ.৬০৬-৬০৭

কয়েকটি বইও প্রকাশ করে, যেমন— 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' (১৮২০) বা 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯)। 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' (অক্টোবর-নভেম্বর ১৮১৮) হরচন্দ্র রায়ের বাঙ্গাল গেজেটি প্রেসে মুদ্রিত। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রে এটি পুর্নমুদ্রিতও হয়। লল্লুজী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সঙ্গে সহযোগিতায় রামমোহনের কিছু বই প্রকাশ করেন, যেমন, বেদান্তের অনুবাদ।

রামমোহনের প্রথম বই 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫) বাঙালী মুদ্রণ ব্যবসায়ী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য উদ্যোগী হয়ে ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেসে ছেপে প্রকাশ করেন। তাঁর দ্বিতীয় বই 'বেদান্তসার' (১৮১৫)-ও ঐ একই প্রেসে ছাপা হয়। এখানে লক্ষণীয় রামমোহনের প্রথম প্রকাশ একজন বাঙালী মুদ্রণব্যবসায়ীর উদ্যোগেই সম্ভব হয়েছিল। 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫)-এর এক খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। বইটির আখ্যাপত্রে এই নাম না থাকলেও, বইটি সমাপ্ত হয়েছে এইভাবে : 'ইতি···সমাপ্তোয়ং বেদান্ত গ্রন্থ'। বইটির ইংরেজি আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 'The/Bengalee Translation/of the/Vedant,/or/Resolution/of all the/Veds ; /the most celebrated and revered work/of/Brahminical Theology,/establishing the unity/ of/The Supreme Being,/And/that He is the only object of worship./Together with/A Preface,/by the translator./Calcutta : /From the Press of Ferris and Co./1815.'

অক্টেভো ৮½" × ৫" আকারের এই বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭ + ১৬৬। বইটি পরিষ্কার সুন্দর হরফে ছাপা। হরফগুলি অপেক্ষাকৃত ছোটো আকারের, উচ্চতা সাধারণত ৩ মি. মি.। তবে হরফগুলির face কিছুটা মোটা। বেশির ভাগ হরফই প্রায় আধুনিক ধাঁচের। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট অক্ষরের নমুনা দেওয়া যেতে পারে :—'স্ব', 'শ', 'ন্ব', 'ড', 'চ', 'ক্ষ', 'ষ্ট', 'জ', 'ক', 'প্র' ইত্যাদি। অক্ষর সাজানোর ধরনটি সুন্দর। পঙক্তিগুলি সমান্তরাল রেখায় কিছুটা ফাঁকা ফাঁকা করে বিন্যস্ত। প্রতি আট পৃষ্ঠা অন্তর বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণে signature দেওয়া আছে। বইটি খসখসে মোটা পাটনাই কাগজে ছাপা. অধুনা কিছুটা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

এই বইটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, এর পরের বছর অর্থাৎ ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'। এই দ্বিতীয়োক্ত বইটিও ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেসে ছাপা। স্বভাবতই উভয় বইয়ের মুদ্রণ সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

রামমোহনের রচনার উদাহরণ স্বরূপ 'বেদান্ত গ্রন্থ' থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে : 'প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কথকগুলিন শব্দ আছে এ ভাষা সংস্কৃতের জেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা

ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদান্ত শাস্ত্রে ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ ২ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। জাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর জাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর সুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক।···এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি নাশ যাহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করি। যেহেতু কার্য্য থাকিলে কারণ থাকে। কার্য্য না থাকিলে কারণ থাকে না। ব্রহ্মের এই তটস্থ লক্ষণ হয় তাহার কারণ এই জগতের দ্বারা ব্রহ্মকে নির্ণয় ইহাতে করেন। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন, যে সত্য সর্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ যাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায়।'[১]

রামমোহন-সৃষ্ট বাংলা গদ্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তিনি যখন আপন ভাষায় বাঙালির আত্মপ্রকাশের উপাদানকে বলিষ্ঠ করবার জন্য প্রবৃত্ত ছিলেন তখন বাংলা গদ্য ভাষার অনুদ্ঘাটিত পথ তাঁকে প্রায় প্রথম থেকেই কঠিন প্রয়াসে খনন করতে হয়েছিল; যখন তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে বাঙালির মন উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি সেই অপরিণত গদ্যে দুরূহ অধ্যবসায়ে এমন সকল পাঠকের কাছে বেদান্তের ভাষ্য করতে কুণ্ঠিত হন নি যাদের কোনো কোনো পণ্ডিতও উপনিষদ্‌কে কৃত্রিম বলে উপহাস করতে সাহস করেছেন, ও মহানির্বাণতন্ত্রকে মনে করেছিলেন রামমোহনেরই জাল-করা শাস্ত্র;···'[২] বাঙালী মানস তথা ভারতীয় চিন্তারাজ্যে রামমোহন আধুনিকতার হাওয়া বয়ে এনেছিলেন। 'নব্যবঙ্গের আদি পুরুষ রামমোহন' থেকেই আধুনিকতার সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভকালেই এসেছেন রামমোহন রায়।'[৩] অন্যত্র বলেছেন, 'Rammohun Roy inaugurated the Modern Age in India.'[৪] বাংলা মুদ্রণের আদিযুগও রামমোহনের চিন্তা-ভাবনা-আদর্শকে মুদ্রিতাকারে প্রকাশ করতে গিয়ে আধুনিকতার স্পর্শ পেয়েছিল। বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদিযুগে আধুনিকতার জন্ম বলা যেতে পারে ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এখানেই রামমোহন-রচনার বৈশিষ্ট্য।

---

১ রামমোহন রচনাবলী, ঐ, পৃষ্ঠা ৭,৮।

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতপথিক রামমোহন রায়'।

৩ ঐ

৪ ঐ

বাংলা মুদ্রণের বিকাশ পর্বে রামমোহনের আবির্ভাব তাই এত তাৎপর্য মণ্ডিত। আধুনিকতার জন্ম ও পর্বান্তর শুরু সেখান থেকেই।

রামমোহনের অভ্যুদয় ছাড়াও বক্ষ্যমাণ বিকাশ পর্বের আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা— ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ বৃদ্ধি। বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবন ও বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে এই ঘটনারও সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখা দিয়েছিল। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ আরো কুড়ি বছর বাড়িয়ে দেয় তখন এর সঙ্গে এমন কিছু কিছু নতুন ধারা সংযোজিত হয় যার ফলে এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। যেমন, ঐ সনদের একটি নতুন ধারার ফলে ভারতবর্ষে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার লোপ পায়। ফলত, ভারতবর্ষের বাজারে সাধারণ ইংরেজ শিল্পপতিদেরও নানা পণ্যসামগ্রী অবাধে আসতে থাকে। নতুন সনদের কুড়ি বছর কাল, অর্থাৎ ১৮১৩ থেকে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কলকাতায় যে বহু সংখ্যক সরকারী প্রভাবমুক্ত নতুন ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল তার অন্যতম কারণ ঐ সময় ইংলণ্ডের বাজার থেকে অন্যান্য শিল্পসামগ্রীর মতো মুদ্রাযন্ত্রও অবাধে আমদানী করার সুযোগ এসেছিল।

উপরোক্ত সনদের আরো একটি নতুন ধারা অনুসারে খ্রীস্টান মিশনারী সম্প্রদায়ের ভারতে আগমন সংক্রান্ত সমস্ত বাধানিষেধ তুলে নেওয়া হয়। তখন থেকে খ্রীস্টান মিশনারীরা অনেক বেশি সংখ্যায় অবাধে ভারতে আসতে শুরু করেন। ফলত মিশনারী ধর্মপ্রচার ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সরকারী সহযোগিতায় ধর্মান্তরীকরণের কাজ যেমন জোরদার হতে পেরেছিল, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামপুর ও কলকাতায় ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের মুদ্রণ প্রকাশনের কাজও বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল। এ ছাড়া ঐ সনদের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার বলে কোম্পানীকে ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার বাবদ বার্ষিক দু'লক্ষ টাকা খরচের নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও প্রথম দিকে বেশ কিছুকাল এই অর্থ ব্যয়িত হয়নি, তবে ক্রমে ক্রমে এর ফল দেখা দিতে থাকে এবং এর গুরুত্বও উপলব্ধি করা যায়। যে গূঢ় রহস্যের প্রেরণায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এদেশীয়দের শিক্ষা বাবদ এই অর্থব্যয়ে উদ্যোগী হন, তা নিছক ভারতপ্রেম নয়; পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ইংরেজিয়ানায় ভারতীয়দের অভ্যস্ত করে তুলতে পারলেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ও তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সুরক্ষিত হওয়া সম্ভব। ইংরেজি শিক্ষার মারফত তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ এদেশীয়দের রুচি ও অভ্যাসের দিক দিয়ে ব্রিটিশমুখীন ও ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রী ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই গূঢ় রহস্যের প্রেরণাতেই এ দেশে সরকারী উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের সূত্রপাত। কিন্তু তার পরোক্ষ ফল হিসাবে আমাদের বক্ষ্যমাণ মুদ্রণেতিহাস অনিবার্যভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে

কোম্পানীর সনদের নতুন করে মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে এইরূপ নানা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বাংলা মুদ্রণের বিকাশের ক্ষেত্রে দেখা দিতে থাকে।

সমসাময়িককালের আরো একটি গুরুত্বপুর্ণ সরকারী নীতি বাংলা মুদ্রণের বিকাশের ধারাকে প্রভাবান্বিত করেছিল। সেটি ছিল সরকারের প্রেস নিয়ন্ত্রণ বিধি। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, বাংলা মুদ্রণের সমগ্র বিকাশ পর্ব জুড়েই প্রেস নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠোর বিধি নিষেধ সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে রেখেছিল। ফলে সেই সময় মুদ্রণ প্রকাশনের অবাধ বিকাশ প্রতি পদে ব্যাহত হয়। রামমোহনের আবির্ভাবের পর থেকে ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। পরিশেষে সরকারী প্রেস নিয়ন্ত্রণ আইন শিথিল হওয়ার মধ্য দিয়েই বক্ষ্যমাণ বিকাশ পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। শুরু হয় বাংলা মুদ্রণের নতুন পর্ব—বাংলা সাময়িকপত্রের নতুন ইতিহাস।

ভারতে কোম্পানী রাজত্বের প্রথম যুগে সংবাদপত্রের মালিকদের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকদের মোটেই সদ্ভাব ছিল না। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে ভারতে প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র হিকীর বেঙ্গল গেজেট প্রকাশিত হবার পর থেকেই এই পারস্পরিক অসদ্ভাব ও সংঘর্ষ প্রকট হয়ে দেখা দিতে থাকে। তখনকার সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় গভর্নর জেনারেল ও অন্যান্য পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে নানা ব্যক্তিগত কুৎসাকাহিনী প্রচারিত হত এবং তা পাঠকমহল বেশ মুখরোচক সংবাদ হিসাবে উপভোগ করতেন। অবশ্য এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে সংবাদপত্রের মালিক সম্পাদকদেরও কঠোর সরকারী দণ্ড এমন-কি কারাবাস পর্যন্ত ভোগ করতে হত। প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত ঐ সমস্ত পত্রিকাই ছিল ইংরেজি ভাষায় এবং ঐগুলির সম্পাদক-মালিক সবাই ছিলেন বিদেশাগত ইংরেজ। সুতরাং বলা যায়, এদেশে সাংবাদিকতার প্রথম যুগে সংবাদপত্র স্বাধীনতা বা নিয়ন্ত্রণের লড়াইটা ছিল ইংরেজ শাসকদলের সঙ্গে সাধারণ ইংরেজদের। এদেশীয়রা তখনো পত্রিকা প্রকাশন বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার অন্দোলন শুরু করেননি। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে সংবাদপত্রসমূহের শাসকবিরোধী বেপরোয়া উক্তি নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে এদেশে ব্রিটিশ শাসনকার্য ব্যাহত হতে পারে। কিন্তু ওয়েলেসলীর আগে পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো সক্রিয় আইন বিধিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। বড়োলাট ওয়েলেসলীই সর্বপ্রথম ১৭৯৯ সালের মে মাসে সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণ আইন জারী করেন। সংবাদপত্রে যাতে পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে অশ্লীল কুৎসা প্রচারিত না হয় এবং সৈন্যসামন্তের গতিবিধি বা জাহাজ গমনাগমনের সংবাদ প্রভৃতি অবাধে সংবাদপত্রে প্রচারিত হতে না পারে সেজন্য সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণ আইন জারী করা হয়। এর ফলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যথেষ্ট সংকুচিত হয়ে পড়ে। তখন থেকে নিয়ম হয় যে পত্রিকায় মুদ্রিতব্য সংবাদ থেকে বিজ্ঞাপন পর্যন্ত কোনো বিষয়ই সরকারী কর্তৃপক্ষ (সেক্রেটারী বা সংবাদ পরীক্ষক) কর্তৃক পরীক্ষিত না হয়ে প্রকাশ করা যাবে না। এ ছাড়া নতুন

আইনানুসারে মুদ্রাকর, সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীর নাম ঠিকানা প্রভৃতি পত্রিকায় ছাপা আবশ্যিক করা হয়। খ্রীষ্টীয় মতানুসারে রবিবারে পত্রিকা প্রকাশও নিষিদ্ধ হয়। নতুন আইনের এই সব কঠোর নিয়ম মেনে নিয়ে, বিশেষ করে ছাপার আগে সমস্ত পাণ্ডুলিপি 'সেন্সর' অর্থাৎ সরকারের পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য পাঠাতে বাধ্য হওয়ায় পত্রিকা প্রকাশন বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে জে. সি. মার্শম্যানের একটি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধার করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন: 'সম্পাদকীয় মন্তব্যের স্থলে সংবাদপত্রের অনেক স্তম্ভই তারকাচিহ্নিত হইয়া বাহির হইত; কেননা যে সকল অংশে "সেন্সর" তাঁহার সাংঘাতিক কলম চালাইতেন, শেষ মুহূর্তে শূন্য অংশগুলি পূরণ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইত না।'[১] আইনানুসারে নিয়মভঙ্গ করলে পত্রিকা যে কেবল বন্ধ করে দেওয়া হত তা নয়, সম্পাদক-মালিককে ইউরোপে নির্বাসিত করাও হত।

১৭৯৯ থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত কুড়ি বছর এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর সনদের মেয়াদ আবার কুড়ি বছর বাড়াবার পর প্রেস নিয়ন্ত্রণ আইন আরো কঠোর হয়। তখন আইন হয়, কেবল পত্রিকা নয়, প্রেসে যা কিছু ছাপা হোক, হ্যাণ্ডবিল বা বিজ্ঞাপন পর্যন্ত, সবই চীফ সেক্রেটারীর দপ্তরে পাঠাতে হবে। প্রেস সেন্সর আইনের পূর্বোক্ত কুড়ি বছর মেয়াদের মধ্যে বহুবার শাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংবাদপত্রের সংঘর্ষ বেধেছে, এমন-কি কয়েকজন সম্পাদককে ইউরোপে নির্বাসিতও করা হয়। যখনই আইন-ভঙ্গকারী কোনো ইউরোপীয় সাংবাদিকের পত্রিকার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তখন আর তাঁর পক্ষে এদেশে থাকা সম্ভব হত না। তল্পিতল্পা গুটিয়ে তাঁকে স্বদেশ ইংলণ্ড বা ইউরোপ ফিরে যেতে হত। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল যখন শেষের দিকে কিছু এদেশবাসী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকা-প্রকাশন শুরু করল। এই শ্রেণীর আইনভঙ্গকারীকে আইনানুসারে বিলেতে নির্বাসিত করা যায় না। তখন তাদের শাস্তিবিধানের জন্য আইন সংশোধন অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়াল। 'মর্নিং পোস্ট' নামে কলকাতার একটি পত্রিকার সম্পাদক ও মালিক এদেশবাসী হিটলীকে নিয়ে একবার এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে এপ্রিল মাসে সংবাদপত্র-পরীক্ষক বেলী 'মর্নিং পোস্টে'র একটি সংখ্যার কিছু অংশ ছাপতে নিষেধ করলে হিটলী সেই আদেশ অগ্রাহ্য করেন। তিনি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন যে বাংলাদেশেই তাঁর জন্ম, তাঁর মা এদেশবাসিনী; এই অবস্থায় সেন্সরের আদেশ অমান্য করলেও তাঁর কোনো শাস্তি হতে পারে না, কারণ আইনে এরূপ অপরাধে কেবলমাত্র ইউরোপীয় সম্পাদকগণেরই শাস্তির বিধান আছে।[২] এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল লর্ড হেস্টিংস প্রচলিত আইনের ত্রুটি ও সংবাদপত্র পরীক্ষক পদের অসারতা উপলব্ধি করেন। দেশীয় সম্পাদকদের শাসন করবার ক্ষমতা যখন সরকারের হাতে নেই তখন কেবলমাত্র

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িকপত্র' (১ম খণ্ড), পৃ.২

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ।

ইউরোপীয় সম্পাদকগণের জন্য সেন্সরের পদ বহাল রাখা সঙ্গত বলে তিনি আর মেনে নিতে পারলেন না। সুতরাং ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে আগস্ট থেকে লর্ড হেস্টিংস সেন্সরের পদ তুলে দেন ও তার পরিবর্তে সম্পাদকদের নির্দেশের জন্য কতকগুলি সাধারণ নিয়ম প্রবর্তন করেন। এই নিয়মাবলীর আওতায় অবশ্য অনেক ব্যাপক বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল, যেমন, ইংলণ্ডস্থিত ভারত-কর্তৃপক্ষ বা ভারতস্থিত ইংরেজ শাসকবর্গের কোনো কাজের সমালোচনা করা, অথবা কাউন্সিল সদস্য, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক বা লর্ড বিশপদের ব্যক্তিগত চরিত্র বা কাজ সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করা, দেশীয়দের মধ্যে ধর্ম বা রাজনীতি সংক্রান্ত উত্তেজনাসৃষ্টিকারী কোনোরূপ রচনা প্রকাশ করা, ইংরেজি পত্রিকা থেকে অনুরূপ উত্তেজনাসৃষ্টিকারী কোনো সংবাদ পুনঃপ্রকাশ করা বা কোনোরূপ ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা নিষিদ্ধ করা হয়; আইনবলে নিয়মভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মামলা করা বা ইউরোপে নির্বাসিত করার অধিকার সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। এই সমস্ত নিয়মাবলী যথাযথ পালন করতে হলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু উদারনীতিবাদী লর্ড হেস্টিংস কখনোই এই সব আইনের নিয়মাবলীকে কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করতে চাননি, ফলে তাঁর রাজত্বকালে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা অনেকটা অবাধ হতে পেরেছিল। বলা যেতে পারে Free Press-এর যুগ সেখান থেকে শুরু। অবশ্য ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল অ্যাডামের রাজত্বকালে আবার নতুন করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপহৃত হয় এবং পুনশ্চ ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে মেট্‌কাফের আমলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। যাই হোক, সে কথা পরে আলোচ্য। আপাতত দেখা যায়, ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন শিথিল হওয়ার পর থেকেই বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশনে জোয়ার আসে। লর্ড হেস্টিংসের নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার কিছু আগে থেকেই অবশ্য বাংলা ভাষায় একাধিক সাময়িকপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। তবে হেস্টিংসের সংবাদপত্র সংক্রান্ত উদারনীতিই পরবর্তী বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশনে যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চার করেছিল। বাংলা মুদ্রণের বিস্তার পর্বের মূলেও তা যথেষ্ট গতিবেগ সঞ্চারিত করেছিল।

বক্ষ্যমাণ বিকাশ পর্বের শেষাশেষি এসে দেখা যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রভাব স্তিমিত হয়ে এসেছে। শ্রীরামপুর মিশনের কর্মোন্মাদনায়ও তখন ভাঁটার টান; ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে দিগ্‌দর্শন-সমাচার দর্পণ-*Friend of India* প্রভৃতি সাময়িকপত্র প্রকাশের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত সেখানে নতুন করে জোয়ারের টান শুরু হয়নি। অপর-দিকে রামমোহনের আবির্ভাবের ফলে বাঙালী সমাজে চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। পুরনো সামাজিক ভিত নড়ে উঠেছে, সনাতন ও নতুনের দ্বন্দ্বে বাঙালী মানসে ভাববিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে শুরু করেছে। বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন তখন দানা বাঁধার মুখে। এর সঙ্গে মুদ্রণ-প্রকাশনের নতুন স্রোত যুক্ত হল ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা ও ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা হ্রাস ও বাংলা সাময়িকপত্রাদি আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। ফলে শুরু হল নতুন ইতিহাস, নতুন যুগ। বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে আমি এর আখ্যা দিয়েছি বিস্তার পর্ব।

বিস্তার পর্ব

(১৮১৭-১৮৩৪)

প্রথম অধ্যায়

বাংলা মুদ্রণের বিস্তার : কাল ও চরিত্র নির্ণয়

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে যেমন বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে 'বিকাশ পর্বের' শুরু, তেমনই ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা হ্রাস ও বাংলা সাময়িক পত্রাদির আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে বাংলা মুদ্রণের 'বিস্তার পর্বের' সূচনা। ১৮১৭ সালে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে বাংলা মুদ্রণের ধারায় প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। সোসাইটির উদ্যোগে স্কুলপাঠ্য অজস্র বাংলা বই রচিত, মুদ্রিত ও প্রচারিত হতে থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা— লর্ড হেস্টিংস কর্তৃক ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠোরতা হ্রাস। ফলে অবাধ মুদ্রণের পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে। ঐ একই সালে বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্মরণীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেল— বাংলা সাময়িকপত্রাদির আবির্ভাব। দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পণ ও বাঙ্গাল গেজেটি প্রকাশনের মধ্য দিয়ে যেমন বাংলা সাময়িকপত্রের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের শুরু, তেমনি বাংলা মুদ্রণের আদিযুগেও সেদিন থেকে এক নতুন পর্বের সূত্রপাত। এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্য— বিস্তার। বাংলা মুদ্রণের সীমানা বিস্তৃত হচ্ছে, মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডার নিত্য নতুন সম্পদে ভরে উঠছে। সাহিত্যিক মূল্যে তা মহৎ না হলেও, সংখ্যায় বৃহৎ। মুদ্রণের আদিযুগে তার মূল্য কম নয়। মুদ্রণ-প্রকাশনার চরিত্রও তখন পালটাচ্ছে। বিচিত্র বিষয়ের বই প্রকাশিত হচ্ছে। ধর্ম-নীতিকথা তো আছেই, বর্ণপরিচয়-ব্যাকরণ-অভিধান সহ স্কুলপাঠ্য নানা বিষয় আছে, ইতিহাস ও বিজ্ঞানভিত্তিক বইও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সঙ্গে আদিরসাত্মক অশ্লীল রচনাও আছে। সচিত্র প্রকাশনাও তখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ম্যাপ-নক্শা-পঞ্জিকা ছাপা হচ্ছে, বহু-রঙা ছবিও দেখা দিচ্ছে। সর্বোপরি সাময়িকপত্রাদির আবির্ভাব ও উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা। পত্রপত্রিকা মারফত নানাবিধ সংবাদ বাঙালীর ঘরে ঘরে পরিবেশিত হচ্ছে। সব মিলিয়ে বুদ্ধিজীবী বাঙালীর কাছে তখন বাংলা মুদ্রণ বৈচিত্র্য ও বিস্তারের মধ্য দিয়ে এক নতুন যুগের নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে। সেইজন্যই ১৮১৭-১৮ খ্রীস্টাব্দের সীমানা ধরে আমি বাংলা মুদ্রণের বিস্তার পর্বের সূচনাকে চিহ্নিত করেছি।

বাংলা মুদ্রণের আদি যুগের এই শেষ পর্ব অর্থাৎ বিস্তার পর্ব ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত বলে আমি ধরেছি। ওখানেই আদি যুগের সমাপ্তি। এই সমাপ্তি রেখাটিও টানা হয়েছে একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ঘটনাটি উইলিয়ম কেরীর মৃত্যু— ১৮৩৪

খ্রীস্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই একটি যুগের সমাপ্তি— বাংলা মুদ্রণের আদিযুগের সমাপ্তি। ১৭৯৩ থেকে ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত চল্লিশ বৎসরাধিক কাল একটানা বাংলাদেশের মাটিতে কেরীর কর্মচঞ্চল দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে। তাঁকে কেন্দ্র করেই বাংলা মুদ্রণের আদিযুগ দানা বেঁধে উঠেছে। এই দীর্ঘযুগের তিনি ছিলেন যেন কেন্দ্রীয় প্রাণপুরুষ বা মধ্যমণি। আরো অনেক শিল্পী, লেখক, কর্মী, চিন্তাবিদ্, রাষ্ট্রনায়ক তাঁদের ক্ষুদ্র বৃহৎ অবদানে বাংলা মুদ্রণের আদিযুগের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। কিন্তু উইলিয়ম কেরীর মতো এমন কোনো একক ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না যিনি একাদিক্রমে চল্লিশ বছর ধরে ঐ যুগের বিভিন্ন পর্বকে একসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছেন। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও প্রচেষ্টাই বাংলা মুদ্রণের বিকাশের ধারায় প্রধানতম শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। তাঁর মৃত্যুতে তাই একটি যুগের পরিসমাপ্তি। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দকে তাই বাংলা মুদ্রণের আদিযুগের শেষ পর্ব অর্থাৎ বিস্তার পর্বের প্রান্ত সীমা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিস্তার পর্ব নামকরণের আরো একটি তাৎপর্যের কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এই পর্বে পৌঁছেই প্রথম বাংলা মুদ্রণের সুযোগ সুবিধা প্রকৃত অর্থে বিস্তৃত হতে পেরেছে। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই কলকাতা ও তার আশেপাশে বহু সংখ্যক ছোটোখাটো ছাপাখানা গড়ে উঠতে থাকে। ফলে এই প্রথম লেখক তাঁর রচনাকে স্বাধীনভাবে মুদ্রিত করার সুযোগ পেলেন। আদিযুগের প্রথম দিকে মুদ্রাকরই ছিলেন মুখ্য, লেখক গৌণ। অর্থাৎ ছাপাখানা বা তার মালিক প্রতিষ্ঠান বা মুদ্রাকরই প্রধান উদ্যোক্তা, লেখককে তিনিই অনুপ্রাণিত করেন বা তাঁর প্রয়োজন মতো তিনিই লেখককে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে তা মুদ্রণ প্রকাশনে উদ্যোগী হন। কিন্তু বিস্তার পর্বে পৌঁছে লেখকের প্রাধান্য প্রথম দেখা দিতে থাকে। তখন বই লেখা হতে লাগল লেখকের নিজস্ব ইচ্ছা, প্রেরণা বা প্রয়োজনে, তারপরে সেই লেখা স্বয়ং লেখক (বা তাঁর পক্ষে কোনো প্রতিষ্ঠান) উদ্যোগী হয়ে তাঁর পছন্দ মতো ছাপাখানায় ছেপে প্রকাশ করার সুযোগ পেলেন। লেখকই তখন মুখ্য, মুদ্রাকর গৌণ। বা অন্যভাবে বলা যায়, লেখকের প্রয়োজন মতো মুদ্রণের সুযোগ তখন সহজলভ্য হয়ে এল। বাংলা প্রকাশনার ইতিহাসে আধুনিক কালের লেখক-প্রকাশক-মুদ্রাকর— এই ত্রি-স্তর প্রথার সূত্রপাত তখন থেকেই। ফলে বাংলা মুদ্রণের সুযোগ সুবিধা তখনই যথার্থ বিস্তার লাভ করল। লেখকের রচনা তখন আর মুষ্টিমেয় মুদ্রাকরের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে রইল না। বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে সেখানেই আদিযুগের সমাপ্তি, আধুনিকতার সূত্রপাত। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে মেটকাফ কর্তৃক সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঘোষণায় সেই আধুনিকতার জয়ধ্বনি শোনা গেল।

বক্ষ্যমাণ বিস্তার পর্বে বাংলা মুদ্রণের সুযোগ সুবিধাই যে কেবল বিস্তার লাভ করল তা নয়, এই পর্বে মুদ্রণ কলাকৌশল ও উপকরণও যথেষ্ট উন্নত হল। নানা আকারের ও নানা ধাঁচের বাংলা হরফ দেখা দিতে লাগল। কোনোরকমে বইটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেই

এখন আর মুদ্রাকরেরা সন্তুষ্ট থাকলেন না। বইয়ের সাজসজ্জা, মুদ্রাক্ষরের বৈচিত্র্য ও মুদ্রণ-পারিপাট্যের প্রতি তাঁরা আরো মনোযোগী হয়ে উঠলেন। মুদ্রণ-প্রকাশন আদর্শ ক্রমে ক্রমে রূপসন্ধানী হয়ে উঠতে লাগল। একই বইয়ে ছোটো ও বড়ো মুদ্রাক্ষরের সমাবেশ দেখা গেল। আখ্যাপত্র, অধ্যায় ও বিষয়-শিরোনাম প্রভৃতি ছাপতে অপেক্ষাকৃত বড়ো হরফের ব্যবহার শুরু হল। বইয়ের ভিতরের অংশে একটানা ছাপার কাজে আবার যতদূর সম্ভব ছোটো হরফ ব্যবহারের ঝোঁক দেখা দিল। যতিচিহ্নের ব্যবহার শুরু হল। এমন-কি এ বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হতে দেখা যায়। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশনায় পূর্ণচ্ছেদে 'দাঁড়ি'র পরিবর্তে ইংরেজি প্রথায় 'ফুলস্টপ'-এর ব্যবহার দেখা যায়। বক্তব্যের তারতম্য বোঝাতে ইংরেজি italics টাইপের পরিপূরক হিসাবে বাংলা মুদ্রণে তাঁরা কিছুকাল বক্রমাত্রা বা তরঙ্গায়িত মাত্রা ব্যবহারও চালু করেন। এই ধরনের নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়েই বাংলা মুদ্রণের ধারা বিস্তৃত হতে থাকে। মুদ্রণ-কলাকৌশল বিকশিত হবার পর এই পর্বে পৌঁছে বিস্তৃত হতে থাকল।

বিস্তার পর্বের সামগ্রিক মুদ্রণ-প্রকাশন ধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ঐ পর্বে বাংলা মুদ্রণধারা মূলত চারটি খাতে প্রবাহিত হয়েছিল : প্রথম ধারাটি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় ধারার জন্ম ও বিকাশ বাংলা সাময়িক পত্রপত্রিকা প্রকাশনকে কেন্দ্র করে। তৃতীয় ধারায় গতি সঞ্চার করেছিল পুনরুজ্জীবিত শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, উইলিয়ম কেরীর মৃত্যুতে যার পরিসমাপ্তি। চতুর্থ ধারাটি গড়ে উঠেছিল কলকাতা ও তার আশেপাশের ছোটো বড়ো অসংখ্য দেশীয় মালিকানার ছাপাখানাকে কেন্দ্র করে। বাংলা মুদ্রণের এই চতুর্মুখী ধারায় বাংলা প্রকাশনা নানাভাবে প্রভাবিত ও বিস্তৃত হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, পূর্বোক্ত প্রথম ধারায় বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় গতিবেগ সঞ্চারিত হয়, দ্বিতীয় ধারার প্রভাবে বাঙালীর সমাজ-সংস্কার ও ধর্মীয় আন্দোলন, ও সর্বোপরি বাঙালীর বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে, তৃতীয় ধারার কল্যাণে বিষয়বৈচিত্র্য ও গুরুত্বে বাংলা প্রকাশনার পরিধি আরো বিস্তৃত হয় এবং চতুর্থ ধারায় বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন শিল্প ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিস্তৃত হতে থাকে। ১৮১৭ থেকে ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত বাংলা মুদ্রণের বিস্তার পর্বের এই চতুর্মুখী ধারার মূল বৈশিষ্ট্য ও অবদানের কথা আমি একে একে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি : বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় গতিবেগ সঞ্চার

১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ৬ই মে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে ঐ দিনটি যেমন স্মরণীয়, বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাসেও ওটি একটি স্মরণীয় দিন। কারণ ঐ দিনে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম যাকে কেন্দ্র করে বাংলা পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। একটি হিসাবে দেখা যায়, প্রথম চার বছরে (১৮১৭-২১) সোসাইটির উদ্যোগে অন্যান্য ভাষা ছাড়া কেবলমাত্র বাংলা ভাষাতেই ১৯টি বইয়ের ৭৯৭৫০ কপি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া ঐ সময়ে আরো ১২টি বাংলা বইয়ের ২৭০২৫টি কপি ছাপাখানায় প্রস্তুতির পথে প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল।[১] এ ছাড়াও ইঙ্গ-বঙ্গ ভাষা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় আরো বহু সংখ্যক বই সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বিস্তার পর্বের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই হারে সোসাইটি কর্তৃক বাংলা পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ-প্রকাশনের ধারা অব্যাহত ছিল। [১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দের পরেও অবশ্য আরো বহুকাল— ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক ও পরিবেশক সংস্থা ('Publishing as well as distributing agency') হিসাবে সক্রিয় ছিল এবং পরবর্তীকালে ১৮৭৮ থেকে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই সংস্থা কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক পরিবেশনের কাজে রত ছিল।] সুতরাং বাংলা মুদ্রণের বিস্তার পর্বে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির অবদানের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই অবদান যে কেবল সংখ্যায় বৃহৎ ছিল তা নয়, বিষয়বৈচিত্র্যে ও মুদ্রণপারিপাট্যেও সোসাইটি বাংলা পাঠ্যপুস্তকের মানকে এক উচ্চপর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছিল। দুঃখের কথা, বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাসে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির এই মহৎ অবদানের কথা ইতিপূর্বে বিশেষ আলোচিত হয়নি, অধিকাংশ সমালোচকের দৃষ্টিতেই প্রসঙ্গটি উপেক্ষিত রয়ে গেছে।

তৎকালীন পরিবেশে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি নানা কারণে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্থা হিসাবে সমাদৃত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। সোসাইটির সেই ঐতিহাসিক

---

১ ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮২১ তারিখে প্রকাশিত ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির চতুর্থ বার্ষিক প্রতিবেদন : প্রথম পরিশিষ্ট।

ভূমিকার যোগ্য মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। সংকীর্ণ আচার-বিচার ও কুসংস্কারের নাগপাশে আবদ্ধ সমাজের পটভূমিকায় ধর্মীয় বাদানুবাদের কোলাহলমুখরিত পরিবেশে আবির্ভূত হয়েও ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি তার প্রকাশন-সংক্রান্ত যে নীতি নির্ধারিত করেছিল তার অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল, কোনো ধর্ম-বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ না করা। তবে ছাত্রদের চরিত্র গঠনের সহায়ক সাধারণ নীতিমূলক পুস্তিকা প্রকাশে সোসাইটির অনাগ্রহ ছিল না। 'Rules of the Society'-র তৃতীয় ধারায় বলা হয়: 'That it form no part of the design of this Institution, to furnish religious books—a restriction, however, very far from being meant to preclude the supply of moral tracts, or books of a moral tendency, which without interfering with the religious sentiments of any person, may be calculated to enlarge the understanding and improve the character.'[১]

ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য ছিল এদেশে বিদ্যালয়ের দেশীয় ছাত্রদের জন্য ইংরেজি ও বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা, মুদ্রণ ও স্বল্প বা বিনামূল্যে বিতরণ। প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী বা 'Rules of the Society' পুনশ্চ উদ্ধার করা যেতে পারে:

'1. That the objects of this Society be the preparation, publication, and cheap or gratuitous supply of works useful in schools and seminaries of learning.

'2. That the attention of the Society be directed, in the first instance, to the providing of suitable books of instruction for the use of native schools, in the several languages, (English as well as Asiatic), which are, or may be taught in the provinces subject to the presidency of Fort William.'[২]

১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে আয়র্ল্যাণ্ডে যে 'Cheap Book Society of Dublin' নামক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় (যা ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে 'Society for the Education of the Poor in Ireland' নামক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়), তারই আদর্শে Calcutta School Book Society গঠিত হয়। ডাবলিনের সোসাইটির আদর্শেই কলকাতার ইংরেজ ও বাঙালী শিক্ষানুরাগীরা অনুপ্রাণিত হন। তাঁদের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সোসাইটি স্বল্পমূল্যে দেশীয় ভাষায় পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশে অগ্রণী হয়। সমকালীন মিশনারী প্রচারধর্মিতা বা হিঁদুয়ানীর গোঁড়ামিকে

---

১ *'Report of the Calcutta School Book Society's Proceedings'*,

২ *Ibid.*

তাঁরা সচেতনভাবে বর্জন করেছিলেন। ধর্ম-নিরপেক্ষ শাশ্বত নীতিবোধ তাঁদের প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকে অগ্রাধিকার লাভ করেছিল। তৎকালীন প্রচলিত ধারার এটি এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এখানেই ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির বৈশিষ্ট্য।

শুধু তাই নয়। দেশীয় ও বিদেশী বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের যৌথ উদ্যোগে গঠিত সোসাইটির কাঠামোতেও ছিল বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত এটিই ছিল প্রথম ইংরেজ ও দেশীয়দের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জনহিতকর সংস্থা— যাকে বলা হয় 'Europeo-Native Organisation'। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির মতো জনহিতকর দেশী-বিদেশী যৌথ সংস্থা ব্রিটিশ শাসিত ভারতের প্রথম যুগে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার এক উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেছিল। শাসক-শাসিতের স্বাভাবিক দূরত্ব এখানে সাময়িকভাবে অনুপস্থিত, সহযোগিতার কর্মবন্ধনে গ্রথিত এই ইন্দো-ইউরোপীয় যৌথ সংস্থার আদর্শে পরবর্তীকালে আরো কিছু কিছু অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির এটি এক উল্লেখযোগ্য আদর্শগত অবদান।

সোসাইটির কার্যনির্বাহক সমিতির কাঠামোর প্রতি দৃষ্টি দিলেই এর ইন্দো-ইউরোপীয় চেহারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির নিয়মানুসারে ষোলজন ইউরোপীয় ও আটজন দেশীয় সদস্যকে নিয়ে এর পরিচালন সমিতি গঠিত হত। যেমন, প্রথম বছরে (১৮১৭-১৮) সোসাইটির পরিচালন সমিতির সদস্য ছিলেন ষোলজন ইউরোপীয় : Hon Sir E. H. East, J. H. Harington, Capt. T. Roebuck, W. B. Bayley, Rev. W. Carey, Rev. J. Parson, Rev. T. Thomason, Major J. W. Taylor, Capt. A. Lockett, W. H. Macnaghten, G. J. Gordon, James Robinson, James Calder (Treasurer), Lieut. F. Irvine (Recording Secy.), E. S. Montagu (Corresponding Secy.), Lieut. D. Bryce (Collector)— এ ছাড়া ছিলেন আটজন দেশীয় সদস্য : মৌলভী আবদুল ওয়াহিদ (দেশীয় সম্পাদক), মৌলভী করীম হোসেন (Curum Hoosyn), মৌলভী আবদুল হামিদ, মৌলভী মুহম্মদ রশীদ, বাবু তারিণীচরণ মিত্র (দেশীয় সম্পাদক), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, বাবু রাধাকান্ত দেব ও বাবু রামকমল সেন।

সোসাইটির ইউরোপীয় উদ্যোক্তারা এর উদ্দেশ্য ও কর্মধারার সঙ্গে দেশীয়দের সংশ্লিষ্ট করার জন্য যৌথ পরিচালন সমিতি গঠন করেছিলেন। তার ফল হিসাবে দেশীয়দের পরিশ্রম ও জনহিতকর সেবা, উদার আর্থিক সাহায্য এবং সর্বোপরি তাঁদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা লাভ করায় সোসাইটির কার্যক্রম সফল হতে পেরেছিল। সোসাইটির ইউরোপীয় উদ্যোক্তারা ভারতীয়দের বদান্যতা ও তাঁদের বিভিন্ন জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণ ও আর্থিক সাহায্য-দানের ঐতিহ্য ('experience in gifts') সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। স্বভাবতই তাঁরা যখন দেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজে সোসাইটির জন্য সাহায্যের আবেদন জানান, ভারতীয়দের কাছ থেকে তাঁরা তখন স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পেয়েছিলেন। সোসাইটির প্রথম

বার্ষিক সাধারণ সভার দিন পর্যন্ত (৪ঠা জুলাই ১৮১৮) মোট সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭,১৭৫ টাকা। এর মধ্যে ৫৪৯১ টাকা দিয়েছিলেন ৯৪ জন ভারতীয় এবং বাকি ১১,৬৮৪ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল ১১৪ জন বিদেশীর কাছ থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ৯৪ জন ভারতীয় দাতার মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন সাধারণ মানুষ— তাঁদের সামান্য সামান্য দানেই সোসাইটির ভাণ্ডার ভরে উঠেছিল। যেমন, তাঁদের মধ্যে ২৯ জন চাঁদা দিয়েছিলেন ১ থেকে ১০ টাকার মধ্যে, ২১ জন দিয়েছিলেন ১১ থেকে ২০ টাকার মধ্যে। আবার এঁদের সঙ্গে সমাজের ধনী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের দানও যুক্ত হয়েছিল। যেমন, রাধাকান্ত দেব (দান ১০০ টাকা), রামকমল সেন (দান ৩২ টাকা, চাঁদা ৮ টাকা), রসময় দত্ত (দান ২৫ টাকা), কালীশঙ্কর ঘোষাল (দান ২০০ টাকা, চাঁদা ৫০ টাকা), জয়কৃষ্ণ সিংহ (দান ১০০ টাকা, চাঁদা ৫০ টাকা), মুর্শিদাবাদের নবাব (দান ৫০০ টাকা), মুর্শিদাবাদের ফায়জন্নিসা বেগম (দান ২৫০ টাকা), লক্ষ্ণৌ-এর নবাব (দান ৫০০ টাকা, চাঁদা ১০০ টাকা), ঢাকার নবাব (দান ৩০০ টাকা), প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।* এঁদের সঙ্গে গভর্নর জেনারেল মার্কুইস অব্ হেস্টিংস (৪০০ টাকা), লেডী হেস্টিংস (৪০০ টাকা), বেলী (২৫০ টাকা), ডেভিড হেয়ার (১০০ টাকা), পীয়ার্সন (৩২ টাকা), প্রভৃতির চাঁদাও যুক্ত হয়েছিল। এই দান বা চাঁদার অঙ্ক ও দাতাদের নামের তালিকা এখানে উল্লেখ করা হল এইজন্য যে এর থেকে সহজেই বোঝা যায় ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি একটি সত্যিকারের জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান ও যথার্থ দেশী-বিদেশী যৌথ সংস্থা হিসাবে গড়ে উঠেছিল; সাধারণ ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য স্বল্পমূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণই ছিল যার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে গিয়ে বাংলা মুদ্রণের যথার্থ বিস্তার ঘটেছিল।

কিন্তু সোসাইটির পরিচয়ের এইটাই শেষ কথা নয়। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির প্রথম দিকের সমস্ত প্রচেষ্টা, উদ্যম, পরিকল্পনা ও কার্যাবলী নিঃসন্দেহে দেশীয় ভাষা-সাহিত্যের চর্চা ও উন্নতি এবং দেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের প্রসার। সোসাইটির ইংরেজ পরিচালক-বৃন্দের ধারণা ছিল দেশীয় শিক্ষা থেকেই ইংরেজি শিক্ষার পত্তন হবে, অর্থাৎ তাঁদের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় যে শিক্ষিত দেশীয় গোষ্ঠী গড়ে উঠবে তাঁরা শেষ পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অবশ্যই আকৃষ্ট হবেন। সুতরাং বলা হয়ে থাকে, তাঁদের দেশীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রচারের প্রাথমিক প্রচেষ্টার মূলে ছিল দেশে ভবিষ্যৎ ইংরেজি-চর্চার উপযোগী ক্ষেত্র গড়ে তোলা ('to pave the way for English Education in due course')। ১৮১৭ থেকে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সোসাইটি মূলত দেশীয় ভাষায় শিক্ষার কাজে জড়িত ছিল। তারপর ধীরে ধীরে ইংরেজির প্রতি ঝোঁক বাড়তে থাকে এবং জনসাধারণের চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে তাঁদের কর্মসূচী প্রধানত ইংরেজি শিক্ষা-প্রসার-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ই মার্চ তারিখে

তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণায় সরকারী নীতিরও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন এদেশে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারই সরকার ও কমিটির মূল লক্ষ্য :…'the great object of the British Government in India ought to be the promotion of European Literature and Science ; …all funds at the disposal of the committee be henceforth employed in imparting to the native population, a knowledge of English Literature and Science through the medium of the English Language.'[১]

সুতরাং ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রসারে যা কিছু অবদান তা প্রধানত ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্বভাবতই এই সময়ে, অর্থাৎ আলোচ্য 'বিস্তার পর্বে' (১৮১৭-১৮৩৪) সোসাইটি বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা, মুদ্রণ ও প্রচারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলা মুদ্রণের বিস্তার ঘটেছিল।

ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি তৎকালীন কলকাতা ও তার বাইরে— বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত দেশীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপযোগী দেশীয় ভাষায় বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এ জন্য তাঁরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে বাংলাভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা, মুদ্রণ ও তার প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। সোসাইটি নিজেরাই অনেক বই ছেপেছেন, আবার কিছু অন্যত্র ছাপিয়েছেন। তা ছাড়া সোসাইটি কলকাতায় (১১২ নম্বর বৈঠকখানায়) তাঁদের নিজস্ব কেন্দ্রীয় পুস্তকভাণ্ডার ও দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত অন্যান্য শাখাকেন্দ্র মারফত তাঁদের ঐ সব মুদ্রিত পুস্তক বিক্রয় বা দ্রুত বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও জনসাধারণের একাংশে ঐ সব বই সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ ও চাহিদাও গড়ে উঠেছিল। সে দিক থেকে বলা যায় তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছিল। ১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে যে ৯৪টি দেশীয় বিদ্যালয় পরিচালিত হত তাদের পাঠ্যতালিকায় প্রধানত ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত পুস্তকাবলীই স্থান লাভ করেছিল। ফলত ঐ সব বইয়ের চাহিদাও দ্রুত বেড়ে ওঠে। স্কুল বুক সোসাইটির বই বুদ্ধিজীবী বাঙালীর কাছে তখন ছিল অপরিহার্য, অধীর আগ্রহে পাঠক তার প্রকাশের অপেক্ষায় থাকতেন। Rev. Pearce বলেছেন তখনকার পাঠককুল ছিলেন— 'hungry for the School Book Society's publications and full of impatience to receive them from the Press.'[২]

---

১ N. L. Basak. 'Origin and Role of the Calcutta School Book Society in improving the cause of education in India, especially vernacular education in Bengal (1817-1835)' : *Bengal, Past and Present*, Jan.-June, 1959.

২ N. L. Basak, *Ibid*.

সোসাইটির উদ্যোগে ছাপা বাংলা বইয়ের কিছু কিছু হিসাব নিলেই তাঁদের প্রচেষ্টার ব্যাপকতা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা যেতে পারে। প্রথম দু'বছরে (১৮১৭-১৮১৯) সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত বাংলা প্রকাশনার হিসাবটা মোটামুটি এইরূপ দাঁড়ায়:

বইয়ের নাম	আকার	১৮১৭-১৮ মুদ্রিত কপির সংখ্যা		১৮১৮-১৯ মুদ্রিত কপির সংখ্যা		
		১ম সং	২য় সং	১ম সং	২য় সং	৩য় সং
১ স্টুয়ার্টের 'এলিমেন্টারী বেঙ্গলী টেবল' (বাংলা বর্ণমালা) : সংখ্যা ১ থেকে ৭	ফোলিও	৩০০	—	—	১০০০	১০০০
শ্রীরামপুর প্রকাশন : সংখ্যা ৮ থেকে ১১		—	—	৭৫০		
২ ঐ : ১১ সংখ্যা একত্রে	অক্টেভো	—	—	১০০০		
৩ পীয়ার্সনের 'টেবল' (*Introductory Bengalee Table*—বাংলা বর্ণমালা)	"	—	—	২০০০	—	—
৪ রাধাকান্ত দেবের *Bengalee Spelling Book* (বাংলা শিক্ষাগ্রন্থ)	অক্টেভো	—	—	২০০০	—	—
৫ রেভা. মে-র গণিত	"	—	—	৫০০	১৫০০	—
৬ হারলে-র 'এরিথমেটিক' (গণিতাঙ্ক)	"	—	—	১০০০	—	—
৭ নীতিকথা : ১ম ভাগ (সংকলক : তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন)	"	৫০০	১০০০			
১ম ভাগ ২য় অংশ	"	—	১৫০০	—	—	৪০০০
৮ ঐ : ২য় ভাগ (মে, হারলে, পীয়ার্সন)	"	—	—			
		—	—	৪০০০		
৯ ঐ : ৩য় ভাগ (রামকমল সেন)	"	—	—	—	—	৫০০০
১০ তারাচাঁদ দত্তের 'মনোরঞ্জনেতিহাস' (*'Pleasing Tales'*) : (বাংলা)	"	—	—	২০০০	—	—
ঐ : (ইংরেজি-বাংলা)	"	—	—	১০০০	—	—

	বইয়ের নাম	আকার	১৮১৭-১৮ মুদ্রিত কপির সংখ্যা		১৮১৮-১৯ মুদ্রিত কপির সংখ্যা		
			১ম সং	২য় সং	১ম সং	২য় সং	৩য় সং
১১	ইষ্টুয়ার্টের 'উপদেশ কথা' (বাংলা) অথবা ***'Beauties of History'***-এর অনুবাদ	অক্টেভো	—	—	১০০০	—	—
	('ইতিহাসকথা' : ইংরেজি-বাংলা)	"	—	—	২০০০	—	—
১২	ফেলিক্স কেরীর 'ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' (গোল্ডস্মিথের 'ইংলণ্ডের ইতিহাস'-এর অনুবাদ)	"	—	—	৫০০	—	—
১৩	পালিত ও অন্যান্য অনুদিত ফারগুসনের এ্যাষ্ট্রনমি (জ্যোতির্বিদ্যা)	"	—	—	১০০	—	—
১৪	ভূগোল, **'by a learned Native'** (রামমোহন রায় ?)	"	—	—	২০০০	—	—
১৫	ডি'এনসেলমি-র (**D'Anselme's**) 'বেঙ্গলী এক্সারসাইজেস' (বাংলা পাঠ)	"	...	...	...	...	...
১৬	গোলাধ্যায় (শ্রীরামপুর সং)	"	১০০	—	—	৫০০	নব পর্যায়
১৭	দিগ্দর্শন (শ্রীরামপুর সং) :						
	বাংলা : ১ম সংখ্যা	"	১০০০	—	—	২০০০	নব পর্যায়
	২য় "	"	১০০০	—	—	৩০০০	
	৩য় "	"	১০০০	—	—	২০০০	
	৪র্থ "	"	—	—	১০০০	২০০০	
	৫ম "	"	—	—	১০০০		
	৬ষ্ঠ "	"	—	—	২০০০		
	৭ম "	"	—	—	২০০০		
	৮ম "	"	—	—	২০০০		
	৯ম "	"	—	—	২০০০		
	১০ম "	"	—	—	২০০০		
	১১শ "	"	—	—	২০০০		
১৮	রামচন্দ্র শর্মার 'অভিধান'	(16mo)	২০০	—	২০০	১০০০	
১৯	পাঠশালার বিবরণ অথবা পীয়ার্সন-অনুদিত 'স্কুল ইনষ্ট্রাকশনস' (**Dr. Bell's**)	অক্টেভো	—	—	৫০০	—	—

বইয়ের নাম	আকার	১৮১৭-১৮ মুদ্রিত কপির সংখ্যা		১৮১৮-১৯ মুদ্রিত কপির সংখ্যা		
		১ম সং	২য় সং	১ম সং	২য় সং	৩য় সং
২০ পীয়ার্সন ও হারলে-র 'ফ্যামিলিয়র লেটারস' (পত্রকৌমুদী ?)	...	...	...	...	...	...
২১ ফেলিক্স কেরীর 'বিদ্যাহারাবলী', ১ থেকে ১২ সংখ্যা : প্রতিটি	অক্টেভো	—	—	২৫	—	—
২২ রেভা. লসনের 'সিংহের বিবরণ' (*History of the Lion*)	"	—	—	২০০০	—	—
২৩ কপি বুক (আদর্শ বাংলা হাতের লেখা) [কালীকুমার রায়ের হস্তাক্ষর]						
২৪ ভূগোল বৃত্তান্ত, সংখ্যা ১ থেকে ৪ : প্রতিটি (অথবা পীয়ার্স ও ইউস্টেস কেরীর 'ইনস্ট্রাক্টিভ কপি বুক')	ক্লিপ Long Form	—	—	২০০০	—	—
ভূগোল বৃত্তান্ত (পীয়ার্সের ভূগোল), সংখ্যা ১ থেকে ৪ : প্রতিটি	অক্টেভো	—	—	২০০০	—	—
		৪১০০	২৫০০	৪০৫৭৫	১৩০০০	১০০০০

মোট মুদ্রিত কপির সংখ্যা : ৭০১৭৫

[২১শে সেপ্টেম্বর ১৮১৯ তারিখে পঠিত ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক কার্যবিবরণীর পরিশিষ্ট থেকে সংগৃহীত।]

এইসব বইয়ের অধিকাংশ তৎকালে খুবই জনপ্রিয় ছিল। কেবলমাত্র স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে যে এগুলির চাহিদা ছিল তা নয়, শিক্ষক ও সাধারণ বুদ্ধিজীবী বাঙালী সমাজেও এগুলির বিশেষ সমাদর ও চাহিদা ছিল। ১৮২১ সালের মধ্যে দেখা যায় সোসাইটি প্রকাশিত ৬টি বাংলা বইয়ের সমস্ত কপি নিঃশেষিত ('Out of print') হয়ে গেছে। ঐ সময়ে বইগুলির সংস্করণ ও মুদ্রিত কপির সংখ্যা ছিল এইরূপ :

১ রেভা. মে-র গণিত—২টি সংস্করণ, ২০০০ কপি

২ পীয়ার্সনের 'ইনট্রোডাক্টরি লেসনস্' (টেবল ?)—২টি সং, ৩০০০ কপি

৩ রেভা. হারলে-র 'এরিথমেটিক' (গণিতাঙ্ক)—১টি সং, ১০০০ কপি

৪ পীয়ার্সনের *School Master's Manual* (পাঠশালার বিবরণ)—১টি সং, ৫০০ কপি

৫ নীতিকথা, ১ম ভাগ—৩টি সং, ৭০০০ কপি।

৬ নীতিকথা, ২য় ভাগ—১টি সং, ৪০০০ কপি।[১]

প্রথম চার বছরের (১৮১৭-২১) আর-একটি হিসাবে দেখা যায় ঐ সময়ে সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত মোট বাংলা বইয়ের সংখ্যা :

	মুদ্রিত বইয়ের সংখ্যা		মুদ্রিত কপির সংখ্যা
সোসাইটির নিজের ছাপা—	বাংলা—	১৬	৪৮,৭৫০
	ইংরেজি-বাংলা—	৩	২,৮০০
সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায়	বাংলা—	৩	৩১,০০০
শ্রীরামপুর মিশন বা অন্যত্র ছাপা—	ইংরেজি-বাংলা—	১	১৫,০০০
		মোট : ২৩	মোট : ৯৭, ৫৫০

এ ছাড়া ঐ সময় (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮২১ তারিখে) প্রেসে ছাপা চলছিল ৭টি বাংলা বই (ম্যাপ সহ), যাদের মোট মুদ্রিত কপির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮,৫২৫, এবং আরো ৫টি বাংলা বইয়ের ৮৫০০ কপি মুদ্রণের অপেক্ষায় ছিল।[২] সোসাইটি যে কেবল এই বিপুল সংখ্যক বাংলা বই ছেপেছিলেন তা নয়, তার প্রচারেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৮২১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সোসাইটি তাঁদের প্রকাশিত বাংলা বইয়ের মোট ৪৯,০২৮টি কপি[৩] বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিতরণ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির Book distribution বা পুস্তক পরিবেশন-প্রচার-বিক্রয়-বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিক রীতিসম্মত সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালের বাংলা পুস্তক-ব্যবসায়ের সূত্রপাত সেখান থেকেই। কলকাতায় তাঁদের একটি কেন্দ্রীয় পুস্তক-ভাণ্ডার ছিল ১১২নং বৈঠকখানায়। সেখান থেকেই সমস্ত বইয়ের বিলি-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হত। ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির অনুমোদিত সমস্ত দেশীয় বিদ্যালয়েই স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত বাংলা পাঠ্যপুস্তকাদি পাঠানো হত। ২৯শে আগস্ট ১৮১৯ তারিখে লেখা ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির অন্যতম সম্পাদক W. H. Pearce-এর একটি চিঠি[৪] থেকে জানা যায়, ঐ সময় তাঁরা বিদ্যালয়-প্রশাসনের সুবিধার্থে কলকাতাকে চারটি জেলায় ভাগ করেন : দুর্গাচরণ দত্তের তত্ত্বাবধানে প্রথম জেলায় ছিল ৩০টি দেশীয় বিদ্যালয়ের অধীনে ৮৮৫ জন ছাত্র ; রামচন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় জেলায় ৪৩টি দেশীয় বিদ্যালয়ের অধীন ৮৯৬ জন ছাত্র ; উমানন্দন ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে তৃতীয় জেলায় ৩৬টি দেশীয় বিদ্যালয়ের অধীন ৫৭৪ জন ছাত্র ; এবং রাধাকান্ত দেবের তত্ত্বাবধানে চতুর্থ জেলায় ৫৭টি দেশীয়

১ N. L. Basak, *ibid.*

২ ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির ৪র্থ বার্ষিক কার্যবিবরণী (১৮২০-২১) থেকে সংকলিত।

৩ N. L. Basak, *op. cit.*

৪ ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির ২য় বার্ষিক কার্যবিবরণীর (১৮১৯) পরিশিষ্টে সংযোজিত।

বিদ্যালয়ের অধীন ১১৩১ জন ছাত্র। কেন্দ্রীয় পুস্তক-ভাণ্ডার থেকে প্রতি তত্ত্বাবধায়কের বাড়িতে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক পাঠানো হত। সেখান থেকে কলকাতার ঐ মোট ১৬৬টি দেশীয় বিদ্যালয়ের ৩৪৮৬ জন ছাত্রের হাতে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির পুস্তকাদি পৌঁছে দেওয়া হত। কলকাতার ঐ চারটি শাখা-বিতরণকেন্দ্রে বই দেওয়া-নেওয়ার জন্য সোসাইটির ছুজন নিজস্ব হরকরাও নিযুক্ত ছিল। সর্বোপরি, সমগ্র পুস্তক প্রচার-বিতরণ ব্যবস্থা সোসাইটির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এ ছাড়া সরাসরি জনসাধারণের কাছে বিক্রয়ের জন্য কলকাতায় বই বিক্রয়কেন্দ্রও খোলা হয়েছিল। ১৮২৪-২৫ সালের মধ্যে সোসাইটি কলকাতার দেশীয় পুস্তক-বিক্রেতাদের মারফত কমিশনে তাঁদের বই বিক্রয়ের ব্যবস্থা চালু করেন।[১] এ ছাড়া দেশীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজি বই প্রচারের সুবিধার্থে সোসাইটির উদ্যোগে ১৮২৭-২৮ সালে হিন্দুকলেজের কাছে একটি বই বিক্রয়কেন্দ্র খোলা হয়। নামমাত্র খরচের দামে এখানে ছাত্রদের ইংরেজি বই দেওয়া হত, এখানে মাসিক বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ টাকা।[২] বছর দুয়েক পরে ('১৮২৯-৩০ সালে) এই বইয়ের দোকানে ডাকাতি হওয়ার পর তা উঠে যায়। তারপর থেকে শহরের সকল ইউরোপীয় ও দেশীয় বইয়ের দোকানেই সোসাইটির পুস্তকাদি বিক্রয়ার্থে রাখা হত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মূলত বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানের প্রসারের জনহিতকর উদ্দেশ্যেই ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি দেশীয় ভাষায় পুস্তক-প্রকাশনের কাজে ব্রতী হন। বইয়ের ব্যবসায়ে অর্থোপার্জন করার কোনো অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না। সুতরাং যখনই তাঁরা দেখেছেন বইয়ের মুদ্রণ ইত্যাদির ব্যয় কমে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নিজস্ব তদন্তকারী কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রকাশিত বইয়ের দামও কমিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৮৩২ সালে এইভাবে কয়েকটি বইয়ের দাম কমানো হয়:

		পূর্বমূল্য	দাম কমার পর মূল্য
১	ছবিতে বর্ণমালা (*'Picture Alphabet'*):	৬ আনা	৩ আনা
২	পীয়ার্সনের 'কথোপকথন'— ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ক (*'Dialogues'-on Geography & oths*):	১টা. ৪আনা	১৩ আনা
৩	নীতিকথা, ৩য় ভাগ:	৪ আনা	২আ. ৯পা.

১ ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, ৬ষ্ঠ বার্ষিক কার্যবিবরণী, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৫।

২ ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, ৭ম বার্ষিক কার্যবিবরণী, ৫ মার্চ ১৮২৮।

৯ম বার্ষিক কার্যবিবরণী থেকে জানা যায়, সোসাইটি বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে অর্ধেক খরচের দামে বই সরবরাহ করতেন। ১৮৩২ সালে মূল্য সংশোধনের পর, তাঁরা খরচের মাত্র ২০ শতাংশ মূল্যে বই সরবরাহ করেছেন ; যদিও তাতে তাঁদের নিঃসন্দেহে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে।[১] তার কারণ, আগেই বলেছি, অর্থোপার্জন তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, মানব কল্যাণার্থে বিদ্যাচর্চার প্রসারই তাঁদের লক্ষ্য।

ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশে উদ্যোগী হওয়ায় নিঃসন্দেহে বাংলা মুদ্রণের ক্ষেত্র বহুধাবিস্তৃত হয়। তাঁদের প্রচেষ্টায় বাংলা মুদ্রিত পুস্তকের ভাণ্ডার সংখ্যা ও বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা মুদ্রণের সুযোগ সুবিধা এবং মানও উন্নত হয়। বাংলা বইয়ের ব্যবসাও প্রসারিত হয়।

এই মুদ্রণ-প্রকাশনের কাজে সোসাইটি নিজের ছাপাখানা বসিয়েছে, সেখানে নিজেরাই বই ছেপেছে। আবার, সোসাইটি তাঁদের প্রকাশিত অনেক বই অন্য প্রেস থেকেও ছাপিয়ে নিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্যের উদ্যোগে রচিত ও মুদ্রিত বই সোসাইটির সমর্থনে, বদান্যতায় বা আর্থিক আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছে। সব মিলিয়ে বাংলা পুস্তক-প্রকাশনার ক্ষেত্রে সোসাইটি এক নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত করেছিল। বাংলা মুদ্রণের বিস্তার পর্বে এখানেই সোসাইটির বৈশিষ্ট্য।

কলকাতায় সোসাইটি যে তার নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেছিল, দেখা যায়, ১৮২৫ সালে তা সার্কুলার রোডে চালু রয়েছে। ১২নং সার্কুলার রোডে তখন তাঁদের অফিস। সোসাইটির কিছু কিছু বই তাঁদের নিজস্ব প্রেসে ছাপা। যেমন পীয়ার্সনের 'বাক্যাবলী', ২য় সংস্করণ (১৮২৫) ১৫০০ কপি সোসাইটির প্রেসে ছাপা, যদিও এর ১ম সংস্করণ গ্রন্থকার নিজেই ছেপেছিলেন এবং সোসাইটি তার ৮০০ কপি কিনে নিয়েছিলেন ; উইলিয়ম ইয়েটস্ অনূদিত 'জ্যোতির্বিদ্যা' (১৮৩৩) সোসাইটির প্রেসে ছাপা ও তাঁদের সার্কুলার রোডস্থিত পুস্তক-ভাণ্ডার ('depository') থেকে বিক্রয় করা হয় ; লসনের 'পশ্বাবলী' (১৮২৮) সোসাইটির নিজস্ব প্রেসে ছাপা। তবে প্রথমদিকে তাঁদের প্রকাশিত অধিকাংশ বই শ্রীরামপুর ও কলকাতার বিভিন্ন প্রেসে ছাপানো হয়। যেমন, রাধাকান্ত দেব-তারিণীচরণ মিত্র-রামকমল সেন সংকলিত ও অনূদিত 'নীতিকথা', ১ম ভাগ (১৮১৮) বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় ছাপা ; পীয়ার্সন-মে-হারলে সংকলিত ও অনূদিত 'নীতিকথা', ২য় ভাগ (১৮১৮) ইউস্টেস কেরী ও ইয়েটস্-এর তত্ত্বাবধানে কলকাতায় মিশন প্রেসে ছাপা। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির এইরূপ আরো কিছু কিছু বইয়ের মুদ্রাকর ছিলেন : কলকাতার মিশন প্রেস : মে-র 'গণিত' (২য় সং, ১৮১৯) ; তারাচাঁদ দত্তের 'মনোরঞ্জনেতিহাস' (১৮১৯)। চুঁচুড়ার স্কুল প্রেস : হারলে-র 'গণিতাঙ্ক' (১৮১৯) ; পীয়ার্সনের 'পাঠশালার বিবরণ' (১৮১৯) ; জেমস

[১] N. L. Basak, *op. cit.*

স্টুয়ার্টের '*Elementary Bengali Tables*' (অক্টেভো সংস্করণ, ১৮১৯) ; পীয়ার্সনের '*Introductory Bengali Tables*' (২য় সং, ১৮১৯)। বিশ্বনাথ দেবের প্রেস : রাধাকান্ত দেবের '*Bengali Spelling Book*' (১৮১৮)। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস : রামকমল সেনের 'হিতোপদেশ' বা 'নীতিকথা', ৩য় ভাগ (১৮২০) ; জেমস স্টুয়ার্টের '*Elementary Bengali Tables*' (ফোলিও সংস্করণ, ১৮১৮) ; ফেলিক্স কেরীর 'ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' (১৮২০)। এ ছাড়া সমসাময়িককালের আরো কিছু কিছু বই মুদ্রিত হবার পর সোসাইটির আর্থিক আনুকূল্যে প্রচারিত হয়েছিল। যেমন, রামচন্দ্র শর্মার বাংলা 'অভিধান' (১৮১৮) সোসাইটি প্রথম বছর ২০০ কপি (প্রতি কপি এক টাকা মূল্যে) ও দ্বিতীয় বছর আরো ২০০ কপি কিনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করেন। সোসাইটির অনুমোদনক্রমে এর পরিবর্ধিত ও উন্নত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে তাঁরা ৪০০০ কপি কিনে নেন। ব্রজমোহন মজুমদার, মহেশচন্দ্র পালিত ও হরচন্দ্র পালিত অনূদিত ফার্গুসনের '*Introduction to Astronomy*' সোসাইটির আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। এর ১০০ কপির জন্য (প্রতি কপি ৪ টাকা হারে) অগ্রিম চাঁদা দিয়ে তাঁরা এর প্রকাশনায় আনুকূল্য করেন। রেভা. কীথের বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হবার পর সোসাইটি দেশীয় বিদ্যালয়ে প্রচারার্থে ৫০০ কপি কিনে নেন।

আসলে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি তৎকালীন বাংলা বইয়ের সর্ববৃহৎ মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে মোটামুটি এই ধরনের একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছিলেন যাতে সোসাইটির পক্ষে উপযোগী মিশনের বাংলা প্রকাশনাগুলি তাঁরা সহজেই এবং সুলভে পেতে পারেন। এজন্য অগ্রিম আর্থিক ব্যবস্থাও তাঁরা করে নিয়েছিলেন। সোসাইটির প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণীতে (জুলাই ১৮১৮) বিষয়টির স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় : 'A friendly undertaking has been established with the Missionaries of Serampore, tending to secure a copious supply on moderate terms of such of the Serampore publications as come within the Society's province, either by bespeaking a share in the edition of a work before it is printed, or by obtaining, after publication, the number of copies wanted.'[১] তাঁদের এই পারস্পরিক বোঝাপড়ার ফল হিসাবে 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকা থেকে শুরু করে মিশনের আরো অনেক বাংলা প্রকাশনা সোসাইটির মারফত দেশীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অন্যান্য বাঙালী পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। ফলে বাংলা বইয়ের কদর যেমন বাড়ে, সামগ্রিকভাবে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহযোগিতার ফলে বাংলা মুদ্রণ-

১ Calcutta School Book Society's 1st Report : July 1818.

প্রকাশনের ক্ষেত্রে যে বিকাশ পর্ব সূচীত হয়েছিল তা ইতিপূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। এরপরে কিছুকাল শ্রীরামপুর মিশনে ভাঁটার টান এসেছিল। পুনশ্চ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষাশেষি পৌঁছে মিশনে কর্মচাঞ্চল্য ফিরে আসে। তখন এই পুনরুজ্জীবিত শ্রীরামপুর মিশন ও ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের ইতিহাসে দেখা দিল বিস্তার পর্ব।

১৮১৮ সালের একটি হিসাবে দেখা যায়, স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে রেভা. মে ও স্টুয়ার্টের পরিচালনাধীন দেশীয় বিদ্যালয়সমূহের জন্য শ্রীরামপুর মিশনের নিম্নলিখিত বিচিত্র বিষয়ক বাংলা প্রকাশনগুলি কেনা হয় (প্রতিটি প্রকাশনার পাশে ক্রীত কপির সংখ্যা উল্লেখ করা হল) :

দিগ্‌দর্শন, ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা—প্রতি সংখ্যা ১০০০ কপি, গণিত—১২৭, লিপি-ধারা—১২৪, শুভঙ্কর-কৃত আর্য্যা—৪৭৫, জমিদারী হিসাব—২৩১, বর্ণমালা—২০, বাংলা বানান (or Syllabic Tables/সরল বর্ণ)—২০, ফলা/যুক্তাক্ষর—৪০, আকুয়াল/চুক্তিপত্র, ইত্যাদি (Agreement/Bonds)—৭৫, ধাতুজাত শব্দ (সংস্কৃত মূল)—২০, জমাবন্দী (Settlement Papers)—৭৫, হিতোপদেশ—৫০, শাস্ত্রপদ্ধতি (পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা : account of learned authors)—১৫৫, জ্যোতিষ—৫০, ভূগোল—৪, তলববাকী (Papers for arrears of rent)—৫৪, গুরুশিষ্য (কথোপকথন)—৭, গোলাধ্যায়—১০০।

[Calcutta School Book Society's 1st Report : July 1818]

স্কুল বুক সোসাইটি যে কেবলমাত্র মিশনের নিজস্ব পরিকল্পনাধীন সাধারণভাবে ছাপা বইগুলিই কিনতেন তা নয়, তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী মিশন আবার নতুনভাবে ও বিশেষ-ভাবে কিছু কিছু বই ছেপে দিতেন। যেমন, দ্বিতীয় বছরে সোসাইটি মিশনের কাছ থেকে 'দিগ্‌দর্শন' : ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা (১০০০ কপি করে) ও ৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা (২০০০ কপি করে) কিনে নেবার পর, সোসাইটির বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী মিশন আবার 'দিগ্‌দর্শন', দ্বিতীয় সংস্করণ : ১ থেকে ১৫ সংখ্যা সুলভ মূল্যে (প্রতি সংখ্যা ৩৫০০ কপি, ৩৫০ টাকা মূল্যে) ও আরো উন্নতধরণের হরফ খোদাই করে ছেপে দেবার ব্যবস্থা করেন।[১] বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনার ইতিহাসে এই যৌথ উদ্যোগ যেমন গতিবেগ সঞ্চার করেছে, তেমনই মুদ্রণের মানকেও উন্নত করতে সহায়তা করেছে।

বাংলা মুদ্রণের উন্নতিকল্পে স্কুল বুক সোসাইটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা

বাংলা মুদ্রণের মনোন্নয়নে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। দেশীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন নতুন বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা, মুদ্রণ, প্রকাশনা

---

১ Calcutta School Book Soceity, 2nd Report : 21 Sept. 1819.

ও পরিবেশনার ব্যবস্থা করা ছাড়াও, বাংলা মুদ্রণের ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপূর্ণতা বা দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি রেখে সামগ্রিকভাবে এর উন্নতির জন্য তাঁরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির ভূমিকা তাই বিশেষভাবে স্মরণীয়।

সোসাইটির কাছে বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার মূল লক্ষ্যের সঙ্গে বাংলা মুদ্রণের সামগ্রিক উন্নতি বিধানের লক্ষ্যও যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এ কথা তাঁদের দ্বিতীয় বার্ষিক (১৮১৮-১৮১৯) কার্যবিবরণীতে খুব স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হয়: 'Your Committee take this occasion to observe that the more general introduction and improvement of the arts of printing, engraving in all its branches, and the humbler, though very useful art of type-cutting, are objects which naturally fall within the province of this Society, not merely as collateral but as subsidiary to its main design. Those objects have already occupied their attention ; and hopes may be entertained of their rapid attainment, should the continuance and enlargement of the public liberality give to this Society ample means and extended influence.'[১]

বাস্তব কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সোসাইটি তাঁদের এই বিঘোষিত লক্ষ্যের প্রতি যথোচিত মর্যাদা দেখাতে পেরেছিলেন। বাংলা মুদ্রণের নানা বৈশিষ্ট্য তাঁদের প্রকাশনায় লক্ষ্য করা যায়। বাংলা হরফের নানা উন্নতি ও সংস্কার, যতিচিহ্নের বিচিত্র ব্যবহার, বাংলায় ইংরেজি মুদ্রণ-পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা, ধাতু ফলকের উপর খোদাইকরা ব্লক মুদ্রণ, বাংলা মানচিত্র মুদ্রণ, ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁরা বাংলা মুদ্রণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এর ফলে বাংলা মুদ্রণের ক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত হতে পেরেছিল।

বাংলা মুদ্রণের সংস্কার ও উন্নতিকল্পে সোসাইটির বিভিন্ন প্রয়াসকে মোটামুটি তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা চলে। প্রথমত, বাংলায় ইংরেজি প্রথানুযায়ী যতিচিহ্নের ব্যবহার। দ্বিতীয়ত, বক্তব্যের গুরুত্বের মান অনুযায়ী বাংলা হরফে বিভিন্ন ধাঁচ ও বিভিন্ন মাত্রা প্রবর্তন: সরল ও বক্র মাত্রার ব্যবহার। তৃতীয়ত, বাংলা মুদ্রণে তামার বা অন্য ধাতু ফলকের উপর খোদাই করা ব্লকের প্রবর্তন: বাংলা গ্রন্থে ছবি, নক্শা, মানচিত্র ও বাংলা আদর্শলিপি মুদ্রণ।

প্রথম প্রয়াস: সোসাইটি দেশীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী নবপর্যায়ে এক উন্নত ধরনের *Instructive Copy Book* ছাপার পরিকল্পনা করেন। এই নতুন ধরণের 'কপি' বইগুলি যেমন ছাত্রদের হাতের লেখা অভ্যাসের জন্য সাদা বা ফাঁকা জায়গা বা অমুদ্রিত পৃষ্ঠা সংযোজন করে ব্যবহার করা হত, তেমনি একই সঙ্গে এই বইগুলি বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্য

১ *Ibid.*

হিসাবেও ব্যবহৃত হত। সোসাইটির অনুরোধে ডব্‌লু এইচ. পীয়ার্স ও ইউস্টেস কেরী এই নবপর্যায় 'কপি বুকে'র প্রথম বই 'ভূগোল বৃত্তান্ত' (১৮১৯) প্রকাশ করেন। এর প্রথম বিষয় ছিল— এশিয়ার ভূগোল। ঐ ভূগোল বৃত্তান্তের পাঠগুলি মুদ্রণে অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। এর মুদ্রাক্ষর সাজানোর পদ্ধতি (composing) ছিল আধুনিক ধরনের। তবে এর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল, বাংলায় ইংরেজি প্রথানুযায়ী যতিচিহ্নের ব্যবহার। এখানে কমা, সেমিকোলন, ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণচ্ছেদে দাঁড়ির (।) পরিবর্তে ফুলস্টপ (.) ব্যবহার করা হয়েছে। ভাষার নমুনা হিসাবে 'ভূগোল বৃত্তান্ত' থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

২ পাঠ.

পৃথিবীর জল ও স্থলের বিবরণ.

পৃথিবীর চতুর্দ্দিক জল ও স্থল দ্বারা নিৰ্ম্মিত হইয়াছে ; ঐ পৃথিবীকে ত্রিধা বিভক্ত করিলে, দুই ভাগ জল এক ভাগ স্থল পাওয়া যায় ; তাহার মহাসাগরস্থ সকল জল লবণ মিশ্রিত'.[১]
এখানে ফুলস্টপের অভিনব ব্যবহার লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় প্রয়াস : বাংলা মুদ্রণের উন্নতিকল্পে সোসাইটির পরবর্তী পরিকল্পনা ছিল আরো দুঃসাহসিক, অভিনব, চিন্তাপ্রসূত। আজও এর উপযোগিতা কিছুমাত্র কমেনি, বরং সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শ (standard) প্রথা হিসাবে এর প্রবর্তন করা যায় কিনা ভাববার কথা। স্কুল বুক সোসাইটি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে উদ্যোগী হয়ে সর্বদাই মনে করতেন, বাংলা ছাপার হরফের আদর্শ ও মান এমন হওয়া উচিত যা সর্বত্র সকল শিক্ষকের কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে, দ্বিতীয়ত ছাপার হরফ যথাসম্ভব আদর্শ (standard) হাতের লেখার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। দেখা গেছে মুদ্রিত বাংলা বইয়ের আগে সাধারণ্যে যে পুঁথির প্রচলন ছিল তাতে সোজা রেখার খাড়া অক্ষরের বদলে বাংলা অক্ষরগুলো হত বেশিরভাগ বাঁকা রেখায় টানা টানা। ছাপা হরফের সোজা মাত্রার (সরল রেখার মাত্রা) বদলে পুঁথির অক্ষরের মাত্রাও ছিল বাঁকা রেখায়। সুতরাং সাধারণ বাঙালী তাঁদের পুঁথির সঙ্গে পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে ছাপা বইয়েও বাঁকা রেখায় টানা অক্ষর ও বাঁকা মাত্রা বেশি পছন্দ করবেন বলে সোসাইটির ধারণা হয়েছিল। তাই তাঁরা বাংলা মুদ্রাক্ষরের সংস্কার সাধন করে বক্ররেখা ও বক্রমাত্রা (বা তরঙ্গায়িত মাত্রা) সম্বলিত টানা ছাপার হরফ প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তা ছাড়া এই প্রথায় তাঁরা একটা জটিল সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। বক্রমাত্রার (বা তরঙ্গায়িত মাত্রার) হরফের সঙ্গে কিছু কিছু প্রচলিত সোজা মাত্রা (বা সরল রেখার মাত্রা) সম্বলিত হরফের ব্যবহারও তাঁরা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। এই শেষোক্ত হরফগুলি মূল ছাপা অংশের মধ্যে কেবলমাত্র উদ্ধৃতি, নাম বা অপেক্ষাকৃত

১ ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক (১৮১৮-১৯) কার্যবিবরণীর পরিশিষ্টে এই অংশটি মুদ্রিত হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ কোনো বক্তব্য ছাপার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, যাতে হরফের তারতম্যের ফলে তা সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। মূলত এই শেষোক্ত সোজা মাত্রার বাংলা হরফ ইংরেজি অক্ষরের ক্যাপিটাল বা ইটালিক্স্ যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তা সাধন করতে পারবে। বাংলায় ইংরেজির মতো ক্যাপিটাল, ইটালিক্স্ প্রভৃতি বিভিন্ন ধাঁচের বা আকারের মুদ্রাক্ষরের দীর্ঘকালব্যাপী যে অভাব তা এইভাবে দূর করা যেতে পারে বলে স্কুল বুক সোসাইটি প্রস্তাব করেন। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির Recording Secretary Capt. Irvine ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রীরামপুর মিশনের ডঃ মার্শম্যানকে লেখা একটি চিঠিতে বাংলা মুদ্রাক্ষরের এই প্রস্তাবিত সংস্কার ও উন্নতির কথা উল্লেখ করে লেখেন: '...While the curvilinear type may form the body of works, just as the upright Roman does with us, the rectilinear may be retained for quotations, emphatical words and clauses, in short whatever purpose is answered by the use of Italicks. With this and other improvements, the Bengalee type will be more on a par with the Roman than hitherto'.[১] এ ছাড়া, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির Corresponding Secretery, E. S. Montagu-ও বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের গুরুত্বের বিভিন্নতা অনুযায়ী তাকে প্রকাশের উপযোগী বিভিন্ন প্রকার বাংলা হরফের অভাবজনিত বাংলা মুদ্রণের সমস্যাদির কথা ও তার সমাধানের উপায় স্বরূপ বাংলা হরফের মাত্রার বিভিন্নতাসাধনের কথা অন্যত্র আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন: 'To students in Bengalee it is well known, there are no artificial helps in the characters of the language by which proper names, quotations, or peculiarities of expression or thought can be marked so as readily to catch the eye, and many have witnessed the difficulty into which the Natives are thrown, in perusing any matter which may accidentally contain particular names, etc. which, if designated as such, would have saved the trouble of endeavouring to consider their meaning as appellatives. The nature also of the Bengalee type does not readily admit of Capitals, though this is by no means impracticable...By the varied use of the curvilinear and rectilinear type together, it is obvious the whole effect produced by Roman and Italic in the English character, may be attained in the Bengalee, the contrast between the two kinds of matro

১ **Report of the Calcutta School Book Society's Proceedings. Vol. I: 2nd Report for the Year 1818-19: Appendix: No. X.**

or running line at the head of the letters as readily catching the eye. The application of this improvement to maps, etc. is available to a greater extent'.[১]

বাংলা মুদ্রাক্ষরের এই প্রস্তাবিত সংস্কারকে রূপদান করেন কলকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের অধ্যক্ষ (Superintendent) ডব্লু. এইচ. পীয়ার্স। সোজা মাত্রা ও বাঁকা মাত্রার এই সব বাংলা হরফের ছাঁচ, ইত্যাদি তৈরির জন্য ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি তাঁকে ৮০০ টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন। আসলে বাংলা মুদ্রণের সমস্যাদি সমাধানের অন্যতম সূত্র হিসাবে সোসাইটির অনুরোধক্রমে পীয়ার্স-ই মূল পরিকল্পনাটি রচনা করেন এবং সেই অনুযায়ী হরফ তৈরি করে নমুনা স্বরূপ কিছু কিছু বাংলা গদ্যাংশ ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে ছেপে প্রকাশ করেন। সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিবেদনটি (১১. ১০. ১৮২০) যখন ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে ছাপা হয় তখন তার পরিশিষ্টে কয়েকজন দেশীয়ের লেখা একটি বাংলা বিবৃতি প্রস্তাবিত নতুন হরফে ছাপা হয়। আলোচ্য বাংলা গদ্যাংশটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এটি তৎকালীন ১৮ জন ব্রাহ্মণ ও ১১ জন কায়স্থ কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি। এই বিবৃতি থেকে জানা যায় যে সমসাময়িককালে প্রকাশিত বাঙালীদের লেখা কিছু কিছু বাংলা বইয়ে যে অশ্লীলতার নিদর্শন দেখা যায় সমাজের পক্ষে তা বিশেষ ক্ষতিকারক বলে তাঁরা মনে করেন এবং ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত বাংলা বইগুলিকে জনসাধারণের জ্ঞানোন্মেষণের পক্ষে পরম সহায়ক বলে তাঁরা অভিনন্দিত করেন।

মুদ্রিত বিবৃতিটির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

'এবং এতদ্দেশীয় পণ্ডিত কর্তৃক শুদ্ধীকৃত মুদ্রিত পুস্তকও প্রচলিত ছিল না যে তন্মুদ্রিত পুস্তক বর্ণানুসারে তাহারা শুদ্ধ লিখনাদিতে ক্ষমতাপন্ন হয়েন। পরে শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডীয় লোকেরা মুদ্রিত পুস্তকের প্রচার করিলে ও এতদ্দেশীয়েরা তৎপথপ্রজ্ঞ হইয়া কামসংবর্দ্ধক নানাবিধ রতিমঞ্জরী বিদ্যাসুন্দর কামশাস্ত্র প্রচার করিয়া বালকেরদিগের মনশ্চাঞ্চল্য করিয়া কুপথ দৃষ্টিই বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

'এইক্ষণে লোকনিকরাশেষ হিতার্থি শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডীয় ও শ্রীযুক্ত বাঙ্গালি লোক কর্তৃক বঙ্গ দেশস্থ দুস্থ বালকেরদিগের জ্ঞানোদয়ার্থে অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক জনমনোমহান্ধকার নিকরোৎসারণ কারণাখণ্ড প্রতাপান্বিত মার্ত্তণ্ড প্রতিবিম্ব স্কুল বুক সোসাইটি নামক এক সমাজোদিত হইয়াছেন তাহার প্রখরতর কর নিকর স্বরূপ যে ভূগোল বৃত্তান্ত ও দিগ্‌দর্শন ও অভিধান ইত্যাদি নানাবিধ মহোপকার জনক শুদ্ধ পুস্তক তদ্দ্বারা লোক সমূহের অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হইয়া ক্রমে ২ জ্ঞানোদয়ের উপক্রম হইতেছে অতএব বঙ্গ দেশস্থ লোকেরা স্কুল বুক

১ Calcutta School Book Society, 3rd Report (1819-20) : Appendix No. II, p. 59.

সোসাইটির উপকার বার ২ স্বীকার করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন যে স্কুল বুক সোসাইটি এইরূপে আমারদিগের জ্ঞান প্রদান করুন।'[১]

প্রস্তাবিত নতুন বাংলা হরফে উপরোক্ত বিবৃতিটি ছাপা হয়েছে। নব-পরিকল্পিত বাংলা মুদ্রণের নমুনা স্বরূপ এর কিছু অংশের প্রতিলিপি এখানে সংযোজিত হল। এর মধ্যে দেশ, জাতি, সংস্থা বা বিভিন্ন গ্রন্থের যে সব নাম আছে, যেমন, 'ইংলণ্ডীয়', 'বাঙ্গালি', 'বঙ্গ', 'স্কুল বুক সোসাইটি', 'রতিমঞ্জরী', 'বিদ্যাসুন্দর', 'কামশাস্ত্র' 'ভূগোল বৃত্তান্ত', 'দিগ্‌দর্শন' ও 'অভিধান'— এইগুলি সোজা মাত্রার হরফে ছাপা ও বাকি অংশ বাঁকা মাত্রার হরফে ছাপা। ঐ নামগুলির উপর জোর দেওয়া লেখকের অভিপ্রেত, তাই ঐগুলি ভিন্ন চেহারার হরফে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

এইরূপে লোকনিকরাশেষ হিতার্থি শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডীয় ও
শ্রীযুক্ত বাঙ্গালি লোক কর্ত্তৃক বঙ্গ দেশস্থ দুস্থ বালকেরদি-
গের জ্ঞানোদয়ার্থে অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক জনমনোমহান্ধ
কার নিকরোৎসারণ কারণাখণ্ড প্রতাপান্বিত মার্ত্তণ্ড প্রতি-
ম স্কুলবুক সোসাইটি নামক এক সমাজোদিত হইয়াছেন
তাহার প্রখরতর কর নিকর স্বরূপ যে ভূগোল বৃত্তান্ত ও
দিগ্দর্শন ও অভিধান ইত্যাদি নানাবিধ মহোপকার জনক
শুভ পুস্তক তদ্দ্বারা লোক সমূহের অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হইয়া
ক্রমেং জ্ঞানোদয়ের উপক্রম হইতেছে অতএব বঙ্গ দেশস্থ
লোকেরা স্কুলবুক সোসাইটির উপকার বারং স্বীকার করিয়া
প্রার্থনা করিতেছেন যে স্কুলবুক সোসাইটি এই রূপে আমার
দিগের জ্ঞান প্রদান করুন। *.*

ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে সোজা মাত্রা ও বাঁকা মাত্রার হরফে ছাপার নমুনা

সমসাময়িককালের কিছু কিছু বাংলা প্রকাশনায় এই তরঙ্গায়িত বা বাঁকা মাত্রার হরফে ছাপা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'সমাচারচন্দ্রিকা' পত্রিকার শিরোনাম ও পত্রিকার শিরোভাগে মুদ্রিত শ্লোকটি বাঁকা মাত্রার হরফে ছাপা।

---

১ *Ibid*, pp. 49-50.

স্কুল বুক সোসাইটির প্রস্তাবিত হরফ সংস্কার শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাংলা মুদ্রণে স্থায়ী হতে পারেনি। তবুও আজ নতুন করে ভাববার সময় এসেছে, ইংরেজি ইটালিক্সের কায়দায় বাঁকা মাত্রার বাংলা হরফে করা সম্ভব কিনা।

তৃতীয় প্রয়াস : বাংলা মুদ্রণের মনোন্নয়নকল্পে সোসাইটির তৃতীয় উল্লেখযোগ্য প্রয়াস ছিল ধাতুফলক, বিশেষ করে তামার ফলকের উপর খোদাই করা ব্লক মুদ্রণের প্রবর্তন। সোসাইটির উদ্যোগে বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থ এই ব্লকের সাহায্যে নতুন চিত্রসম্ভারে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। সোসাইটির কার্যনির্বাহক সমিতির জনৈক সদস্য গর্ডন কর্তৃক সংশোধিত Joyce-এর '*Dialogues on Mechanics and Astronomy*' (1818-19) নামক ইংরেজি গ্রন্থে এইরূপ তাম্রফলকের ছবি ছাপা হয়েছিল। কাশীনাথ মিস্ত্রী নামক জনৈক দেশীয় শিল্পী এই ধরনের তাম্রফলকের উপর খোদাইয়ের কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। বাংলা মুদ্রণশিল্পে দেশীয়দের অগ্রগতির এটি এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। সোসাইটির উদ্যোগে (১৮১৮-১৯) তাম্রফলকে খোদাই করা ব্লক মুদ্রণের আরো এক অভিনব প্রয়োগ দেখা যায়। সোসাইটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙালী খোশনবীস ('Bengalee Writing Master') কালীকুমার রায়ের হস্তাক্ষর ছটি তাম্রফলকে খোদাই করে আদর্শ বাংলা হস্তলিপির নমুনা ছেপে বাঙালী ছাত্রমহলে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করেছিলেন।[১] সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সোসাইটির উদ্যোগে ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় পৃথিবীর মানচিত্র ১০০০ কপি ছাপা হয়। প্রতি ডজন এই মানচিত্রের মূল্য ছিল এক টাকা। জনৈক বাঙালী শিল্পী ধাতুফলকের উপর এই মানচিত্র নিপুণ হস্তে খোদাই করেন। বাংলায় মুদ্রিত মানচিত্রের প্রকাশ এই প্রথম। নিঃসন্দেহে এই প্রকাশন বাংলা মুদ্রণের মানকে বিশেষভাবে উন্নীত করেছিল। পীয়ার্সের ও পীয়ার্সনের ভূগোলে এই মানচিত্র সংযোজিত করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেরীর অনুপ্রেরণায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত প্রথম পর্বের বাংলা বইয়ের লেখকবৃন্দের সবাই ছিলেন বাঙালী। অপর পক্ষে, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে বক্ষ্যমাণ 'বিস্তার পর্বে' প্রকাশিত বাংলা পাঠ্য পুস্তকের লেখকবৃন্দের মধ্যে দেশী ও বিদেশী উভয়েই আছেন। দেখা যায়, দুই দশকের ব্যবধানে অনেক বিদেশীই, যাঁদের বেশির ভাগ ছিলেন খ্রীস্টান মিশনারী সম্প্রদায়ভুক্ত, বাংলা ভাষা ভালোই আয়ত্ত করেছিলেন। বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাচর্চার অগ্রগতির এটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের অধিকাংশ ছিল বিদেশী বইয়ের বাংলা অনুবাদ। দেশীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাতৃভাষা ও ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে 'useful knowledge'

---

১ Calcutta School Book Society, 2nd Report (1818-19).

বা ব্যবহারিক জ্ঞান বিতরণ ছিল ঐ সব প্রকাশনার উদ্দেশ্য। শিক্ষক-ছাত্র-পাঠকমহলে ঐ সব বই সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে একাধিক সংস্করণ প্রকাশ সোসাইটির পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন পরিকল্পনার সাফল্যের সাক্ষ্য বহন করে।

সোসাইটির উদ্যোগে (বা তাঁদের আর্থিক আনুকূল্যে) বক্ষ্যমাণ 'বিস্তার পর্বে' প্রকাশিত ঐ সব বইয়ের বিশিষ্ট দেশী বিদেশী লেখকবৃন্দ ও তাঁদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বাংলা বইয়ের একটি তালিকা প্রণয়ণ করলে এইরূপ দাঁড়ায় :

বিদেশী গ্রন্থকার

১ রেভা. রবার্ট মে : গণিত, ১৮১৮

২ রেভা. জে. হারলে : গণিতাঙ্ক (*Arithmetic*), ১৮১৯

৩ জে. ডি. পীয়ার্সন : নীতিকথা (২য় ভাগ), ১৮১৮ [পীয়ার্সন-মে-হারলে]
বর্ণমালা (*Introductory Bengalee Tables*), ১৮১৮-১৯
পাঠশালার বিবরণ (Dr. Bell's *School Master's Manual of Instructions*), ১৮১৯
পত্রকৌমুদী (*Book of Letters*), ১৮২০ [পীয়ার্সন-হারলে] বাক্যাবলী (*Idiomatic Exercises*), ১৮২০ ; ২য় সং ১৮২৫
প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়, ১৮৩০ [পীয়ার্সন-ইয়েটস]
ভূগোল এবং জ্যোতিষ···কথোপকথন (*Dialogues on Geography···*), ১৮২৪ ; ২য় সং., ১৮২৭

৪ জেমস স্টুয়ার্ট : বর্ণমালা (*Elementary Bengalee Tables*), ১৮১৮
উপদেশকথা (*Moral Tales of History*), ১৮২০ (৩য় সং)

৫ ডব্লু. এইচ. পীয়ার্স : ভূগোল বৃত্তান্ত (*Instructive copy Book*), ১৮১৯ [পীয়ার্স- ইউস্টেস কেরী]

৬ উইলিয়ম ইয়েটস : পদার্থ বিদ্যাসার (*Elements of Natural Philosophy & Natural History*), ১৮২৫
জ্যোতির্বিদ্যা (*Ferguson's Introduction to Astronomy*), ১৮৩৩

৭ জন লসন : সিংহের বিবরণ (*History of Lion*), ১৮১৯
[পশ্বাবলী, ১৮২৮ (পীয়ার্স অনূদিত)]

৮ ফেলিক্স কেরী : ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়, ১৮২০ [*Goldsmith's History of England.*], বিদ্যাহারাবলী, ১৮২০

৯ রেভা. জেমস কীথ : বঙ্গভাষার ব্যাকরণ, (১ম সং) ১৮২০ ; (২য় সং), ১৮২৫

১০ ডেভিড কারমাইকেল স্মীথ (Smyth) : জমিদারীর হিসাব (*Zumeendaree Account*), ১৮২৩

১১ জন ক্লার্ক মার্শম্যান : জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়, ১৮১৯ (২য় সং)

১২ ডঃ ব্রেটন (Dr. Breton) : ওলাউঠার বিবরণ (*Treatise on cholera*), ১৮২৬

দেশীয় গ্রন্থকার :

১ তারিণীচরণ মিত্র : নীতিকথা (১ম ভাগ), ১৮১৮ [রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের সহযোগে]

২ রাধাকান্ত দেব : বাংলা শিক্ষাগ্রন্থ (*Bengalee Spelling Book*), ১৮২১

৩ রামকমল সেন : নীতিকথা (৩য় ভাগ), ১৮১৯। হিতোপদেশ, ১৮২০

৪ রামমোহন রায় : ভূগোল, ১৮১৮। ১৯ ?। গৌড়ীয় ব্যাকরণ, ১৮৩৩

৫ রামচন্দ্র শর্মা : অভিধান, ১৮১৮

৬ তারাচাঁদ দত্ত : মনোরঞ্জনেতিহাস (*Pleasing Tales*), ১৮১৯

৭ মহেশচন্দ্র পালিত, হরচন্দ্র পালিত, ব্রজমোহন মজুমদার : জ্যোতির্বিদ্যা (*Ferguson's Astronomy*), ১৮১৮।১৯

৮ গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার : স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক, ১৮১৮ ; ২য় সং, ১৮২২

৯ ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় : গ্রীকদেশের ইতিহাস, ১৮৩৩। রোমের ইতিহাস

১০ রামচন্দ্র মিত্র : পশ্বাবলী, ২য় পর্যায় : *History of the Dog*, ১৮৩২।৩৩

১১ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন : পদার্থকৌমুদী, ১৮২১ (ভাষা পরিচ্ছেদ)।

১২ মাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য : ব্যাকরণসার, ১৮২৪

ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত উপরোক্ত গ্রন্থতালিকার প্রতি দৃষ্টি দিলে সহজেই বোঝা যায়, বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা তাঁদের উদ্যোগেই প্রথম ব্যাপকভাবে শুরু হয়। দেশ-বিদেশের ইতিহাস, মানচিত্র-সহ ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, পশুপক্ষীদের ইতিহাস, দেশ-বিদেশের নীতিকথা, পদার্থবিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি, স্ত্রীশিক্ষা, অভিধান, ব্যাকরণ, প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের পাঠশালার ছাত্রদের মুদ্রিত বাংলা অক্ষরের মাধ্যমে পরিচয় ঘটতে থাকে। সোসাইটির ঐ সব বিদ্যালয়পাঠ্য অনূদিত বাংলা বইগুলি বাঙালী শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে প্রথম পাশ্চাত্য জ্ঞানরাজ্যের

বাতায়ন উন্মুক্ত করে দেয়। বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থও বিষয়-বৈচিত্র্য ও বিষয়-গৌরবে বাঙালী পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করে। এখানেই বাংলা মুদ্রণের যথার্থ বিস্তার। বাঙালীর বুদ্ধিমুক্তির সাধনা এই 'বিস্তার পর্ব' থেকেই শুরু।

বাঙালীর বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনে রসদ জোগাবার কাজে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির অবদান তাই অনস্বীকার্য। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত কতিপয় পাঠ্য পুস্তক ছাড়া যখন বাংলা ভাষায় বিদ্যাচর্চার উপযোগী আর খুব বেশি সংখ্যক বাংলা বই পাওয়া যেত না, পাঠ্য পুস্তকের সেই দুর্ভিক্ষের বাজারে যে মহৎ প্রতিশ্রুতি নিয়ে স্কুল বুক সোসাইটির আবির্ভাব, তৎকালীন বুদ্ধিজীবী বাঙালী মাত্রই তাকে পরম সমাদরে অভিনন্দিত করেছিল। সমকালীন কিছু উগ্র ধর্মীয় প্রচারপুস্তিকা বা কিছু অশ্লীল আদিরসাত্মক হাল্কা রচনার ভীড় কাটিয়ে একের পর এক যখন বিশুদ্ধ পাশ্চাত্য জ্ঞানাশ্রিত ইতিহাস-ভূগোল-গণিত-জ্যোতির্বিদ্যা-নীতিকথার বিভিন্ন বই সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত হতে থাকে, তখন থেকেই বাঙালীর মানসমুক্তির লগ্ন ত্বরান্বিত হতে থাকে। সদ্য প্রকাশিত ঐ সব বাংলা পাঠ্যপুস্তকের সহায়তায় বাংলাদেশে প্রথম আধুনিক দেশীয় বিদ্যালয়-শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির উদ্যোগে শহরে গ্রামে বহু পাঠশালা গড়ে উঠতে থাকে এবং ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ডঃ ইয়েটস্‌-এর মতো প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ যোগ্য সম্পাদকের নেতৃত্বে ঐ সব পাঠশালার ক্রমবর্ধমান বাঙালী ছাত্রদের হাতে বিভিন্ন বিষয়ের সময়োপযোগী অভিনব পাঠ্যপুস্তক স্বল্পমূল্যে দ্রুত সরবরাহের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। তার আগে দেশীয় পাঠশালায় গুরুমশায় স্বল্প সংখ্যক পুঁথি থেকে বা তাঁর স্মৃতি থেকে ছাত্রদের শ্রুতিলিখিন দিতেন, তাই লিখে বা হাতের লেখা অভ্যাস করে আর নামতা মুখস্থ করেই ছাত্রদের সন্তুষ্ট থাকতে হত। এখন তারা মাতৃভাষায় ছাপার অক্ষরে অভিনব জ্ঞানের ভাণ্ডার হাতে পেয়ে এক নতুন রাজ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র পেল। এর কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে স্কুল বুক সোসাইটির প্রাপ্য। বাংলাদেশে বিদ্যাচর্চা ও আধুনিক দেশীয় বিদ্যালয় শিক্ষার প্রসার, ক্রমবর্ধমান বাঙালী ছাত্রদের উপযোগী আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-আশ্রিত বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের বহু সংখ্যক বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশন, বাংলা ভাষা-সাহিত্যের বিকাশ ও বাংলা মুদ্রণের বিস্তার— এ সবের মূলেই ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির মহৎ অবদান ও গৌরবময় ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা সাময়িকপত্রের জন্ম ও বিকাশ : বাঙালীর সংস্কার-আন্দোলন ও বুদ্ধিমুক্তির সূচনা

বাংলা মুদ্রণের বিস্তার পর্ব স্থচনার অন্যতম কারণ হিসাবে বাংলা সাময়িকপত্রের অবদান ও গুরুত্বের কথা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বাঙালীর নবজাগৃতির ইতিহাসের পটভূমিকায় বাংলা সাময়িকপত্রের মূল্যায়ন ও তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাময়িকপত্রের জন্ম ও বিকাশের মূল স্থত্রগুলি নির্ধারণের চেষ্টা করা যেতে পারে। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে আগস্ট লর্ড হেষ্টিংস (মার্ক্ ইস অব্ হেষ্টিংস) কর্তৃক সেন্সরের পদ তুলে দিয়ে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠোরতা হ্রাস করায় দেশে সাংবাদিকতার যে অনুকূল পরিবেশ স্মৃষ্ট হয় তার ফলে বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশনে জোয়ার আসে। অবশ্য লর্ড হেষ্টিংসের সেন্সর ব্যবস্থা তুলে দেবার কিছু আগে থেকেই বাংলা ভাষায় একাধিক সাময়িকপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্র 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশিত হওয়ায় বাংলা সাময়িক-পত্রের জন্ম স্থচিত হয়। এর পরবর্তী এক মাস বা তু মাসের মধ্যেই শ্রীরামপুর ও কলকাতা থেকে আরো তুটি বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র— 'সমাচার দর্পণ' ও 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হওয়ায় বাংলা সংবাদপত্রের ধারায় বিশেষ গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। বুদ্ধিজীবী বাঙালী পাঠককুল লুব্ধ আগ্রহে এই সব বাংলা সংবাদপত্রকে প্রথমাবধি গ্রহণ করেছিল এবং এই সাময়িকপত্রাদি পাঠে তারা এক অননুভূত রসাস্বাদনের পরিতৃপ্তি লাভ করে।

বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে বাংলা মুদ্রণের মুক্তির বার্তা ঘোষিত হয়। দ্রুত সংবাদ সংগ্রহ ও সম্পাদন, ততোধিক দ্রুততার সঙ্গে তার মুদ্রণ ও সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকাশন-পরিবেশন অর্থাৎ বিক্রয়-বিতরণ বা নির্দিষ্ট গ্রাহকদের কাছে তা দ্রুত পৌছে দেওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ— এই সবই সংবাদপত্র ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার মুদ্রাকর-প্রকাশকদের অবশ্যকরণীয়। সঙ্গে সঙ্গে আবার পরের সংখ্যা প্রকাশের প্রস্তুতিও চাই। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত প্রকাশ— সাময়িকপত্রাদি প্রকাশনার আরো একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য। মূল কথা, দ্রুতগতি ও সময়ানুবর্তিতা সাময়িকপত্র প্রকাশনার অপরিহার্য অঙ্গ। বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে এ সবই নতুন অভিজ্ঞতা। সাময়িকপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে বাংলা মুদ্রণের পরিচালক-কর্মীর দল নবীন উৎসাহে এইসব অপরিহার্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য-

গুলি ধীরে ধীরে আয়ত্ত করতে শুরু করলেন। ফলে বাংলা মুদ্রণের চরিত্রে এক মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিল। মুদ্রণের সাজ-সরঞ্জাম যেমন বিস্তৃত ও উন্নত হল, তাতে গতিবেগ সঞ্চারেরও চেষ্টা শুরু হল। তখনই দেখা দিল বাংলা মুদ্রণের যথার্থ বিস্তার। অন্য কথায় একেই আমি বলেছি— বাংলা মুদ্রণের মুক্তি।

কিন্তু কেবল মুদ্রণের মুক্তি নয়, সঙ্গে সঙ্গে এল বাঙালীর বুদ্ধিমুক্তির সুযোগ। চিন্তার মুক্তি, চিত্তের মুক্তি। এই সার্বিক মুক্তি-আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে দেখা দিয়েছিল বাংলা সাময়িকপত্র। একথা সত্য, সমসাময়িক পত্রিকায় অনেক ক্লেদ-গ্লানি, কটূক্তি, বা ধর্ম-কলহ স্থান লাভ করেছিল। কিন্তু এ সবকে অতিক্রম করেও বুদ্ধিজীবী বাঙালীর চিত্ত-জাগরণের সুযোগ এসেছিল এই সব পত্রপত্রিকার মাধ্যমে। দেশবিদেশের নানান খবর, বিজ্ঞান ও মানবতার নতুন আলো, অভিনব আবিষ্কারের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী, মনীষীদের জীবন-বাণী, ধর্ম-দর্শনের নতুন ব্যাখ্যা, শিক্ষার নতুন তত্ত্ব— এ সবই বাংলা সাময়িকপত্রাদির মাধ্যমে বুদ্ধিজীবী বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতে লাগল। ফলে তাঁদের চিন্তায় যে আলোড়ন এসেছিল পরিণতিতে তাই বাঙালীর বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছিল। সনাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে সংস্কারবাদী চিন্তার সংঘর্ষ তদানীন্তন সাময়িক-পত্রাদিতে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। কিছু কিছু মিশনারী বাংলা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যখন এ দেশীয় সমাজ ও ধর্মের প্রতি বিদেশী ধর্মের আঘাত আসতে শুরু করে, তখন তার প্রত্যুত্তরে আরো নতুন নতুন বাংলা পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে এবং তাদের কেন্দ্র করে সনাতন ধর্মের সংরক্ষণ প্রচেষ্টা যেমন জোরদার হয়ে ওঠে, তেমনই সমাজ ও ধর্মের সংস্কার সাধনের জন্যও প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আঘাত-আত্মরক্ষা-সংস্কারপ্রবণ যে ধর্মকলহ ও কোলাহল তখন সমাজের নানা স্তরে উত্থিত হয়েছিল তদানীন্তন বাংলা সাময়িকপত্রাদিতে তা সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাঙালীর যুক্তি, জ্ঞান ও বুদ্ধির চর্চা। ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, সনাতন হিন্দু ধর্মের মহিমা কীর্তন, সংস্কৃত চর্চার পুনরুজ্জীবন, রামমোহনের বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ প্রচার, ডিরোজিও-ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর ভাববিপ্লব, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, ইত্যাদি নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে তদানীন্তন সমাজ-মন আলোড়িত হয়েছিল। এবং বাংলা সাময়িকপত্রাদিই ছিল এই সব সামাজিক আলোড়ন ও ভাববিপ্লবের প্রধান আশ্রয়। সুতরাং বলা যেতে পারে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালী মানসে যে ভাবদ্বন্দ্ব ও আলোড়ন দেখা দিয়েছিল এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলাদেশে যে নবজাগৃতির ঢেউ উঠেছিল তার অন্যতম প্রধান আশ্রয় ছিল বাংলা সাময়িকপত্রাদি।

ধর্ম সংরক্ষণ ও সংস্কার এবং সর্বোপরি বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ধারক হিসাবে তদানীন্তন বাংলা সাময়িক পত্রত্রিকায় এত যে বাদানুবাদ ও লেখালেখি তার ফলে আরো একটা বড়ো লাভ হয়েছিল— বাংলা গদ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন। ধর্মীয় বিচার-বিতর্কে,

বাদী-বিবাদীর উত্তর-প্রত্যুত্তরে এবং সর্বোপরি মননশীল চিন্তার বাহন হিসাবে বাংলা গদ্যের চর্চার অবাধ সুযোগ এনে দিয়েছিল এই সব বাংলা পত্রপত্রিকা। তার ফলে বাংলা গদ্য-ভাষার রূপ-ঐশ্বর্য-শক্তি ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে বুদ্ধিজীবী বাঙালী ক্রমশ সচেতন হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের সযত্ন প্রয়াসে ও একনিষ্ঠ চর্চায় বাংলা গদ্যভাষা ধীরে ধীরে সাহিত্য-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। মাতৃভাষার প্রতি শিক্ষিত বাঙালী সমাজের অবজ্ঞা বা উপেক্ষার ভাব ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে এবং বুদ্ধিজীবী বাঙালীদের মধ্যে বাংলা গদ্যরচনার প্রতি আগ্রহ বা ঝোঁক দেখা দিতে থাকে। মিশনারী বাংলার হাস্যকর প্রকাশভঙ্গি, ইংরেজি রীত্যনুসারী অনুবাদের আড়ষ্টতা বা আরবী-ফারসী মিশ্রিত দুর্বোধ্যতাকে ধীরে ধীরে কাটিয়ে বাংলা গদ্যভাষা স্বাধীন চিন্তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে গড়ে উঠতে থাকে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, বাংলা সাময়িকপত্রের জন্ম ও বিকাশের ফলে বাংলা ভাষার নিজস্ব গদ্যরীতি গড়ে তোলার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলা সাময়িকপত্রাদি বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজের কাছে ভাষাচর্চার অবাধ সুযোগ এনে দিয়েছিল। এ কথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, বাংলা সাময়িকপত্রের জন্মের আগে বাংলা গদ্যের চর্চা শুরু হয়নি। প্রথম বাংলা পত্রিকা প্রকাশের আঠারো বছর আগে থেকেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠী বাংলা গদ্যের চর্চা শুরু করেছিলেন। কিন্তু একথা স্বীকার্য, সাময়িক-পত্রের যুগে পৌঁছেই প্রথম বাংলা গদ্যভাষা অবাধ বিচরণের সুযোগ পেয়েছিল। গদ্যশিল্পীর একান্ত সাধনার সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ যোগ এই সব পত্রপত্রিকার মাধ্যমেই প্রথম স্থাপিত হতে পেরেছিল। দৈনন্দিন জীবনের মুখের ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষার একাত্মতা সম্বন্ধে উপলব্ধি, বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের বাহন হিসাবে বাংলা গদ্যভাষা প্রয়োগের সার্থকতা সম্বন্ধে সম্যক বোধ, এবং নানা জটিল বিষয়ে বিচারবিতর্কের ক্ষেত্রেও বাংলা গদ্যের সার্থক ব্যবহারের ফলে ভাষার ওজস্বিতা ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়লাভ বাংলা সাময়িক-পত্রের মাধ্যমেই প্রথম সম্ভব হয়েছিল। এর ফলে ধীরে ধীরে বাংলা গদ্যের যে নিজস্ব রীতি গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে সাধারণ বাঙালীর আত্মিক যোগ অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসের পটভূমিতে বাংলা সাময়িকপত্রের এই ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও অবদানের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাংলা সাময়িকপত্রের জন্ম ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ছাপাখানার যেমন প্রসার হয়েছিল, বাংলা প্রকাশনারও তেমন বিস্তার ঘটেছিল। এক-একটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন ছাপাখানা গড়ে উঠেছিল। পত্রিকাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজস্ব ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হত। কেবল তাই নয়, ঐ সব পত্রিকাকেন্দ্রিক ছাপাখানাকে আশ্রয় করে এক-একটি প্রকাশনসংস্থা গড়ে উঠত। সেখান থেকে কেবলমাত্র পত্রিকাই নয়, অবকাশ মতো অন্যান্য বাংলা বইও প্রকাশিত হত। ফলে সামগ্রিকভাবে বাংলা মুদ্রণের ক্ষেত্র বিস্তৃত হতে থাকে। এই পত্রিকাকেন্দ্রিক প্রকাশনসংস্থার ধারা বাংলাদেশে এখনো অব্যাহত আছে।

এক-একটি বড়ো সংবাদপত্র বা পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নানা বইও প্রকাশিত হয়। কেবল বাংলাদেশেই বা কেন, সব দেশে সব ভাষার ক্ষেত্রেই এই প্রকাশন-ধারা লক্ষ্য করা যায়। তদানীন্তনকালের চন্দ্রিকা যন্ত্রালয় বা তিমিরনাশক যন্ত্র বা বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস, সংবাদ প্রভাকর প্রেস, রত্নাবলী প্রেস প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বাংলা সাময়িকপত্রের সঙ্গে সঙ্গে নানা বাংলা বইও প্রকাশিত হত। বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের ধারা এইভাবে ক্রমশ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে দৃঢ়মূল প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অন্যভাবে বলা যায়, প্রাথমিক বিকাশের পালা শেষ করে তখন বাংলা মুদ্রণের বিস্তার পর্ব শুরু হয়েছিল।

এই বিস্তার পর্বে বাংলাদেশে যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল তার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল সামাজিক সচেতনতা। সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজ-ভাবনা বা সামাজিক সমস্যাদি নিয়ে জনমত (public opinion) সংগঠন ও তার বিধিবদ্ধ প্রকাশ শুরু হয়েছিল এই যুগে। এবং বাংলা সাময়িক পত্রপত্রিকাই প্রথম এই জনমত সংগঠন ও প্রকাশের স্বর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিল। অবশ্য বাংলা সাময়িকপত্রে জনমত প্রকাশের এই ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল সমসাময়িককালে বাংলাদেশে প্রচারিত ইংরেজি পত্রপত্রিকার আদর্শ ও প্রেরণায়। সংগঠিত সমাজ-ভাবনা তখন এক-একটি বাংলা পত্রপত্রিকাকে আশ্রয় করে প্রবলবেগে আলোড়িত ও প্রচারিত হতে থাকে। এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে নানা পক্ষ-প্রতিপক্ষ বা বাদী-প্রতিবাদীর সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাঁরা ঐ সব সাময়িকপত্রাদিকে কেন্দ্র করে পরস্পরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতেন। ফলে ধর্মীয় বা সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের বিভিন্ন কূট প্রশ্নে ঐ সব পত্রপত্রিকায় বাদানুবাদ বা বিতর্ক চলত, পক্ষে বা বিপক্ষে জনমত সংগঠিত হত, এবং ক্রমশ অধিকতর সংখ্যক মানুষ ঐ সব বিতর্ক-জালে জড়িয়ে পড়তেন ও তার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ বাংলা পত্রপত্রিকার প্রচার ও প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তদানীন্তন বাংলাদেশে ধর্ম বা আদর্শ প্রচার এবং ধর্ম ও সমাজ সংরক্ষণ বা সংস্কারের প্রেরণায় আত্মীয়সভা, গৌড়ীয় সমাজ, ধর্মসভা, ইয়ং বেঙ্গল বা বিভিন্ন খ্রীস্টান মিশনারী সংস্থা গড়ে উঠেছিল এবং এঁরা প্রত্যেকেই এক-একটি বাংলা সাময়িক-পত্রকে নিজ নিজ মুখপত্রস্বরূপ ব্যবহার করতেন। সুতরাং ঐ সব সংস্থার সভ্য বা সমর্থকদের আনুকূল্যেই প্রধানত পত্রিকাগুলি প্রকাশিত ও প্রচারিত হত। এ ছাড়া অবশ্য আরো কিছু কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হত যাতে ধর্মীয় বাদানুবাদ ছাড়া অন্যান্য বিষয়, যেমন, দেশ-বিদেশের নানান খবর, বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বা সরকারী-বেসরকারী-ব্যবসায়িক বিজ্ঞপ্তি-সংবাদ-তথ্য পরিবেশিত হত। সাময়িকপত্রিকার রসাস্বাদনে আগ্রহী বুদ্ধিজীবী বাঙালী সমাজে বা ছাত্র-শিক্ষক মহলে ঐ সব বিষয় ও রুচির পত্রিকা বিশেষভাবে সমাদৃত হত।

সারা ভারতের মধ্যে বাংলাদেশেই যে প্রথম সাময়িকপত্র জন্ম ও বিকাশ লাভ করেছিল এবং এখানে যে বাংলা সাময়িকপত্রাদি উত্তরোত্তর বিস্তার লাভ করেছিল তার আরো দুটি বড়ো কারণ ছিল : প্রথমত, বাংলাদেশে, বিশেষ করে কলকাতায় শহরকেন্দ্রিক শিক্ষিত

বুদ্ধিজীবী সমাজের বিকাশ এবং দ্বিতীয়ত, এখানে আন্তর্দেশীয় ও বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের উত্তরোত্তর বিস্তার। বাংলা সংবাদপত্রের এই ঐতিহাসিক পটভূমিকে ব্যাখ্যা করে জনৈক সমালোচক বলেছেন: 'It was here (Bengal) that the two conditions for the success of a newspaper were early fulfilled, namely the growth of a literate urban community and the steady development of commerce, both internal and external. Demand of information, the *raison d'etre* for any newspaper, was greatly increasing in Bengal with the progress of education.'[১] সারা ভারতের মধ্যে কলকাতাই ছিল তখন ইংরেজদের সবচেয়ে বড়ো ঘাঁটি। সুতরাং স্বভাবতই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কেন্দ্রভূমি কলকাতাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল তখনকার ইংরেজি সভ্যতা। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমিও ছিল কলকাতা। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বাঙালী সমাজ। তাঁদের শিক্ষাপ্রচেষ্টা, জ্ঞান ও বুদ্ধির চর্চা, সমাজ-সংস্কার ও ধর্মান্দোলন, নবযুগের কলহ ও উন্মাদনা সবই প্রধানত কলকাতাকে কেন্দ্র করে আলোড়িত হয়েছিল। এবং দেশীয় সমাজে তদানীন্তন এই আলোড়নের প্রতিভূ হিসাবে প্রথম কলকাতাতেই জন্ম নিয়েছিল ইংরেজি সংবাদপত্রের মতো বাংলা সাময়িকপত্রও। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্রভূমি কলকাতায় প্রয়োজনীয় সকল সুবিধা লাভ করায় বাংলা সাময়িকপত্রাদি দ্রুত বিস্তারের সুযোগ পেয়েছিল। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর মনে যে অনুসন্ধিৎসা জেগেছিল এবং সমাজ ও ধর্ম সংস্কার ও সংরক্ষণের আন্দোলনের ফলে বাঙালী সমাজে যে প্রচণ্ড বিতর্কের ঝড় উঠেছিল তারই ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশনায় তীব্র গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল। সেই গতিই শেষ পর্যন্ত বাংলা মুদ্রণের বিস্তার পর্বকে ত্বরান্বিত করেছিল।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি ১৮১৮ সালে সেন্সরের পদ উঠে যাওয়ায় এবং লর্ড হেস্টিংসের কিছু প্রশাসনিক উদারতার ফলে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠোরতা হ্রাস পাওয়ায় দেশে সাংবাদিকতার অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে। ফলে বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ইংরেজি পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত দেশীয় ভাষার সংবাদ-পত্রও প্রসার লাভ করে। অল্পকালের মধ্যে বাংলা ভাষায় সমাচার দর্পণ, সম্বাদ কৌমুদী, সমাচারচন্দ্রিকার মতো জনপ্রিয় কাগজের আবির্ভাব ঘটে। ঐ সময় কিছু ইংরেজি পত্রিকাও বহুল প্রচারিত ছিল। যেমন, জেমস সিল্ক বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর (২রা অক্টোবর ১৮১৮ - ১০ নভেম্বর ১৮২৩), কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলির কিছু কিছু লেখার ধরনধারণ দেখে সরকার কিন্তু ক্রমশই উদ্বেগ বোধ করতে থাকেন। তদানীন্তন

১ A. F. Salahuddin Ahmed, '*Social ideas and social change in Bengal, 1818-1835*', p. 79.

ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু কিছু রচনা সরকারের কাছে বিশেষভাবে আপত্তিজনক ও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে অনিষ্টকর বলে মনে হয়। কিছু ফারসী, বাংলা সংবাদপত্রও সরকারের কুনজরে পড়ে। সংবাদপত্র মারফত এদেশীয়দের মধ্যে জনমত সংগঠনের প্রবণতা সরকার মোটেই সুনজরে দেখেননি। ধর্মীয় বা সামাজিক সমস্যাদি নিয়ে প্রাথমিক চিন্তা ভাবনা ও তীব্র বাদানুবাদ পরিণতিতে ব্রিটিশবিদ্বেষী রাজনৈতিক বিস্ফোরণে আকার নিতে পারে বলে তাঁরা আশঙ্কা করেন। ফলে সরকার আবার অবিলম্বে সংবাদপত্র শাসনের জন্য কঠোরতর বিধি প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

সরকারী আশঙ্কা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে প্রধানত বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জার্নাল'-কে কেন্দ্র করে। তা ছাড়া এই পত্রিকার সঙ্গে রামমোহন প্রভাবিত বাংলা সংবাদপত্র 'সম্বাদ কৌমুদী'র সহযোগিতা লক্ষ্য করেও সরকারী মহল উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠেন। সম্বাদ কৌমুদীর বহু অংশ তখন ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে ক্যালকাটা জার্নালে প্রকাশিত হত। ব্রিটিশ মহলের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, বাকিংহাম সম্বাদ কৌমুদীকে প্রত্যক্ষ সাহায্য ও উৎসাহ জোগাতেন এবং তার ফলে দেশীয় সংবাদপত্র মারফত ভারতে ব্রিটিশ বিদ্বেষ প্রচারের ক্ষেত্র প্রশস্ততর হয়ে উঠেছিল। কোম্পানীর বেসরকারী মুখপত্র লণ্ডনের এশিয়াটিক জার্নাল এ ব্যাপারে বাকিংহামকে অভিযুক্ত করে লেখেন: 'A Journal published in the language of the natives, conducted by natives, designed for the perusal of native Indians, and of them almost exclusively, is set on foot, avowedly, if Mr. Buckingham is to be credited, for the purpose of fomenting their accidental discontents, of opening their eyes to the defect of their rulers, of encouraging and giving utterance not to their complaints but to their remonstrances.'[১] এর প্রত্যুত্তরে বাকিংহাম তীব্র প্রতিবাদ করে লেখেন: 'Machiavellian doctrines obscurely developed by this Oracle of Leaden Hall (sic) street, which seems to have no nobler purpose in view than an account of Dr. and Cr. or the Wrapper of a pound of Tea,—to be a mere article of Trade, whose reasonings have much the same object as those which usually pass over a Shopkeeper's Counter.'[২]

এই বাদানুবাদ থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ক্যালকাটা জার্নালের বিরোধিতার সম্পর্ক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সরকার এদের আশু নিয়ন্ত্রণের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। দেশীয় সংবাদ-

১ *The Asiatic Journal*, August 1822, xiv, 8, 139 : quoted by A. F. Salahuddin Ahmed, *op. cit.* p. 87.

২ *Calcutta Journal*, 14 Feb. 1823 : quoted by A. F. Salahuddin Ahmed, *op. cit.*

পত্রাদিতে প্রকাশিত কিছু কিছু প্রবন্ধও সরকারের কাছে আপত্তিজনক মনে হয়। উইলিয়ম বাটারওয়ার্থ বেলী (W. B. Bayley) তাঁর ১৩ অক্টোবর ১৮২২ তারিখের দীর্ঘ মিনিটে এই বিষয়ের উল্লেখ করে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা বৃদ্ধির আশু প্রয়োজনীয়তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[১] বেলী লিখেছেন : 'বর্তমানে চারিখানি দেশীয় সংবাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হয় ; দুইখানি বাংলায় এবং দুইখানি ফারসীতে। চারিখানিই সাপ্তাহিক।...ফারসী কাগজগুলির নাম—'জাম-ই-জাহান-নুমা' এবং 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার'। ...দ্বিতীয়খানি সুপরিচিত রামমোহন রায়ের। ধর্ম সম্বন্ধীয় তর্ক বিতর্কে সম্পাদকের প্রবণতা আছে— ইহা জানা কথা, এবং সেই প্রবণতার বশে একটি সুযোগ পাইয়া খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে তিনি যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রচ্ছন্ন হইলেও অনিষ্টকারক।...

'ফারসী ও বাংলা উভয় ভাষার সংবাদপত্রেই অনেক আপত্তিজনক অংশ আছে। "সতীদাহ" লইয়া বাংলা সংবাদপত্রে বহু তীব্র আলোচনা প্রকাশ করা হইতেছে। ইউরোপীয় মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে, দেশের লোকেরা স্ব-ইচ্ছায় এই সকল আলোচনা চালাইলে মঙ্গলের বিষয় হইবে।'[২] বাংলা পত্র-পত্রিকায় সতীদাহ প্রথা সম্বন্ধে তীব্র বাদানুবাদ বেলী পছন্দ করেননি, বিশেষ করে ঐ ব্যাপারে বিদেশীদের যোগদান অনিষ্টকর হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। [বেলীর নিজের ভাষায়, 'Were this dispute voluntarily and really conducted by the natives without the intervention of Europeans, the discussion might lead to beneficial results.'[৩]]

সংবাদপত্রে অবাধ আলোচনা যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে ক্ষতিকারক এ কথা বেলী সুস্পষ্টভাবে তাঁর মিনিটে উল্লেখ করেন : 'The stability of the British dominion in India mainly depends upon the cheerful obedience and subordination of the Officers of the Army on the fidelity of the Native Troops, on the supposed character and power of the Government, and upon the opinion which may be entertained by a superstitious and unenlightened Native population of the motives and tendency of our actions as affecting their interests.

'The liberty of the Press, however essential to the nature of a free state, is not in any judgement, consistent with the character of our insti-

---

১ *Bengal Public Consultation*, 17 Oct. 1822, No. 7. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেলীর সমগ্র মিনিটটি *Modern Review*, Nov. 1928—পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত : 'বাংলা সাময়িক-পত্র', পৃ- ২৩

৩ Quoted by A. F. Salahuddin Ahmed, *op. cit.*, p. 87.

tutions in this Country, or with the extraordinary nature of our dominion in India'.[১]

সুতরাং সংবাদপত্র মারফত ক্রমবর্ধমান জনমত সংগঠনের প্রবণতা লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত ১৭ অক্টোবর ১৮২২ তারিখে সকৌন্সিল লর্ড হেস্টিংস বিলেতে কর্তৃপক্ষের কাছে সংবাদ-পত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিকতর ক্ষমতা প্রার্থনা করেন। ১৮২৩ সালের ৯ই জানুয়ারি লর্ড হেস্টিংস বিলেতে ফিরে যান। তখন অ্যাডাম অস্থায়ীভাবে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। কট্টর সাম্রাজ্যবাদী অ্যাডাম বিলেতের সমর্থন নিয়ে ৪ মার্চ ১৮২৩ তারিখে এক কড়া প্রেস আইন লিপিবদ্ধ করেন এবং ৪ঠা এপ্রিল ১৮২৩ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের অনুমোদনক্রমে ঐ আইন জারী হয়। ১৮২৩ সালের মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক এই কুখ্যাত আইনের ফলে সংবাদপত্রের যেটুকু স্বাধীনতা ছিল তাও খর্ব হয়। ফলে বিদেশী সংবাদপত্রের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় পত্র-পত্রিকার অবাধ বিস্তারের পথে প্রচণ্ড বাধা দেখা দেয়। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই মুদ্রাযন্ত্র-বিধির প্রয়োগ ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। বিশেষ করে বেন্টিঙ্কের শাসনকালে (জুলাই ১৮২৮-মার্চ ১৮৩৫) সংবাদপত্রগুলি কড়া প্রেস আইন থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা ভোগ করতে পায়। ১৮৩৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঐ প্রেস আইন বলবৎ ছিল। পরিশেষে ৩রা আগস্ট ১৮৩৫ তারিখে তদানীন্তন অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল স্যার চার্লস মেটকাফ আর-এক নতুন আইন বিধিবদ্ধ করে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যাই হোক, সে অনেক পরের কথা।

১৮২৩ থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত সময়ে যে কটি বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল বলা বাহুল্য সেগুলি সবই অ্যাডামের সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধি অনুযায়ী প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে আইনের বিধি অনুযায়ী সরকারী দপ্তরে জমা দেওয়া তাদের নাম ধাম ইত্যাদি পরবর্তীকালে গবেষকদের পক্ষে হোম ডিপার্টমেন্টের দলিল ঘেঁটে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঐ সময়ের কিছু কিছু বাংলা পত্রিকার আদৌ কোনো সংখ্যা খুঁজে পাওয়া না গেলেও সরকারী দপ্তরের দলিল থেকে তাদের নাম ঠিকানা ইত্যাদি অবগত হওয়া গেছে।

অ্যাডামের প্রেস আইন অনুসারে কোনো সাময়িকপত্র প্রকাশ করতে হলে স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রাকরকে সরকারের কাছ থেকে হলফনামা দাখিল করে (ম্যাজিস্ট্রেট ও পরে চীফ সেক্রেটারি মারফত) লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র নিতে হত। বিনা অনুমতিতে পত্রিকা প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল। তা ছাড়াও সংবাদপত্রে কী কী বিষয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল তা সরকার আগে থেকেই নির্ধারণ করে দেন। ঐ সব নিষিদ্ধ বিষয়ের মুদ্রিত বিবরণ অনুযায়ী সম্পাদককে চলতে হত। তা লঙ্ঘন করলে বা কোনো-রূপ বেআইনীভাবে কাগজ চালালে কাগজের লাইসেন্স বাতিল ও চারশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক-পত্র', পৃ. ২৬

করা হত। এইসব বিধিনিষেধের রজ্জু গলায় পরেই তখনকার বাংলা সাময়িকপত্রাদি প্রকাশিত হত। কিন্তু রামমোহন রায়ই প্রথম এই আইনের প্রতিবাদস্বরূপ আইন ধার্যের প্রথমদিন অর্থাৎ ৪ এপ্রিল ১৮২৩ তারিখ থেকেই তাঁর ফারসী পত্রিকা মীরাৎ-উল-আখ্‌বার বন্ধ করে দেন। ঐ দিনে প্রকাশিত তাঁর পত্রিকার শেষ সংখ্যায় এ বিষয়ে তিনি যা লেখেন ১০ এপ্রিল ১৮২৩ তারিখের ক্যালকাটা জার্নাল-এ তা অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার যে বঙ্গানুবাদ করেছেন প্রাসঙ্গিক বোধে তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

'পূর্বেই জানান হইয়াছিল যে, সকৌন্সিল মহামান্য গবর্নর-জেনারেল কর্তৃক একটি আইন ও নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে, যাহার ফলে অতঃপর এই নগরে পুলিস আপিসে স্বত্বাধিকারীর দ্বারা হলফ না করাইয়া ও গবর্মেণ্টের প্রধান সেক্রেটারির নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক বা সাময়িক পত্র প্রকাশ করা যাইবে না এবং ইহার পরও পত্রিকা সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইলে গবর্নর জেনারেল এই লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। এখন জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ৩১-এ মার্চ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় সার ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেন এই আইন ও নিয়ম অনুমোদন করিয়াছেন। এই অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্য সমাজে সর্বাপেক্ষা নগণ্য হইলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সহিত এই পত্রিকা ('মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার') প্রকাশ বন্ধ করিলাম। বাধাগুলি এই :

'প্রথমতঃ, প্রধান সেক্রেটারির সহিত যে সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে, তাঁহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হইলেও আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দ্বারবান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়া এইরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ: এবং আমার বিবেচনায় যাহা নিষ্প্রয়োজন, সেই কাজের জন্য নানাজাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিস আদালতের দ্বার পার হওয়াও কঠিন। কথা আছে—

আব্রু কে বা-সদ্ খুন ই জিগর দস্ত্ দিহদ্
বা-উমেদ্-ই করম-এ, খাজা, বা-দারবান্ মা-ফরোশ্

অর্থাৎ, যে-সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।

'দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্য আদালতে সম্ভ্রান্ত বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই, যাহার জন্য কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করিবার মত বেআইনী ও গর্হিত কাজ করিতে হইবে।

'তৃতীয়তঃ, অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাতি ও হলফ করিবার অসম্মানভাজন হইবার পরও গবর্মেণ্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হইতে পারে, এই আশঙ্কার জন্য সেই ব্যক্তিকে লোক-সমাজে অপদস্থ হইতে হইবে এবং এই ভয়ে তাহার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইবে কারণ,

মানুষ স্বভাবতঃই ভ্রমশীল ; সত্য কথা বলিতে গিয়া তাহাকে হয়ত এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহা গবর্মেণ্টের নিকট অপ্রীতিকর বিবেচিত হইতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম।—

গদা-এ গোশা-নশিনি ! হাফিজা ! মাখরোশ্,
রুমুজ্-ই-মস্লিহৎ-ই খেশ্ খুসরোয়াগ্ দানন্দ্।

—হাফিজ

তুমি কোনধেঁষা ভিখারী মাত্র, চুপ করিয়া থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন।...'[১]

মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইনের এইসব বিভিন্ন পর্যায়ে স্বভাবতই বাংলা মুদ্রণের গতিপ্রকৃতি নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে। সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন যখনই কঠোর হয়েছে বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশনের গতিও তখন শ্লথ হয়েছে, আবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রকাশন ধারাকে বেগবান করেছে। আলোচ্য বিস্তার পর্বে ১৮১৮ থেকে ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত মোট ২৮টি বাংলা সাময়িকপত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।[২] পত্রিকাগুলিকে প্রথম প্রকাশের ক্রম অনুসারে সম্পাদক, প্রকাশক বা মুদ্রাকর সংক্রান্ত তথ্য ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সহ নিম্নলিখিতভাবে সাজানো যেতে পারে :

	ক	খ	গ	ঘ
	পত্রিকা	প্রথম প্রকাশ ও স্থায়িত্বকাল	সম্পাদক/প্রকাশক	প্রকাশক / মুদ্রাকরের ঠিকানা
১	দিগ্দর্শন (মাসিক)	এপ্রিল ১৮১৮। বাংলায় ১-২৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তিন বছর চলে (এপ্রিল ১৮১৮-ফেব্রুয়ারি ১৮২১)।	জন ক্লার্ক মার্শম্যান	শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস।

অন্যান্য তথ্যাদি : প্রথম প্রকাশিত এই বাংলা মাসিক পত্রের পুরনো সংখ্যাগুলি এখনো পাওয়া যায়। দিগ্দর্শনের বাংলা সংস্করণ (১-২৬ সংখ্যা এপ্রিল ১৮১৮-ফেব্রুয়ারি ১৮২১) ছাড়াও ইংরেজি বাংলা (১-১৬ সংখ্যা) ও ইংরেজি সংস্করণও (১-১৬ সংখ্যা) প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ষোলো বা ততোধিক। এর বহু সংখ্যক পুনর্মুদ্রিত কপি স্কুলপাঠ্য হিসাবে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ক্রয় করেন। দিগ্দর্শন বাংলা সংস্করণের ২৬টি সংখ্যা তুখণ্ডে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ১৮২২ সালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়।

১ তদেব, পৃ. ২৭-২৮

২ তদেব

২ সমাচার দর্পণ (সাপ্তাহিক)	২৩ মে ১৮১৮। সাড়ে তেইশ বছর চলে। শেষ সংখ্যা : ২৫ ডিসেম্বর ১৮৪১	জন ক্লার্ক মার্শম্যান [সম্পাদনার মূল দায়িত্ব পালন করেন দেশীয় পণ্ডিতেরা : জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, তারিণীচরণ শিরোমণি।]	শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস

অন্যান্য তথ্যাদি : প্রথম প্রকাশিত এই বাংলা সংবাদপত্রের পুরনো সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়। ৬ মে ১৮২৬ থেকে অল্প কিছুদিন সমাচার দর্পণের ফারসী সংস্করণ 'আখবারে শ্রীরামপুর' প্রকাশিত হয়। ১৮২৯ সনে এর বাংলা-ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১১ জানুয়ারি ১৮৩২ থেকে ৫ নভেম্বর ১৮৩৪ পর্যন্ত বাংলা সমাচার দর্পণ দ্বিসাপ্তাহিক হয়— প্রতি বুধবার ও শনিবার প্রকাশিত হত। তার পর তা পুনশ্চ সাপ্তাহিক হিসাবে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হতে থাকে।

৩ বাঙ্গাল গেজেটি (সাপ্তাহিক)	১৮১৮, মে-র শেষ অথবা জুনের গোড়ায়। [শুক্রবার -২৯ মে বা ৫ জুন ১৮১৮। সম্ভবত শেষের তারিখটিই ঠিক।] বছরখানেক চলে।	হরচন্দ্র রায়—সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী। গঙ্গা-কিশোর ভট্টাচার্য—মুদ্রাকর ও প্রকাশক।	বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস বা আপিস / Bengalee Printing Press : ১৪৫নং চোরবাগান স্ট্রীট (বা ৪৫নং চোর-বাগান স্ট্রীট)

অন্যান্য তথ্যাদি : বাঙালী পরিচালিত এই প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের কোনো কপি আজও পাওয়া যায়নি। জে. লঙ তাঁর প্রতিবেদনে (১৮৫৫) লিখেছেন বাঙ্গাল গেজেটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮১৬ সালে এবং তার সম্পাদক/প্রকাশক গঙ্গাধর ভট্টাচার্য। দুটি তথ্যই ভুল। সমাচার দর্পণ প্রকাশের এক পক্ষকাল মধ্যে এটি প্রকাশিত হয়। মূল্য মাসিক দু টাকা।

৪ গসপেল মাগাজীন (মাসিক)	ডিসেম্বর ১৮১৮	?	Baptist Auxiliary Missionary Society (B. A. M. S.) Calcutta

অন্যান্য তথ্যাদি : এটি দ্বিতীয় বাংলা মাসিক পত্র ও খ্রীস্টতত্ত্ব-বিষয়ক প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র। এটি ছিল দ্বিভাষিক : প্রতি পৃষ্ঠার বাম স্তম্ভে ইংরেজি ও ডান স্তম্ভে তার

বঙ্গানুবাদ। জানুয়ারি ১৮২০ থেকে এর একটি বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয়; তাতে অবশ্য বিষয়বস্তু অপেক্ষাকৃত কম থাকত।

৫ ব্রাহ্মণ সেবধি— Brahmunical Magazine (মাসিক ?)	সেপ্টেম্বর ১৮২১ [১৮২১ সনে প্রকাশিত তিনটি সংখ্যার সন্ধান পাওয়া যায়।]	'শিবপ্রসাদ শর্মা' (রামমোহন রায়)	কলকাতা

অন্যান্য তথ্যাদি: এর প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ: 'ব্রাহ্মণসেবধি /Brahmunical/Magazine/The Missionary & the Brahmun/No. 1/ব্রাহ্মণ সেবধি/ ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ / সং ১ / 1821.'। পত্রিকাটির এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও পর পৃষ্ঠায় তার ইংরেজি অনুবাদ থাকত। রামমোহন তাঁর পণ্ডিত শিবপ্রসাদ শর্মার নামে এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর মোট কতগুলি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল সঠিক জানা যায় না। রামমোহন গ্রন্থাবলীর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণে ব্রাহ্মণ সেবধির তিনটি সংখ্যা মুদ্রিত হয়েছে: ঐ গ্রন্থাবলীর সম্পাদকদের (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস) মতে, 'সম্ভবত ইহার আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই।' যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত রামমোহনের ইংরেজি গ্রন্থাবলীর মধ্যে Brahmunical Magazine-এর চারটি সংখ্যা মুদ্রিত হয়েছে; সম্পাদকের মতে চতুর্থ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় নভেম্বর ১৮২৩। মিস্ কলেটের বইয়ের সম্পাদকদ্বয় (S. D. Collet '*Life and Letters of Raja Rammohun Roy*', ed. by Dilip Kr. Biswas & Provat Ch. Ganguly) ৩য় সংস্করণের Supp. Notes-এও এ কথা সমর্থন করেন। ['Rammohun in reply issued the fourth and the last number of the Brahmunical Magazine in 1823. This was published only in English'] কিন্তু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়' গ্রন্থে পাদটীকায় লেখেন, এই পত্রিকার 'সর্বশুদ্ধ দ্বাদশ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল।' কিন্তু বাংলায় তিনটি ও ইংরেজিতে চারটির বেশি সন্ধান করা যায়নি।[১]

৬ সম্বাদ কৌমুদী (সাপ্তাহিক)	৪ ডিসেম্বর ১৮২১। উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে (সাময়িক বিরতি সহ) প্রায়	তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। (ভবানীচরণ ১৩ সংখ্যা: ফেব্রুয়ারি ১৮২২-র পর	কলুটোলা, কলিকাতা ৮৯ নং জোড়াসাঁকো (১৮২৩) / চরকডাঙা (Bengal Directory 1824)

১ মদন গড়াই, 'রামমোহন'।

	১৩ বছর চলে। শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৩৪ সালে।	ছেড়ে দেন।) [আসলে এটি রামমোহনের আনু-কূল্যে ও পরিচালনায় প্রকাশিত হয়।] পরবর্তী বিভিন্ন সম্পাদক/প্রকাশক : হরিহর দত্ত / গোবিন্দচন্দ্র কোঙার / আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় / গুরুচরণ নন্দী (Bengal Directory 1832) / হলধর বসু / রাধা-প্রসাদ রায়	

অন্যান্য তথ্যাদি : এর কোনো সংখ্যা এখনো পাওয়া যায়নি। *Calcutta Journal* পত্রিকায় এর কয়েকটি সংখ্যার বিষয়সূচী ও কিছু প্রবন্ধের চুম্বক ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। পরিষ্কার বাংলা হরফে ছেপে সম্বাদ কৌমুদী প্রথমে প্রতি মঙ্গলবার ও পরে (১৬শ সংখ্যা : ১৬ মার্চ ১৮২২ থেকে) প্রতি শনিবার প্রকাশিত হত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮। মাসিক চাঁদা দু টাকা। ১৮৩০ সন থেকে এটি দ্বিসাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়, তখন সপ্তাহে দুবার প্রকাশিত হত।

৭ পশ্বাবলী (মাসিক)	ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। [দ্বিতীয় পর্যায় প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ সালে।]	লসন ও ডবলিউ. এইচ. পীয়ার্স। [২য় পর্যায় (ইংরেজি বাংলা) : রামচন্দ্র মিত্র।]	ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি

অন্যান্য তথ্যাদি : বিভিন্ন সংখ্যায় পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল বলে এটিকে পত্রিকা বলা হয়, আসলে এটি মাসিক পুস্তক। প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করে সচিত্র জন্তুর বিবরণ থাকত। এর প্রথম ৬টি সংখ্যা একত্রে 'পশ্বাবলী' নামক পুস্তকাকারে ১৮২৮ সালে ক্যাল-কাটা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

৮ সমাচার চন্দ্রিকা (সাপ্তাহিক)	৫ মার্চ ১৮২২। ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে ২৬ বছর চলে। ঐ বছর ভবানী-চরণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ও অন্যান্যদের পরিচালনায়	ভবানীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায় (১৮২২-৪৮)। পরে, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়/ ভগবতীচরণ চট্টো-	চন্দ্রিকা যন্ত্র, কলু-টোলা ২৬ নং। (২৫ নং রামমোহন ঘোষ স্ট্রীট-প্রকাশন -কার্যালয়)

	আরো বছর পাঁচেক চলে।	পাধ্যায়/প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর।	

অন্যান্য তথ্যাদি : পত্রিকাটি প্রথমত প্রতি সোমবার প্রকাশিত হত। মূল্য মাসিক এক টাকা। কোয়ার্টো আকারের পত্রিকাটির পৃষ্ঠাসংখ্যা থাকত বারো, এবং প্রতি পৃষ্ঠায় দুটি করে কলাম। এপ্রিল ১৮২৯ থেকে প্রতি সপ্তাহে দুবার— সোম ও বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকাটির কিছু পুরনো সংখ্যা পাওয়া গেছে। ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে ১২ এপ্রিল ১৮৩০ থেকে ১২ এপ্রিল ১৮৩১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি আছে। ক্যালকাটা জার্নল (১৮২২) ও ক্যালকাটা রিভিয়ু (১৮৫০) পত্রিকায় সমাচার চন্দ্রিকার ১৮২২ ও ১৮২২-২৫ সনের অনেকগুলি সংখ্যার বিষয়সূচী ও কোনো কোনো প্রবন্ধের চুম্বক ইংরেজিতে দেওয়া আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (দুখণ্ড) গ্রন্থে এর কিছু রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়।

৯ খ্রীস্টের রাজ্যবৃদ্ধি (মাসিক)	মে ১৮২২। ১৪ সংখ্যায় ১ম খণ্ড শেষ হয় (জুন ১৮২৩); ২য় খণ্ডের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ১৮২৪।	?	শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন

অন্যান্য তথ্যাদি : খ্রীস্টতত্ত্ব বিষয়ক এই দ্বিতীয় বাংলা মাসিক পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যায় ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী রচনা থাকত। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক আনা।

১০ সম্বাদ তিমিরনাশক (সাপ্তাহিক)	অক্টোবর ১৮২৩। ১৮২৩ থেকে ১৮৩৬ পর্যন্ত প্রায় তেরো বছর চলে।	কৃষ্ণমোহন দাস	সম্বাদ তিমিরনাশক ছাপাখানা, ৪০নং মীর্জাপুর, কলিকাতা

অন্যান্য তথ্যাদি : এই সংবাদপত্রটি প্রথম সাত বছর সপ্তাহে একবার ও তারপর থেকে সপ্তাহে দুবার করে প্রকাশিত হতে থাকে।

১১ বঙ্গদূত (সাপ্তাহিক)	১০মে ১৮২৯। ১৮২৯ থেকে ১৮৩২ পর্যন্ত পূর্ণোদ্যমে চালু ছিল। মোট দশ বৎসরাধিককাল ছিল।	নীলরত্ন হালদার। ১৮৩০ এপ্রিলের পর থেকে—ভোলানাথ সেন।	বঙ্গদূত প্রেস, ১৫২ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।

অন্যান্য তথ্যাদি : অন্যতম স্বত্বাধিকারী ৭নং বাঁশতলা গলির সার্জন আর. মন্টগোমারি

মার্টিনকে [অন্যান্য স্বত্বাধিকারী : দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামমোহন রায়, নীলরত্ন হালদার ও রাজকৃষ্ণ সিংহ] ৫ মে ১৮২৯ তারিখে সরকার ইংরেজি বেঙ্গল হেরাল্ড সহ বাংলা বঙ্গদূত প্রকাশের লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। বঙ্গদূত প্রতি শনিবার প্রকাশিত হত। প্রতি সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল আট, মূল্য মাসিক এক টাকা।

১২	সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণ (অনিয়মিত প্রকাশ)	জুলাই ১৮২৯। প্রথম বছর দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।	কালাচাঁদ রায়	তিমিরনাশক যন্ত্র। বহুবাজারের গিরিধর বাবুর বাটীতে কালাচাঁদ রায়ের নিকট পাওয়া যায়।

অন্যান্য তথ্যাদি : আসলে এটি ঠিক 'পত্রিকা' নয়, এটি ছিল রক্ষণশীল দলের 'পুস্তক'। তবে তা দফায় দফায় প্রকাশিত হয়। প্রতি খণ্ডের মূল্য এক টাকা।

১৩	শাস্ত্রপ্রকাশঃ (সাপ্তাহিক)	জুন ১৮৩০। প্রায় বছরখানেক চলে। (১৮৩১ ফেব্রুয়ারির অব্যবহিত পরেই বন্ধ হয়ে যায়।)	লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার।	কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার

অন্যান্য তথ্যাদি : এই সাপ্তাহিক পত্রে কোনো সংবাদাদি থাকত না, কেবল শাস্ত্রীয় আলোচনাই স্থান পেত। 'বেদবেদাঙ্গ পুরানো পুরাণাদি শ্লোকের প্রকৃতার্থ ও ফল এবং ব্রতাদির ইতিকর্ত্তব্যতা নানা শাস্ত্র হইতে সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়া···চলিত ভাষায়' এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর মূল্য ছিল মাসিক এক টাকা।

১৪	সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক)	২৮ জানুয়ারি ১৮৩১। প্রথম পর্যায়ে দেড় বছর (৬৯ সংখ্যা : ২৫ মে ১৮৩২ পর্যন্ত) চলে। [পরে ১০ আগস্ট ১৮৩৬ থেকে বারত্রয়িক (সপ্তাহে তিনবার) রূপে ও ১৪ জুন ১৮৩৯ থেকে বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক রূপে	ঈশ্বর গুপ্ত। [পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'সম্পূর্ণ সাহায্যক্রমে' এটি প্রকাশিত হয়।]	সংবাদ প্রভাকর প্রেস, ৩২নং সিমলা, কলিকাতা। [সংবাদ প্রভাকর প্রথমে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের ব্যয়ে চোরবাগানে এক মুদ্রাযন্ত্র ভাড়া করে ছাপা হত। পাঁচমাস পর থেকে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়িতে স্থাপিত পত্রিকার নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্রে

		প্রকাশিত হয়ে দীর্ঘকাল চলে।]		ছাপা হত।]

অন্যান্য তথ্যাদি : এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হত। ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র এই পত্রিকার সংশ্রব ত্যাগ করেন, তার তিন মাস পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৫	সম্বাদ সুধাকর (সাপ্তাহিক)	২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। চার বছর চলে।	প্রেমচাঁদ রায়।	কলকাতার জোড়াবাগান স্ট্রীটে 'দেবীচরণ প্রামানিকের আলয়ে' মুদ্রিত হত। [কানাইলাল ঠাকুর পত্রিকাটির জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবস্থা করে দেন।]
১৬	সমাচার সভারাজেন্দ্র (সাপ্তাহিক)	৭ মার্চ ১৮৩১। বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।	শেখ আলীমুল্লা, কলিঙ্গা	—

অন্যান্য তথ্যাদি : মুসলমান সম্পাদিত এই প্রথম বাংলা সংবাদপত্রটি বাংলা ও ফারসী ভাষাতে প্রকাশিত হত।

১৭	জ্ঞানান্বেষণ। (সাপ্তাহিক)	১৮জুন ১৮৩১। নভেম্বর ১৮৪০ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় দশ বছর চলে।	দক্ষিণানন্দন (পরে 'দক্ষিণারঞ্জন') মুখোপাধ্যায়। [অবশ্য সম্পাদকীয় মূল দায়িত্ব পালন করতেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য)।] পরবর্তী সম্পাদক রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মাধবচন্দ্র মল্লিক ১৮৩২ সনের জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে পত্রিকাটি ইংরেজি ও বাংলায় প্রকাশ করেন।	চোরবাগান (কলকাতা) থেকে প্রকাশিত।

অন্যান্য তথ্যাদি : এটি 'ইয়ং বেঙ্গল'দের মুখপত্র ছিল। এই নব্যতন্ত্রবাদীরা সতীদাহ প্রভৃতি বিষয়ে রামমোহন ও উদারনীতিক দলের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু হিন্দুধর্মের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে মানতে পারেননি।

১৮	অনুবাদিকা (সাপ্তাহিক)	আগস্ট ১৮৩১। বছর-খানেকের মধ্যেই (এপ্রিল ১৮৩২) বন্ধ হয়ে যায়।	ভোলানাথ সেন—সম্পাদক, প্রসন্নকুমার ঠাকুর— স্বত্বাধিকারী।	কলকাতা

অন্যান্য তথ্যাদি : এতে প্রধানত *Reformer* পত্রের প্রবন্ধাদির বঙ্গানুবাদ থাকত। এই পত্রিকা বিনামূল্যে বিতরণ করা হত।

১৯	সম্বাদ রত্নাকর (সাপ্তাহিক)	২২ আগস্ট ১৮৩১। মাস পাঁচেক চলে।	মধুসূদন দাস (সিমলা-নিবাসী)—স্বত্বাধিকারী, রামচন্দ্র পাল-সম্পাদক।	৭১নং পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট, কলকাতা।

অন্যান্য তথ্যাদি : 'কলিকাতা নগরীর উন্নতিবিধান কল্পে' এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের প্রকাশ। এটি প্রচলিত ধর্ম ও আচারের সমর্থক ছিল।

২০	সম্বাদ সারসংগ্রহ (সাপ্তাহিক)	২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। অল্প কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।	সিমলা-নিবাসী বেণীমাধব দে—স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক ; কলুটোলানিবাসী সরূপচাঁদ দাসগুপ্ত—অন্যতম উদ্যোক্তা ও সম্পাদক (?)।	কলকাতা

অন্যান্য তথ্যাদি : পত্রিকাটি ছিল দ্বিভাষিক : বাংলা ও ইংরেজি। 'ঐ পত্রে সমুদায় বাঙ্গলা পত্রস্থ সমাচারের মর্ম্ম ও অবিকল প্রেরিত পত্র মুদ্রিত' হত। মূল্য মাসিক দু টাকা।

২১	জ্ঞানোদয় (মাসিক)	ডিসেম্বর ১৮৩১। পত্রিকার প্রকাশ অনিয়মিত ছিল। যেমন ১০ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় মার্চ ১৮৩৩। মোট ২০টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।	রামচন্দ্র মিত্র ও কৃষ্ণধন মিত্র	কলকাতা

অন্যান্য তথ্যাদি : পত্রিকাটিতে বালকদের উপযোগী নীতিকথা, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক কাহিনী প্রকাশিত হত।

২২ দলবৃত্তান্ত (সাপ্তাহিক ?) জানুয়ারি ১৮৩২। 'কোন মহানুভব মহাশয়'। কলকাতা

২৩ বিজ্ঞানসেবধি (মাসিক) এপ্রিল ১৮৩২। প্রকাশ অনিয়মিত ছিল।* মোট ১২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অমলচন্দ্র গাঙ্গুলি ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ : অনুবাদক-সম্পাদক। এইচ. এইচ. উইলসন : প্রধান পৃষ্ঠপোষক। Society for Translating European Science (কলকাতা)

অন্যান্য তথ্যাদি : এই পত্রিকায় 'স্বদেশস্থ লোকেরদের উপকারার্থ ইউরোপীয় বিদ্যার গ্রন্থমালা বঙ্গভাষায় অনুবাদ' করে প্রকাশিত হত। [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য়), পৃ. ১৮৭] প্রতি সংখ্যায় থাকত ৫০ পৃষ্ঠা।

২৪ সংবাদ রত্নাবলী (সাপ্তাহিক) ২৪ জুলাই ১৮৩২। 'এক বৎসর আট মাস তিন দিবস' পর্যন্ত এটি জীবিত ছিল। পরে ১৮৪৫ সালে পুনঃ-প্রকাশিত হয়। মহেশচন্দ্র পাল— সম্পাদক। (তবে আসলে সম্পাদনার কাজ করতেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।) জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক— প্রধান পৃষ্ঠপোষক। মেছুয়াবাজার বড়তলা লেনে/মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে অবস্থিত রত্নাবলী প্রেস।

অন্যান্য তথ্যাদি : দ্বিতীয় দফায় ব্রজমোহন চক্রবর্তী এর সম্পাদক হন।

২৫ জ্ঞানসিন্ধু-তরঙ্গ। (মাসিক) ১৮৩২। স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। রসিককৃষ্ণ মল্লিক। কলকাতা

অন্যান্য তথ্যাদি : লঙের তালিকায় ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদপত্রের ইতিহাসে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

২৬ 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ।' (পাক্ষিক / মাসিক) [*The Hindoo Manual of Literature and Science*] সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ডবলিউ. এম. ওলাস্টন, নবকুমার চক্রবর্তী ও গঙ্গাচরণ সেনগুপ্ত। সংস্কৃত পাঠশালা (সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা)

অন্যান্য তথ্যাদি : পত্রিকাটি ছিল দ্বিভাষিক : 'প্রত্যেক পৃষ্ঠার দক্ষিণ পাটিতে বাংলা এবং বাম পাটিতে তাহার ইংরেজি অনুবাদ থাকিত।'[১] প্রথমদিকে রয়াল অক্টেভো আকারের এই পত্রিকাটি ছিল পাক্ষিক ; প্রতি সংখ্যায় ষোল পৃষ্ঠা। মাসিক মূল্য বারো আনা। মাঝে মাঝে এতে ছবিও ছাপা হত। জানুয়ারি ১৮৩৪ থেকে এটি মাসিক পত্রে পরিণত হয় ; প্রতি সংখ্যায় ৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় জানানো হয় যে এতে ভূগোল-ইতিহাস, নীতিকথা ও বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার সার সংগ্রহ করা হবে। নবপর্যায়ে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান এদেশে প্রচার করাই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। এ ছাড়া, ইউরোপীয় গ্রাহকদের জন্য সংস্কৃত ও বাংলা রচনার অনুবাদও দেওয়া হত।

২৭ চার আনা পত্রিকা। ১৮৩৩। ? ?
(মাসিক)

অন্যান্য তথ্যাদি : পত্রিকাটি ইংরেজি ও বাংলায় প্রকাশিত হত। নীতিকথা ও ঐতিহাসিক কাহিনী এর উপজীব্য ছিল। লঙের তালিকায় এর উল্লেখ আছে।[১]

২৮ বৃত্তান্তবাহক। ১৮৩৪। ? বৃত্তান্তবাহক
(অর্ধ-সাপ্তাহিক) প্রেস, ভবানীপুর, কলকাতা।

অন্যান্য তথ্যাদি : পত্রিকাটি ইংরেজি ও বাংলায় প্রকাশিত হত। মাসিক মূল্য এক টাকা।

মতাদর্শ বা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উপরোক্ত পত্রিকাগুলির অধিকাংশই এক-একটি বিশেষ আদর্শ বা সমাজভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। তদানীন্তন বাংলাদেশের ধর্ম ও সমাজ আন্দোলনের বিভিন্ন শরিক অথবা বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী বাঙালী গোষ্ঠী এক-একটি পত্রিকাকে সমর্থন ও সাহায্য করতেন বা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে প্রকাশ করতেন। ধর্ম ও মতবাদ প্রচার অথবা জনসংযোগের জন্য যেমন পত্রিকা প্রচারিত হত, তেমনই আবার বিশুদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞান ও বুদ্ধির চর্চার জন্যও পত্রিকা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ধর্ম-কলহের সংকীর্ণতা থেকে ক্রমে পত্রিকাকাররা বুদ্ধিমুক্তির সাধনায় ব্রতী হন।

---

১ Long's 'Returns relating to publications in the Bengalee Language in 1857' (Selections from the Records of the Bengal Govt. No. XXXII), 1859. *Long's Catalogue of Bengali Works*, 1855.

ধর্ম সংরক্ষণ ও সংস্কারের দোটানা থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমশ তাঁরা বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চায় উৎসাহী হন, শাস্ত্রবাক্য ও নীতিকথার গণ্ডি ছাড়িয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ইতিহাস-ভূগোল চর্চায় তাঁদের মনোযোগ দেখা যায়, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-বিচারের চুলচেরা তর্ক ছেড়ে তাঁরা তখন মানবকল্যাণবোধে অনুপ্রাণিত উদার জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। ফলত বাংলা মুদ্রণের বিস্তার পর্বে বাংলা সাময়িকপত্র সম্বাদ কৌমুদী-সমাচার চন্দ্রিকার পর্ব (১৮২১-২২) থেকে জ্ঞানান্বেষণ-জ্ঞানোদয়-বিজ্ঞানসেবধি-বিজ্ঞানসারসংগ্রহ-এর পর্বে (১৮৩১-৩৩) উপনীত হতে পেরেছিল। ভাবাদর্শের দিক দিয়ে বাংলা সাময়িকপত্রের এই বিবর্তন লক্ষণীয়। আলোচ্য পর্বে বাংলা সাময়িকপত্রাদি ধর্ম-প্রচারকের হাতিয়ার বা কোনো গোষ্ঠীর মুখপত্র হিসাবে, অথবা নিছক ব্যক্তিগত সাহিত্য প্রয়াস হিসাবে, কখনো বা ব্যবসায়িক স্বার্থে, আবার কখনো নিছক সংবাদ বা নানা বিষয়ক সরকারী-বেসরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারার্থে প্রকাশিত হয়েছে। মত ও আদর্শ এবং উপজীব্য বিষয়বস্তু অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করলে তখনকার বিশিষ্ট বাংলা পত্রিকাগুলিকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন :

প্রথমত, রক্ষণশীল (Conservative)	: সমাচার চন্দ্রিকা, সম্বাদ তিমিরনাশক, সম্বাদ : রত্নাকর
দ্বিতীয়ত, মধ্যপন্থী বা উদারনৈতিক / সংস্কারবাদী (moderate/ reformist)	: ব্রাহ্মণসেবধি, সম্বাদ কৌমুদী, বঙ্গদূত, সম্বাদ : সুধাকর
তৃতীয়ত, আমূল সংস্কারবাদী / নব্যতন্ত্রবাদী (radical)	: জ্ঞানান্বেষণ
চতুর্থত, খ্রীস্টধর্মপ্রচারকামী (Christian Missionary)	: গস্পেল মাগাজীন, খ্রীস্টের রাজ্যবৃদ্ধি
পঞ্চমত, সাধারণ সংবাদ পরিবেশক / শিক্ষামূলক / বিজ্ঞান বিষয়ক / জ্ঞান ও বুদ্ধিচর্চায় উৎসাহী (General news & others)	: সমাচার দর্পণ, দিগ্‌দর্শন, পশ্বাবলী, : জ্ঞানোদয়, বিজ্ঞান সেবধি, বিজ্ঞানসারসংগ্রহ

এইসব বাংলা সাময়িকপত্রাদির আবির্ভাবের ফলে বাংলা মুদ্রণের ক্ষেত্রে আরো একটি বড়ো উপকার সাধিত হয়েছিল। এইসব পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে কলকাতায় অনেকগুলি ছাপাখানা গড়ে উঠেছিল এবং অনেক বিত্তশালী বাঙালী মুদ্রণব্যবসায়ে উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। তার ফলে স্বভাবতই বাংলা মুদ্রণের বিস্তার পর্ব ত্বরান্বিত হয়েছিল। তখনকার নব প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল : চোরবাগান স্ট্রীটের বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস, কলুটোলার চন্দ্রিকা যন্ত্র, মীর্জাপুর স্ট্রীটের সম্বাদতিমিরনাশক ছাপাখানা, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের বঙ্গদূত প্রেস, সিমলা স্ট্রীটের সংবাদ

প্রভাকর প্রেস, জোড়াবাগান স্ট্রীটে সম্বাদ সুধাকরের প্রেস, চোরবাগানে জ্ঞানান্বেষণের প্রেস, পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটে সম্বাদ রত্নাকরের প্রেস, বাঁশতলা গলির রত্নাবলী প্রেস, ভবানীপুরের বৃত্তান্তবাহক প্রেস। পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর সংবাদপত্র ও বাংলা মুদ্রণ বিষয়ে বিলক্ষণ উৎসাহী ছিলেন। প্রথমে তাঁরই ব্যয়ে চোরবাগানে এক ভাড়া করা মুদ্রাযন্ত্রে সংবাদ প্রভাকর ছাপা শুরু হয়। কয়েকমাস পরে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়িতেই তিনি প্রভাকরের জন্য নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। [তখনকার কালে চোরবাগান অঞ্চল বাংলা ছাপাখানার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এখানে অনেক ছাপাখানা পরিচালিত হত। চোরবাগান ছাড়া কলুটোলা, আড়পুলি, মেছুয়াবাজার, চিৎপুর, সিমলা, জোড়াবাগান প্রভৃতি অঞ্চলও সেই সময় বাংলা ছাপাখানার কেন্দ্র ছিল।] কানাইলাল ঠাকুর 'সম্বাদ সুধাকর' পত্রিকার জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবস্থা করে দেন। জোড়াবাগানে দেবীচরণ প্রামাণিকের বাড়িতে একটি ছাপাখানা ছিল, সেখানে সম্বাদ সুধাকর পত্রিকা ছাপা হত। এইটিই সুধাসিন্ধু যন্ত্র নামে খ্যাত ছিল।* দেবীচরণ প্রামাণিক, অম্বুজলোচন প্রামাণিক ও নৃসিংহ দাস এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন। সেই সময় অনেক বাংলা বইও এই প্রেসে ছাপা হত, যেমন, দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-কৃত 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' (১২৩৫ সাল / ১৮২৮ খ্রী)। মুদ্রণ বিষয়ে রামমোহন রায়ের আগ্রহ ও উৎসাহও সুবিদিত ছিল। ধর্মতলা স্ট্রীটে তিনি তাঁর নিজস্ব ইউনিটারিয়ান প্রেস স্থাপন করেন।

বাঙালীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কলকাতার এইসব বাংলা ছাপাখানার সঙ্গে শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসও বাংলা সাময়িকপত্রের ধারাকে পরিপুষ্ট করেছিল। বরং বলা উচিত, শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগেই প্রথম বাংলা সাময়িকপত্রের জন্ম এবং আলোচ্য পর্বের সবচেয়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রভাবশালী সংবাদপত্রটি তাঁদের পরিচালনাতেই মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীরামপুর মিশন যেমন বাংলা মুদ্রণে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছিলেন, তেমনই বাংলা সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্র 'দিগ্‌দর্শন' প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত। এর বাংলা সংস্করণের মোট ২৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম বারোটি সংখ্যা মার্চ ১৮১৯ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ১৪টি সংখ্যা পুনশ্চ জানুয়ারি ১৮২০ থেকে শুরু করে নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে প্রকাশিত হতে থাকে, শেষ সংখ্যা বেরোয় ফেব্রুয়ারি ১৮২১। এই সংখ্যাগুলি দু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে একত্রে গ্রন্থাকারে (ডিমাই অক্টেভো আকারে) পুনর্মুদ্রিত হয় ১৮২২ সালে। এই পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত 'দিগ্‌দর্শন' (২ খণ্ড, ১৮২২) জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রভৃতির সংগ্রহে রয়েছে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত ১ম খণ্ডের (এপ্রিল ১৮১৮ থেকে মার্চ ১৮১৯ ও জানুয়ারি থেকে এপ্রিল ১৮২০) মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৭২ + ৯৬, আর ২য় খণ্ডে (মে ১৮২০ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৮২১) রয়েছে

২৭ থেকে ৩৩৭ পৃষ্ঠা। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে যথাক্রমে ১১ ও ৯ পৃষ্ঠাব্যাপী 'দিগ্‌দর্শনের অভিধান' ছাপা আছে।

দিগ্‌দর্শন পত্রিকার আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ: 'দিগ্‌দর্শন। অর্থাৎ যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ। *Dig-Durshun. Or the INDIAN YOUTH'S MAGAZINE*'। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির অনুরোধে দিগ্‌দর্শনের বহু সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত হয়। ১ম-৫ম সংখ্যার প্রতিটি ১০০০ কপি করে, ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যার প্রতিটি ২০০০ কপি করে তাঁদের জন্য ছাপা হয়। প্রতি সংখ্যা ৩৫০০ কপি— বাংলা ২০০০, ইংরেজি-বাংলা ১০০০ ও ইংরেজি সংস্করণ ৫০০ কপি— ৩৫০ টাকা হিসাবে দিগ্‌দর্শনের ১৫টি সংখ্যা ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির জন্য ছাপা হয়। দিগ্‌দর্শনের ৩টি সংস্করণ মিলিয়ে ১৮২১ সালের মধ্যে উক্ত সোসাইটি পত্রিকাটির মোট ৬১২৫০ কপি কিনেছিলেন।[১] ঐগুলি দেশীয় বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হত। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বই তার মূল কারণ। যে বিচিত্র বিষয়ের স্বাদ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চার সুযোগ এই মাসিকপত্রটি এনে দিয়েছিল তার ফলে বুদ্ধিজীবী বাঙালী পাঠকমাত্রই এর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। দিগ্‌দর্শনের শেষ দশটি সংখ্যায় হিন্দুস্থানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়। এর প্রথম দুটি সংখ্যার সূচীর প্রতি দৃষ্টি দিলেও এর বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, প্রথম সংখ্যার (এপ্রিল ১৮১৮: পৃষ্ঠা ১-১৬) সূচী: 'আমেরিকার দর্শন বিষয়। / হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ। / হিন্দুস্থানের বাণিজ্য। / বলুনদ্বারা সাদ্‌লর সাহেবের আকাশগমন। / মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের বিবরণ। / শঙ্কর তরঙ্গের কথা।' দ্বিতীয় সংখ্যার (মে ১৮১৬: পৃষ্ঠা ১৭-৩২) সূচী: 'উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে প্রথম আসিবার কথা। / ভারতবর্ষে জন্মে অথচ ইংগ্লণ্ডে না জন্মে যে ২ বৃক্ষ তাহারদের বিবরণ। / ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের পৌত্রীর মৃত্যু বিবরণ। / বাষ্পের দ্বারা নৌকা চলানের বিষয়। / কোমিল্লার পাঠশালার বিষয়। / মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় বাহাদুরের কথা।'[২]

[১৮২২ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন'-এর পূর্বোক্ত প্রথম খণ্ডের বিষয়-সূচীতে অবশ্য কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, সেখানে প্রথম ভাগের (এপ্রিল ১৮১৮) নির্ঘণ্ট: 'আমেরিকার দর্শন বিষয়ে। / হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ। / হিন্দুস্থানের বাণিজ্য। / বলুনদ্বারা সাদ্‌লর সাহেবের আকাশগমন। / বিসুবিয়স পর্ব্বতবিষয়ে।' দ্বিতীয় ভাগের (মে ১৮১৮) নির্ঘণ্ট: 'উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে প্রথম আসিবার কথা। / ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বৃক্ষ। / ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের পৌত্রীর মৃত্যু

---

১ ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির ৪র্থ বার্ষিক কার্যবিবরণী, পরিশিষ্ট ১; **A. F. Salahuddin Ahmed,** *op. cit.*, p. 80

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক-পত্র', পৃ. ৯

বিবরণ। / বাষ্পের দ্বারা নৌকা চালানের বিষয়ে। / আলক্সেণ্ডের বিষয়ে। / রোমদেশের বাদশাহ্ তীতস।'][1]

প্রথম বাংলা মাসিক পত্র প্রকাশের মাসখানেকের মধ্যেই প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের আবির্ভাব ঘটে। ১৮১৮ সালের মে-জুনের মধ্যে অল্প সময়ের ব্যবধানে দুটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। একটি 'সমাচার দর্পণ' অপরটি 'বাঙ্গাল গেজেটি'। প্রথমটির প্রকাশক শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন, দ্বিতীয়টি বাঙালী পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র হিসাবে পরিচিত। এ দুটির মধ্যে কোন্‌টি প্রথম প্রকাশিত তা নিয়ে আজও বিতর্কের শেষ নেই। এই বিতর্ক ও সংশয়ের মূল কারণ সমাচার দর্পণ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য ও তার প্রায় পুরো সেট যেমন অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে, অপরপক্ষে বাঙ্গাল গেজেটির একটি সংখ্যাও আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা যায়নি। তার ফলে ২৩শে মে ১৮১৮ তারিখে প্রথম প্রকাশিত সমাচার দর্পণের পরিচয় সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও নানা পরোক্ষ তথ্য ও অনুমানের সাহায্যে বাঙ্গাল গেজেটির প্রথম প্রকাশের যে সম্ভাব্য তারিখ নির্দেশ করা হয় স্বভাবতই সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। সুতরাং সংশয় নিরসনের চেষ্টায় এ বিষয়ে প্রচলিত বিভিন্ন অভিমত ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদিকে পুনর্বিচার করা যেতে পারে।

রেভা. লঙের প্রতিবেদনে (১৮৫৫) বলা হয় '*Bengal Gazette*' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮১৬ সালে, সম্পাদক গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, মাসিক মূল্য এক টাকা।[2] কিন্তু এ তথ্য ভুল। ১৮১৬ সালে কোনো বাংলা সংবাদপত্রের অস্তিত্ব আর কোনো তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়নি, দু বছর পরে প্রকাশিত বাঙ্গাল গেজেটির মূল্য ছিল মাসিক দু টাকা, গঙ্গাকিশোরের নামও ভুলক্রমে এখানে গঙ্গাধর বলে উল্লিখিত হয়েছে। সমসাময়িক কিছু দলিল বা কয়েকটি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি ও নিবন্ধাদি থেকে জানা যায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রাক্তন বাঙালী কম্পোজিটর গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কলকাতায় এসে পূর্ণোদ্যমে মুদ্রণ ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং তারই সূত্রে ফেরিস এণ্ড কোম্পানির ছাপাখানা থেকে সচিত্র 'অন্নদামঙ্গল' (১৮১৬) প্রকাশ থেকে শুরু করে পরবর্তী ধাপে নিজস্ব ছাপাখানা, অফিস ও পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও শেষ পর্যন্ত কলকাতা থেকে একটি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের কাজে হাত দেন। স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও গঙ্গাকিশোরের উদ্যোগে প্রকাশিত ঐ পত্রিকাই বাঙালী পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র হিসাবে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করে। ১৮২০ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা গঙ্গাকিশোরের পত্রিকা সম্বন্ধে লেখেন :

---

১ দিগ্‌দর্শন (জাতীয় গ্রন্থাগার, পুস্তক সংখ্যা 182. QC. 82. C.)

২ **'A Return of the Names & Writings of 515 persons...during the last fifty years, and a catalogue of Bengali Newspapers/ Periodicals...from 1818 to 1835 : submitted to Govt. by the Rev. J. Long, 1855'.**

'...Within a fortnight after the publication from the Serampore press of the Somachar Durpun, the first native weekly journal printed in India, he (Gunga Kishore) published another, which we hear has since failed.' ['On the effect of the Native Press in India' : *The Friend of India*, Qly. series, No. I, September 1820, pp. 134-35.] ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়ার এই সাক্ষ্য সত্য হলে অনুমান করা যায়, গঙ্গাকিশোরের বাংলা সংবাদপত্রটি সমাচার দর্পণ প্রকাশের (২৩শে মে ১৮১৮) এক পক্ষকাল মধ্যে অর্থাৎ শুক্রবার (যেহেতু বাঙ্গাল গেজেটি শুক্রবার প্রকাশিত হত) ২৯শে মে বা ৫ই জুন ১৮১৮ তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর পত্রিকাগোষ্ঠীর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ সেদিন কেউ করেছিলেন বলে জানা যায়নি। বিশেষ করে বাঙ্গাল গেজেটির সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন— গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বা তাঁর সহযোগী হরচন্দ্র রায় অথবা রামমোহন রায় বা আত্মীয়সভার অপর কোনো সদস্য, তাঁরা সবাই তখন জীবিত, কিন্তু তাঁদের কেউই সেই সময় সমাচার দর্পণ পত্রিকাই যে অগ্রজ সেই দাবি অগ্রাহ্য করতে এগিয়ে আসেননি। তবে এর প্রায় বছর দশেক পরে সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে শ্রীরামপুর মিশন গোষ্ঠীর বক্তব্যের বিরোধিতা করা হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমাচার দর্পণ সম্পাদক সেই পত্রের দৃঢ় প্রতিবাদ করে লেখেন : 'দর্পণ ও বাঙ্গাল গেজেট।—চন্দ্রিকার এক পত্র লেখক দর্পণে প্রকাশিত এক পত্রের উত্তর দেওনেতে কহেন দর্পণ যে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হয় ইহা তিনি স্বীকার করেন না এবং তিনি কহেন যে দর্পণ প্রকাশ হওনের পূর্বে গঙ্গাকিশোর নামক এক ব্যক্তি প্রথম বাঙ্গাল গেজেট নামে সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে আমারদের এই উত্তর যে আমারদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেট নামে পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু কদাচ পূর্বে নহে। চন্দ্রিকার পত্রপ্রেরক মহাশয় যগুপি অনুগ্রহপূর্বক ঐ বাঙ্গাল গেজেটের প্রথম সংখ্যার তারিখ আমারদিগকে নির্দিষ্ট করিয়া দেন তবে দর্পণের প্রথম সংখ্যার সঙ্গে ঐক্য করিয়া ইহার পৌর্ব্বাপর্য্যের মীমাংসা শীঘ্র হইতে পারে। যগুপি তাঁহার নিকটে ঐ পত্রের প্রথম সংখ্যা না থাকে তবে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের যে ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদ পত্রে তৎপত্রের ইশ্‌তেহার প্রকাশ হয় তাহাতে অন্বেষণ করিতে হইবে। যেহেতুক ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভাষায় যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া তৎসম্ভ্রম অনিবার্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষা করা যাইবে না।' ['সমাচার দর্পণ, ১১ জুন, ১৮৩১]

সমাচার দর্পণের এই বক্তব্য খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় এবং এর প্রতিবাদে সমাচার চন্দ্রিকা বা অন্য কেউ আর কোনো প্রমাণাদি উপস্থাপিত করেছিলেন বলে জানা যায় না।

এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক আর যে দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেগুলি বিচার করা যেতে পারে।[১] কলকাতার সমসাময়িক ইংরেজি সাপ্তাহিক 'গভর্নমেণ্ট গেজেট'-এর ১৪ মে ১৮১৮ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের সংকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়। বিজ্ঞপ্তিটির একাংশে জানানো হয় : HURROCHUNDER ROY begs leave to imform his Friends and the Public in general, that he has established a BENGALEE PRINTING PRESS, at No. 45, Chorebagaun Street, where he intends to publish a WEEKLY BENGAL GAZETTE...' হরচন্দ্র রায়ের এই বিজ্ঞপ্তিটির তারিখ ১২ই মে ১৮১৮, সেদিন তিনি সাপ্তাহিক বাঙ্গাল গেজেটি প্রকাশের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেছেন। তখনো পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়নি। কয়েকদিন পরে ১৬ মে ১৮১৮ তারিখের 'ওরিয়েন্টাল স্টার' পত্রিকায় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সম্বন্ধে আরেকটি সংবাদ প্রকাশিত হয়, যেটি লণ্ডনের এশিয়াটিক জার্নাল পত্রিকার জানুয়ারি, ১৮১৯-সংখ্যায় পুনশ্চ উদ্ধৃত হয়। সংবাদটি ছিল এইরূপ :

BENGALEE NEWSPAPER

From the Oriental Star, May 16.—Amongst the improvements which are taking place in Calcutta, we observe with satisfaction that the publication of a Bengalee newspaper has been commenced. The diffusion of general knowledge and information amongst the natives must lead to beneficial effects ; and the publication we allude to, under proper regulations, may become of infinite use, by affording the more ready means of communication between the natives and the European residents. ['*The Asiatic Journal and Monthly Register*' (London), January 1819, p. 59]

অনুমান করা যেতে পারে, কলকাতা থেকে যে বাংলা সংবাদপত্র 'প্রকাশিত হয়েছে' বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা বাঙ্গাল গেজেটি প্রসঙ্গে লিখিত। কারণ সমাচার দর্পণ আরো এক সপ্তাহ পরে, ২৩ মে ১৮১৮ তারিখে, এবং শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়। তা হলে বিবেচ্য, এই সংবাদের ভিত্তিতে কি ধরে নেওয়া চলে যে সমাচার দর্পণের পূর্বেই— ১৬ই মে ১৮১৮ তারিখের মধ্যে বাঙ্গাল গেজেটি প্রকাশিত হয়েছিল? এ সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংশয় ও ব্যাখ্যা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়। তিনি বলেন: '১৪ মে ১৮১৮ তারিখের "গভর্ণমেণ্ট গেজেটে" মুদ্রিত ১২ মে তারিখ যুক্ত বিজ্ঞাপনে (ইতিপূর্বে উদ্ধৃত) "বাঙ্গাল গেজেটি" "বাহির হইবে" ('intends to publish') বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং "ওরিয়েন্টাল ষ্টারের" ১৬ মে তারিখের সংবাদে দেখা যাইতেছে, "The publication

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক-পত্র', পৃ. ১২-১৩

of a Bengalee Newspaper has been commenced." তাহা হইলে, ১২ হইতে ১৬ মে তারিখের কোনো এক দিনে "বাঙ্গাল গেজেটি" প্রকাশিত হইয়াছিল। "বাঙ্গাল গেজেটি' প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হইত, সুতরাং ১৫ মে ১৮১৮ (শুক্রবার) তারিখে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে। "বাঙ্গাল গেজেটি" "বাহির হইবে" এই বিজ্ঞাপন ১৪ মে বাহির হইবার পর দিনই ১৫ মে তারিখে কাগজ বাহির হইয়াছে এবং এই ১৫ তারিখেই "ওরিয়েন্টাল ষ্টারের" সাহেব সম্পাদক সেই পত্রিকা দৃষ্টে সেইদিনই তাহার উপর মন্তব্য লিখিয়াছেন ও সেই মন্তব্য তাহার পরের দিন অর্থাৎ ১৬ প্রকাশিত হইয়াছে— এই জাতীয় তৎপরতা সে যুগে সম্ভব ছিল কি না, বিশেষভাবে বিবেচ্য। সে যুগের ছাপাখানা ও সংবাদপত্র পরিচালন ব্যাপারে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারাই বুঝিবেন, ইহার মধ্যে কোনো গল্‌তি থাকা সম্ভব। আমার বিশ্বাস, এই সংবাদের অর্থ—"বাঙ্গাল গেজেটি" প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে; "the publication···has been commenced" কথাগুলির দ্বারা সম্পাদক মহাশয় ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।'[১] ওরিয়েন্টাল ষ্টার সম্পাদক সম্ভবত ১৬ মে ১৮১৮ তারিখের গভর্নমেন্ট গেজেটের বিজ্ঞপ্তিকে (পূর্বে উদ্ধৃত) ভিত্তি করেই তাঁর ১৬ মে ১৮১৮ তারিখের সংখ্যায় কলকাতায় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বাঙ্গাল গেজেটি প্রকাশের সংবাদ ঘোষণা করেন এবং হয়ত অনবধানতাবশত যে পত্রিকা 'প্রকাশিত হবে' বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল তাকেই 'প্রকাশিত হয়েছে' বলে উল্লেখ করেন।

সুতরাং এই যুক্তি-তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমার পূর্বোদ্ধৃত অনুমান, অর্থাৎ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের (ও হরচন্দ্র রায়ের) বাঙ্গাল গেজেটি যে সমাচার দর্পণ প্রকাশের অব্যবহিত পরে এক শুক্রবার, ২৯ মে বা ৫ জুন ১৮১৮ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল তা যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়। ('দুই সপ্তাহ পরে' ধরলে, ৫ জুন ১৮১৮ তারিখেই বাঙ্গাল গেজেটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে)।

তবে একথা অনস্বীকার্য, দু-এক সপ্তাহ আগে পরে প্রকাশিত হলেও বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে পথপ্রদর্শকের গৌরব সম্ভবত দুটি পত্রিকাই দাবি করতে পারে, কারণ পত্রিকা দুটি শ্রীরামপুর ও কলকাতা থেকে একে অন্য-নিরপেক্ষ হয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ পরিকল্পনা ও সামর্থ্য অনুযায়ী প্রকাশিত ও পরিচালিত হয়। তবে বাংলা সংবাদপত্রের আদি যুগে সমাচার দর্পণ সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবশালী পত্রিকা, অপরপক্ষে বাঙ্গাল গেজেটি একটি স্বল্পস্থায়ী প্রয়াস মাত্র।

সমাচার দর্পণের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর আভাস তার প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি থেকেই জানা যায়:

'এই সমাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে ছাপান যাইবে তাহার মধ্যে এই ২ সমাচার দেওয়া যাইবে।

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ১৪-১৫

'১ এতদ্দেশের জজ ও কলেক্তর সাহেবেরদের ও অন্য রাজকর্ম্মাধ্যক্ষেরদের নিয়োগ।

'২ শ্রীশ্রী যুত বড় সাহেব যে ২ নূতন আয়িন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন।

'৩ ইংগ্লণ্ড ও ইউরোপের অন্য ২ প্রদেশ হইতে যে ২ নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

'৪ বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ।

'৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া। •

'৬ ইউরোপ দেশীয় লোককর্ত্তৃক যে ২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে এবং যে ২ নূতন পুস্তক মাসে ২ ইংগ্লণ্ড হইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যে ২ নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।

'৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।'

বাঙ্গাল গেজেটি প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে (১৪ মে ১৮১৮) ও কিছু পরে (৯ জুলাই ১৮১৮) গভর্নমেন্ট গেজেট পত্রিকায় প্রকাশিত হরচন্দ্র রায়ের দুটি বিজ্ঞাপন থেকে বাঙ্গাল গেজেটি পত্রের বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যায়। এই পত্রে সরল, সংক্ষিপ্ত ও বিশুদ্ধ বাংলায় সরকারী আইন, বিজ্ঞপ্তি ও কর্মচারী-নিয়োগ সংক্রান্ত নানা সংবাদ এবং পাঠকদের রুচিকর এইরূপ অন্যান্য স্থানীয় সংবাদ যথাসম্ভব আকর্ষণীয় ভাবে পরিবেশন করা হত। [...'a WEEKLY BENGAL GAZETTE, which he (HURROCHUNDER ROY) publishes on Fridays, containing the Translation of Civil Appointments, Government Notifications and Regulations, and such other LOCAL MATTER as are deemed interesting to the Reader, into a plain, concise and correct Bengalee language.' (*Government Gazette*, 9th July 1818.)] এ ছাড়াও হিন্দু সমাজের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সংক্রান্ত সংবাদ এবং চলতি মাসের পরবর্তী মাসের পঞ্জিকা/তিথি-সংবাদ বাঙ্গাল গেজেটি পত্রে প্রকাশিত হত। [.. 'to which will be added the Almanack, for the subsequent Months, with the Hindoo Births, Marriages, and Deaths.' (*Government Gazette*, 14th May, 1818.)]

বাঙ্গাল গেজেটি প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হত, মাসিক চাঁদা দু টাকা। পত্রিকাটি বছর-খানেক চলে বন্ধ হয়ে যায়। সমকালীন *Asiatic Journal* (July 1819, p. 69) পত্রিকা থেকে জানা যায় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' বাঙ্গাল গেজেটি পত্রে পুনর্মুদ্রিত হয়— সম্ভবত ১৮১৯-এর গোড়ার দিকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রামমোহনের এই গ্রন্থটি প্রথম হরচন্দ্র রায় কর্তৃক তাঁর ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়। পরে তাঁদের পত্রিকাতেই (বাঙ্গাল গেজেটি) এটি পুনর্মুদ্রিত হয়। লণ্ডনের 'এশিয়াটিক জার্নাল' পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বোক্ত তথ্যটি কলকাতার সমকালীন পত্র *India*

Gazette থেকে উদ্ধৃত। এতে লেখা হয়—'We have been informed this little work (on Suttees) has been republished in a newspaper, which for some time past has been printed and circulated in the Bengalee language and character, under the sole conduct of natives. This additional publicity which the labours of Rammohun Roy will obtain, cannot fail to produce beneficial consequences ; and we are happy to find that the conductors of the Bengalee journal have determined to give insertion to articles that are likely to prove more advantageous to their countrymen, than the pompous and inflated productions of a most learned Hindoo, who, we understand, has declared that the cholera morbus can never be overcome, until general puja shall be performed to conciliate the angry deity, by whom his affliction has been occasioned.'[১] তখন বাঙালী-পরিচালিত অপর কোনো বাংলা সংবাদপত্র ছিল না, সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে এই উদ্ধৃত অংশে বাঙ্গাল গেজেটির কথাই বলা হয়েছে।[২]

এখন পরবর্তী সংশয়, বাঙ্গাল গেজেটির সঙ্গে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায়ের সম্পর্ক নিয়ে। ঐ পত্রিকার প্রকৃত মালিক বা সম্পাদক বা প্রকাশক/মুদ্রাকর কে ? প্রথমেই ধরা যেতে পারে, গভর্নমেণ্ট গেজেট পত্রে— ১৪ মে ১৮১৮ ও ৯ জুলাই ১৮১৮ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি দুটির কথা। বাঙ্গাল গেজেটি পত্র প্রকাশের পূর্বে ও পরে প্রকাশিত ঐ দুটি বিজ্ঞপ্তিই হরচন্দ্র রায়ের নামে প্রকাশিত এবং তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে, পত্রিকাটি একান্তভাবে হরচন্দ্র রায়ের নিজস্ব, অর্থাৎ তিনিই এর স্বত্বাধিকারী (ও সম্পাদক/প্রকাশক) এবং সংশ্লিষ্ট প্রেসেরও মালিক। বিজ্ঞাপন দুটির ভাষা লক্ষণীয় : 'HURROCHUNDER ROY begs leave to inform his Friends and the Public in general, that he has established a BENGALEE PRINTING PRESS at No. 45, Chorebagaun Street, where he intends to publish a WEEKLY BENGAL GAZETTE,···Advertisement for insertion in this Gazette, will be received at 2 Annas per line. English and Persian, the same price.

'Gentlemen wishing to become Subscribers to this Weekly Publication will be pleased to send their Names to HURROCHUNDER ROY,

---

১ J. N. Mazumdar, '*Raja Rammohan Roy and Progressive Movement in India*', pp. 117-18 ; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য', পৃ. ৩১৫-১৬

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা' (১ম) : 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য'।

at his PRESS, No. 45, Chorebagaun Street, where every information will be thankfully received.

'The Price of Subscription is 2 Rupees per Month. Extras included. Calcutta, 12th May, 1818.' [*Government Gazette*, 14 May 1818.] পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে যাবার মাসাধিককাল পরে হরচন্দ্র রায় পুনশ্চ বিজ্ঞাপন দেন :

' HURROCHUNDER ROY

Having established a BENGALEE PRINTINC PRESS and a WEEKLY BENGAL GAZETTE,...earnestly hopes that in consideration of the heavy expenses which he has incurred, Gentlemen who have a knowledge and proficiency in that language, will be pleased to patronize his undertaking, by becoming subscribers to the BENGAL GAZETTE. No Publication of this nature having hitherto been before the Public HURROCHUNDER ROY trusts that the community in general will encourage and support his exertions in the attempt which he has made, and afford him a small share of their Patronage.

'Gentlemen wishing to become Subscribers to this WEEKLY PUBLICATION will be pleased to send their names to HURROCHUNDER ROY, at his Press, No. 145, Chorebagan Street, where every information will be thankfully received. The Price of Subscription is 2 Rupees per month. Extras included. Calcutta, Chorebagan Street, No. 145.' [*Government Gazette*, 9th July 1818.]

বিজ্ঞাপনের এই ভাষা নিঃসন্দেহে মূল উদ্যোক্তা ও স্বত্বাধিকারীর। হরচন্দ্র রায়ই চোরবাগান স্ট্রীটে তাঁর বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন ও সেখান থেকে তাঁর সাপ্তাহিক বাঙ্গাল গেজেটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই উদ্যোগে ('undertaking') তিনি শুরুতেই প্রচুর অর্থব্যয় করেন ('heavy expenses···he has incurred')। সুতরাং বলা যায়, তিনিই ছাপাখানা ও পত্রিকার মালিক এবং তাঁর উদ্যোগেই পত্রিকাটি প্রকাশিত ও পরিচালিত হয়। জানা যায়, এই হরচন্দ্র রায়ও প্রথম জীবনে মুদ্রণের পীঠস্থান শ্রীরামপুরের অধিবাসী ছিলেন, পরে তিনি কলকাতায় গিয়ে মুদ্রণব্যবসায়ে উদ্যোগী হন। রামমোহন রায় ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'র সঙ্গে হরচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল। রামমোহন রায়ের 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০) বইটির মুদ্রাকর / প্রকাশক ছিলেন হরচন্দ্র রায়, বইয়ের শেষে লেখা আছে— 'শ্রীযুত হরচন্দ্র রায়ের দ্বারা—'। রামমোহনের

'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' (১৮১৮) বইটিও হরচন্দ্র রায় প্রকাশ করেন।[১]

কিন্তু বাঙ্গাল গেজেটি পত্রের সঙ্গে হরচন্দ্র রায় ছাড়াও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের নাম জড়িত হয়ে পড়েছে। [গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য : বিকাশ পর্ব— ৪র্থ অধ্যায় ও ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।] *Friend of India* (Qly. Sept. 1820) বা সমাচার দর্পণ (১১ জুন ১৮৩১) পত্রিকার পূর্বোদ্ধৃত সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে বাঙ্গাল গেজেটি প্রসঙ্গে গঙ্গাকিশোরের নাম জানা যায়। এমন-কি কোনো কোনো মহলে বাঙ্গাল গেজেটি একান্তভাবে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের পত্রিকা বলেই পরিচিত। আসলে গঙ্গাকিশোর ছিলেন এর মুদ্রাকর / প্রকাশক। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রাক্তন কম্পোজিটর গঙ্গাকিশোর ঐ সময়ে কলকাতায় একজন বিশিষ্ট মুদ্রাকর, প্রকাশক ও পুস্তক-ব্যবসায়ী হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস থেকে সচিত্র বাংলা 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশ করে ১৮১৬ সাল থেকেই গঙ্গাকিশোর কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ক্রমে ক্রমে আরো অনেক স্বরচিত বা সম্পাদিত বই, যেমন, বাংলা ভাষায় ইংরেজি ব্যাকরণ (১৮১৬), দায়ভাগ (১৮১৬-১৭) বা গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, লক্ষ্মীচরিত্র, চাণক্যশ্লোক, বেতালপঞ্চবিংশতি, সঙ্গীত-তরঙ্গিণী বা লল্লুলালের সহযোগে রামমোহন রায়ের কিছু কিছু বই— বেদান্ত অনুবাদ, ঈশোপনিষদ, কেনোপনিষদ, প্রভৃতি ছেপে তিনি মুদ্রাকর হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।[২] তা ছাড়াও গঙ্গাকিশোর কলকাতায় তাঁর নিজস্ব বইয়ের দোকান-অফিস-মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে প্রকাশক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। সুতরাং ঐ সময়ে হরচন্দ্র রায় তাঁর মুদ্রাযন্ত্র ও বাংলা পত্রিকা স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে স্বভাবতই গঙ্গাকিশোরের সহযোগিতা লাভে আগ্রহী হন। গঙ্গাকিশোর বাঙ্গাল গেজেটির মুদ্রাকর হিসাবে হরচন্দ্রের সঙ্গে যোগদান করেন। [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুরূপ মত পোষণ করেন। অবশ্য বাঙ্গাল গেজেটি যে ১৫ই মে ১৮১৮ প্রকাশিত হয় তাঁর এই মত সমর্থন করা যায় না। তিনি লেখেন : 'হরচন্দ্র রায় ১৫ই মে বাঙ্গাল গেজেটি নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, গঙ্গাকিশোর ছিলেন তার মুদ্রাকর ও প্রকাশক— সম্পাদকও নন, প্রেসের মালিকও নন।][৩] তখনকার দিনে প্রকাশন জগতে মুদ্রাকরেরই প্রাধান্য ছিল বেশি। সেই হিসাবে সম্পাদক বা স্বত্বাধিকারী না হলেও মুদ্রাকর হিসাবেই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের নামই বাঙ্গাল গেজেটির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়ে এবং সাধারণ্যে এটি তাঁরই পত্রিকা হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। সম্ভবত হরচন্দ্র রায় ও গঙ্গাকিশোরের মধ্যে যোগাযোগের সূত্র ছিলেন রামমোহন রায়। [উভয়েই রামমোহনের বিভিন্ন বইয়ের প্রকাশক ছিলেন। রামমোহনের 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও

১ Calcutta School Book Society, 3rd Report (Appendix) : 11 Oct. 1820.

২ *Ibid.*

৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য', পৃ. ১২৮

নিবর্তকের সম্বাদ' (১৮১৮) হরচন্দ্র রায় প্রকাশ করেন— ১০০০ কপি। আত্মীয় সভার নির্বাহক বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বাঙ্গাল গেজেটি ছাপাখানার সঙ্গে জড়িত থাকতে দেখা যায়। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে 'শ্রীভগবদ্গীতা গ্রন্থ…মোং কলিকাতার বাঙ্গাল গেজেটি আপিসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপা করিয়াছেন।…'[১]]

কিন্তু অনতিকাল পরেই হরচন্দ্র রায়ের সঙ্গে গঙ্গাকিশোরের মতানৈক্য দেখা দেয়। ফলে তাঁদের মধ্যেকার ব্যবসায়িক যোগ ছিন্ন হয়ে পড়ে। সম্ভবত সেই কারণেই বাঙ্গাল গেজেটি বছরখানেক চলে বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকার ছাপাখানায় হরচন্দ্রের সঙ্গে গঙ্গা-কিশোরেরও অংশ ছিল। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ায় গঙ্গাকিশোর তাঁর মুদ্রণযন্ত্র ('বাঙ্গাল যন্ত্র') নিজ গ্রাম বহড়ায় নিয়ে যান। ১৮১৯ সালে গঙ্গাকিশোর বহড়ায় চলে যান। ত্রৈমাসিক ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার সেপ্টেম্বর, ১৮২০ সংখ্যায় তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখ আছে…'having disagreed with his co-adjutor, he has now removed his press to his native village.' হরচন্দ্র রায়ও তাঁর প্রেস ৯নং আড়পুলি লেনে স্থানান্তরিত করেন। উভয়েই আরো কিছুকাল তাঁদের নিজ নিজ নতুন মুদ্রণকর্মস্থল থেকে মুদ্রণ-প্রকাশনের কাজে জড়িত ছিলেন।

আড়পুলি ও বহড়ায় মুদ্রণপ্রচেষ্টার পূর্বে হরচন্দ্র রায় ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য যৌথ-ভাবে চোরবাগানে বাংলা সংবাদপত্র মুদ্রণ-প্রকাশনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। বাঙালী পরিচালিত ঐ প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বাঙ্গাল গেজেটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেই হিসাবে তাঁদের প্রথম ছাপাখানাটি সম্বন্ধে স্বাভাবিক কৌতূহলবশত আরো কিছু তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা আমি করেছি। বাঙ্গাল গেজেটি প্রেসটি ছিল কলকাতায় ১৪৫নং চোরবাগান স্ট্রীটে। [গভর্নমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হরচন্দ্রের প্রথম বিজ্ঞাপনে অবশ্য ঠিকানা ছিল ৪৫নং চোরবাগান স্ট্রীট, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনে ঠিকানা দেওয়া হয় ১৪৫নং চোরবাগান স্ট্রীট। প্রথম বিজ্ঞাপনটি পত্রিকা প্রকাশের আগে বেরোয়, দ্বিতীয়টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে যাবার মাসাধিক কাল পরে প্রকাশিত হয়। সুতরাং দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনের ঠিকানাটিই সঠিক বলে মনে হয়।] এই চোরবাগান সমসাময়িককালে কলকাতায় বাংলা মুদ্রণের অন্যতম বৃহৎ কেন্দ্র ছিল। 'জ্ঞানান্বেষণ', 'সংবাদ প্রভাকর' (প্রথমদিকের) প্রভৃতি বেশ কয়েকটি বাংলা সাময়িকপত্র এই অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এছাড়াও চোরবাগান অঞ্চলের ছাপাখানা থেকে ঐ সময় অনেক বাংলা বইও ছাপা হয়। বাঙ্গাল গেজেটি পত্রের ছাপাখানা ও তার আদি ভিটে সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, অধুনা চোরবাগান স্ট্রীট বলে কোনো রাস্তার অস্তিত্ব নেই, আছে চোরবাগান লেন (ওয়ার্ড নং ২৭ ; পোস্ট অফিস বড়বাজার, কলকাতা-৭)— সেণ্ট্রাল এভিনিউ ও কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ১২৯/১

---

১ সমাচার দর্পণ, ৪ সেপ্টেম্বর ১৮১৯ ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১ম), পৃ. ৭১

মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে উত্তরদিকে এগিয়েছে। চোরবাগান লেনে এখন ৩৯নং (39-B)-এর বেশি আর কোনো বাড়ি নেই। তবে মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে এখনো ১৪৫নং বাড়ি রয়েছে, এটি চোরবাগান লেন ও মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের সংযোগস্থল থেকে সামান্য দূরে সাত-আটটি বাড়ি পরে অবস্থিত। [মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে এখন আর ৪৫নং বাড়ির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, কলকাতা কর্পোরেশনের নথিপত্রেও এর কোনো হদিশ নেই।] ১৪৫নং মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের বর্তমান বাড়িটি একটি বৃহৎ দ্বিতল বাড়ি, এটি এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ গোয়েঙ্কা হাসপাতাল। কর্পোরেশনের ১৯৫৫-৫৬ সালের 'এ্যাসেসমেণ্ট রেকর্ড' (Assessment Record) থেকে জানা যায়, তখন বাড়িটির মালিক ছিলেন ঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা ও অন্যান্যরা। প্রশ্ন থেকে যায়, এ বাড়িটি প্রথম কে কবে তৈরি করিয়েছিলেন ? এখানেই কি পূর্বতন ১৪৫নং চোরবাগান স্ট্রীটস্থ 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রিকার ছাপাখানাটি ছিল ?

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৮১৯ সালে এখান থেকেই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য তাঁর মুদ্রাযন্ত্রটি নিজ গ্রাম বহড়ায় নিয়ে যান ও সেখান থেকে আরো প্রায় বছর বারো তিনি বিভিন্ন বাংলা বই মুদ্রণ, প্রকাশন ও বিক্রয়ের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর জীবনের এই শেষ পর্ব সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য আমি উদ্ধার করতে পেরেছি প্রসঙ্গক্রমে তা এখানেই উল্লেখ করা হল এবং তাঁর কর্মসাধনার সঙ্গে যুক্ত বহড়া গ্রাম সম্বন্ধেও যে তথ্যানুসন্ধান করা গেছে তাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রাচীন বহড়া (বহেড়া, বহরা, বা বহেরা বানানও চালু আছে) গ্রাম সঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল সে বিষয়ে এখনো মতান্তর আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন বহরা গ্রাম ছিল শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী। [সাহিত্যসাধক চরিতমালা (১ম)] বহুকাল তার বেশি জানার বা নতুন তথ্যাবিষ্কারের প্রয়াস গবেষকদের মধ্যে বিশেষ দেখা যায়নি। অথচ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই গ্রামের যে একটি বিশিষ্ট মর্যাদার স্থান ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলকাতার বাইরে অল্প যে দু-একটি জায়গায় বাংলা মুদ্রণের কেন্দ্র ছিল, বহরা তার অন্যতম। শ্রীরামপুরের আশেপাশে এই গ্রামের অস্তিত্বকে যাচাই করার জন্য আমি তাই ব্যাপক অনুসন্ধান করেছি। স্থানীয় এলাকায় লোকমুখে প্রচলিত একটি ধারণা যে শ্রীরামপুর থেকে ৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বর্তমান বড়া গ্রামে গঙ্গাকিশোরের আদি বাসস্থান ছিল। বড়া গ্রামটি হুগলী জেলাস্থিত বর্তমান 'বড়া অঞ্চল'-এর অন্তর্গত, শ্রীরামপুর-শিয়াখালা বাস রাস্তার উপর (৩১নং বাসরুট, যা শ্রীরামপুর কোর্টের কাছ থেকে শুরু হয়েছে) অবস্থিত। কিন্তু বড়ায় গিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান করেও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের কোনো বংশধর বা তাঁদের আদি ভিটের কোনো সন্ধান আমি পাইনি। সেখানে যে এককালে (দেড়শো বছর আগে) ছাপাখানা ছিল এমন কোনো তথ্য বা লোকশ্রুতিও জানা যায়নি। অল্প যে দু-একজন বড়া গ্রামকে গঙ্গাকিশোরের নামের

সঙ্গে সম্পর্কিত করতে চান (যেমন, ওখানকার জনৈক এম. এল. এ. বা শ্রীরামপুরবাসী জনৈক আইনজীবী) তাঁদের কাছেও কোনো যুক্তি বা তথ্য-প্রমাণ পাইনি। বড়ার আদি বাসিন্দাদের অল্প যে দু-একজনের সাক্ষাত পেয়েছিলাম (যেমন, বড়ানিবাসী ৮১ বৎসর বয়স্ক ডঃ রামচন্দ্র মিত্র বা শ্রীরামপুরনিবাসী বৃদ্ধ শিক্ষক শ্রীললিতমোহন মুখার্জী : ঠাকুর বাড়ি স্ট্রীট, বল্লভপুর বাজার, শ্রীরামপুর) তাঁদের কেউই মনে করেন না যে ওখানে প্রাচীন বহড়া অবস্থিত ছিল। আমারও অনুরূপ ধারণা— বহড়ানিবাসী গঙ্গাকিশোর বর্তমান বড়ার আদি বাসিন্দা ছিলেন না।

এ ছাড়া আরো একটি বিষয় চিন্তনীয়। গঙ্গাকিশোরের পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁর একটি বইয়ে উল্লেখ পাই যে তিনি ছিলেন সুরধুনী বা গঙ্গাতীরস্থ বহরা-নিবাসী। ['সুরধনী তিরে ধাম ধন্য সে বহরাগ্রাম গঙ্গাকিশোর নাম দ্বিজদিন অতি ॥ চন্দ্রতেজ করি চুর তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর ভুবনে দ্বিতীয়শূর মহারাজা তাঁর অধিকারেতে বসতি ॥' : গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বিরচিত 'চিকিৎসার্ণব', কলিকাতা, ১৮২? (?) থেকে উদ্ধৃত। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।) রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই বইয়ের এক খণ্ড রক্ষিত আছে : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১ম), 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য', পৃ. ২০-২১।] কিন্তু বর্তমান বড়া গ্রাম গঙ্গার তীর থেকে প্রায় মাইল ছয়েক দূরে অবস্থিত। সুতরাং গঙ্গাকিশোরের বাসভূমি বহরা গ্রাম সম্ভবত অন্য কোথাও অবস্থিত ছিল। এই সূত্র ধরে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি অপর একটি জায়গার সন্ধান পাই যার বর্তমান নামও বহরা। এটি শ্রীরামপুরের পার্শ্ববর্তী কোন্নগর স্টেশনের পশ্চিমে অবস্থিত, পাশাপাশি দুটি গ্রাম— ছোটো বহরা ও বড়ো বহরা নামে পরিচিত। এককালে এই সব অঞ্চল বর্ধমান-মহারাজার জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। বর্তমান বহরা শ্রীরামপুর থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে অবস্থিত, তা ছাড়া গঙ্গার তীর থেকে এর দূরত্ব মাইলখানেক। আসলে এই বহরা গ্রাম এককালে গঙ্গাতীরস্থ কোন্নগরেরই অন্তর্গত ছিল, পরে তার মাঝামাঝি অঞ্চল দিয়ে রেললাইন পাতা হয়েছে। সুতরাং প্রাথমিক বিচারে অনুমান করা যেতে পারে সুরধুনী-তীরস্থ এই বহরা গ্রামই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের আদি বাসস্থান ছিল। অনুসন্ধানে জানা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই বহরা-ন'পাড়া এক বর্ধিষ্ণু স্থান ছিল। তখন এখানে অনেকগুলি টোল ছিল— সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার অন্যতম পীঠস্থান হিসাবে এই গ্রামের প্রাচীন পরিচিতি সুবিদিত। একে দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলা হত। এখানকার বিদ্যাচর্চার ঐতিহ্যের সঙ্গে ছাপাখানার অবস্থিতি সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সম্ভব। তখন এখানে অনেক ঘর ভট্টাচার্য বংশের বাস ছিল। অধুনা তাঁদের বংশধরদের কেউ কেউ বন্দ্যোপাধ্যায় পদবী ব্যবহার করেন। তবে দুঃখের বিষয় এই অঞ্চলের যে কজন বয়স্ক আদি বাসিন্দা এখনো জীবিত আছেন তাঁদের কাছে অনুসন্ধান করেও গঙ্গাকিশোরের আদি ভিটে বা তাঁর ছাপাখানার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়নি। [এখানকার একজন

আদি বাসিন্দা শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য জীবনের শেষভাগে মাহেশে বসবাস করতেন। ১৯৭২ সালে প্রায় ১০০ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর দু-এক বছর আগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রাচীন বহরা-ন'পাড়ার টোলের পণ্ডিতদের বংশধর বলে তিনি নিজেকে উল্লেখ করেন, তবে তিনি নিজে যজমানি করতেন। বহরার প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকলেও তিনি অবশ্য বলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্বন্ধে তাঁর কিছু জানা নেই'।]

সুতরাং বহড়ার সন্ধানে আমাদের অন্যত্র দৃষ্টি ফেরাতে হয়।

বর্ধমানের 'দামোদর' পত্রিকার সম্পাদক দাশরথি তা-র উদ্যোগে সংগৃহীত কিছু তথ্য-প্রমাণাদি থেকে সম্প্রতি জানা গেছে যে গঙ্গাকিশোরের আদি বাস ছিল বর্ধমান জেলার 'পুবথুল' বা বর্তমান পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত বহড়া গ্রামে।[১] ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া-বারহাড়োয়া রেললাইনের অগ্রদ্বীপ স্টেশনের নিকটবর্তী এই গ্রামটি ভাগীরথী তীরে অবস্থিত। এককালে ১৮-পাড়া বিশিষ্ট এই বঙ্কিফু' গ্রামে বহু টোল ছিল। গঙ্গাকিশোর তাঁর ছাপাখানাটি কলকাতা থেকে নদীপথে তুলে নিয়ে গিয়ে ১৮১৯ সালে এখানেই স্থাপন করেন। পরবর্তী প্রায় বারো বৎসর কাল তিনি এখানেই তাঁর মুদ্রণের কাজ চালান। তাঁর পরেও ওখানে মুদ্রণের কাজ অব্যাহত ছিল। গঙ্গাকিশোরের বসতবাটির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন আজও বহড়া গ্রামে পাওয়া যায়। প্রাচীন মুদ্রণ-ঐতিহ্যের স্মৃতি হিসাবে এখনো ঐ স্থান 'ছাপাখানা ডাঙা' নামে পরিচিত।

বহড়া গ্রামে ছাপাখানা স্থাপনের জন্য গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যকে প্রদত্ত মূল সরকারী অনুমতিপত্রটি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারী এম. এল. বেইলী স্বাক্ষরিত হাতে লেখা ঐ অনুমতিপত্রের (licence) তারিখ ২ এপ্রিল ১৮১৯। ঐ পত্রে বহড়াকে মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তৎকালে মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধি ছিল কলকাতার পরেই এবং বহড়া (বা বর্তমান অগ্রদ্বীপ) কলকাতা (১৩০ কি. মি.) অপেক্ষা মুর্শিদাবাদেরই (৬৫ কি. মি.) অধিকতর নিকটবর্তী। এখনো ঐ অঞ্চলের মানুষেরা মুর্শিদাবাদের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ। গঙ্গাকিশোর নিযুক্ত 'ভ্রাম্যমান পুস্তক-বিক্রেতা'রা তখন মুর্শিদাবাদে তাঁর বই ফিরি করত। কলকাতা কাউন্সিল চেম্বারের ৬০০ সংখ্যক ঐ অনুমতিপত্রটি ছিল এইরূপ: 'M. L. Bayley having submitted to Government Gangakeysore Bhattacharji's application to be permitted to carry with him to Buhurraw near Moorshidabad his Printing Press, has been authorised to inform Gangakeysore that Government are not aware of any objection to his carrying his intentions into effect.'

---

১ দৈনিক দামোদর, ১৫ মে ১৯৭৫।

দাশরথি তা এই মূল দলিলটি গঙ্গাকিশোরের ভাগিনেয় বংশের বর্তমান উত্তরাধিকারী ভূপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে উদ্ধার করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি ওটি, হরচন্দ্র রায় (কলকাতা, ১৮১৮) ও নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়কে (বহড়া, ১৮৫৭) দেওয়া আরো দুটি মূল সরকারী দলিল সহ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ চিত্রশালায় দান করেন। জানা যায়, গঙ্গাকিশোর নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হন ভাগিনেয় মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পুত্র ছিলেন নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, তস্য পুত্র হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; এবং পূর্বোক্ত ভূপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরই চতুর্থ পুত্র। গঙ্গাকিশোরের উত্তরকালে মহেশচন্দ্র ঐ ছাপাখানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ; তাঁর ছাপা বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। বহেড়ায় মুদ্রাযন্ত্র চালানোর জন্য নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া যে আরেকটি মূল সরকারী মুদ্রিত আদেশনামা, তারিখ ১৮ মার্চ ১৮৫৭, দাশরথি তা উদ্ধার করেছেন তার বয়ান ছিল এইরূপ : 'Nilmoney Banerjee of Buherah, Thannah Poobthul in Zillah Burdwan, Printer having applied to the Magistrate of Burdwan for sanction and Licence to keep and use a printing Press, Types and other materials and articles for printing and his application having been verified by solemn declaration, as required by Law, Lieutenant Governor does hereby authorise and empower the said Nilmoney Banerjee to keep and use a printing Press, Types and other materials or articles for printing at Buherah Thannah Poobthul in Zilla Burdwan and not elsewhere.' সম্ভবত নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ঐ ছাপাখানা আর চলেনি।

গঙ্গাকিশোর তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে বহড়ার ছাপাখানা থেকে বেশ কয়েকটি বাংলা বই ছেপেছিলেন। ১৮২৪ সালে 'কলিকাতার বাহিরে মোং বহেড়াতে শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যকৃত দ্রব্যগুণ ভাষা' ছাপা হয়।[১] ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে 'শ্রীভগবদ্গীতা'র ২য় সংস্করণ 'শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যেন প্রকাশিত ॥ বাঙ্গালা যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। মোকাম বহরা ॥ সন ১২৩১ সাল।'[২] [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এর একটি কপি আছে।] অমর সিংহের অভিধান অবলম্বনে বাঙলা অভিধান 'শব্দার্ণব' ১৮২৫ সালে 'শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য দ্বারা বহরায় ছাপা' হয়।[৩]

গঙ্গাকিশোরের মৃত্যুর পর বাংলা ভাষায় 'দেওয়ানী এবং কালেকটরী আইনের সংগ্রহ'

---

১ সমাচার দর্পণ, ২২ জানুয়ারি ১৮২৪ ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১ম), পৃ. ৬৮

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' (১ম) : 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য', পৃ. ২৩।

৩ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, 'বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়', পৃ. ৫২

১৮৪৫ সালে বহড়ায় '৺গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাঙ্গাল গেজেট যন্ত্রালয়ে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়স্যানুমত্যনুসারে' দ্বিতীয়বার ছাপা হয়। [কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এর এক কপি রক্ষিত আছে।] ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে (১৭৬৬ শকে) মুদ্রিত 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ॥ প্রকৃতি খণ্ড ॥ তদ্ভাষা রামলোচন দাস কর্তৃক পয়ারছন্দে বিরচিত' পুস্তকের আখ্যাপত্রে আছে— 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যমহাশয়স্য বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ে শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়স্যানুমত্যনুসারে ছাপা হইল বহরা গ্রামে।'[১] ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে বহড়া গ্রামে ছাপা আরেকটি বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এর আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 'বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের প্রচলিত আইন।/···শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা সংগৃহীত হইয়া/বহরাগ্রামে/৺হরিশচন্দ্র দত্ত কোং/বিদ্যাকর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।/সন ১২৫৬ সাল।' [কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এর এক কপি রক্ষিত আছে। এই বিদ্যাকর যন্ত্র কি বহড়া গ্রামের আরেকটি স্বতন্ত্র প্রেস ?

মুদ্রণ প্রকাশন ছাড়াও গঙ্গাকিশোরের বইয়ের ব্যবসায়ের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় শহরে গঙ্গাকিশোর তাঁর নিজস্ব প্রতিনিধি (agent) রেখেছিলেন, তাঁরা ঘুরে ঘুরে বই বিক্রি করে বেড়াতেন। ত্রৈমাসিক '*Friend of India*' (Sept. 1820) পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে ('On the effect of the Native Press in India') তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়, 'He appointed agents in the chief towns and villages in Bengal, from whom his books were purchased with great avidity.' ১৮২২ সালে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এরূপ চারজন 'Walking Bookseller' বা ভ্রাম্যমান পুস্তকবিক্রেতার কথা জানা যায়, যাঁদের দু'জন সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'the other two are selling for another native, who has established a press near Agrudeep.'[২] নিঃসন্দেহে এই 'দেশীয়' মুদ্রণ-ব্যবসায়ী অগ্রদ্বীপের নিকটবর্তী বহড়া-নিবাসী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য।

১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে জুন মাসের আগেই গঙ্গাকিশোর ভট্টার্যের মৃত্যু হয়[৩]। সম্ভবত ১৮২৯।৩০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাঙালী পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের আলোচনা সূত্রে বাঙ্গাল গেজেটি, ও প্রাসঙ্গিক-ক্রমে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানেই শেষ করা যেতে পারে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, বাঙালী পরিচালিত এই প্রথম বাংলা সংবাদপত্রটি ছিল স্বল্পস্থায়ী এবং

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' (১ম) : 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য', পৃ. ২৪

২ *Friend of India* (Monthly), March 1822.

৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' (১ম) : 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য' : পৃ. ২৪

এর কোনো সংখ্যাই আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা যায়নি। সেদিক থেকে বলা যায় বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে প্রথম বাঙালী পরিচালিত যে দুটি বাংলা সংবাদপত্র দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তা হল সম্বাদ কৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকা।

উদারনৈতিক সংস্কারবাদী ও প্রগতিশীল ভাবান্দোলনের নেতা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ও আনুকূল্যে এবং ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার প্রেরণায় সর্বশ্রেণীর হিন্দুদের সমর্থনে সম্বাদ কৌমুদীর আবির্ভাব (৪ ডিসেম্বর ১৮২১)। বাংলা সাময়িকপত্রের আদিযুগের প্রখ্যাত সাংবাদিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমাবধি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যেই রামমোহনের মতবাদ ও চিন্তাধারার সঙ্গে, বিশেষ করে সতীদাহ প্রথার বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে, রক্ষণশীল ভবানীচরণের অনিবার্য সংঘর্ষ দেখা দেয়। ফলে ভবানী-চরণ সম্বাদ কৌমুদী ত্যাগ করে প্রকাশ করেন সমাচার চন্দ্রিকা (৫ই মার্চ ১৮২২/ফাল্গুন ১২২৮)। এই পত্রিকা কালক্রমে রক্ষণশীল চিন্তাধারার প্রধানতম মুখপত্র হয়ে দাঁড়াল। রক্ষণশীল হিন্দু সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এতই গোঁড়া ছিলেন যে তাঁর ছাপাখানা থেকে শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রণের কাজে তিনি বিশেষ করে ব্রাহ্মণ কম্পোজিটর নিয়োগ করতেন। [উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শ্রীমদ্ভাগবত' (১৮৩০) এইভাবেই ছাপা হয়।[১]] বাংলা মুদ্রণের আদি ইতিহাসে এটি এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সমাজে রক্ষণশীলতার ধারাই তখন প্রকটতম। তাই সমাচার চন্দ্রিকা খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

সম্বাদ কৌমুদীর কয়েকটি সংখ্যার বিষয়সূচী ও কিছু কিছু প্রবন্ধের সারাংশ ইংরেজিতে সমসাময়িক *Calcutta Journal* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী-বিরোধী এই ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক জেমস সিল্ক বাকিংহাম রামমোহনের বিশেষ বন্ধু ও সমর্থক ছিলেন। সেই সূত্রেই এই পুনর্মুদ্রণ। সম্বাদ কৌমুদীর পুরনো সংখ্যা আর পাওয়া যায় না, তবে কিছু কিছু পরোক্ষ সূত্র থেকে এই পত্রিকা সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্যাদি জানা গেছে। উদাহরণ স্বরূপ এইরূপ কয়েকটি সূত্রের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে : ১. যতীন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত *Rammohan Roy and Progressive Movements in India* গ্রন্থে সমসাময়িক ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত সম্বাদ কৌমুদীর কয়েকটি সংখ্যায় মুদ্রিত রচনার চুম্বক দেওয়া হয়েছে এবং কয়েকটি অনুবাদও সমসাময়িক পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। ২. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত' গ্রন্থে সম্বাদ কৌমুদীতে প্রকাশিত কয়েকটি রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। ৩. ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত 'বঙ্গীয় পাঠাবলী' (১৮৫৫) নামক পাঠ্যপুস্তকে সম্বাদ কৌমুদীর কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হয়। ৪. রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' (১ম) : 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়', পৃ. ৩৫

বাগীশ সম্পাদিত রামমোহন গ্রন্থাবলীতে (১৮৮০) সম্বাদ কৌমুদীর কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হয়। ৫. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য বাংলা পাঠ্য-পুস্তকে (১৮৭৪) সম্বাদ কৌমুদীর কয়েকটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়।[১]

সম্বাদ কৌমুদীর কয়েকটি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

১ দরিদ্র অথচ সম্রান্ত হিন্দু ছাত্রদের বিনা বেতনে বিদ্যাদানের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন।

২ মফঃস্বল, জিলা ও প্রাদেশিক আদালতে 'জুরি' প্রথা প্রবর্তনের জন্য বিনীত প্রার্থনা।

৩ হিন্দুদের জন্য নদীতীরে একটিমাত্র শ্মশান থাকায় অসুবিধা ; অথচ খ্রীস্টানদের কবরের জন্য বহুল পরিমাণে জমি প্রদত্ত হয়েছে।

প্রথম তিনটি সংখ্যায় এই বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছিল। এ ছাড়া পরবর্তী সংখ্যায় অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা হয়, যেমন : ১. বাংলাদেশ থেকে বিদেশের বন্দরে শস্য রপ্তানি বন্ধ করবার জন্য আবেদন। ২. বাঙালী মধ্যবিত্তদের পক্ষে য়ুরোপীয় ডাক্তারদের চিকিৎসা পাবার জন্য আবেদন। ৩. কলকাতার রাজপথে ইংরেজ ভদ্রলোকেরা তাঁদের বগিগাড়ি করে যাবার সময় দু পাশের লোকের ওপর চাবুক মারেন, চিৎপুর রাস্তার উপর জনতা ঠাকুর দেখবার জন্য যখন ভীড় করে তখন তাদের উপর নির্মমভাবে চাবুক চালানো হয়— কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এইসব নিবারণের জন্য আবেদন।[২] বাংলা সাময়িকপত্রের প্রথম যুগে আলোচিত এইসব বিষয়সূচী নিঃসন্দেহে সম্বাদ কৌমুদীর প্রগতিশীল নির্ভীক সাংবাদিকতার সাক্ষ্য বহন করে।

সম্বাদ কৌমুদীর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্গীয় পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদনে স্পষ্ট করে জানানো হয়— ধর্ম, নীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক অলোচনা, আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী, দেশবিদেশের সংবাদ ও জ্ঞাতব্য তথ্য-সম্বলিত প্রেরিত পত্রাবলী প্রকাশ— এক কথায় লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র প্রচারের প্রধান লক্ষ্য।[৩] জনমত সংগঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা এখানে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে। সম্বাদ কৌমুদীর শিরোভাগে এই শ্লোকটি মুদ্রিত থাকত :

দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং।
রবিনা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ ॥[৪]

---

১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য', পৃ. ১৩১

২ '*The English Works of Raja Rammohon Roy*' (1905), p. XXII; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ১৩১–৩২

৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িকপত্র', পৃ. ১৭

৪ তদেব। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রবন্ধ (নব্যভারত, বৈশাখ ১৩০৪) থেকে এটি গৃহীত।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাচার চন্দ্রিকা রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মুখপত্রস্বরূপ ছিল। রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রামকমল সেন, প্রভৃতি এর সমর্থক ছিলেন। ১৭ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখে কলকাতার রক্ষণশীল হিন্দুরা মিলে 'ধর্মসভা' স্থাপন করেন। ভবানীচরণ এর সম্পাদক হন ও স্বভাবতই সমাচার চন্দ্রিকা ধর্মসভার মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মসভার কার্যবিবরণী, বিজ্ঞাপন, অর্থপ্রাপ্তি-স্বীকৃতি ও অর্থানুকূল্যের জন্য প্রার্থনা, প্রভৃতি সবই ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হত। কোথাও কোনো সতীদাহের খবর পাওয়া গেলে সমাচার চন্দ্রিকায় তা বিশদভাবে ছাপা হত। এই নিয়ে সমাচার দর্পণ বা সম্বাদ কৌমুদীর সঙ্গে সমাচার চন্দ্রিকার বাদানুবাদ চলত।

'নানাদিগ্দেশীয় বিবিধ সমাচার' প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুরু হলেও রাজনৈতিক অপেক্ষা সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ের আলোচনাই সমাচার চন্দ্রিকায় বেশি স্থান পেত। তবে মাঝে মাঝে ট্যাক্সবৃদ্ধি, আদালতে মোকদ্দমার ব্যয়বাহুল্য, দারোগা ও আমিনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ বা পত্রপ্রেরকদের পত্রও প্রকাশিত হত। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে সমাচার চন্দ্রিকার একটি সংখ্যার প্রথম দশ পৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন ও ইস্তাহারের বিষয়গুলির উল্লেখ পাই। যেমন : ১. রেভেনিউ বোর্ডের নোটিশ। ২. শেষ শেরিফ সেল। ৩. মোকাম কলিকাতার নাতওয়ান দাতকের পরিত্রাণের আদালত। ৪. ধর্মসভা…। ৫. ধর্মসভার ধনরক্ষক। ৬. সমাচার চন্দ্রিকা (বাণিজ্য বিষয়ক বিজ্ঞাপন)। ৭. কেতাব শাহনামা (উক্ত নামধেয় কোনো পুস্তকের বিজ্ঞাপন)। ৮. পুস্তক বিক্রয় (চন্দ্রিকা প্রেসে প্রকাশিত বিক্রয়ার্থ পুস্তকের তালিকা)। ৯. রাজকর্মে নিয়োগ এবং… সহমরণ বিষয়ক প্রবন্ধ। ১০. ধর্মসভায় অর্থদান ও দাতাদের নামের তালিকা।[১] [এই বিজ্ঞাপনগুলি সমাচার চন্দ্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ আছে। কিন্তু আমার মনে হয়, সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি পরবর্তী কোনো এক সংখ্যা।]

সমাচার চন্দ্রিকার প্রতি সংখ্যার শিরোভাগে এই শ্লোকটি মুদ্রিত থাকত :

'সত্ত্ব সমাচারজুষাং ফলাপিকা, পদার্থচেষ্টাপরমার্থদায়িকা
বিজ্ঞস্ততে সর্ব্বমনোহুরঞ্জিকা প্রিয়া ভবানীচরণস্য চন্দ্রিকা।'[২]

বাংলা মুদ্রণের বিস্তার প্রসঙ্গে বাংলা সাময়িক পত্রাদির আলোচনা এখানেই শেষ করা যেতে পারে। বাংলা সাময়িকপত্র সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অনেকেই আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,[৩] সুশীলকুমার দে,[৪] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,[৫] এ. এক.

---

১ রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সমাচার চন্দ্রিকা' : আনন্দবাজার, ১৮ জুলাই ১৯৭১

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িকপত্র', পৃ. ২১।

৩ বাংলা সাময়িকপত্র। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২ খণ্ড)।

৪ *Bengali literature in the 19th century.*

৫ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য।

সালাউদ্দীন আমেদ,[১] অমিতাভ মুখোপাধ্যায়,[২] কেদারনাথ মজুমদার,[৩] বিনয় ঘোষ,[৪] সুকুমার সেন,[৫] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়[৬] প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সুতরাং এই প্রসঙ্গে পুনশ্চ বিস্তৃত আলোচনা না করে বাংলা মুদ্রণেতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য আমি কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক তথ্যাদিই এখানে উদ্ধার করেছি। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য অনালোচিত বা স্বল্পালোচিত কিছু কিছু প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি। বিতর্কিত প্রসঙ্গের সন্দেহ নিরসনেরও চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের মুদ্রণেতিহাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু কিছু পত্রিকা বা তার সম্পাদক ও প্রকাশক/মুদ্রাকর অনিবার্য কারণেই বর্তমান আলোচনায় গুরুত্ব লাভ করেছে। মূলত বাংলা মুদ্রণ ও বাঙালীর নবজাগৃতির ইতিহাসের পটভূমিকায় আমি বাংলা সাময়িকপত্রাদিকে বিচারের চেষ্টা করছি এবং সেক্ষেত্রে এর জন্ম ও বিস্তারের মূল সূত্রগুলি নির্ধারণই ছিল আমার এই প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য।

---

১ ***Social ideas and social change in Bengal*, 1818-1835.**

২ ***Reform and Regeneration in Bengal.***

৩ বাংলা সাময়িক সাহিত্য (ময়মনসিংহ, ১৯১৭)

৪ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র।

৫ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

৬ রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য।

চতুর্থ অধ্যায়

পুনরুজ্জীবিত শ্রীরামপুর মিশন প্রেস : বিষয়বৈচিত্র্য ও গুরুত্বে বাংলা প্রকাশনার পরিধি বিস্তার

বাংলা মুদ্রণের আদি যুগে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের গৌরবোজ্জল ভূমিকার কথা আমি ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের শুরুতে যখন মিশনের যাত্রারম্ভ, তখন তার নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন উইলিয়ম কেরী। আসলে উইলিয়ম কেরীই ছিলেন মিশনের প্রাণপুরুষ, তাঁকে কেন্দ্র করে জোশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, ফেলিক্স কেরী প্রভৃতি সুদক্ষ পরিচালকেরা একত্রিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের যৌথ উদ্যোগে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় রচিত হয়েছিল। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়ম কেরীর মৃত্যুর ফলে সেই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে ; তারপর থেকে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসকে আর তেমন সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায় না। কেরীর প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিশন প্রেসের জীবনদীপও নির্বাপিত হয়েছে।

কিন্তু ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মিশন প্রেসের কর্মধারা একই গতিতে চলেনি, হয়ত বা তা সম্ভবও ছিল না। কখনো তা প্রচণ্ড বেগে আলোড়িত হয়েছে, কখনো বা মন্দীভূত হয়েছে। যে-কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জীবনে এইরূপ উত্থান-পতন খুবই স্বাভাবিক। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মিশন প্রেস যে কর্মচাঞ্চল্যে মুখরিত ছিল তারপর থেকে তা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে, তার মুদ্রণ-প্রকাশনের গতি ক্রমশ কমে আসে। এর নানাবিধ কারণ অনুমান করা যেতে পারে। তা শ্রীরামপুরের কর্মকেন্দ্র থেকে উইলিয়ম কেরীর দীর্ঘকালের অনুপস্থিতি ও কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনার কাজে উত্তরোত্তর ব্যাপৃত থাকার পরিণতি হতে পারে, মিশনের পরিচালকদের মধ্যে কিছু কিছু মনোমালিন্য বা অন্তর্দ্বন্দ্ব হতে পারে, মিশনারীদের নবীন গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যলাভের চেষ্টা ও প্রাচীনদের প্রতি উপেক্ষার মনোভাব হতে পারে, আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের মতো কিছু কিছু দৈব দুর্বিপাক বা আর্থিক সংকটও এর কারণ হতে পারে অথবা মুদ্রণ-প্রকাশন অপেক্ষা ধর্মপ্রচারের কাজে মিশনের অধিকতর মনোযোগী হওয়া উচিত এই ধরনের কিছু চিন্তার ফলে প্রেসের কাজে মন্দা আসতে পারে, বা বিলেতের ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের পক্ষ থেকে বাংলা পাঠ্যপুস্তকাদি মুদ্রণ প্রভৃতি কাজে শ্রীরামপুর মিশনকে সদা ব্যাপৃত থাকতে উৎসাহ দিতে না চাওয়ায় বা তাঁদের সেই প্রবণতাকে সুনজরে

না দেখায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের মুদ্রণ-প্রকাশনের ধারায় ভাঁটার টান আসতে পারে। তবে মনে হয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের স্তিমিতপ্রায় অবস্থাই মিশন প্রেসকে সর্বাধিক দুর্বল করেছিল, এবং তার ফলে প্রেসের বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের কাজে মন্দা দেখা দিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে কেরীর ঘনিষ্ঠতা, কলেজের বাংলা পাঠ্যপুস্তকাদির চাহিদা, এবং তা পূরণের জন্য কেরীর উৎসাহ ও উদ্যমের ফলেই প্রধানত শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের ধারা প্রাণরসে সঞ্জীবিত হতে পেরেছিল। কিন্তু শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পৌছে সেই রসধারার মূল উৎসটি ক্রমশ শুষ্ক হয়ে যাওয়ায় মিশন প্রেসের মুদ্রণ-প্রকাশন ধারাটিও ক্রমশ মন্দীভূত হয়ে আসে। দেশীয় ভাষায় বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ মুদ্রণের কাজটি কেবল ধীর লয়ে চলতে থাকে। কিন্তু কয়েক বছর মন্দার পরে ঐ দশকেরই শেষাশেষি পৌছে আবার এক নতুন প্রাণরসের সঞ্জীবনী প্রবাহে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই নতুন প্রাণচাঞ্চল্যের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেদিন থেকে বাংলা মুদ্রণের বিস্তার পর্বেরও সূচনা।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের এই পুনরুজ্জীবনের প্রধান যে তিনটি কারণ লক্ষ্য করা যায় তা হল : প্রথমত, বাংলা সাময়িকপত্রের সূচনা, দ্বিতীয়ত, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও তাদের বাংলা পাঠ্যপুস্তকাদির ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং তৃতীয়ত, ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, জন ম্যাক, প্রভৃতি নবীন মিশনারী গোষ্ঠীর সক্রিয় ভূমিকা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা স্তিমিত হয়ে যাবার পর বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের যে নতুন পর্বের সূচনা হল সেই পর্বে বাংলা পাঠ্যপুস্তকাদি রচনা ও প্রকাশের মূল তাগিদ আসে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির পক্ষ থেকে। সেদিনও সহযোগিতার উদার হস্ত প্রসারিত করে এগিয়ে এসেছিল শ্রীরামপুর মিশন প্রেস। ফলত, উভয় প্রতিষ্ঠানই উপকৃত হয়েছিল এবং সর্বোপরি বিস্তৃতি লাভ করেছিল বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদিযুগ। অবশ্য এইসময় ইউস্টেস কেরী, উইলিয়ম পীয়ার্স ও উইলিয়ম ইয়েটস প্রমুখ নবীন মিশনারীগোষ্ঠী শ্রীরামপুর গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস স্থাপন করায় সেখান থেকেও ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত কিছু কিছু বাংলা বই মুদ্রিত হতে থাকে। এই যুগের অপর এক প্রধান শক্তির উৎস ছিল বাংলা সাময়িক-পত্রাদি। এবং তারও সূত্রপাত শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে। তাদের প্রকাশিত দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পণ ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' বাংলা দেশে সাময়িকপত্রের ইতিহাসে যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল তার ফলে বুদ্ধিজীবী বাঙালীর শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিহাস নতুন পথে মোড় নিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাও পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। নবীন মিশনারীদের উৎসাহে বাংলা ভাষায় ভূগোল, ইতিহাস, জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানের নতুন নতুন বই প্রকাশিত হওয়ায় বিষয়বৈচিত্র্যে ও গুরুত্বে বাংলা প্রকাশনার পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে। পুনরুজ্জীবিত শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের কল্যাণে বাংলা প্রকাশনার জগতে নতুন রূপ ও রস

সঞ্চারিত হওয়ায় ধীরে ধীরে বাঙালীর বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। অন্য কথায় বলা যায়, সেখান থেকেই বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর রেঁণেশাসের পটভূমিকা গড়ে উঠতে থাকে।

সেদিনকার বাঙালীর বুদ্ধিমুক্তির চর্চায় পুনরুজ্জীবিত শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রকাশিত পত্রপত্রিকা ও বিভিন্ন বইয়ের অবদান অনস্বীকার্য। বিচিত্র বিষয়গৌরবে সমৃদ্ধ দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পণ প্রভৃতি পত্রিকার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁদের বইগুলির বিষয়বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। বত্রিশ বছরের প্রচেষ্টায় চল্লিশটি ভাষায় মোট দু লক্ষ বারো হাজার কপি বই প্রকাশ করে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস যে অত্যাশ্চর্য নজীর সৃষ্টি করেছে বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদিযুগের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। ধর্ম-পুস্তকাদি এই সব প্রকাশনার একটা বড়ো অংশ জুড়ে থাকলেও অন্যান্য বইয়ের বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেও চমৎকৃত হতে হয়। বিস্তার পর্বের আঠারো বছরের কালসীমায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত এইরূপ কয়েকটি বইয়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে :

১ ফেলিক্স কেরী, 'ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়', ১৮২০। (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ + ৪১২ + ১৯)

২ „ „ 'বিদ্যাহারাবলী···তৎপ্রথমগ্রন্থ। ব্যবচ্ছেদবিদ্যা', ১৮২০। (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯ + ৬৩৮ + ৪)

৩ „ „ 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ,' প্রথম ভাগ, ১৮২১। (পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৭)

„ „ ঐ, দ্বিতীয় ভাগ, ১৮২২। (পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪০)

৪ জন ক্লার্ক মার্শম্যান, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (দুইখণ্ড), ১৮৩১। (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১ম খণ্ড, ১৬ + ৩৭৪ ; ২য় খণ্ড, ২৪ + ৩৯১)

৫ „ „ „ 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরন', ১৮৩৩। (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ + ৫১৩)

৬ — 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়', ১৮১৯। (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ + ১৮১)

৭ — 'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস', ১৮২৯। (দুইভাগ—মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৯)

[৬ ও ৭ সংখ্যক বই দুটির আখ্যাপত্রে লেখকের নামের কোনো উল্লেখ নেই। এ দুটি সম্ভবত জন ক্লার্ক মার্শম্যানের রচনা।]

৮ জন ম্যাক, 'কিমিয়া বিদ্যারসার,' ১৮৩৪। (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৭)

এই সব বইয়ের বিষয়বস্তু ছিল ইতিহাস, ভূগোল, শারীরতত্ত্ব ও ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, ধর্ম, নীতিকথা, পুরাণ প্রভৃতি। এ ছাড়া কৃষিবিজ্ঞান ও উদ্যানবিদ্যা (Agri-Horticulture) সংক্রান্ত বইও ('ক্ষেত্রবাগান বিবরণ' ১ম ভাগ, ১৮৩১) তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষের রসাস্বাদন এই সময়েই প্রথম বাঙালী পাঠক লাভ

করেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ সব বই নতুনত্বের আস্বাদ নিয়ে এসেছিল। মূলত পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডার থেকে আহরণ করে মিশনারী গোষ্ঠী এগুলি বাংলা ভাষায় বুদ্ধিজীবী বাঙালী পাঠককুলের হাতে অর্পণ করেছিলেন। বাঙালীর বুদ্ধিমুক্তির চর্চায় এগুলি পরম সহায়ক হয়েছিল।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের অবদানের পরিপূরক হিসাবে ব্যাপটিস্ট মিশনারী প্রচেষ্টার আর-এক অংশ কলকাতায় ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করেছিল। উইলিয়ম কেরীর ভ্রাতুষ্পুত্র ইউস্টেস কেরী ও উইলিয়ম পীয়ার্স, ইয়েটস প্রভৃতি দু-একজন নবীন মিশনারী শ্রীরামপুর মিশনের মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় যে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস স্থাপন করেছিলেন সেখানেও বাংলা মুদ্রণের এক ব্যাপক ও দুঃসাহসী আয়োজন গড়ে উঠেছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যে সেখান থেকে অনেকগুলি বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছিল। প্রধানত ক্যালক্যাটা স্কুল বুক সোসাইটির সহযোগে কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে বাংলা মুদ্রণ নিয়ে বেশ কিছু দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল। নানা ধাঁচের বাংলা হরফের ব্যবহার, বাংলা ভাষা মুদ্রণে ইংরেজি ভাষার আদর্শে যতিচিহ্নের প্রবর্তন, বাঁকা মাত্রার প্রচলন প্রভৃতি ঐ দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার অঙ্গ ছিল। এ ছাড়া তাঁদের প্রকাশিত বইয়ের অভিনবত্বও ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির অবদানের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়গুলি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পুনরুজ্জীবিত শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের ভূমিকা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের কথা পুনশ্চ উল্লেখ করা হল এই জন্য যে তাঁরা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন দুটি স্বতন্ত্র বিশিষ্ট গোষ্ঠী হলেও সামগ্রিকভাবে বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে ব্যাপটিস্ট মিশনের অবদানের ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা একটি অন্যের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে এবং বলা যেতে পারে উভয়ের যৌথ অবদানে বাংলা মুদ্রণের পরিধি বহুদূর বিস্তৃত হতে পেরেছিল।

পুনশ্চ পুনরুজ্জীবিত শ্রীরামপুর মিশনের বাংলা প্রকাশনগুলি প্রসঙ্গে ফিরে আসা যেতে পারে। পূর্বোক্ত বইগুলির বিষয়বস্তুর প্রতি আরেকটু গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে তাদের নতুনত্বের তাৎপর্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বাংলা মুদ্রণের আদিযুগে ফেলিক্স কেরী অনূদিত ‘বিদ্যাহারবলী’ (১৮২০) বাঙালী পাঠকের কাছে এক সম্পূর্ণ নতুন বিষয়বস্তুর সন্ধান দিয়েছিল। বাংলা ভাষায় কোষগ্রন্থ রচনার প্রয়াস এই প্রথম। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার পঞ্চম সংস্করণ অবলম্বন করে ফেলিক্স কেরী পর্যায়ক্রম তাঁর বিদ্যাহারাবলী রচনার সূত্রপাত করেন। চিকিৎসাবিদ্যা ও অস্ত্রোপচার বিষয়ে ফেলিক্সের যথেষ্ট আগ্রহ ও দক্ষতা ছিল, সেজন্য তিনি ‘অ্যানাটমি’ বা ব্যবচ্ছেদবিদ্যা দিয়েই প্রথম বিদ্যাহারাবলী পর্যায়ে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অনুবাদ শুরু করেন। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের ১লা অক্টোবর থেকে শুরু করে পরবর্তী ১৪ মাস ধরে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি মাসের ১লা তারিখে ৪৮ পৃষ্ঠা

করে পর্যায়ক্রমে বিদ্যাহারাবলী প্রকাশিত হয়ে ঐ বছরের শেষে সম্পূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হলে তার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯ + ৬৩৮ + ৪, ও মোট মূল্য ধার্য হয় ২৮ টাকা। এর প্রথমে ৩৯ পৃষ্ঠাব্যাপী 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যাভিধান' সংযোজিত হয়েছে। ৮½" × ৫½" আকারের এই বৃহৎ বইটিতে খুব ছোটো আকারের হরফ ব্যবহৃত হয়েছে। হরফের উচ্চতা ২ মি. মি. মাত্র। মূলগ্রন্থের আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ : 'বিদ্যাহারাবলী | অর্থাৎ | বাঙ্গালাভাষায়কৃত ইউরোপীয় সর্ব্বগ্রাহ্য তাবৎ আয়ুর্ব্বেদশিল্প | বিদ্যাদি মূলগ্রন্থাবলী। | তৎপ্রথমগ্রন্থ। | ব্যবচ্ছেদবিদ্যা।' ইংরেজি আখ্যাপত্রে পাই 'VIDYA-HARAVULEE,/ OR/ BENGALEE ENCYCLOPÆDIA./VOL. I./Anatomy.' এর সঙ্গে প্রথম খণ্ডের বাংলা আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ : 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। | ফিলিক্স কেরি কর্ত্তৃক | পঞ্চমবারছাপাকৃত এনসক্লোপেদিয়াব্রিটানিকানাম-গ্রন্থাবলী হইতে বাঙ্গালাভাষায় কৃত। | পরিষ্ঠ উলিয়াম কেরিকর্ত্তৃক তর্জ্জমাবিবেচিত | শ্রীকান্তবিদ্যালঙ্কারকর্ত্তৃক ভাষাবিবেচিত এবং শ্রীকবিচন্দ্র | তর্কশিরোমণিকর্ত্তৃক সাহায্যীকৃত। | শ্রীরামপুর মিশিয়ন্ ছাপাখানাতে ছাপাকৃত। | সন ১৮২০'। বিষয়ের গুরুত্ব ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার দুরূহতার কথা স্মরণ রেখে বলা যায় বাংলাভাষায় ব্যবচ্ছেদবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত করে ফেলিক্স কেরী অবশ্যই দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এই ধরনের গ্রন্থ প্রকাশে নিঃসন্দেহে বাংলা প্রকাশনার পরিধি বহুদূর বিস্তৃত হতে পেরেছে। দেড়শতাধিক বছর আগে দুরূহ বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচনার কাজে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার নমুনা স্বরূপ এর কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে : 'প্রত্যেক মাংসপেশীর মধ্যে দুইপ্রকার তন্তু আছে তন্মধ্যে একপ্রকার অতিকোমল এবং রক্তবর্ণ এবং স্পর্শাভিজ্ঞ এবং ব্যথাভিজ্ঞ সেই সকলের মাংসতন্তু-সংজ্ঞা ব্যবচ্ছেদকেরা করিয়াছেন এবং অন্য প্রকার তন্তুসকল অন্যতন্তু হইতে দৃঢ় এবং চক্চকিয়া শুক্লবর্ণ এবং ব্যথানভিজ্ঞ এবং স্পর্শানভিজ্ঞ এবং সঙ্কোচনশক্তিহীন ঐ সকল তন্তুর ব্যবচ্ছেদকেরা স্নায়ুতন্তুসংজ্ঞা করিয়াছেন।'

বাংলা প্রকাশনার বিষয়-বৈচিত্র্যের অপর নিদর্শন পাওয়া যায় ফেলিক্স কেরী কর্তৃক গোল্ডস্মিথ রচিত ইংলণ্ডের ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থে। এর বাংলা আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ : 'ব্রিটিন্ দেশীয় বিবরণসঞ্চয় | অর্থাৎ | জুলিয়স্ কাইসরের ব্রিটিন্ দেশাতিক্রম-সময়াবধি, | আইমেন্স নামে প্রসিদ্ধ সন্ধিসময়পর্য্যন্ত, | মহাব্রিটিনের বিবরণ সঞ্চয়, | তন্মধ্যে জুলিয়স্ কাইসরের কালাবধি দ্বিতীয় জর্জ্জ নামে রাজার মৃত্যুপর্য্যন্ত, | গোল্দস্মিৎ উপাধ্যায়-কর্ত্তৃক বিবরণীকৃত : | এবং ঐ জর্জ্জের মরণাবধি ১৮০২ শালের আইমেন্স নামক সন্ধিসময়-পর্য্যন্ত, | অন্য এক প্রথিত প্রজ্ঞোপাধ্যায়কর্ত্তৃক বিবরণীকৃত, | ফিলিক্স কেরিকর্ত্তৃক বাঙ্গলা-ভাষায় কৃত | C. S. B. S. | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল, ইতি | শন ১৮১৯'। ইংরেজি আখ্যাপত্রে প্রকাশ-সন দেওয়া আছে ১৮২০। সেটিই ঠিক। ফেলিক্স কেরীর এই ইতিহাস-অনুবাদের ফলে বাংলাভাষায় দেশবিদেশের ইতিহাসচর্চার পথ সুগম হয়ে ওঠে। ভাষার নমুনা স্বরূপ

এর কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে : 'রুমীয়দিগের অধিকার হওনের পূর্ব্বে ব্রিটিন্ দেশ পৃথিবীর অপর ২ অংশেতে অত্যল্প খ্যাত ছিল অপর গাল্ দেশের সম্মুখস্থতটে সকল তদ্দেশীয় প্রজাগণেরদের উদ্যোগদ্বারা যে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইত, তাহারি বাণিজ্যের কারণ অনেক ২ সওদাগর সর্ব্বদা সে দেশে যাইত ইহাতে অনুভব হয় যে ঐ সকল সওদাগরেরা, যে সকল সমুদ্রতীরেতে প্রথমতো বাস করিয়াছিল, কিছুকাল পরেতেই সে সকল স্থান অধিকার করিয়া লইল, পরে সে দেশ অতিরমণীয় এবং বাণিজ্যোপযুক্ত দেখিয়া বাণিজ্যহেতুক সমুদ্রসান্নিধ্যবাস করিয়া প্রজারদের মধ্যে কৃষিকর্ম্মাদি বিষয়ক জ্ঞান জন্মাইল কিন্তু সমুদ্রতটের দূরবাসী লোকেরা সে ভূমি অধিকার করিয়া রাখা আপনারদিগের ধর্ম্ম ইহা বোধ করিয়া, এবং উহারা আমারদিগের অর্থের অপহারক এই বিবেচনাতে, ঐ নূতন আগত লোকেরদিগের সহিত সমুদায় ব্যবহার ত্যাগ করিল…' (পৃ. ১)।

বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চার আরো সুযোগ এনে দিয়েছিল শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন— জন ক্লার্ক মার্শম্যানের ভারতবর্ষের ইতিহাস (দুখণ্ড), ১৮৩১ : 'ভারতবর্ষের ইতিহাস। অর্থাৎ কোম্পানী বাহাদুরের সংস্থাপনাবধি মার্কুইশ হেষ্টিংসের রাজশাসনের শেষ বৎসর পর্যন্ত ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয়েরদের কৃত তাবদ্বিবরণ। শ্রীযুত জান মার্স্যমন সাহেব কর্ত্তৃক বাঙ্গালাভাষায় সংগৃহীত। প্রথম বালম | দ্বিতীয় বালম শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত। সন ১৮৩১ সাল।'

এই গ্রন্থে ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রী. এবং পরবর্তী ৩৬ বছরের ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এটি মিল সাহেবের ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের অনুবাদ। বাংলাভাষা এখানে অনেক সহজ ও সাবলীল হয়ে এসেছে। ভাষার নমুনা স্বরূপ কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

'ঐ দুর্ভাগ্য নবাব যুদ্ধের পর রাত্রিতে আপন রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে তথাতে আর কোন মিত্র নাই অতএব ভবিতব্য বিষয়ে ভাবিত হইয়া সমস্ত দিবস রাজগৃহে থাকিলেন। সেই রাত্রিতে মীরজাফর মুর্শেদাবাদে উপস্থিত হইলে সিরাজদ্দৌলার উপায়ান্তর চেষ্টাকরণের আবশ্যকতা হইল অতএব তিনি কদর্য পরিচ্ছেদে পরিহিত হইয়া এক প্রিয়তমা সৈলিনীকে ও এক খোজাকে সঙ্গে লইয়া রাত্রির দশ দণ্ডের সময় রাজগৃহের এক ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া নীচে নামিলেন সুবা বেহারে গিয়া লা সাহেবের সহিত মিলনাশাতে ও সেথানকার অধ্যক্ষের সহায়তা প্রাপনাশাতে নৌকাযোগে বেহারের অভিমুখে গমন করিলেন। নাবিকেরা সমস্ত রাত্রি দাঁড়ক্ষেপ করত অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়াতে প্রাতঃকালে রাজমহলের নীচে নৌকা লাগাইল অতএব সিরাজদ্দৌলা অগত্যা উত্তীর্ণ হইয়া এক বাগানে আশ্রয় লইলেন।'

ইতিহাস থেকে পুরাবৃত্তও বাংলা প্রকাশনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। এখানেও জন ক্লার্ক মার্শম্যানের অবদান স্মরণীয় : 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ। | অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টি

অবধি খৃষ্টীয়ান শকের আরম্ভ পর্যন্ত। শ্রীরামপুর। ১৮৩৩। or Brief Survey of History/in Bengalee/from the Creation to the beginning of the Christian era/ Serampore 1833.'

পুরাবৃত্তের সঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, পুরাণ ও শাস্ত্রকথা, খ্রীস্টতত্ত্ব যার মূল উৎস। বাংলা প্রকাশনায় এই বিষয়বস্তু পূর্বেও ছিল, এই পর্যায়ে তা আরো বলিষ্ঠ রূপ নেয় দুটি বিশিষ্ট গ্রন্থের আকারে। একটি ফেলিক্স কেরী কর্তৃক John Bunyan রচিত '*Pilgrim's Progress*'-এর বঙ্গানুবাদ ('যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ', দু' খণ্ড: ১৮২১। ১৮২২) ও দ্বিতীয়টি জন ক্লার্ক মার্শম্যান অনূদিত ও সংকলিত 'সদগুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস।। সকল লোকের হিতার্থে বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা। করা গেল।। তাহার এক দিগে ইঙ্গরেজী ও এক দিগে বাঙ্গালা।। প্রথম ভাগ।। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।। ১৮২৯।' ইংরেজিতে এটির আখ্যা: '*Anecdotes of Virtue and Valour.*' এই দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থে 'ইতিহাস' নাম দিয়ে ছোটো ছোটো কাহিনী সংকলিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে একটি উল্লেখ করা যেতে পারে: 'ক্ষুদ্র বালকের উত্তর। অতিশয় চতুর এক ক্ষুদ্র বালক একজন পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহাকে কহিলেন যে ঈশ্বর কোথায় ইহা কহিতে পারিলে আমি তোমাকে একটা কমলালেবু পারিতোষিক দিব। শিশু উত্তর করিল যে ঈশ্বর যে স্থানে নাই মহাশয় এমত স্থান আমাকে দর্শাইয়া দিলে আমি মহাশয়কে দুইটা কমলালেবু দিব।' (সদগুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস। ৬৮ সংখ্যক ইতিহাস)

প্রথমোক্ত গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ: 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ। অর্থাৎ ইহলোক হইতে পরলোকে গমনবিবরণ। বিশেষতঃ ॥ ১ ॥ যাত্রিরা কোন বিষয়দ্বারা প্রথমে চালিত হইয়া যাত্রারম্ভ করিয়াছিল। ॥ ২ ॥ পথে তাহারদের কি ২ দুঃখকষ্ট ঘটিয়াছিল। এবং ॥ ৩ ॥ বাঞ্ছিতদেশ কিরূপে সচ্ছন্দপূর্বক প্রাপ্ত হইয়াছিল এত বিবরণ। য়োহন বন্যান্ কর্তৃক তৎস্বপ্নলভ্য এই গ্রন্থ বিবরণরচিত হইয়াছে।…এতৎগ্রন্থের দুই ভাগ। প্রথমভাগে যাত্রীর স্বীয় অগ্রেসরণ বিবরণ। দ্বিতীয় ভাগে তাহার পরিবারের অগ্রেসরণ বিবরণ।…ফিলিকস্ কেরি কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অর্থসংগৃহীত। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ইংগ্লণ্ডীয় সন ১৮২১ শাল। বাঙ্গালা সন ১২২৮ সাল।' (১ম ভাগ)। এর দ্বিতীয় ভাগের আখ্যাপত্রও অনুরূপ, ১৮২২ সনে প্রকাশিত।

ইতিহাস ছাড়াও জ্যোতিষ ও ভূগোল চর্চাও শ্রীরামপুর প্রকাশনায় লক্ষ্য করা যায়। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের রচনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য: 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়। অর্থাৎ জ্যোতিষ পদার্থের ও পৃথিবীর আকৃতি ও নানা দেশ ও নদী ও পর্ব্বত ও রাজ্যাধিকার ও ঈশ্বরারাধনা ও বাণিজ্য ও লোকসংখ্যা ইত্যাদির বিবরণ। লোকেরদের বিশেষ জ্ঞাপনার্থে বাঙ্গালি ভাষাতে তর্জমা হইল। শ্রীরামপুরে দ্বিতীয়বার ছাপা হইল। সন ১৮১৯।' এর ইংরেজি আখ্যাপত্রে লেখা আছে: '*Treatises of Astronomy and Geography*

***Translated into Bengalee.*'** বইটির প্রথম ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী নির্ঘণ্ট, তারপর ১ থেকে ১৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'জ্যোতিষ বিষয়' ও পরবর্তী ১৫ থেকে ১৮১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত গোলাধ্যায় অংশ। এর প্রথম সংস্করণ কবে প্রকাশিত হয়েছিল জানা যায় না। প্রসঙ্গত, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যা গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সোসাইটির অনুরোধে পীয়ার্স ও ইউস্টেস কেরী 'কপি বুক' পর্যায়ের প্রথম বই 'ভূগোল বৃত্তান্ত' (১৮১৮-১৯) প্রকাশ করেন। এর প্রথম বিষয় ছিল এশিয়ার ভূগোল। পীয়ার্সের ভূগোল বৃত্তান্ত পঞ্চম ভাগ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। উইলিয়ম ইয়েটস অনূদিত জ্যোতির্বিদ্যা (১৮৩৩) ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির নিজস্ব প্রেসে ছেপে প্রকাশিত হয়। মহেশচন্দ্র পালিত-হরচন্দ্র পালিত-ব্রজমোহন দত্ত অনূদিত ফার্গুসনের *Introduction to Astronomy* (বাংলা সংস্করণ—১৮১৮-১৯) সোসাইটির অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞান বিষয়ক আরো কিছু বই কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন গোষ্ঠী ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির সহযোগিতায় প্রকাশ করেন। উইলিয়ম ইয়েটস রচিত 'পদার্থবিদ্যাসার। অর্থাৎ বালকদিগের পদার্থ শিক্ষার্থে কথোপকথন', ১৮২৫ খ্রীঃ (ইংরেজি নাম '*Elements of Natural Philosophy and Natural History*'), পীয়ার্স অনূদিত লসনের 'পশ্বাবলি', ১৮২৮ ('*Animal Biography*') প্রভৃতি সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। আবার শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রকাশ করেন জন ম্যাক অনূদিত রসায়ন বিদ্যার বই : 'Principles of Chemistry/By John Mack, of Serampore College/Vol. I/ কিমিয়া বিদ্যার সার।/শ্রীযুক্ত জন ম্যাক সাহেক কর্ত্তৃক | রচিত হইয়া | গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইল।| প্রথম খণ্ড | From the Serampore Press./1834.' কৃষিবিজ্ঞান ও উদ্যানবিদ্যা সংক্রান্ত বইও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়— জন ক্লার্ক মার্শম্যান অনূদিত 'ক্ষেত্রবাগান বিবরণ', দু' খণ্ড। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে। এই বইয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন সম্বন্ধীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। যেমন, তুলা, সেগুন, চা, কফি, ইক্ষু, ধান, এরারুট, গুটিপোকা, তামাক, আলু প্রভৃতি চাষের কথা এখানে উল্লিখিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই প্রকাশিত হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে লোকশিক্ষার প্রথম প্রবর্তন হয়। প্রকারান্তরে এই সব বাংলা প্রকাশনা বাঙালীর বুদ্ধিমুক্তির চর্চায় পরম সহায়ক হয়েছিল।

পুনরুজ্জীবিত শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের বাংলা প্রকাশনা প্রসঙ্গে বিস্তার পর্বে প্রকাশিত আরো দুটি উল্লেখযোগ্য বাংলা বইয়ের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। দুটিই অভিধান, একটি উইলিয়ম কেরীর বাংলা-ইংরেজি অভিধান, দু খণ্ড (১৮১৫-১৮২৫) ও অপরটি রামকমল সেনের ইংরেজি-বাংলা অভিধান দু খণ্ড (১৮৩৪)। অভিধান, ও তৎসহ ব্যাকরণ, রচনার প্রবণতা বাংলা মুদ্রণের আদি যুগের গোড়া থেকেই শুরু হয়েছে। সুতরাং এই পর্যায়ে

পূর্বোক্ত বই দুটির বিষয়বস্তুগত অভিনবত্ব নেই বটে, তবে বাংলা অভিধান পর্যায়ে বই দুটিকে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট সংযোজন হিসাবে গণ্য করা চলে। কেরীর বাংলা অভিধানটিকে তো তাঁর লেখক-জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলা যায়। তাঁর দীর্ঘকালের সাধনা ও অধ্যবসায় এর সঙ্গে জড়িত ছিল। অপরপক্ষে রামকমল সেনের অভিধানটিও প্রায় দু দশকের অনলস পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে প্রকাশিত হতে পেরেছিল। দুটি বইই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের বাংলা প্রকাশনার উজ্জ্বলতম নিদর্শন হিসাবে সমাদৃত হবার যোগ্য।

উইলিয়ম কেরীর অভিধান প্রথম খণ্ড ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। কিন্তু বড়ো হরফে ছাপা হওয়ায় কেরী আশঙ্কা করেন সমগ্র অভিধানটির মুদ্রণ সম্পূর্ণ হলে তা অতি বৃহৎ কলেবর ধারণ করবে। সুতরাং সমুদয় মুদ্রিত কপি বাতিল করে অভিধান মুদ্রণের জন্য বিশেষ করে খুব ছোটো আকারের হরফ তৈরি করিয়ে তিনি আবার নতুন করে তাঁর অভিধানের প্রথম খণ্ড মুদ্রিত করান। এই মুদ্রণকার্য সম্পূর্ণ হয়ে তাঁর অভিধানের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে ; এটিকে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বলা চলে, এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১৬। তাঁর অভিধানের দ্বিতীয় খণ্ড দু'ভাগে প্রকাশিত হয় ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে, এর প্রথম ভাগের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬৪, দ্বিতীয় ভাগের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬৫ থেকে ১৫৪৪। দ্বিতীয় খণ্ড (১ম সং) প্রকাশের সময় প্রথম খণ্ডের পুনর্মুদ্রিত ২য় সংস্করণও ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আসলে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম খণ্ডের অবিক্রীত কপিগুলির কেবলমাত্র আখ্যাপত্রটি এই সময় পুনর্মুদ্রিত করে ২য় সংস্করণ করা হয়, সেই হিসাবে ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম খণ্ডটিকে পুনর্মুদ্রিত ২য় সংস্করণ বলা হয়েছে। এর সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগটি একই সঙ্গে বাঁধাই করে প্রকাশ করা হয়। [কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এর একটি কপি আছে।] দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগটিও স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সুতরাং কেরীর বাংলা-ইংরেজি অভিধানের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ২১৬০ (১ম খণ্ড : ৬১৬ ; ২য় খণ্ড, ১ম ভাগ : ১-৪৬৪, ২য় খণ্ড, ২য় ভাগ : ৪৬৫-১৫৪৪)।

কেরীর বাংলা অভিধান তাঁর পূর্ববর্তী অভিধানসমূহের তুলনায় একটি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। দুই সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই অভিধানে প্রায় আশি হাজার শব্দ সংকলিত হয়েছে। এতে প্রতি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও তার ইংরেজিতে বিভিন্ন অর্থ বা ইংরেজি প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। এ ছাড়া প্রতি বাংলা শব্দ ইংরেজি, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী বা পর্তুগীজ কোন্ ভাষা থেকে গৃহীত তাও উল্লিখিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ যে-কোনো একটি শব্দ উদ্‌দৃত করা যায় : 'কান্তা, S. (from কম্ to desire), a wife, a beautiful or agreeable woman.' কেরী ভূমিকায় লিখেছেন, বাংলা ভাষা মূলত সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্‌ভূত, এর শব্দ-সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশেরও অধিক খাঁটি সংস্কৃত শব্দ। কেরীর অভিধানে তৎসম শব্দই বেশি স্থান পেয়েছে। তদ্ভব ও দেশজ শব্দ তুলনায় খুবই কম।

বাংলা মুদ্রণের বিস্তার পর্বে বিষয়বৈচিত্র্য ও গুরুত্বে বাংলা প্রকাশনার পরিধি কী ভাবে বিস্তৃত হতে শুরু করেছে তা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। লক্ষ্য করা গেছে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই এই পরিধিবিস্তার শুরু হয়েছে। আশ্চর্য দূরদর্শিতা ও মনীষার গুণে কেরী বাংলা ভাষা-সাহিত্যের এই আসন্ন সম্ভাবনার কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন এবং সেইজন্যই জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিষয়ে বাংলা গ্রন্থ রচনা ও লোকশিক্ষা প্রসারের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে বাংলা শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার দিকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর অভিধান সংকলনের মূলেও তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি সক্রিয় ছিল। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা উইলিয়ম কেরী বাংলা সাহিত্যের নতুন যুগের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। বাংলা ভাষা সাহিত্যের ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে কেরী এর আসন্ন ভবিষ্যতের রূপটিকে স্পষ্টভাবে দেখেছিলেন এবং সেই ভবিষ্যতকে গড়ে তোলার কাজে তিনি তাঁর অবদানও রেখে গেছেন। তাঁর বাংলা অভিধান তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। তাঁর অভিধানের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায়, ১৭ এপ্রিল ১৮১৮ তারিখে, তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাতে তাঁর এই মনোভঙ্গি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে : 'The number of books yet published in the Language is very small, and they are mostly translations from the Sungskrita ; no work has yet been published upon any one science, nor a treatise upon any particular subject. When literature and science become objects of pursuit in Bengal, and works on various subjects are published, (a period, the approach of which must be desired by every benevolent parson,) many of these terms, which are now only known to the learned, will become more common, and perhaps the lauguage will be enriched by many words borrowed from otber tongues.'

বক্ষ্যমাণ বিস্তার পর্বের অপর উল্লেখযোগ্য অভিধান— রামকমল সেনের ইংরেজি-বাংলা অভিধান ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে দু খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৭ বৎসরের পরিশ্রমে বহু বাধা অতিক্রম করে এই অভিধানখানি মুদ্রিত হয়। জনসনের ইংরেজি অভিধানের টড (Todd)-সম্পাদিত সংস্করণ অবলম্বনে এই অভিধানটি সংকলিত। এতে ইংরেজি শব্দসমূহ রোমান বর্ণমালানুসারে মুদ্রিত। প্রতি ইংরেজি শব্দের পাশে প্রথমে তা বিশেষ্য কী বিশেষণ ইত্যাদি উল্লেখ করে তার বাংলা অর্থ, একাধিক বাংলা প্রতিশব্দ সহ, দেওয়া আছে। উদাহরণ স্বরূপ দু-একটি শব্দ ও তার অর্থ এখানে উদ্ধৃত হল : 'Agast, a. শঙ্কাযুক্ত, ভয়ান্বিত, বিস্ময়াপন্ন, ভয়ানক। Decorament, n. s. অলঙ্কার, শোভা, সাজ। Fawn, n. s. Fr. মৃগশাবক, হরিণবৎস।'

অভিধানটির প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২০ + ১৮ + ৫৩৮ ও দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫২৩। অভিধানটিতে মোট ৬০,০০০ শব্দ সংকলিত হয়েছে। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে

কলকাতায় একটি প্রেসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় অভিধানটির মুদ্রণকার্য শুরু হয়। রামকমল সেনের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত বাংলা হরফের সাহায্যে ১১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছাপা হয়। পরে ঐ প্রেসের মালিকানা হস্তান্তরিত হওয়ায় অভিধানের মুদ্রণকার্য বন্ধ হয়ে যায়। তখন রামকমল শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে এটি মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। সেখানে তাঁদের নিজস্ব কলে প্রস্তুত কাগজে ও এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে তৈরি ছোটো হরফে অভিধানটির মুদ্রণকার্য আবার নতুন করে প্রথম থেকে শুরু হয়। কলকাতার প্রেসে ছাপা ১১৬ পৃষ্ঠা স্বভাবতই বাতিল হয়ে যায়। এই সময়ে ফেলিকস্ কেরী অভিধানটি সংকলনের কাজেও সহায়তা করেন। তা ছাড়া উইলিয়ম কেরী ও মার্শম্যানও এর প্রুফ সংশোধন ও মুদ্রণকার্যে অনেক সাহায্য করেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে ফেলিকস্ কেরীর মৃত্যু হওয়ায় মুদ্রণের কাজ বাধা-প্রাপ্ত হয়। তা ছাড়া আবার ওয়ার্ডের বিলেত গমন, তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর কয়েকটি জরুরী কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়া ও পরিশেষে তাঁর মৃত্যুর ফলেও অভিধান মুদ্রণের কাজ পুনশ্চ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এইভাবে ৯ বছরে ৩৫০ পৃষ্ঠা ছাপা হওয়ার পর দেখা যায় অধিকাংশ মুদ্রিত পৃষ্ঠাই বিবর্ণ হয়ে গেছে, অক্ষরগুলি ঝাপসা হয়ে পড়েছে ও হরফগুলিও জীর্ণ হয়ে গেছে। এতে মিশন প্রেসের মুদ্রণমানের যে সুনাম আছে তা ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কায় মার্শম্যান ঐ মুদ্রণ বন্ধ করে দেন। সুতরাং পুনশ্চ বিলম্ব ঘটে। পরিশেষে আবার নতুনভাবে সব বন্দোবস্ত করে নিয়ে মুদ্রণের কাজ শুরু হয় ও শেষ পর্যন্ত ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে অভিধানটি দু খণ্ডে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। রামকমল সেন তাঁর অভিধানের ভূমিকায় গ্রন্থ মুদ্রণের এই দীর্ঘ ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। সেই বর্ণনায় মুদ্রণের মানরক্ষায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের সজাগ দৃষ্টি ও কেরী, মার্শম্যান প্রমুখের অভিধানটি প্রকাশনার কাজে সযত্ন আগ্রহের কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রাসঙ্গিকবোধে এখানে তাই সে ইতিহাস উল্লেখ করা হল।

এ ছাড়াও শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত আরেকটি অভিধানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে জন ক্লার্ক মার্শম্যান উইলিয়ম কেরীর বাংলা-ইংরেজি অভিধানের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এতে কিঞ্চিদধিক ২৫০০০ বাংলা শব্দ সংকলিত হয়েছে। [১৮২৮ খ্রী. তিনি কেরীর অভিধানকে অবলম্বন করে একখানি ইংরেজি-বাংলা অভিধান রচনা করেন। ১৮২৯ খ্রী. এর ২য় সং প্রকাশিত হয়। মার্শম্যান তাঁর সংকলিত কেরীর অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণকে প্রথম ভাগ ও স্বরচিত ইংরেজি-বাংলা অভিধানকে দ্বিতীয় ভাগ বলে অভিহিত করেছেন।] ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকেও একটি অভিধান প্রকাশিত হয়। সেটি তারাচাঁদ চক্রবর্তী সংকলিত বাংলা-ইংরেজি অভিধান। এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০, এতে প্রায় সাড়ে সাত হাজার বাংলা শব্দ সংকলিত হয়েছে।

পরিশেষে পুনরুজ্জীবিত শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের মুদ্রণ-বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে

১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত একটি বইয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি একটি আইনের বই। এর বাংলা আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ : 'আইন | অর্থাৎ | শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের | ইং ১৭৯৬ লাং ১৮০১ সালের তাবৎ আইন। | তাহা শ্রীযুত নবাব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাতে | সংশোধিত হইয়া | দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। | শ্রীরামপুর। | ইং ১৮২৮ সাল। | বাং ১২৩৫ সাল।' এই আইন অনুবাদ এইচ. পি. ফরস্টার কর্তৃক অনুমোদিত। ভূমিকায় 'আইন সকলের ফিরিস্তি'র শেষে অথবা গ্রন্থমধ্যে প্রতিটি আইনের অনুবাদ ও আলোচনা সম্বলিত অধ্যায়ের শেষে লেখা আছে 'A True Translation, H. P. Forster' | ১১২⁄৩" × ৭১⁄৩" আকারের এই বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭৬ + ৩২ + ২৪। বইটির প্রতি পৃষ্ঠাতে আইনের বিভিন্ন ধারা বর্ণনাকালে পাশে পাশে শিরোনাম, সংক্ষিপ্ত টীকা বা সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আছে। আইনের বই ছাপাবার যে রীতিসম্মত পদ্ধতি আছে, সেই অনুযায়ীই বইটি ছাপা।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মুদ্রণের মানোন্নয়নের প্রতি শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের সর্বদাই সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত। নিত্য নতুন ও উন্নত ধাঁচের হরফ নির্মাণ, অক্ষর সাজানোর পদ্ধতি (composing) সংস্কার, কাগজ ও কালির মানোন্নয়ন— এক কথায় মুদ্রণ কলাকৌশলের ক্রমিক উন্নয়নের জন্য তাঁরা সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। বক্ষ্যমাণ 'আইন' (১৮২৮) বইটি তার উজ্জ্বল নিদর্শন। সমগ্র বইটি পরিষ্কার সুন্দর হরফে ছাপা। প্রতিটি হরফের উচ্চতা ২'৫ মি. মি.। একেবারে আধুনিক ধরনের অক্ষর, composing ও ছাপা। উৎকর্ষের বিচারে এর মুদ্রণের মান সত্যিই বিস্ময়কর। এর ছাপা আধুনিক লাইনোর সমতুল। নিদর্শন স্বরূপ, এর একটি পৃষ্ঠার একাংশের প্রতিলিপি এখানে সংযোজিত হল :

জানিবেন যে সুবেজাৎ বাঙ্গালার ও বেহারের ও বারাণসের এবং উড়িষ্যার মধ্যের শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকারভুক্ত সীমানার বাহিরে যত প্রকার নিমকপোক্তানী হয় ও জন্মে তাহা সমস্তই বিদেশীয় লবণের স্থানে গণ্য হইল। সে নিমক ঐ সরকারের নিজের নিমিত্তব্যতীত কিম্বা সরকারের হুকুমব্যতি রেকে অথবা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুক্রমে ছাপা ও জারীহওয়া আইনসকলের বিধির অনুসারে নহিলে ঐ সরকারের অধিকৃত দেশের ভিতরে আসিতে পারে না। যদি তাহা এ ধারার লিখিত নিষেধের অন্যথায় আইসে কিম্বা

বিদেশীয় লবণ আনিতে নিষেধের ও তাহা আনিলে জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

Vol. III. 417.

'আইন' (১৮২৮) বইয়ের একটি পৃষ্ঠার একাংশ

পুনরুজ্জীবিত শ্রীরামপুর মিশন প্রেস যে কেবলমাত্র বিষয়বৈচিত্র্য ও গুরুত্বে বাংলা প্রকাশনার পরিধি বিস্তার করেছিলেন তা নয়, মুদ্রণ কলাকৌশলের মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষ বিচারেও তাঁরা বাংলা মুদ্রণকে এক গৌরবময় পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

দেশীয় মালিকানায় মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার : ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনশিল্পের বিস্তার

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ যখন আরো কুড়ি বছর বাড়ানো হয় সেই সময় তাতে যে-কয়টি নতুন উল্লেখযোগ্য শর্ত আরোপিত হয় তার মধ্যে অন্যতম ছিল, ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার লোপ। কোম্পানীর এই একচেটিয়া অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লুপ্ত হওয়ায় অন্যান্য সাধারণ ইংরেজ ব্যবসায়ীরাও তাঁদের পণ্যসামগ্রী ভারতের বাজারে রপ্তানী করতে উৎসাহিত হন। ফলে ঐ সময় থেকে নানাবিধ নতুন নতুন ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রী কলকাতার বাজারে আসতে থাকে। বাংলাদেশে মুদ্রণব্যবসায় তখন সবে জমে উঠতে শুরু করেছে। নতুন বইয়ের চাহিদা দেখা দিচ্ছে, ছাপা বইয়ের জনপ্রিয়তাও বাড়তির মুখে। সুতরাং সেই নতুন ব্যবসায়িক সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে কলকাতার বাজারে বেশ কিছু সংখ্যক মুদ্রণযন্ত্রও আমদানী হতে থাকে। জীবিকা হিসাবেই অনেকে তখন মুদ্রণ ব্যবসায়ে এগিয়ে আসেন, ফলে নতুন নতুন ছাপাখানা গড়ে উঠতে থাকে। এবং এর বেশিরভাগই গড়ে ওঠে বেসরকারী ব্যবসায়িক ভিত্তিতে। তার চেয়েও বড়ো কথা, ক্রমবর্ধমান হারে দেশীয় মালিকানায় মুদ্রণব্যবসায় চালু হতে থাকে। ফলে কলকাতা ও তার আশেপাশে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন শিল্প ধীরে ধীরে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিস্তার লাভ করতে থাকে।

মুদ্রণব্যবসায় যখন জমে ওঠে, তখন ব্যবসায়ের স্বাভাবিক সূত্র অনুযায়ী বাজারে মুদ্রাযন্ত্রের লেনদেনও চলতে থাকে। বাংলা মুদ্রণের বিস্তার পর্বে কলকাতায় অনেক ছাপাখানা হস্তান্তরিত হতে দেখা যায়। কখনো তা স্থানান্তরিত হয়েছে, কখনো হস্তান্তরিত। একক মালিকানা থেকে যৌথ মালিকানা, অথবা নীলামে বিক্রয়। কোনো কোনোটি সম্প্রসারিত হয়েছে, কিছু বা গুটিয়ে এসেছে। এ সবই ব্যবসায়ের স্বাভাবিক নিয়মে চলেছে। মুদ্রণযন্ত্র কেনাবেচার বিজ্ঞপ্তিও দেখা গেছে তখনকার কাগজে। যেমন গভর্নমেণ্ট গেজেটে (পূর্বতন বা পরবর্তী ক্যালকাটা গেজেট) প্রকাশিত ২৯শে আগস্ট ১৮২৭ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গভর্নমেণ্ট গেজেট অফিসের ঠিকানায় 'কিষেণ মিস্ত্রী' (কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রী বা কর্মকার ?)-এর কাছ থেকে চারটি কাঠের মুদ্রণযন্ত্র সুলভে পাওয়া যাবে। ['For sale/

Four Wooden Printing Press, at moderate prices. Apply to Kisen Mistry, at the Government Gazette Office, Calcutta, 29th August, 1827'.][১]

এইভাবেই তখন কলকাতার বাজারে মুদ্রণযন্ত্র বা কাগজ, কালি, মুদ্রাক্ষর প্রভৃতি মুদ্রণের সাজসরঞ্জাম কেনাবেচা হয়েছে, নতুন নতুন ছাপাখানা গড়ে উঠেছে, নিত্য নতুন বাংলা বই ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, বইয়ের দোকান খোলা হয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে একদল বিদগ্ধ বাঙালী পাঠক গড়ে উঠেছে। আর এইভাবে রচিত হয়েছে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন শিল্পের বিস্তার পর্বের ইতিবৃত্ত।

এই ইতিবৃত্তের সাক্ষ্য তদানীন্তন পত্রপত্রিকা বা বিভিন্ন প্রকাশনে পাওয়া যায়। ১৮১৭ থেকে ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত বক্ষ্যমাণ 'বিস্তার পর্বে' বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন শিল্প অত্যন্ত দ্রুতগতিতে প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। ছাপাখানার সংখ্যা যেমন এই পর্বে দ্রুত হারে বেড়েছে, মুদ্রিত বাংলা বই ও পত্রপত্রিকার সংখ্যাও তেমনই বেড়েছে; আবার ছাপার মান যেমন উন্নত হয়েছে, প্রকাশনার মানও তেমনি বিষয়বৈচিত্র্যে গুরুত্ব ও আভিজাত্য লাভ করেছে। ১৮৩৩ সালের অক্টোবর মাসে 'সমাচার দর্পণ' লেখেন: 'দশ বৎসরাবধি ভারতবর্ষে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যের অপূর্ব্বরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কলিকাতা নগরে ভূরি ২ ঐ যন্ত্রালয় হইয়াছে তদধ্যক্ষেরা এইক্ষণে প্রতিযোগিতারূপে এমত উদ্যোগ করিতেছেন যে কে কত উত্তমরূপ অথচ অল্পমূল্যে গ্রন্থাদি ছাপাইতে পারেন।'[২] বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের বিস্তার ধারার আরো সাক্ষ্য পাওয়া যায় তদানীন্তন কালের কিছু কিছু বাংলা বইয়েও। 'আসাম বুরঞ্জি' (১৮২৯) গ্রন্থের অনুষ্ঠানপত্রে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: 'কলিকাতা মহানগরে ছাপাযন্ত্রের বাহুল্য হওয়াতে বিদ্যার অধিক অনুশীলন হইয়াছে এবং অনেক গুণবান ভাগ্যবান মহাশয়েরা নানা বিদ্যা বিষয়ক ও নানা দেশ বিবরণ পুস্তক অধিক পরিশ্রম দ্বারা শোধিত ও মুদ্রিত করিয়া অনেকের পরিশ্রম নিবারণ ও বিজ্ঞতা করিতেছেন···' ইত্যাদি।

পূর্বোক্ত দুটি সাক্ষ্য-উদ্ধৃতি থেকে বাংলা মুদ্রণের এই পর্বের তিনটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়। বৈশিষ্ট্যগুলি এই: প্রথমত, 'কলিকাতা মহানগরে ছাপাযন্ত্রের বাহুল্য' বা 'কলিকাতা নগরে ভূরি ২ ঐ যন্ত্রালয়' প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয়ত, মুদ্রণ কলাকৌশলের উৎকর্ষ সাধন অর্থাৎ 'কে কত উত্তমরূপ অথচ অল্পমূল্যে গ্রন্থাদি ছাপাইতে পারেন' তার প্রতিযোগিতা; তৃতীয়ত, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যসাধন অর্থাৎ 'নানা বিদ্যাবিষয়ক' ও 'নানা দেশ বিবরণ পুস্তক' প্রকাশ। বাংলা মুদ্রণের বিস্তার পর্বের এর চেয়ে বড়ো পরিচয় আর হয় না। যে বেসরকারী ব্যবসায়িক মুদ্রণ প্রচেষ্টায় বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন শিল্পের এই বৈশিষ্ট্যগুলি গড়ে উঠেছিল প্রসঙ্গক্রমে এখানে তার বিশদ পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

---

১ *'The Days of John Company: Selections from the Calcutta Gazette*, **1824-1832', ed. by Anil Ch. DasGupta, 1959: p. 259.**

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৯।

বেসরকারী মুদ্রণব্যবসায়ের মধ্যে মিশনারী উদ্যোগে পরিচালিত কয়েকটি ছাপাখানার কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে ব্যাপটিস্ট মিশনারী গোষ্ঠী পরিচালিত শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ও কলকাতায় সার্কুলার রোডে অবস্থিত ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের কথা এর আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া তদানীন্তনকালে অপর উল্লেখযোগ্য মিশনারী প্রেস: কলকাতায় আমহার্স্ট স্ট্রীট অঞ্চলে অবস্থিত চার্চ মিশন প্রেস এবং গঙ্গার পশ্চিম তীরে হাওড়া শিবপুরে কোম্পানী বাগানের (বোটানিক্যাল গার্ডেন) নিকট অবস্থিত বিশপস্ কলেজ প্রেস। এই উভয় প্রেসেই খ্রীস্টধর্মসম্পর্ক-বিহীন সাধারণ বাংলা বইও ছাপা হত। চার্চ মিশন প্রেসের একটি উল্লেখযোগ্য বাংলা প্রকাশন— 'সাধারণ প্রার্থনা' পুস্তক বা *Book of Common Prayer*-এর বঙ্গানুবাদ ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অকটেভো ৮" × ৫" আকারের ২৭৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই বইটির আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ: 'ইংলণ্ডে ও ঐর্লণ্ডে সংস্থাপিত মণ্ডলীর | সাধারণ প্রার্থনা। | অর্থাৎ | প্রাতঃকালের ও সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা, | এবং | লিটনী নামক প্রার্থনা ও প্রত্যেক রবিবারাদির | বিশেষ প্রার্থনা, | আর | প্রেরিতগণ পত্রের ও মঙ্গলসমাচারের বিশেষভাগ | বঙ্গভাষায় তর্জ্জমা করা গেল। | কলিকাতায় | চার্চ মিশন ছাপাখানাতে ছাপা হইল। | ১৮২২।' এই বইটির মুদ্রণবৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর আখ্যাপত্রে বা অধ্যায় শিরোনামে বা বইয়ের মূল অংশে বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন ধাঁচের বা ফেসের মুদ্রাক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও ছোটো বা কোথাও বড়ো আকারের হরফ, আবার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের ছোটো হরফ ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের গোড়ারদিকের ছাপার সঙ্গে এখানেই এর মূল পার্থক্য। এই বইয়ে ব্যবহৃত সবচেয়ে ছোটো যে হরফ তার উচ্চতা ২ মি. মি. বা তার চেয়েও কিছু কম, বইয়ের মূল অংশের হরফের উচ্চতা ২.৫ মি. মি. এবং শিরোনাম ইত্যাদি ছাপার কাজে ব্যবহৃত মোটা (bold) হরফের উচ্চতা ৩.৫ মি. মি.। এর মুদ্রাক্ষর সাজানোর পদ্ধতিও (composing) অত্যন্ত সুষম, মাত্রা কোথাও উঁচু নিচু নেই, machine composing-র মতো নিখুঁত। সব মিলিয়ে এর ছাপা আধুনিক কালের ছাপার সমতুল। এই বইয়ের ছাপার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, ইংরেজি যতিচিহ্নের ব্যবহার। কমা (,), সেমিকোলনের (;) সঙ্গে পূর্ণচ্ছেদের জন্য দাঁড়ির (।) স্থলে ফুলস্টপ (.) ব্যবহৃত হয়েছে। চার্চ মিশন প্রেস এ বিষয়ে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির আদর্শ অনুসরণ করেছে।

চার্চ মিশন প্রেসে আরো কিছু বাংলা বই ছাপা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত জে. এফ. এলারটনের 'গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর ধারাতে সৃষ্ট্যাদির বিবরণ' (এর পূর্ববর্তী সংস্করণ ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়), ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রামজয় তর্কালঙ্কার সংগৃহীত 'দায়কৌমুদী দত্তককৌমুদী-ব্যবস্থা সংগ্রহঃ'। এ ছাড়া চার্চ মিশনের যাবতীয় ধর্মীয় পুস্তকাবলী চার্চ মিশন প্রেসে ছাপা হত। এর প্রখ্যাত মুদ্রাকর ছিলেন

P. S. D. Rozario।[১] '*Christian Intelligencer*' নামক একটি মাসিক পত্র এই প্রেস থেকে প্রকাশিত হত।

১৮২০ সালের ডিসেম্বর মাসে গঙ্গার পশ্চিম তীরে হাওড়া শিবপুরে কোম্পানী বাগানের (অর্থাৎ বোটানিক্যাল গার্ডেনের) পাশে বিশপ মিডলটন (কলকাতার প্রথম Anglican Bishop) কর্তৃক বিশপস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। Incorporated Society for Propagating the Gospel in Foreign Parts নামক সমিতির উদ্যোগে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজ প্রথমে খ্রীস্টতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে কলা ও বিজ্ঞান বিষয়েও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। ১৮২৬ সালে এর অধ্যক্ষ ছিলেন রেভা. ডব্লু. এইচ. মিল, তখন এর বাংলা বিভাগের পণ্ডিত ছিলেন রাজকুমার ও কাশীনাথ।[২] ১৮২৭ সালে বাংলা বিভাগে যোগ দেন পণ্ডিত গঙ্গাধর।[৩] কলেজ প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যে (সম্ভবত ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে) কলেজের একটি নিজস্ব ছাপাখানাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজ প্রেসের অধ্যক্ষ ছিলেন হেনরি টাউনসেণ্ড (Henry Townsend)।[৪] ১৮৩২ সালে প্রেসের নতুন অধ্যক্ষ হন প্রাচ্যভাষাবিশারদ জে. সাইক্স (J. Sykes)।[৫] কলেজের যাবতীয় নিজস্ব ছাপার কাজ ছাড়াও, বহু বাংলা বইও বিশপস কলেজ প্রেস থেকে ছাপা হয়। যেমন, বিশপস কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মিশনারী রেভা. উইলিয়ম মর্টনের বাংলা-ইংরেজি অভিধানটি ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে কলেজ প্রেস থেকে ছেপে প্রকাশিত হয়। অভিধানটির আখ্যাপত্র ছিল এইরূপ: 'দ্বিভাষার্থকাভিধান, /or/A Dictionary/of the / Bengali Language/ with/Bengali Synonyms/and / An English Interpretation,/ compiled from native and other authorities./By/ The Rev. William Morton,/Missionary from the incorporated society for the propa-/gation of the Gospel in foreign parts./ অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ। নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ ॥/ Bishop's College :/ Printed by H. Townsend./ 1828.' অক্টেভো আকারের এই বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭ + ৬৬০ + ২, এর মূল্য ধার্য হয় দশ টাকা, এতে ১০৭০০ শব্দ সংকলিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি শব্দ ও তাদের অর্থ নীচে উদ্ধৃত হল:

অকরুণ, নির্দয়—Unmerciful, unfeeling.

উত্তাপ, উষ্ণতা, তাপ—heat, ardour, zeal, distress.

---

১ *Bengal Directory*, 1830.

২ *Bengal Directory*, 1826.

৩ *Bengal Directory*, 1827.

৪ *Bengal Directory*, 1826.

৫ *Bengal Directory*, 1832.

কাঁকালি, কটিদেশ, কক্ষ—the loins, hip, waist, side.

ঘুঘু, পারাবত, বন্য কপোত—a dove, a turtle-dove.

ছুকরী, ছুঁড়ী, কন্যা, বালিকা—a girl.[১]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিশপস কলেজ কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। এর কোম্পানী বাগান সংলগ্ন আদি ভিটে বর্তমান শিবপুর বি. ই. কলেজের এলাকাভুক্ত। খ্রীস্টতত্ত্ব শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে এখনো বিশপস কলেজ কলকাতায় বেকবাগান অঞ্চলে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে টিঁকে রয়েছে।

বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত এই সব মিশনারী ছাপাখানা ছাড়াও আলোচ্য বিস্তার পর্বে কলকাতা ও তার আশেপাশে দেশীয় মালিকানায় পরিচালিত অসংখ্য ছাপাখানা গড়ে উঠেছিল। এই সব দেশীয় ছাপাখানা থেকে বক্ষ্যমাণ পর্বের আঠারো বছরের কালসীমায় অসংখ্য বাংলা বই ও বাংলা পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রপত্রিকার কথা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। অন্যান্য প্রকাশনার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে ঐ পর্বের কয়েকটি প্রধান প্রধান দেশীয় ছাপাখানার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন শিল্পের বিস্তৃতির মূলে এই সব দেশীয় ছাপাখানার অবদান ছিল অপরিসীম।

১৮২০ সালে প্রকাশিত '*Friend of India*'-এর একটি নিবন্ধে বলা হয় ঐ সময় অন্তত চারটি দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত ছাপাখানা ছিল। (…'there are now no less than Four Presses in constant employ, conducted by natives and supported by the native population.')[২]

রেভা. জে. লঙ-ও তাঁর একটি প্রতিবেদনে (১৮২১) উল্লেখ করেছেন যে ঐ সময়ে অন্তত চারটি দেশীয় ছাপাখানা চালু ছিল। ('In 1821 it was pronounced a great triumph that "there are no less than 4 Native Presses in constant employ." ')[৩]

উপরোক্ত প্রতিবেদনে ঐ দেশীয় ছাপাখানাগুলির নামোল্লেখ করা না হলেও এগুলি কী হতে পারে অনুমান করা যায়। পটলডাঙ্গায় লল্লুলাল কবির সংস্কৃত যন্ত্র, আড়পুলি লেনে হরচন্দ্র রায়ের ছাপাখানা ও শোভাবাজারে বিশ্বনাথ দেবের প্রেস ছিল ঐ সময়ের তিনটি বিখ্যাত দেশীয় ছাপাখানা। এ ছাড়া চতুর্থ দেশীয় ছাপাখানা হিসাবে ঐ সময়ে লালবাজারস্থ হিন্দুস্থানী ছাপাখানা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। তবে সঠিক বিচারে হিন্দুস্থানী

১ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়, পৃ. ৬১।

২ 'On the effect of the Native Press in India' : *Friend of India* (Qly.), September, 1820.

৩ *Report on the Native Press in Bengal in 1857*, by J. Long, 1859., p. X.

ছাপাখানাকে দেশীয় মালিকানার প্রেস বলা যায় না। কারণ ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উইলসন ও রোবাক ছিলেন এর স্বত্বাধিকারী। তবে ঐ প্রেসের মূল পরিচালক বা কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন রামকমল সেন। সেইজন্যই বোধ হয় এটি অন্যতম দেশীয় ছাপাখানা হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। কিছু কিছু ইংরেজি বইয়ের সঙ্গে বাংলা বইও ঐ প্রেসে ছাপা হয়। যেমন, ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে রামকমল সেনের 'ঔষধসার সংগ্রহ' হিন্দুস্থানী ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়। সমসাময়িককালে কলকাতায় আরেকটি দেশীয় ছাপাখানার উল্লেখ পাই। সেটি হল বাঙ্গালি প্রেস। এই প্রেসের দুটি উল্লেখযোগ্য বাংলা প্রকাশন: রামমোহন রায়ের 'কঠোপনিষৎ' (১৮১৭) ও রাধামোহন সেনের 'সঙ্গীত তরঙ্গ' (আষাঢ় ১২২৫ / ১৮১৮)। প্রসিদ্ধ বাঙালী মুদ্রণ ব্যবসায়ী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সঙ্গে এই প্রেসের সম্পর্ক থাকা অসম্ভব ছিল না। তবে আগেই উল্লেখ করেছি ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে গঙ্গাকিশোর কলকাতার পাট চুকিয়ে নিজগ্রাম বহড়ায় ফিরে গেছেন। হরচন্দ্র রায় ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত চোরবাগান স্ট্রিটের বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস (বা 'বেঙ্গলী প্রিন্টিং প্রেস') ততদিনে উঠে গেছে। 'বাঙ্গাল গেজেটি আপিস' থেকে প্রকাশিত যে শেষ গ্রন্থের উল্লেখ পাই তা ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রীভগবদ্গীতা' (সংস্কৃত শ্লোক ও তার বাংলা পদ্যানুবাদ সহ)। ৪ সেপ্টেম্বর ১৮১৯ (২০ ভাদ্র ১২২৬) তারিখে সমাচার দর্পণে এর বিশদ বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়: 'শ্রীভগবদ্গীতা গ্রন্থ সংস্কৃত অষ্টাদশ অধ্যায় এবং তাহার প্রতিশ্লোকের যথার্থ অর্থ পয়ারে প্রতি সংস্কৃত শ্লোকের নীচে অত্যুত্তম রূপে মোং কলিকাতার বাঙ্গাল গেজেটি আপিসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপা করিয়াছেন।...যে ২ মহাশয়েরদিগের ঐ পুস্তক লইতে মানস হইবেক তাঁহারা মোং কলিকাতার জোড়াসাঁকোর পূর্ব্ব জোড়া পুখুরিয়ার নিকট শ্রীযুত জয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া লইবেন। প্রতিপুস্তকের মূল্য জেলেদ সমেত লইলে ৪।০ সাড়ে চারি টাকা দিতে হইবেক জেলেদ সমেত না লয়েন চারি টাকা দিলে পুস্তক পাইবেন।'[১] পরবর্তীকালে গঙ্গাকিশোর বহড়ায় স্থাপিত তাঁর বাঙ্গালা যন্ত্র থেকে গদ্যে রচিত ভাষা অর্থ সহ 'শ্রীভগবদ্গীতা'র ২য় সংস্করণ (১২৩১। ১৮২৪) প্রকাশ করেন। এ ছাড়া বহড়ায় ছাপা তাঁর অন্যান্য বইয়ের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

অপরপক্ষে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর হরচন্দ্র রায় তাঁর প্রেস (বেঙ্গলী প্রেস) ৯নং আড়পুলি লেনে স্থাপন করেন। তাঁর এই প্রেস 'আড়পুলির ছাপাখানা' বলেও প্রসিদ্ধি লাভ করে। হরচন্দ্র রায়ের ঐ প্রেস থেকে অনেকগুলি বাংলা বই প্রকাশিত হয়। কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:

রামমোহন রায়ের 'কবিতাকারের সহিত বিচার', ১৮২০। পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়-এর

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১।

'শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ঃ' ও 'উদ্ধবদূত' একত্রে, ১৮২১। (বই দুটির শেষে 'রায় শ্রীহরচন্দ্র শর্মণো মুদ্রাক্ষর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিতমিদং গ্রন্থদ্বয়ং'— এইরূপ উল্লেখ আছে।[১])

শ্রীমন্ত রায় কর্তৃক রামরত্ন ন্যায়পঞ্চাননের 'ভগবতী গীতা' ও তার ভাষ্য, ১৮২৪। (এই বইয়ের গোড়ায় নারদ ও শিবের একটি ধাতু খোদাই চিত্র আছে।) বারাণসী আচার্যের 'কালীর সহস্র নাম' । 'বিষ্ণুর সহস্র নাম' । 'রাধিকার সহস্র নাম' । 'হনুমশ্চরিত্র', 'কাকচরিত্র' ও 'চক্ষুরাদি স্পন্দনের ফলাফলসূচক এক গ্রন্থ', ১৮২৪।[২] বারাণসী আচার্যকৃত জ্যোতিষের বঙ্গানুবাদ, ১৮২৪। রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ 'চাণক্যশ্লোক', 'শৃঙ্গারতিলক' ও 'মোহমুদ্গর'-এর বঙ্গানুবাদ, ১৮২৫। রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'দায়ভাগ' ও তার অনুবাদ, ১৮২৫। নন্দকুমার দত্তকৃত কাশীনাথ সার্বভৌমের 'চৌরপঞ্চাশিকা'র বঙ্গানুবাদ (মূল সংস্কৃত সমেত), ১৮২৫।[৩]

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্রজভাষার মুন্সী লল্লূলাল কবির সংস্কৃত যন্ত্র (Sungscrit Press) ১৮১৫ খ্রী. থেকে ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসর কাল চালু ছিল। ঐ সময়ে উক্ত মুদ্রাযন্ত্রে অনেক বাংলা বই ছাপা হয়। বিশেষ করে রামমোহন রায়ের অনেকগুলি বই লল্লূজী নিজে বা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সহায়তায় ছাপেন। আগেই উল্লেখ করেছি, খিদিরপুরের বাবুরাম পণ্ডিত পূর্বে এই সংস্কৃত যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তাঁর পরেই ১৮১৪-১৫ খ্রীস্টাব্দে লল্লূলাল এই ছাপাখানার মালিক হন। শোনা যায়, ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা ত্যাগ করে আগ্রা যাবার সময় লল্লূলাল তাঁর মুদ্রাযন্ত্রটি সঙ্গে করে নিয়ে যান। কলকাতায় থাকাকালীন লল্লূলালের সংস্কৃত যন্ত্র পটলডাঙায় অবস্থিত ছিল। বাবুরামের আমলের মদন পাল এরও মুদ্রাকর ছিলেন। সংস্কৃত যন্ত্রে ছাপা বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল :

রামমোহনের উদ্যোগে প্রকাশিত 'শারীরক মীমাংসা,' বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত (১৮১৮)। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 'জ্যোতিষ সংগ্রহসার' (১৮১৭)। রামমোহন রায়ের 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' (বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত : ১৮১৬-১৭), 'পথ্যপ্রদান (১৮২৩)। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য অনূদিত 'মহিম্নঃ স্তব' (১৮২৩) ইত্যাদি।

সমসাময়িক কালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দেশীয় ছাপাখানা ছিল শোভাবাজারে অবস্থিত বিশ্বনাথ দেবের প্রেস বা ছাপাখানা। ঐ সময়কার 'সমাচার দর্পণ', প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তিতে এই ছাপাখানাকে 'শোভাবাজারস্থ যন্ত্র' বা 'Sobhabazar Press' বলেও উল্লেখ করা হত। শোভাবাজার রাজবাড়ির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় বিশ্বনাথ দেবের প্রেস সমাজে বিশেষ আভিজাত্যও অর্জন করেছিল। বাংলা মুদ্রণের বিস্তার পর্বের অনেক

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা (১ম) : 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য', পৃ. ২৩-২৪।

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম), পৃ. ৬৮।

৩ তদেব, পৃ. ৭৩। সমাচার দর্পণ, ১৪ জানুয়ারি ১৮২৬।

প্রখ্যাত বাংলা বই এই প্রেসে ছাপা হয়। কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

রাধাকান্ত দেব-তারিণীচরণ মিত্র-রামকমল সেনের 'নীতিকথা', ১ম ভাগ (১৮১৮)। রাধাকান্ত দেবের '*Bengalee Spelling Book*'। গৌরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার কৃত '১২২৭ সালের পঞ্জিকা' (১২২৬ সন বা ১৮২০ খ্রীস্টাব্দ)। রাধাকান্ত দেবের 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' (১৮২১)। রামজয় বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী' (১৮২৪)। 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮২৫)। দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' (১২৩১ সন বা ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দ)। রাধামোহন সেন কর্তৃক বাংলা পদ্যে অনূদিত 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী', (১২৩২ সন বা ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দ), সচিত্র, মূল্য দু টাকা। কৃষ্ণলাল দেবের বররুচিকৃত 'পত্রকৌমুদী' (১৮২৮)। মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের 'কুলপ্রদীপ' (রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের উদ্যোগে ১৮৩২ সালে প্রকাশিত)।

গভর্নমেন্ট গেজেটে (পূর্বতন ক্যালকাটা গেজেট) ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪ তারিখে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে উপরোক্ত রামজয় বিদ্যাসাগর সম্পাদিত 'চণ্ডী' সম্বন্ধে বলা হয় যে ৪৭০ পৃষ্ঠা সম্বলিত অক্টেভো আকারের এই বইটি ৫টি সুন্দর ধাতু-খোদাই চিত্র শোভিত ও চামড়া বাঁধাই হয়ে বিশ্বনাথ দেবের প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং এর মূল্য ধার্য হয়েছে সিক্কা আট টাকা : প্রাপ্তিস্থান—রামচাঁদ ঘোষ ও তারিণীচরণ চন্দ, ৮৬নং রাধাবাজার।[১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রামজয় বিদ্যাসাগরের আগে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ করেন। এ সম্বন্ধে ৩ এপ্রিল ১৮১৯ (২২ চৈত্র ১২২৫) তারিখের সমাচার দর্পণে লেখা হয় : 'কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তীকৃত ভাষাচণ্ডী গান পুস্তক নানাপ্রকার লিপি দোষেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বহু দেশীয় বহুবিধ পুস্তক একত্র করিয়া বিবেচনাপূর্বক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিতেছেন অনুমান হয় যে লাগাদ শ্রাবণ ভাদ্র সমাপ্ত হইতে পারে।'[২]

উলা নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত ও বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানা থেকে ১২৩১ সনে প্রকাশিত পূর্বোক্ত 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২০৪। এতে বিশ্বম্ভর আচার্য-খোদিত 'ভগীরথ গঙ্গা' নামে একখানি ধাতু-খোদাই চিত্র ছিল।[৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই একই উলা-নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ বিভিন্ন ছাপাখানা থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন ১২৩৫

---

১ ***'The Days of John Company...', op. cit., p. 36.***

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম), পৃ. ৩০।

৩ তদেব, পৃ. ৪০৭-৪০৮।

সালে (১৮২৮ খ্রীঃ) সুধাসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'-র একটি সংস্করণের সন্ধান আমি পেয়েছি। এর আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ : 'শ্রীশ্রীদুর্গা | শরণং | গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী | নামক গ্রন্থঃ | শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়স্য কৃত | ইদানীন্ত | মোকাম কলিকাতায় যুগলোদ্যানে | শ্রীযুক্ত শ্রীল | শ্রীদেবীচরণ প্রামাণিক তথা শ্রীনৃসিংহ দাস | দিগের সুধাসিন্ধু নামক যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল | অতএব দেশ বিদেশস্থ | মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন | যাহার এই পুস্তক লইতে বাঞ্ছা হইবেক | তাহারা মোকাম যোড়াবাগানে শ্রীযুক্ত অম্বুজ | লোচন প্রামাণিকের বাটীতে আইলে পাইবে | ইতি তারিখ ৩১ আষাঢ় ১২৩৫ সাল…'। এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২ + ৩ + ২২৮। এই বইয়ের পাঠ আমি বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত পূর্ববর্তী সংস্করণের (১২৩১) পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি একই, কেবলমাত্র কিছু বানানের পার্থক্য ঘটেছে। তা সম্ভবত কম্পোজিটর-মুদ্রাকরের ভাষাজ্ঞানের তারতম্যের ফলে ঘটেছে।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বক্ষ্যমাণ বিস্তার পর্বে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের অগ্রগতিতে বাংলা সাময়িকপত্র পরিচালকদের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ঐ সময়কার অধিকাংশ পত্রপত্রিকাই তাদের নিজস্ব ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হত। এবং অবসর সময়ে ঐ ছাপাখানাগুলি নানাবিধ বাংলা বই প্রকাশনে নিয়োজিত থাকত। যেমন, সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রালয় সংবাদপত্র ছাড়াও ঐ সময়ে বহুবিধ বাংলা সংস্কৃত বইয়ের এক বিশিষ্ট প্রকাশক রূপেও খ্যাতি লাভ করে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে কলুটোলায় নিজালয়ে সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্র স্থাপন করেন। সমসাময়িককালে ঐ ছাপাখানাকে কলুটোলার চন্দ্রিকা যন্ত্রালয় বলেও উল্লেখ করা হত। ঐ মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা কিছু বাংলা বইয়ের পরিচয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

রঘুরাম শিরোমণির 'দায়ভাগার্থদীপিকা' (১৮২২), পৃ. ৬১। কালীশঙ্কর ঘোষালের 'ব্যবহার মুকুর' (১৮২৩।১২৩০)। কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ড পীড়ন' (১৮২৩)। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩ খ্রী. । ১২৩০ সন), ও তাঁর সংগৃহীত 'হিতোপদেশ' (১৮২৩।১২৩০) | ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দূতীবিলাস' (১৮২৫। ১২৩২)— এতে বারোখানি লাইন-এনগ্রেভিং চিত্র সন্নিবেশিত হয়। ভাবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ('প্রমথনাথ শর্ম্মন') 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫)। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক কয়েকটি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের সটীক পুনর্মুদ্রণ : সটীক 'শ্রীমদ্‌ভাগবত' (১৮৩০) [ভবানীচরণ এই বই পুঁথির আকারে তুলট কাগজে ব্রাহ্মণ দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করান], 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকং (১৮৩৩) ও 'মনুসংহিতা' (১৮৩৩)। [শেষোক্ত বই দুটিও পুঁথির আকারে তুলট কাগজে ছাপা।] পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের 'ক্রিয়াযোগসার' (১৮২৪)। রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের 'আনন্দলহরী' (১৮২৪)। লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের 'মিতাক্ষরা-ব্যবহারকাণ্ড' (১৮২৪)। শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের 'পুরাণ

বোধদ্দীপন' অনুবাদ (১৮২৫)। মাধব শর্ম্মার শ্রীভাগবতের দশম স্কন্দের ভাষা বিবরণ 'ভাগবতসার' (১৮২৫)। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', ২য় সং (১৮২৫)। হরগোবিন্দ দত্তের 'সাত্বত সভাপ্রবেশ প্রবন্ধ' (১৮২৫)। ১২৩৪ সালের নবপঞ্জিকা (১৮২৭)। বেণীমাধব দত্ত সম্পাদিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (১৮২৭ সালে তুলট কাগজে উত্তমাক্ষরে মুদ্রণারম্ভ)। লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কর্তৃক সাধু গৌড়ীয় ভাষায় সংগৃহীত 'শাস্ত্র সর্ব্বস্ব' (১৮২৬ সালে মুদ্রণারম্ভ)। 'আসাম বুরঞ্জি', 'শঙ্করীগীতা' ও 'বায়ুব্রহ্ম' ১৮২৯ সালে ছাপা।

এ ছাড়া সমসাময়িককালে আরো কয়েকটি সংবাদপত্র মুদ্রণালয় যেমন, 'সম্বাদতিমির-নাশক ছাপাখানা', 'বঙ্গদূত যন্ত্রালয়', 'সমশুল আখবার প্রেস' গ্রন্থ প্রকাশক হিসাবেও খ্যাতি লাভ করে।

কলকাতার মীর্জাপুরে অবস্থিত 'সংবাদমিতিরনাশক ছাপাখানা' থেকে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

শ্রীকৃষ্ণমোহন দাসের 'জ্যোতিষ' (১৮২৪), 'দিন কৌমুদী' (১৮২৪)। তারাচাঁদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'চণ্ডী'র বঙ্গানুবাদ (১৮২৫)। ১৮২৪ সালে প্রকাশিত 'রতিমঞ্জরী', 'তর্পণ', 'শূদ্র ও ব্রাহ্মণের প্রণাম শিক্ষা বিবরণ', 'পদাঙ্ক দূত', 'পঞ্চাঙ্গ সুন্দরী', 'আনন্দলহরী' ও 'রাধিকামঙ্গল'।

১৫২ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রিট, সিমলায় অবস্থিত 'বঙ্গদূত যন্ত্রালয়ে' ছাপা বাংলা বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

অভয়াচরণ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্যের 'ভূপাল কদম্ব' (১৮২৯-৩০) [এটি রাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ছাপেন।]; ভর্তৃহরির ত্রিশতকের বাংলা পদ্যানুবাদ (১৮২৯-৩০); রাধা-মোহন সেনের 'অন্নপূর্ণা মঙ্গল' (১৮৩৩)।

চোরবাগান নিবাসী মথুরামোহন মিত্র সম্ভবত সমশুল আখবার প্রেসের মালিক ছিলেন। সমশুল আখবার প্রেসে কিছু প্রাচীন বই পুনর্মুদ্রিত হয়। যেমন ১৮২৫ সালে ছাপা :

জহরি অর্থাৎ দেশের বিবরণ ও বাদসাহী বিবরণ ইত্যাদি। তৌকিয়াত কিসরা এবং মরফিয়ৎ ও জবা অর্থাৎ জ্ঞানোপদেশের কথা। দস্তরল্ এন্‌সা অর্থাৎ পত্রাদি লিখনের ধারা। এ আর মহম্মদ অর্থাৎ শ্রাবৎ।[১]

বাংলা মুদ্রণের বিস্তার পর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, যেমন, সমাচার দর্পণ, সম্বাদতিমিরনাশক, বঙ্গদূত, *Friend of India*, *Government Gazette* (*Calcutta Gazette*) প্রভৃতিতে সমসাময়িককালে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হত। ঐ সব বিজ্ঞপ্তি থেকে ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা', '*Selections from Calcutta Gazette*' প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত) ঐ সময়ের বিভিন্ন দেশীয় ছাপাখানা ও তাদের মুদ্রিত

১ তদেব, পৃ. ৭৪।

বিভিন্ন বইয়ের বিবরণী পাওয়া যায়। এইসব তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে ঐ সময়কার আরো কিছু দেশীয় ছাপাখানা ও সেখান থেকে ছাপা বিভিন্ন বাংলা বইয়ের পরিচয় এখানে উল্লেখ করা হল :

বউবাজারের লেবেণ্ডর সাহেবের ছাপাখানায় মুদ্রিত বই :

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের 'মিতাক্ষরাদর্পণ' (১৮২৪)। লেবেণ্ডর সাহেব সংগৃহীত ইংরেজি-বাংলায় 'জানসেন ডিকসিয়ানারী' (১৮২৪-২৫)। রামজয় তর্কালঙ্কারের 'দায়ভাগ সংগ্রহ' (১৮২৫)। জন রবিনসনের 'ইতিহাস সার সংগ্রহ' (১৮৩২)।

শাঁখারিটোলার মহেন্দ্রলাল প্রেস বা ছাপাখানায় মুদ্রিত বই :

কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' (১৮২২। ১২২৯)। শিবচন্দ্র ঘোষের 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮২৪)। বদনচন্দ্র পালিতের 'নারদ সম্বাদ' (১৮২৪)।

শাঁখারিটোলার বদন পালিতের প্রেসে ছাপা বই : 'নারদ সম্বাদ (১৮২৫)।

১৫ চৌরঙ্গী রোডে অবস্থিত মহিন্দ্রিলাল যন্ত্রালয়ের মুদ্রাকর ছিলেন সুখময় দে এবং এর মালিক সুখময় দে এণ্ড কোং।[১] এই যন্ত্রালয়ে ছাপা বই : ইঙ্গরেজি ও বাঙ্গলাতে 'সেল্‌পগাইড' (১৮২৯), বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী 'বকেবিলরি' (১৮২৯)।

মীরজাপুরে মুন্সী হেদাতুল্লার ছাপাখানায় মুদ্রিত বই : দেবীপ্রসাদ রায়ের 'লেডিক্সল' নামে ফারসী-ইংরেজি-বাংলায় রচিত এক বই (১৮২৪)।

চোরবাগানস্থিত রামকৃষ্ণ মল্লিকের যন্ত্রালয়ে ছাপা বই : ১৮২৯ সালে প্রকাশিত 'আদিপর্ব্ব', 'সভাপর্ব্ব', 'বিদ্যাসুন্দর', 'নিত্যকর্ম্ম', 'রসমঞ্জরী', 'পদাঙ্কদূত' 'মানসিংহোপাখ্যান' ও 'পঞ্জিকা'।

চোরবাগান অঞ্চলের মথুরানাথ মিত্রের যন্ত্রালয়ে ছাপা বই : ১৮২৯ সালে প্রকাশিত 'সংসারসার', 'গঙ্গাভক্তি', 'বিষ্ণুর সহস্র নাম', 'অভয়ামঙ্গল', 'চন্দ্রকান্ত', 'রতিমঞ্জরী', 'ভাগবত', 'আদিরস', 'ভগবদ্গীতা', 'চাণক্য', 'নিত্যকর্ম্ম', ও 'বিদ্যাসুন্দর'।

শিয়লদহের সিন্ধুযন্ত্র বা পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়ে ছাপা বই : ১৮২৯ সালে প্রকাশিত 'ব্যবস্থার্নব', 'নলদময়ন্তী', 'বিদ্যাসুন্দর', 'অন্নদামঙ্গল', 'চাণক্য', 'মহিম্ন', 'কর্ম্মবিপাক', 'নিত্যকর্ম্ম', 'বেতাল', 'চন্দ্রবংশ' ও 'পঞ্জিকা'।

সিন্ধুযন্ত্রে ছাপা আরেকটি উল্লেখযোগ্য বই কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'কৌতুক-সর্ব্বস্ব নাটক' (১২৩৫ সন। ১৮২৮ খ্রী.)। এটি গোপীনাথ চক্রবর্তী রচিত মূল সংস্কৃত নাটকের বাংলা গদ্যে ও পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ। প্রথম মুদ্রিত অনূদিত বাংলা নাটক হিসাবে এই বইটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বইটির আখ্যাপত্রটি এইরূপ : 'শ্রীশ্রীদুর্গা॥ | জয়তি॥ | কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক॥ | শ্রীযুক্ত কলিবৎসল রাজার উপাখ্যান॥ | শিষ্টান্তক,

---

১ *Bengal Directory*, 1832.

ধর্ম্মানল, অনৃত সর্ব্বস্ব, পণ্ডিত পীড়া | বিশারদ, অভব্যশেখর, এবং কুকর্ম্ম পঞ্চানন ইহার | দিগের কাব্যরসঃ ॥ | শ্রীযুক্ত গোপীনাথ চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক রচিত ॥ | শ্রীরামচন্দ্র তর্ক্কালঙ্কার কবিকেশরী কর্ত্তৃক ॥ | তদীয়ার্থ সাধু ভাষায় এবং পয়ারাদি | ছন্দে শ্রীপীতাম্বর সেন দিগরের | সিন্ধুযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত | হইল ইতি ॥ | ১২৩৫।' বইটি আধুনিক ধাঁচের নিখুঁত সুন্দর হরফে ঝকঝকে ছাপা। দেশীয় ছাপাখানায় বাংলা মুদ্রণের উৎকৃষ্ট মানের নমুনা স্বরূপ এই 'কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক'-এর আখ্যাপত্রটির প্রতিলিপি গ্রন্থমধ্যে সংযোজিত হল। অবশ্য এর কিছু কিছু হরফে, যেমন কু, 'ৰ' প্রভৃতিতে প্রাচীন ধাঁচ লক্ষ্য করা যায়।

৮½" × ৫" আকারের এই বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮। ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে এর একটি কপি রক্ষিত আছে। এটি একটি অনূদিত বাংলা নাটক। এতে মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলিও উদ্ধৃত আছে, তবে সবই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। প্রথমে সংস্কৃত শ্লোক ও পরে পয়ার ছন্দে তার বাংলা অনুবাদ এবং বাংলা সাধু গদ্যভাষায় নাটকের দৃশ্যবর্ণনা আছে। বইটির সমাপ্তি (৭৮ পৃষ্ঠায়) হয়েছে এইভাবে: 'ইতি কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটকে দ্বিতীয়োহঙ্কোয়ং সমাপ্তং ॥ ইতি শ্রীগোপীনাথ চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক রচিত নাটকং সমাপ্তং ॥ শ্রীরামচন্দ্র তর্ক্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সাধুভাষায় সংগৃহীত হইল ইতি॥ শকাব্দা ১৭৫০ সন ১২৩৫। ৬ ভাদ্র | সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ।'

ব্রিটিশ মিউজিয়মের তালিকা থেকে সন্ধান করে ও পরে সেখান থেকে এই 'কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক' (১৮২৮)-এর প্রতিলিপি আনিয়ে তা বিচার করে আমার মনে হয়েছে এখন পর্যন্ত যে সব মুদ্রিত বাংলা বইয়ের অস্তিত্বের সন্ধান করা গেছে তার মধ্যে এটিই প্রথম বাংলা অনুবাদ নাটক। [কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কর্তৃক সংস্কৃত থেকে বাংলা গদ্যে অনূদিত 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী' (১৮২২)-কে ঠিক বাংলা অনুবাদ-নাটক হিসাবে ধরা যায় না।] বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্যের বইয়ে বাংলা অনুবাদ নাটকের তালিকায় রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্তৃক অনূদিত 'কৌতুক সর্ব্বস্ব' (১৮২৮) নাটকটির উল্লেখ মাত্র আছে, কিন্তু কোনো আলোচনাই নেই।[১] উপরন্তু ঐ একই গ্রন্থে অনুবাদ নাটক অধ্যায়ে (পৃ. ৫৫১) বলা হয়েছে ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে রচিত ও ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (সেক্সপীয়ারের *Merchant of Venice*-এর বঙ্গানুবাদ) বইটিই প্রথম মুদ্রিত বাংলা অনুবাদ নাটক। কিন্তু এ তথ্য ঠিক নয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য নিজেই তাঁর উক্ত গ্রন্থে আরেক জায়গায় (পৃ. ৮৪) লিখেছেন: 'কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একটি কথা এখানে বিস্মৃত হইবার উপায় নাই যে বাংলা নাটকের প্রথম উৎপত্তির যুগে সংস্কৃত নাটকের বহু বাংলা অনুবাদও রচিত হয়। এই সকল অনুবাদের মধ্যে স্বভাবতই সংস্কৃত নাটকের ভাব ও আঙ্গিককে রক্ষা করা হইত···।' এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে আমার

১ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ৪৮১।

আগের বক্তব্যকেই সমর্থন করে। ১৮২৮ সালে সিন্ধুযন্ত্রে মুদ্রিত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার অনূদিত 'কৌতুক সর্বস্ব নাটক'ই প্রথম প্রকাশিত বাংলা অনুবাদ নাটকের সম্মানের অধিকারী। নিঃসন্দেহে এটি বাংলা মুদ্রণের বিস্তার পর্বের এক উল্লেখযোগ্য প্রকাশন।

নাটকটির 'নির্ঘণ্ট'-এর প্রতি দৃষ্টি দিলেই এর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। এতে আছে : 'গণেশাদির বন্দনা। আশির্বাদ যুক্ত শ্লোক। নর্ত্তকীর দিগের আগমন। নটীর দিগের গীত। কলিবৎসল রাজার আগমন। সমর জম্বুক সেনাপুতির আগমন। সত্যাচার্যের আগমন। রাজার সহিত অভব্যশেখরের কথা। কুকর্ম্ম পঞ্চাননের আগমন। সত্যাচার্য্যের আক্ষেপ। কারাগারস্থ ব্রাহ্মণের দিগের সহিত সত্যাচার্য্যের সাক্ষাৎ। শিষ্টান্তকাদির সহিত রাজার সভায় প্রবেশ। ধর্ম্মানলের সহিত কুকর্ম্ম পঞ্চাননের বিচারারম্ভ। মিথ্যার্ণব গণকের আগমন। মুখরা দাসীর আগমন। কলহপ্রিয়া রানীর আগমন। কলিরাজার স্তব। রানীর সহিত রাজার উদ্যানে গমন। মদনতৃষ্ণা বেশ্যার আগমন। ব্রাহ্মণের দিগের মুক্ত।' ইত্যাদি।

রচনার নিদর্শন স্বরূপ এই নাটকের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

'শ্লোক ॥ রাজ্যোস্মিন কলিবৎসল্য নৃপতে
শ্চাপে গুণগ্রাহিতা প্রোম্মীলৎ করুণান্বিতশ্চ
শরলঃ সংলক্ষ্যতে কাননে। উদ্যানে সুমনোগ-
নঃ কুমুদিনী বুন্দে দ্বিজেস্বাদরো মিত্রালোকন
কৌতুকানি কমলে দানং গজানাং কুলে ॥

অস্যার্থ। হে প্রভু শ্রবণ করুন অত্র কলিবৎসল রাজার অধিকারে যে গুণ সে ধনুকে মাত্র আছে করুণা আর শরণ সে বন মধ্যে আছে অর্থাৎ বৃক্ষ বিশেষে আর সুমন সে পুষ্পোদ্যানে আছে অর্থাৎ পুষ্প দ্বিজের সমাদর কুমদিনী বনে আছে অর্থাৎ দ্বিজরাজ শব্দে শশধর মিত্র দর্শনে যে কৌতুক সে পদ্মবনে আছে অর্থাৎ মিত্র শব্দে স্বর্য্যঃ ইহার যে দান সে গজ সম্বন্ধে আছে ॥ সত্যাচার্য্য ঈষদ হাস্য করিয়া কহিতেছেন আমাকে বলিতে হবেনা সাক্ষাৎ অনুভব হইয়াছে কিন্তু এ প্রকার অনেকজন ছিল তাহার দিগের কত দুর্দ্দশা হইয়াছে অবশ্য ঈশ্বর আছেন স্বরায় ইহার প্রতিকার হইবে ব্রাহ্মণেরা কহিল হে মহাশয় এই রাজ্যে রাজারি কিবল মাত্র দু...ত নহে প্রজাগণ ও সমাজস্থ সকলেই কুস্বভাব ॥

শ্লোক ॥ সৎ পীড়নং পৌরুষ মন্য নারী রতি
ব্বিনোদো নৃত বাগবীচ। নিত্যক্রিয়া শিষ্টমনা
পকারো রীতি প্রজানাং কলিবৎসলস্য ॥

পয়ার। কিবল নহেন রাজা প্রজাগণ দুষ্ট। সতের করিতে পীড়া কেহ না বিরুষ্ট ॥ অন্য নারী হরনেতে পৌরুষ্ব প্রকাশ। মিথ্যা বাক্য আড়ম্বরে সর্ব্বদা বিলাস ॥ নিত্য ক্রিয়া কিবল শিষ্টের অপকার। রাজার গুণেতে এই প্রজা ব্যবহার ॥

সত্যাচার্য্য নাসাগ্রে অঙ্গলী প্রদান পূর্ব্বক খেদাপন্ন হইয়া কহিতেছেন তবে কায়স্থ

দিগের ব্রাহ্মণের প্রতি সর্ব্বদা ভক্তিকরে তাহারা এ স্থানে কি প্রকার। ব্রাহ্মণেরা কহিতেছেন ঠাকুর কি জিজ্ঞাসা করেন রাজস্ব প্রদান করিয়াছি তত্রাপি নানা প্রকারে লিপি দ্বারায় ভূম্যাদের অপলোপ করিতেছে॥ ধীর ব্যক্তির কত দূরবস্থা করিতেছে তাহা কি জানাইব'… (পৃ. ৪০-৪১)।

কলকাতার আরো কয়েকটি দেশীয় ছাপাখানার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপেন্দ্রলাল যন্ত্র। বহুবাজার নেবুতলার লেনে অমর সিংহ চৌধুরীর বাটীতে ঐ ছাপাখানা অবস্থিত ছিল। উপেন্দ্রলাল যন্ত্রে ছাপা বই : ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নববিবিবিলাস (১৮৩১); ইংরেজিতে লেখা ব্যাকরণ, বাংলা অনুবাদ সহ (১৮৩০)।

যোগধ্যান মিশ্র বড়বাজারে সারসুধানিধি প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। ঐটি বড়বাজারে গোবিন্দচন্দ্র ধরের বাড়ির পশ্চিমে লালাবাবুর বাড়িতে স্থাপিত হয়। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে এখানে বাংলা ও হিন্দী নানা বই ছাপা হয়। শোভাবাজারের শাস্ত্রপ্রকাশ যন্ত্রেও কিছু বাংলা বই ছাপা হয়।

কলকাতার বাইরেও ঐ সময়ে দেশীয় মালিকানায় কয়েকটি ছাপাখানা গড়ে উঠেছিল। যেমন, শ্রীরামপুরে নীলমণি হালদারের ছাপাখানা, ১৮২৫ সালে স্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানায় মুদ্রিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : নীলরত্ন হালদারের 'কবিতা রত্নাকর' (১৮২৫), 'বহুদর্শন' (১৮২৬), 'জ্যোতিষ' (১৮২৫), 'পরমায়ুঃ প্রকাশ' (১৮২৬)।

শ্রীরামপুরের রত্নাকর যন্ত্রালয়ে ছাপা বই : রামতর্কবাগীশ ভট্টাচার্য কর্তৃক পয়ার ছন্দে সাধুভাষায় অনূদিত 'প্রাচীন পদ্মাবলী', মূল সহ (১৮২৬)।

কলকাতার বাইরে অগ্রদ্বীপে দেশীয় পরিচালনায় ছাপাখানা স্থাপিত হয় বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] সম্ভবত, অগ্রদ্বীপের নিকটবর্তী বহড়া গ্রামে স্থাপিত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের ছাপাখানার কথাই এখানে বলা হয়েছে। এই ছাপাখানার বিস্তারিত পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। ১৮২২ সালে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে তাঁদের ভ্রাম্যমাণ পুস্তক-বিক্রেতা ছিলেন, তারা ঘুরে ঘুরে নানা জায়গায় তাঁদের বই বিক্রয় করতেন।[২] ১৮২৫ সালের 'পঞ্জিকা' অগ্রদ্বীপের এই দেশীয় ছাপাখানায় ছাপা হয়।

আলোচ্য বিস্তার পর্বে বাংলা মুদ্রণের গতি এক নতুন পথে মোড় নেয় যখন ঐ সময়ে কলকাতায় প্রথম লিথোগ্রাফিক ছাপার প্রবর্তন হয়। তদানীন্তন বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এই নতুন প্রবর্তিত লিথো প্রেসকে 'পাষাণ যন্ত্র' বা 'পাথরীয়া ছাপাখানা' বলে উল্লেখ করা হত। এক ধরনের বিশেষ পাথর বা লিথো স্টোনের সাহায্যে এই ছাপার কাজ হত। এই পদ্ধতিতে বিশেষ করে নানা ধরনের ছবি, নকশা, মানচিত্র, প্রভৃতি

---

১ W. H. Carey, '*The Good Old Days of Honorable John Company*', p. 123

২ *Friend of India* (monthly), March 1822, p. 86.

ছাপা শুরু হয়। ফলে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন শিল্পে এক অভিনব সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। এই নতুন পদ্ধতিতে ১৮২৫ সালে প্রথম ভারতের বাংলা নকশা ছাপা হয়। এতে ভারতের নানা প্রদেশ, নগর, নদী, পর্বত প্রভৃতির নাম বাংলা অক্ষরে খোদাই করে ছাপা হয়। ১৮২৫ সালেই প্রথম কলকাতার নকশাও ছাপা হয়। কলকাতায় মেজর সক সাহেব এটি প্রস্তুত করেন। 'ঐ নকসাতে প্রত্যেক রাস্তা ও গলি এবং সে সকলের পরিমাণ পর্যন্ত স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। সে এমত বাহুল্যরূপে প্রস্তুত করা গিয়াছে যে তাহাতে অনেক স্থানে বৃহৎ ২ বাটী ও সেই বাটীর স্বামিরদের নামও লিখিত আছে।' ('সমাচার দর্পণ', ৯ জুলাই ১৮২৫)।[১] গঙ্গা নদীর নকশাও কলকাতার পাথরীয়া ছাপাখানায় ১৮২৫ সালে ছাপা হয়। এ সম্পর্কে 'সমাচার দর্পণ' (১৫ অক্টোবর ১৮২৫) লেখে: 'কলিকাতার পাথরীয়া ছাপাখানাতে খাজরী অবধি কানপুর পর্য্যন্ত গঙ্গানদীর এক নকসা ছাপান গিয়াছে এবং গঙ্গার উভয় তীরে যত গ্রাম আছে সে সকল তাহাতে লিখিত আছে এতদ্ভিন্ন যেখানে যত খাল কিম্বা নদী আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলে সে সকল স্পষ্টরূপে লিখিত আছে ঐ নক্সার উপর উত্তমরূপে রং দেওয়া গিয়াছে ইহার দ্বারা পথিক লোকেরদের যথেষ্ট উপকার হইবেক।'[২] সুতরাং দেখা যায়, এই নতুন মুদ্রণ-পদ্ধতির প্রচলনের ফলে ঐ সময়ে রাজপথ, নদী বা নগরীর নকশা ও দেশের মানচিত্র মুদ্রিতাকারে জনসাধারণের কাছে পৌঁছতে থাকে। কলকাতার পাথরীয়া ছাপাখানা থেকে ১৮২৮ সালে ভারতের তাবৎ রাস্তার নকশার একটি বই প্রকাশিত হয়। ঐ বইয়ে পৃথক পৃথক প্লেটে ১২১টি রাস্তার নকশা ছাপা হয়। ১৮২৯ সাল থেকে 'শুড়া লিথোগ্রেফিক প্রেষ' বা 'শুড়ার পাতুরিয়া ছাপাখানা' থেকে নানা বই, প্রতিমূর্তি বা ছবি ছাপা হতে থাকে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

১ ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ৩৯৯ বছরের এক বিশেষ ক্যালেণ্ডার ছাপা শুরু হয় ১৮২৯ সালে, মূল্য দু টাকা।

২ মনুষ্য ও পশ্বাদির ১৫ খানা চিত্র সহ গৌড়ীয় ভাষায় চিত্রবিদ্যাবিষয়ক এক গ্রন্থ ছাপা শুরু হয় ১৮২৯ সালে, মূল্য চার টাকা।

৩ বাংলা বর্ণমালা বা সুন্দর বড়ো হরফে ছাপা হাতের লেখা শেখার বই ছাপা শুরু হয় ১৮২৯ সালে।

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, (১ম), পৃ. ৭১।

২ তদেব, পৃ. ৭২।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমকালীন বাংলা প্রকাশনের বিচিত্র ধারা

বিস্তার পর্বে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন শিল্পের ধারা যে চারটি প্রধান খাতে প্রবাহিত হয়েছিল, অর্থাৎ ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, বাংলা সাময়িক পত্রপত্রিকা, পুনরুজ্জীবিত শ্রীরামপুর মিশন প্রেস সহ অন্যান্য মিশনারী প্রেস ও দেশীয় মালিকানায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন বেসরকারী ব্যবসায়িক ছাপাখানা— এগুলিকে কেন্দ্র করে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন শিল্প যে চতুর্মুখী ধারায় বিস্তৃতি লাভ করেছিল পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে স্বতন্ত্রভাবে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া সামগ্রিকভাবে ঐ পর্বের বাংলা প্রকাশনের বিচিত্র ধারার আরো কিছু পরিচয় এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে। মূলত সমকালীন ইংরেজি-বাংলা পত্রপত্রিকা বা সরকারী গেজেটে প্রকাশিত বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি বা সম্পাদকীয় মন্তব্য, অথবা সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত বিভিন্ন সমকালীন প্রতিবেদন থেকে এই পরিচয় লাভ করা যায়। এই সব সংবাদ-তথ্যাদি-বিজ্ঞপ্তি-প্রতিবেদন-পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদি যুগের শেষ পর্বে অর্থাৎ আলোচ্য বিস্তার পর্বের আঠারো বছরে বাংলা প্রকাশন শিল্প কত বিচিত্র রূপে রঙে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

সমসাময়িককালে প্রকাশিত অধিকাংশ প্রতিবেদন বা সম্পাদকীয় মন্তব্যে বিশেষ করে বলা হয় যে ঐ সময়ে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের গতি অত্যন্ত দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণ ব্যবসায়ে উদ্যোগী বাঙালী প্রকাশকের সংখ্যা এবং বাংলা বই ও পত্রপত্রিকা পাঠে আগ্রহাকুল বাঙালী পাঠকের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। তখনকার অনেকের মতেই এই দ্রুত বৃদ্ধির হার ছিল বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব। বাংলা বই, ছাপাখানা ও পাঠকের সংখ্যা সমহারে দ্রুতগতিতে বেড়েছিল। সেকালে ধনী বাঙালীদের ঘরে বই রাখা আভিজাত্যের লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তুলনামূলক বিচারে, ইংলণ্ডে মুদ্রণ প্রচলনের প্রথম যুগে এই দ্রুত বৃদ্ধির হার দেখা যায়নি। ১৮২০ সালে প্রকাশিত *Friend of India*-র একটি নিবন্ধে এই বক্তব্যের সাক্ষ্য পাওয়া যায়: 'Within the last ten years, native works have been printed by natives themselves, and sold among the Hindoo population with astonishing rapidity. An unprecedented impulse has been communicated to the inhabitants of Bengal, and the avidity for reading has increased beyond all former exam-

ple. ...This multiplication of printed works has excited a taste for reading hitherto unknown in India, which promises to become gradually more extensive and more refined. Compared with preceding years, when manuscripts alone existed, books are now exceedingly common; men of wealth and influence begin already to value themselves on the possession of a library, and on obtaining the earliest intelligence of the operations of the press. ...We should compare the progress made in this country with the progress made in England in the days of Edward the Fourth, within twenty years after Caxton set the first types in England. We must compare the present circulation of works, the present number of readers in India, with the state of things twenty years ago. We shall then find that the commencement which has been made, is highly promising'...[১] পাঁচ বছর পরে ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত *Friend of India* পত্রিকার অপর একটি নিবন্ধে বলা হয়, ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের দ্রুত বৃদ্ধির হার তখনো অব্যাহত আছে : 'Since that period it has continued to multiply new works and editions of former works, with a degree of rapidity which could scarcely have been anticipated'.[২]

সমকালীন 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যাতেও বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন শিল্পের অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' লেখে... 'যে দেশে ছাপার কর্ম্ম চালিত না হইয়াছে সে দেশকে প্রকৃতরূপে সভ্য বলা যায় না এই দেশে পূর্ব্বকালে কতক ২ লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্পলোক বিদ্যাভ্যাস করিত অন্য ২ সকল লোক অন্ধকারে থাকিত এখন এই দেশে ক্রমে ২ ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় ঘর সকল ব্যাপ্ত হইতেছে।

'গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে কিন্তু সকল পুস্তক এক স্থানে নাই নানা লোকের ঘরে বিলি হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তক লওনের চেষ্টা জন্মে এইরূপে এদেশে বিদ্যা প্রচলিতা হইতেছে।'[৩]

বাংলা মুদ্রণের প্রসারের ফলে বাঙালীর ঘরে ঘরে মুদ্রিত গ্রন্থের প্রচারের কথা সমাচার

১ 'On the effect of the Native Press in India' : *Friend of India* (Qly), Sept. 1820.

২ 'On the progress and present state of the Native Press in India' : *Friend of India* (Qly.), May 1825.

৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১ম), পৃ. ৫৯।

দর্পণের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, ৩ এপ্রিল ১৮১৯ তারিখের সংখ্যায় সুন্দর মন্তব্য করা হয় : 'এ দেশের এই এক মঙ্গলের চিহ্ন যে নানা প্রকার পুস্তক ছাপা হইতেছে যে হেতুক এই ছাপা পুস্তকের গমন স্রোতের ন্যায় যেমন ক্ষুদ্র নদী নির্গতা হইয়া ক্রমে ২ বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্ব দেশে ব্যাপ্তা হইয়া সেই দেশকে উর্ব্বরা করে সেই মত ছাপার পুস্তক ক্রমে ২ সকল প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়া সকল লোকের বোধগম্য হওয়াতে তাহারদের মন উচ্চাভিলাষি করে পূর্বকালে বিজ্ঞ লোকের ঘরেতেও তালপত্রে অক্ষর মিলা ভার ছিল ছাপার আরম্ভ হওয়া অবধি ক্ষুদ্র ২ লোকের ঘরেতেও অধিক পুস্তক সঞ্চার হইয়াছে।'[১]

৩০ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখের সমাচার দর্পণের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের দ্রুত অগ্রগতির কথা পুনশ্চ উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮২৯ সালে কলকাতায় 'এতদ্দেশীয় ছাপাখানাতে যে সকল পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে' তার বর্ণনা দিয়ে সমাচার দর্পণের ঐ সংখ্যায় বলা হয়েছে : 'এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে ইহা দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এত অল্পকালের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ছাপার কর্ম্মের এমত উন্নতি হইয়াছে।…হিন্দুদের মধ্যে পুস্তক গ্রহণকরণে যে এমত লালসা হইয়াছে যে তাহাতে বিক্রয়ার্থে এইরূপ পুস্তক মুদ্রিতকরণে লোকেরদের সাহস জন্মিয়াছে এ অতিশয় আহ্লাদের বিষয়। ঐ ২ পুস্তকের অধিকাংশ হিন্দুরদের ধর্ম্মসংক্রান্ত কিন্তু যদনুসারে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যার চর্চা হয় তদনুসারে বুঝি যে অন্য ২ নানাবিধ বিদ্যাসম্পর্কীয় মুদ্রিত পুস্তক সকল আরো বিদ্যাধি লোক কর্তৃক গৃহীত হইবেক এবং হিন্দু লোকেরদের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালা ভাষায় তরজমা করিয়া তাদৃশ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিতে উদ্যত হইবে ইহা অসম্ভব নহে।'[২]

সমকালীন 'বঙ্গদূত' পত্রেও বাংলা মুদ্রণের প্রসারের কথা সবিস্তারে উল্লিখিত হয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯ তারিখের 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় লেখা হয় : 'ক্ষুদ্র যন্ত্রালয়ে অনেকানেক গ্রন্থ ইংরাজি পারস্য ও দেবনাগর ও বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার সংখ্যা লিখনাতিরিক্ত অতএব পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন যে এতদ্দেশে ছাপা যন্ত্রের কিপর্যন্ত বিস্তার হইয়াছে ও তদ্দ্বারা নানা দেশীয় সমাচার ও নানাবিধ গ্রন্থ রচনায় লোকের কীদৃক্ উপকার দর্শিতেছে।

'পূর্বে অস্মদ্দেশীয় লোক কোন পত্র ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত দেখিলে নয়ন মুদ্রিত করিতেন যেহেতু সাধারণের সাধারণ বোধে ইহাই নিশ্চয় ছিল যে বর্ণান্তরিয় লোক ছাপায় কেবল আমারদিগের ধর্ম্ম ছাপায় এক্ষণে সেভয়ে নির্ভয় হইয়া অনেকে চক্ষুঃপ্রকাশ পূর্ব্বক ছাপার পত্র

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১ম), পৃ. ৩০।

২ তদেব, পৃ. ৮৫।

দেখিয়া থাকেন যেহেতুক যথার্থ তাৎপর্য্য বোধ করিয়াছেন যে সেপত্রে পাত্রতা লাভ হয় যথা একস্থানে বসিয়া অনায়াসে বহু দর্শনে বহুদর্শী হইতে পারেন।'[১]

সমকালীন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এই সব চিত্তাকর্ষক বর্ণনা, বিজ্ঞপ্তি ও সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যায় সেকালে অর্থাৎ বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদিযুগের শেষ পর্বে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন কত দ্রুত হারে বিস্তার লাভ করেছিল। শুধু এইসব বিজ্ঞপ্তি বর্ণনাই নয়, ঐ সময়ে দেশীয় ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের কিছু কিছু তালিকাও সমসাময়িক বিভিন্ন প্রকাশন থেকে উদ্ধার করা গেছে। স্বভাবতই এইসব তালিকা অবশ্য সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। প্রায়শই এগুলি অসম্পূর্ণ বা আংশিক— কোনো বিশেষ সময়ে ছাপা সমস্ত বইয়ের তালিকা কোথাও পুরোপুরি লিপিবদ্ধ হয়নি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলিতে বইয়ের নাম পুরো বা নির্ভুলভাবে লেখা হয়নি, তা ছাড়া লেখক বা মুদ্রাকর প্রকাশকের নাম ও তারিখ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়নি বা ভুল আছে। তথাপি এইসব পুস্তকতালিকা সমসাময়িক দলিল হিসাবে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়, এগুলিই ইতিহাসের প্রাথমিক উপাদান— এগুলির উপর ভিত্তি করে ছাটাই বাছাই ও বিচার বিশ্লেষণের পর আমাদের সত্যিকারের ঐতিহাসিক তথ্যকে খুঁজে নিতে হয়। সমকালীন বাংলা প্রকাশনের বিচিত্র ধারার এক সামগ্রিক ছবি তুলে ধরার জন্য তাই প্রসঙ্গক্রমে এই তালিকাগুলির কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথম উল্লেখযোগ্য পুস্তক তালিকা পাওয়া যায় ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির কার্যবিবরণীতে। কমিটির অন্যতম সম্পাদক E. S. Montagu (Corresponding Secretary.) দেশীয় ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত বাংলা বইয়ের এই তালিকাটি সংকলন করেন ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে এবং তা কমিটির তৃতীয় বার্ষিক কার্যবিবরণীর (১১ অক্টোবর ১৮২০) পরিশিষ্টে ছাপা হয়। তাঁর তালিকায় উনিশ শতকীয় মুদ্রণেতিহাসের প্রথম ১৫ বছরে অর্থাৎ ১৮০৫ থেকে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে দেশীয় ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত ৬৫টি বাংলা বইয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশিত হয় ১৮২০ খ্রীস্টাব্দেই ত্রৈমাসিক ***Friend of India*** (Qly. Sept. 1820) পত্রিকায়। এই তালিকায় প্রথম দশ বছরে অর্থাৎ ১৮১০ থেকে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত ২৭টি বাংলা বইয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই তালিকা সংকলনকারীর মতে, প্রতিটি বই অন্তত ৪০০ কপি করে ছাপা হলে এবং একাধিক বইয়ের যে ২য় বা ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তা হিসাবের মধ্যে গণ্য করলে বলা যায় যে পূর্বোক্ত দশ বছরে ১৫০০০ কপি বাংলা বই ছাপা হয়েছে এবং তা জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় হয়েছে— অর্থমূল্যে এই বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা।

---

১ তদেব, পৃ. ৩৪০।

অবশ্য সমাচার দর্পণের ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯ তারিখের সংখ্যায় লেখা হয়, গত দশ বছরে অর্থাৎ ১৮০৯ থেকে ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে 'আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে।'

আলোচ্য তৃতীয় তালিকাটি পাওয়া যায় ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত রেভা. জে. লঙ সংকলিত প্রতিবেদনে (*'Report on the Native Press in Bengal in 1857'*)। এই প্রতিবেদনে ১৮২০ সালে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের তালিকায় ৩০টি বইয়ের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

চতুর্থ তালিকা ত্রৈমাসিক *Friend of India* (Qly. May 1825) পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধে ('On the progress and the present state of the Native Press in India') সন্নিবেশিত হয়েছে। ঐ তালিকায় চার বছরে অর্থাৎ ১৮২১ থেকে ১৮২৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত ৩১টি বাংলা বইয়ের নাম উল্লিখিত হয়েছে। নিবন্ধকারের মতে, ঐ সময়ে ৩১টি বইয়ের প্রায় ৩০,০০০ কপি মুদ্রিত ও বিক্রীত হয়েছিল।

পঞ্চমত, রেভা. জে. লঙ সংকলিত পূর্বোক্ত প্রতিবেদনে (১৮৫৯) ১৮২২ থেকে ১৮২৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত ২৮টি বাংলা বইয়ের একটি তালিকা সংযোজিত হয়েছে।

এ ছাড়া সমাচার দর্পণের বিভিন্ন সংখ্যায় আরো কয়েকটি বাংলা বইয়ের তালিকা প্রকাশিত হয়। যেমন, ২২ জানুয়ারি ১৮২৫ তারিখের সমাচার দর্পণে ষষ্ঠ তালিকাটি প্রকাশিত হয়। এতে ১৮২৪ সালে প্রকাশিত ২৫টি বইয়ের নাম উল্লিখিত হয়েছে। ১৮২৫ সালে প্রকাশিত ৩৪টি বাংলা বইয়ের সপ্তম তালিকাটি প্রকাশিত হয় ১৪ জানুয়ারি ১৮২৬ তারিখের সমাচার দর্পণ পত্রিকায়। ১৮২৯ সালে প্রকাশিত ৩৭টি বাংলা বইয়ের অষ্টম তালিকাটি পাওয়া যায় ৩০ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখের সমাচার দর্পণ পত্রিকায়।

পূর্ববর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি এইসব তালিকার অধিকাংশ বইয়ের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে তৎকালীন প্রকাশন ধারার সামগ্রিক রূপটি ধরে রাখার জন্য এখানে পূর্বোক্ত পুস্তক তালিকাগুলি যথাযথ উদ্ধৃত করা হল।

১ প্রথম তালিকাভুক্ত[১] ১৮০৫ থেকে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে দেশীয় ছাপাখানায় মুদ্রিত বাংলা বই (৬৫টি): করুণানিধান বিলাস (প্রকাশক: লল্লুজী)। দশাবতার কথা (কৃষ্ণবিষয়ক)। পদাঙ্ক দূত (কৃষ্ণবিষয়ক)। বিল্বমঙ্গল (কৃষ্ণবিষয়ক)। নারদ পঞ্চরাত্রি বা নারদ সম্বাদ (কৃষ্ণপ্রশস্তি—প্রকাশক: ভিস্তুজা)। জয়দেব। চণ্ডী। অন্নদামঙ্গল (প্রকাশক: গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য)। মহিম্নস্তব (শিবপ্রশস্তি: প্রকাশক লল্লুজী)। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী (প্রকাশক: লল্লুজী)। গীতগোবিন্দ (প্রকাশক: বিশ্বনাথ দেব)। নরোত্তম বিলাস। চৈতন্যচরিতামৃত। বিদ্যাসুন্দর (প্রকাশক: বিশ্বনাথ দেব)। রসমঞ্জরী

১ Calcutta School Book Society, 3rd Report (11 October 1820), Appendix No. II

(ঐ)। রতিমঞ্জরী (ঐ)। আদিরস-শ্লোক (ঐ)। রসপদ্ধতি (প্রকাশক : ডিসুজা)। শৃঙ্গারতিলক। কামশাস্ত্র। রতিকলা। রতিবিলাস। লক্ষ্মীচরিত্র (ধনসম্পদ আহরণ ও রক্ষার বিষয়—প্রকাশক : গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য)। বেতাল পঞ্চবিংশতি (প্র. গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য)। বত্রিশ সিংহাসন (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার : প্র. শ্রীরামপুর প্রেস)। তোতাইতিহাস। ভগবদ্গীতা। বেদান্ত গ্রন্থ, বেদান্ত সার (রামমোহন রায় : প্র. গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও লল্লূজী : ৫০০ কপি করে)। ঈশোপনিষদ (রামমোহন : প্র. ঐ—৫০০ কপি) তলবকার উপনিষৎ। কেনোপনিষৎ (ঐ)। কঠোপনিষদ (ঐ : প্র লল্লূজী—৫০০ কপি)। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (ঐ)। মণ্ডুকোপনিষৎ (ঐ—৬০০)। বেদান্তচন্দ্রিকা (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার)। ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (রামমোহন রায় : প্র. লল্লূজী ৫০০ কপি)। গোস্বামীর সহিত বিচার (ঐ)। কবিতাকারের সহিত বিচার (রামমোহন রায় : প্র. ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস—৫০০ কপি)। ব্রাহ্মণ পৌত্তলিক সম্বাদ (ব্রজমোহন মজুমদার)। গায়ত্রীর অর্থ (রামমোহন রায় : প্র. লল্লূজী—৫০০ কপি)। প্রবোধ চন্দ্রোদয়। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (রামমোহন রায় : প্র. ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস—৫০০ কপি।) Precepts of Jesus—অনুবাদ (রামমোহন রায় : প্র. ঐ)। শান্তি শতক। ('জীবনের সাধারণ ক্রিয়াকর্ম ও উৎসবাদি বিষয়ক'—প্র. গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য)। চাণক্য শ্লোক। গুরুদক্ষিণা (গোপাল তর্কালঙ্কার : প্র. শ্রীরামপুর প্রেস)। পুরুষপরীক্ষা (হরচন্দ্র রায় : ঐ)। হিতোপদেশ (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার : ঐ)। সহমরণ (কালাচাঁদ বসু)। সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের সম্বাদ (রামমোহন রায় : প্র. হরু রায়—১০০০ কপি)। সহমরণ বিষয়ে দ্বিতীয় সম্বাদ (ঐ : প্র. ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস—৫০০ কপি)। কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র। অমর সিংহের অভিধান—শব্দসিন্ধু (পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় : প্র. বিশ্বনাথ দেব)। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ (মথুরমোহন দত্ত : প্র. শ্রীরামপুর প্রেস)। ইঙ্গলিষ দর্পণ (ইংরেজি ব্যাকরণ—রামচন্দ্র)। (ইংরেজি ব্যাকরণ—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য : প্র. ফেরিস এণ্ড কোং)। অশৌচ ব্যবস্থা বা অশৌচ পাঁচালী (প্র. লল্লূজী)। ঔষধ গ্রন্থ (রামকমল সেন : প্র. হিন্দুস্থানী প্রেস)। প্রাণকৃষ্ণ মহদধি (জ্যোতিষ বিষয়ক—গোপীনাথ ভট্টাচার্য : প্র. বিশ্বনাথ দেব)। জ্যোতিষ শাস্ত্র (রামচন্দ্র—প্র. লল্লূজী। স্বপ্নোধ্যায় বা স্বপ্নপুতুল (স্বপ্নবিষয়ক—প্র. লল্লূজী)। সংক্ষেপ সংকেত বা অঙ্ক পুস্তক (জ্যোতিষ পঞ্জিকা অঙ্ক প্রভৃতি বিষয়ক—প্র. বিশ্বনাথ দেব)। পঞ্জিকা (বার্ষিক)। রাগমালা (কবিতা বিষয়ক)। সঙ্গীত তরঙ্গিণী (সঙ্গীত বিষয়ক—প্র. গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য)।

২ দ্বিতীয় তালিকাভুক্ত[১] ১৮১০ থেকে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা বই (২৭টি) : গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী। জয়দেব। অন্নদামঙ্গল। রসমঞ্জরী (তিন প্রকারের নর ও

১ **'On the effect of the Native Press in India'** : *op. cit.*

নারীর বর্ণনা)। রতিমঞ্জরী (পূর্বোক্ত বিষয়ক)। করুণানিধান বিলাস। বিল্বমঙ্গল। দায়ভাগ (আইন বিষয়ক)। জ্যোতিষ। চাণক্য। শব্দসিন্ধু (অভিধান)। (এ দেশীয় ঔষধ ও চিকিৎসা বিষয়ক একটি গ্রন্থ)। রাগমালা (সঙ্গীত বিষয়ক)। বত্রিশ সিংহাসন। বেতাল পঞ্চবিংশতি (রাজা বিক্রমাদিত্য বিষয়ক গল্প)। বিদ্যা-নিন্দা (চিকিৎসকদের নিন্দা)। ভগবদ্গীতা। মহিম্ন স্তব। গঙ্গা স্তব। সুখী চরিত্র (মানবের কর্তব্য বিষয়ক)। শান্তি শতক। শৃঙ্গার তিলক। অশৌচ পাঁচালী। আদিরস। চণ্ডী। চৈতন্যচরিতামৃত।

৩ তৃতীয় তালিকাভুক্ত[১] ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা বই (৩০টি): করুণানিধান বিলাস (কৃষ্ণবিষয়ক)। পদাঙ্ক দূত (ঐ)। বিল্বমঙ্গল (ঐ)। নারদ সম্বাদ (ঐ)। গীতগোবিন্দ (ঐ)। চণ্ডী (দুর্গা বিষয়ক)। অন্নদামঙ্গল (ঐ)। মহিম্ন স্তব (শিব বিষয়ক)। গঙ্গাভক্তি। নরোত্তম বিলাস। চৈতন্যচরিতামৃত। রসমঞ্জরী। আদিরস। রস। পদাবলী। রতিকলা। রতিবিলাস। বেতাল। তোতা ইতিহাস। বত্রিশ সিংহাসন। ইংরেজি ব্যাকরণ (বাংলায়)। সঙ্গীত বিষয়ক পুস্তক। স্বপ্ন বিষয়ক। জ্যোতিষ বিষয়ক। ঔষধ বিষয়ক। অশৌচ। রামমোহন রায়-কৃত উপনিষদের বঙ্গানুবাদসমূহ। চাণক্য শ্লোক। হিতোপদেশ। পঞ্জিকা।

৪ চতুর্থ তালিকাভুক্ত[২] চার বছরে অর্থাৎ ১৮২১ থেকে ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা বই (৩১টি): পঞ্চাঙ্গ সুন্দরী (জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক)। দিন কৌমুদী। আনন্দ লহরী (ভগবতী প্রশস্তি)। রতি মঞ্জরী। তর্পণ। ব্রাহ্মণ প্রশস্তিবিষয়ক। রাধিকামঙ্গল। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী। পদাঙ্কদূত (কৃষ্ণবিষয়ক)। মিতাক্ষরাদর্পণ (উত্তরাধিকার বিষয়ক হিন্দু স্মৃতিগ্রন্থের অনুবাদ)। বত্রিশ সিংহাসন। সেলফ্‌গাইড (ইংরেজি ভাষাশিক্ষা বিষয়ক)। চাণক্য নীতিশিক্ষা। নারদ সম্বাদ (নারদ কৃষ্ণ কথোপকথন)। তোতানামা। রাধার সহস্র নাম। ভগবতীর সহস্রনাম। বিষ্ণুর সহস্রনাম। কাকচরিত্র (ভাগ্যান্বেষণ বিষয়ক)। বিদ্যাসুন্দর। নল-দময়ন্তী। কলঙ্কভঞ্জন (কৃষ্ণ বিষয়ক)। প্রবোধ চন্দ্রোদয় (নাটক)। জ্ঞান চন্দ্রিকা। প্রাণতোষণ। পঞ্জিকা (বার্ষিক)। বাংলা সঙ্গীত বিষয়ক। ন্যায় দর্শনের বঙ্গানুবাদ। অমরকোষ (সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুবাদ)। অধর্মহেতু দুর্দশা বিষয়ক। আইন সম্বন্ধীয় বই। [রামমোহন রায় রচিত পুস্তকাবলী এখানে উল্লিখিত হয়নি।]

৫ পঞ্চম তালিকাভুক্ত[৩] ১৮২২ থেকে ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা বই

---

১ 'Report on the Native Press in Bengal in 1857', by Rev. J. Long, 1859: Appendix C.

২ 'On the progress and present state of the Native Press in India': *op. cit.*

৩ 'Report on the Native Press in Bengal in 1857', by Rev. J. Long, 1859: Appendix D.

(২৮টি) : পঞ্চাঙ্গসুন্দরী। দিন কৌমুদী (বার তিথি পালন বিষয়ক)। আনন্দলহরী। রতিমঞ্জরী। তর্পণ। রাধিকা মঙ্গল। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী। পদাঙ্কদূত। মিতাক্ষরা দর্পণ। বত্রিশ সিংহাসন। সেলফ্ গাইড (ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থে)। চাণক্য শ্লোক (নীতিশিক্ষা বিষয়ক)। নারদ সম্বাদ। ন্যায়। তুতীনামা। রাধার সহস্র নাম। বিষ্ণুর সহস্র নাম। কাকচরিত্র। বিদ্যাসুন্দর। নল-দময়ন্তী। কলঙ্কভঞ্জন। প্রবোধচন্দ্রোদয়। জ্ঞান চন্দ্রিকা প্রাণতোষণ। সঙ্গীত তরঙ্গিণী। পঞ্জিকা। অমরকোষ।

৬ ষষ্ঠ তালিকাভুক্ত[১] ১৮২৪ সালে প্রকাশিত বাংলা বই (২৫টি) : ক্রিয়াযোগসার (পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় অনূদিত : চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়)। আনন্দলহরী (রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার অনূদিত : চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়)। মিতাক্ষরাদর্পণ (লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার অনূদিত : লেবেণ্ডর সাহেবের ছাপাখানা)। জানসেন ডিকস্থানরীর ইংরেজি সহ অনুবাদ (লেবেণ্ডর সাহেবের ছাপাখানা)। জ্যোতিষ (কৃষ্ণমোহন দাসকৃত : সম্বাদতিমিরনাশক ছাপাখানা)। দিন কৌমুদী (ঐ)। রতিমঞ্জরী (সম্বাদতিমিরনাশক ছাপাখানা)। তর্পণ (ঐ)। শূদ্র ও ব্রাহ্মণের প্রণাম শিক্ষা বিবরণ (ঐ)। পদাঙ্ক দূত (ঐ)। পঞ্চাঙ্গ সুন্দরী (ঐ)। আনন্দ লহরী (ঐ)। রাধিকা মঙ্গল (ঐ)। বত্রিশ সিংহাসন (শিবচন্দ্র ঘোষ কৃত : মহেন্দ্রলাল ছাপাখানা)। নারদ সম্বাদ (বদনচন্দ্র পালিত কৃত : মহেন্দ্রলাল ছাপাখানা)। লেডিক্কল (দেবীপ্রসাদ রায় কৃত : মুন্সী হেদাতুল্লার ছাপাখানা)। কালীর সহস্রনাম (বারাণসী আচার্য্যকৃত : আড়পুলির ছাপাখানা)। বিষ্ণুর সহস্র নাম (ঐ)। রাধিকার সহস্র নাম (ঐ)। হনুমচ্চরিত্র (ঐ)। কাকচরিত্র (ঐ)। চক্ষুরাদি স্পন্দনের ফলাফলসূচক এক গ্রন্থ (ঐ)। জ্যোতিষ (ঐ)। ভগবতীগীতা (শ্রীমন্ত রায়কৃত : আড়পুলির ছাপাখানা)। দ্রব্যগুণ (গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কৃত : বহেড়া)।

৭ সপ্তম তালিকাভুক্ত[২] ১৮২৫ সালে প্রকাশিত বাংলা বই (৩৪টি) : পুরাণ-বোধদ্দীপন (শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত : চন্দ্রিকা আপীস)। দূতীবিলাস (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐ)। ভাগবতসার (মাধবশর্ম্মকৃত : ঐ)। বেতালপঞ্চবিংশতি (বেতাল কৃত : ঐ)। সাত্বত সভাপ্রবেশ প্রবন্ধ (হরগোবিন্দ দত্তকৃত : ঐ)। চৌরপঞ্চাশিকা (নন্দকুমার দত্তকৃত : হরচন্দ্র রায়ের প্রেস)। চাণক্য শ্লোক (রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত : ঐ)। শৃঙ্গারতিলক (ঐ)। মোহমুদ্গর (ঐ)। দায়ভাগ (ঐ)। বিশ্বরূপাদর্শ (রাম-স্বামীকৃত : লেবেণ্ডর সাহেবের প্রেস)। দায়ভাগ সংগ্রহ (রামজয় তর্কালঙ্কার : ঐ)। জানসেন ডিকস্থানরী অনুবাদ (লেবেণ্ডর সাহেবের প্রেস)। চণ্ডী (তারাচাঁদ ভট্টাচার্যকৃত :

---

১ সমাচার দর্পণ, ২২ জানুয়ারি ১৮২৫ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১ম), পৃ. ৬৭-৬৮।

২ সমাচার দর্পণ, ১৪ জানুয়ারি ১৮২৬ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৭৩-৭৪।

সম্বাদতিমিরনাশক প্রেস)। নারদসম্বাদ (বদন পালিতের প্রেস)। বত্রিশ সিংহাসন (বিশ্বনাথ দেবের প্রেস)। নীলের আইন (পিয়ার্স সাহেবের ছাপাখানা, ইটালি ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস)। মনোরঞ্জন ইতিহাস (ঐ)। পাঠশালার রীতি (আদম সাহেবকৃত : ঐ)। উপদেশকথা (ঐ)। বর্ণমালা (ষ্টুয়ার্ট সাহেবকৃত : ঐ)। গোলাধ্যায়—পঞ্চমভাগ (তারিণী-চরণ মিত্রকৃত : ঐ)। ব্যাকরণ (কিট সাহেবকৃত : ঐ)। জহরী (সমশূল আখবার প্রেস)। তৌকিয়াত কিসরা, মরফিয়ৎ, জবা—জ্ঞানোপদেশের কথা (ঐ)। দস্তরল এন্‌সা—পত্রাদিলিখনের ধারা (ঐ)। এ আর মহম্মদ—খ্যাৎ (ঐ)। ব্যাকরণ (কালেজ প্রেস)। কবিতা রত্নাকর (নীলমণি হালদারের ছাপাখানা)। জ্যোতিষ (ঐ)। বাংলা ব্যাকরণ (শ্রীরামপুর মিশন প্রেস)। ভারতবর্ষের ইতিহাস (ঐ)। বাংলা অভিধান (ঐ)। পারসী ও বাঙ্গলা আইন (ঐ)।

৮ অষ্টম তালিকাভুক্ত[১] ১৮২৯ সালে প্রকাশিত বাংলা বই (৩৭টি) : শঙ্করী গীতা (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যন্ত্রালয়)। বায়ুব্রহ্ম (ঐ)। আসাম বুরঞ্জি (ঐ)। ভাগবত (ঐ)। আদিপর্ব্ব (রামকৃষ্ণ মল্লিকের যন্ত্রালয়)। সভাপর্ব্ব (ঐ)। বিদ্যাসুন্দর (ঐ)। নিত্যকর্ম্ম (ঐ)। রসমঞ্জরী (ঐ)। পদাঙ্কদূত (ঐ)। মানসিংহোপাখ্যান (ঐ)। পঞ্জিকা (ঐ)। সংসারসার (মথুরানাথ মিত্রের যন্ত্রালয়)। গঙ্গাভক্তি (ঐ)। বিষ্ণুর সহস্র নাম (ঐ)। অভয়ামঙ্গল (ঐ)। চন্দ্রকান্ত (ঐ)। রতিমঞ্জরী (ঐ)। ভাগবত (ঐ)। আদিরস (ঐ)। ভগবদ্গীতা (ঐ)। চাণক্য (ঐ)। নিত্যকর্ম্ম (ঐ)। বিদ্যাসুন্দর (ঐ) ব্যবস্থার্ণব (পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয় / সিন্দুযন্ত্র)। নলদময়ন্তী (ঐ)। বিদ্যাসুন্দর (ঐ)। অন্নদামঙ্গল (ঐ)। চাণক্য (ঐ)। মহিম্ন (ঐ)। কর্ম্মবিপাক (ঐ)। নিত্যকর্ম্ম (ঐ)। বেতাল (ঐ)। চন্দ্রবংশ (ঐ)। পঞ্জিকা (ঐ)। ইঙ্গরাজী ও বাঙ্গালা সেল্লগাইড (মহিন্দিলাল যন্ত্রালয়)। বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী বকোবিলরি (ঐ)।

বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত এইসব বইয়ের তালিকার প্রতি দৃষ্টি দিলে ঐ পর্বের মুদ্রিত বাংলা বইয়ের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। মূলত ঐ পর্বের বাংলা প্রকাশনায় দেবদেবী-মাহাত্ম্য বর্ণনাই সর্বাধিক প্রাধান্য পেত। কৃষ্ণ, রাধা, দুর্গা, শিব বা গঙ্গার মাহাত্ম্য ও প্রশস্তি বন্দনা তখনকার বাংলা রচনা ছেয়ে থাকত। তারপরেই প্রাধান্য লাভ করেছিল আদিরসাত্মক রচনা। রতিকলা ও কামচর্চা বিষয়ক ছোটো ছোটো নানা বাংলা বই তখন ছাপা হত, একশ্রেণীর বাঙালী পাঠকের কাছে ঐ সবের খুবই চাহিদা ছিল। তবে এগুলিই সব নয়। ধর্মমূলক সংস্কৃত গ্রন্থের অনেক বঙ্গানুবাদ তখন ছাপা হত। বাংলা ভাষায় বেদান্ত, উপনিষদ, ভগবদ্গীতা, ভাগবতসার, চৈতন্যচরিতামৃত, বা চাণক্যশ্লোকের বহু সংস্করণ তখন ছাপা হয়েছিল। এ ছাড়া বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতিও নানা ছাপা-

---

১ সমাচার দর্পণ, ৩০ জানুয়ারি, ১৮৩০ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৮৫-৮৬।

খানায় মুদ্রিত হয়ে নতুন করে প্রকাশিত হতে থাকে। হিন্দুদের আচার-বিচার বা শাস্ত্র নিয়েও বাংলা ভাষায় নানা বই প্রকাশিত হত। যেমন, নিত্যকর্ম, দায়ভাগ, অশৌচ, পাঁচালি, শান্তি শতক, ব্যবস্থার্ণব, মিতাক্ষরাদর্পণ, তর্পণ, প্রণাম শিক্ষা, দিন কৌমুদী, ইত্যাদি। এ ছাড়া বাংলা ভাষায় প্রাচীন গল্পকথাও ছাপা হত। হিতোপদেশ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বত্রিশ সিংহাসন, নলদময়ন্তী, মানসিংহোপাখ্যান, তোতা ইতিহাস প্রভৃতি তখন খুবই জনপ্রিয় ছিল। তবে এরই সঙ্গে নানা বিদ্যাবিষয়ক কিছু কিছু বাংলা বইও ছাপা হত। যেমন, জ্যোতিষ-সংগীত-স্বপ্ন-ঔষধ-বিষয়ক বই, ইতিহাস, ভূগোল বই, ব্যাকরণ, অভিধান বা ভাষাশিক্ষার বই, আইন সংক্রান্ত বই, প্রভৃতি তখনকার অনেক ছাপাখানা থেকেই প্রকাশিত হত। এ ছাড়া মিশনারী প্রকাশন, রামমোহন রায়ের রচনাবলী বা ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত নানা পাঠ্যপুস্তকের কথাও উল্লেখ্য। নানা সংস্করণের পঞ্জিকাও তখন বহু সংখ্যায় ছাপা হত। সর্বোপরি ছিল বাংলা পত্রপত্রিকা। বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদিযুগের শেষ পূর্ব পর্যন্ত বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের এই ধারাই চালু ছিল। কালের গতিতে উত্তর যুগে অবশ্য ধীরে ধীরে এই ধারা পালটেছে। প্রসঙ্গক্রমে, তুলনামূলক বিচারের প্রয়োজনে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালের বা বর্তমানকালের বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের এই পরিবর্তিত ধারার সামান্য পরিচয় এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে।

রেভা. জে. লঙ তাঁর পূর্বোক্ত প্রতিবেদনে[১] ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের মোট সংখ্যা ও তাদের বিষয়বিন্যাস এইভাবে উল্লেখ করেছেন :

বিষয়	বইয়ের সংখ্যা	মুদ্রিত কপির সংখ্যা
পঞ্জিকা (Almanacs)	১৯	১,৩৬,০০০
জীবনী ও ইতিহাস (Biography & History)	১৫	২০,১৫০
খ্রীস্টধর্মবিষয়ক (Christian)	৮	৯,৫৫০
নাট্যবিষয়ক (Dramatic)	৮	৫,২৫০
শিক্ষামূলক (Educational)	৪৬	১,৪৫,৩০০
প্রেম বা কাম -বিষয়ক (Erotic)	১৩	১৪,২৫০
উপন্যাস (Fiction)	২৮	৩৩,০৫০
আইন (Law)	৫	৪,০০০
বিবিধ (Miscellaneous)	১২	১৮,৩৭০
পুরাণ ও হিন্দুধর্মবিষয়ক (Mythology & Hinduism)	৮৫	৯৬,১৫০
নীতিকথা ও নীতিবিষয়ক (Moral Tales & Ethics)	১৯	৩৯,৭০০
মুসলমানী বাংলা (Musulman Bengali)	২৩	২৪,৬০০

১ 'Report on the Native Press in Bengal in 1857', by Rev. J. Long, 1859 : p. VIII.

বিষয়	বইয়ের সংখ্যা	মুদ্রিত কপির সংখ্যা
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Sciences)	৯	১২,২৫০
সংবাদপত্র (Newspapers)	৬	২,৯৫০
সাময়িকপত্র (Periodicals)	১২	৮,০০০
সংস্কৃত-বাংলা (Sanscrit-Bengali)	১৪	১৫,০০০
মোট :	৩২২	৫,৭১,৬৭০

উপরোক্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিককালে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের অবস্থা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ধরা যাক, ১৯৭২-৭৩ সালের কথা। জাতীয় গ্রন্থাগার প্রকাশিত ১৯৭২-৭৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ঐ এক বছরে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মোট পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা ছিল ১০৫৩।[১] পরবর্তী আরো কয়েক বছরের হিসাব থেকে জানা যায়, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মোট বইয়ের সংখ্যা ছিল এইরূপ : ১৯৭৩-৭৪ সালে : ১২৬৮, ১৯৭৪-৭৫ : ৯৭০, ১৯৭৫-৭৬ : ৯৭৯, ১৯৭৬-৭৭ : ১৩৩৯ এবং ১৯৭৭-৭৮ : ১০৯৭। [অবশ্য, এইসব পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয়েছে Delivery of Books (Public Libraries) Act, 1954 অনুযায়ী কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত মোট পুস্তকসংখ্যার উপর ভিত্তি করে।] ঐসব প্রকাশিত বাংলা বইয়ের বিষয়বস্তু অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করলে নিম্নরূপ শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করা যায় :

বিষয়	বইয়ের সংখ্যা					
	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪	১৯৭৪-৭৫	১৯৭৫-৭৬	১৯৭৬-৭৭	১৯৭৭-৭৮
সাধারণ বিষয় (General Works)	২৬	৬৬	১৭	২২	১৮	১৬
দর্শন (Philosophy)	২০	৪৮	২৪	৩২	৪৪	৩৮
ধর্ম (Religion)	৪১	১০২	৫৮	৯০	১২৬	১৭০
সমাজবিজ্ঞান (Social Sciences)	১১৫	৫৬	৭৪	৫৭	১০৯	৭৬
ভাষা (Language)	১৮	১২	১২	৫	২৬	২৬
বিজ্ঞান (Pure Science)	৩৩	২০	১৮	১৮	৩৮	৩৬
প্রযুক্তিবিদ্যা (ব্যবহারিক বিজ্ঞান) (Technology)	১৭	২৭	২৬	১৮	১৬	২৬
চারুকলা ও শিল্প (Fine Arts)	৫৮	১০৮	৬৫	৪৮	৫৩	৩৪
সাহিত্য (Literature)	৫৭৯	৬৮১	৫২৯	৫৫২	৬৫১	৫৩০
ইতিহাস-ভূগোল-ভ্রমণ (History-Geography-Travels)	১৪৬	১৪৮	১৪৭	১৩৭	২৫৮	১৪৫
মোট :	১০৫৩	১২৬৮	৯৭০	৯৭৯	১৩৩৯	১০৯৭

১ *Annual Report for the year 1972-73*, published by the National Library, Calcutta.

[প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উপরোক্ত বছরগুলিতে ইংরেজি সহ চৌদ্দটি প্রধান ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত মোট পুস্তকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৭০২০, ১৭৬০০, ১৬১৮২, ২১৮৫৩, ২১৯২২ এবং ১৯৬৫৯। ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (Indian National Bibliography)-এর কেন্দ্রীয় সরকারী প্রকাশকের তরফ থেকে প্রচারিত অপর তথ্য থেকে জানা যায় যে ঐ গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশনার প্রথম ১৫ বছরে অর্থাৎ, ১৯৫৮ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে চৌদ্দটি প্রধান ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের মোট সংখ্যা ছিল ১,৬৮,৪০৩ ; এর মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী ইংরেজিতে ছিল ৫৩,২১২টি বই, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হিন্দিতে ছিল ২৬, ৭৭২টি বই এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী বাংলায় ছিল ১৬,২৩২টি বই।[১] বিষয়-বিন্যাস করলে দেখা যায় পূর্বোক্ত ১৫ বছরে প্রকাশিত মোট বইয়ের শতকরা ৩৬ ভাগ ছিল 'সাহিত্য' ও শতকরা ২৪ ভাগ ছিল 'সমাজবিজ্ঞান' বিষয়ক ; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক বইয়ের শতকরা হার ছিল আরো কম। 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' বিষয়ক বই ছিল ৮৬৪৮টি এবং 'প্রযুক্তিবিদ্যা ও ব্যবহারিক শিল্প' বিষয়ক বই ছিল ১৪৩৭৬টি। ঐ সময়ে কেবলমাত্র ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই ছিল 'সাহিত্য' বিষয়ক। পূর্বোক্ত ১৫ বছরে কেবলমাত্র বাংলা ভাষাতেই 'সাহিত্য' বিষয়ক ৯৪৭৩টি বই প্রকাশিত হয়েছিল।]

বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদিযুগের শেষ পর্বে অর্থাৎ বিস্তার পর্বে পৌঁছে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের হার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়ে অগ্রগতির যে স্তরে পৌঁছেছিল সমকালীন নানা দলিল থেকে বিস্তারিত তথ্য ও পরিসংখ্যান উদ্ধার করে এতক্ষণ তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হল। প্রসঙ্গত সেই আদিযুগের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের ধারা আধুনিক কালে কতদূর অগ্রসর হয়েছে সে সম্বন্ধে ধারণা করার জন্য, সাম্প্রতিক দলিল থেকেও কিছু কিছু পরিসংখ্যান উদ্ধার হল।

সমকালীন বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন প্রসঙ্গে আরো একটি বিশিষ্ট ধারার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেটি হল বিলেতে বাংলা মুদ্রণের ধারা। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ধাঁচে বিলেতেও যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজ স্থাপিত হল, তখন মূলত তারই চাহিদায় সেখানেও ধীরে ধীরে বাংলা মুদ্রণের প্রচলন হতে দেখা যায়। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে হার্টফোর্ডে এই কলেজ স্থাপিত হয়, পরে ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে তা হেইলীবারিতে স্থানান্তরিত হয়। ইংরেজ কর্মচারীদের ভারতে প্রেরণের পূর্বে প্রাচ্যবিদ্যা ও ভাষায় শিক্ষা দেওয়া এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। স্বভাবতই এখানেও বাংলা ভাষা শিক্ষার্থে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা দেখা দেয় এবং তা মেটাতেই বিলেতে বাংলা বই ছাপার সূত্রপাত হয়। লণ্ডনের কক্স এণ্ড বেইলিস-এর মতো কিছু প্রখ্যাত ছাপাখানা এ কাজে এগিয়ে আসে।

১ *The Statesman*, 19 June 1973.

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের লেখা বেশ কয়েকটি বাংলা বই ঐ সময়ে লণ্ডনে নতুন করে ছাপা হয়। যেমন, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'— ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে, হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা'— ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বত্রিশ সিংহাসন-এর তৃতীয় সংস্করণ ('শ্রীবিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুত্তলিকা সিংহাসন সংগ্রহ বাঙ্গালা ভাষাতে')— ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে এবং এর অপর একটি সংস্করণ— ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে, চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস', তৃতীয় সংস্করণ— ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে এবং এর পরবর্তী আরেকটি সংস্করণ— ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে ছাপা হয়। শেষোক্ত বইটির আখ্যাপত্র ও তার ভাষাও লক্ষণীয়: 'শ্রী/॥ তোতা ইতিহাস ॥/॥ বাঙ্গালা ভাষাতে ॥/॥ শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্সীতে রচিত ॥/লন্দন রাজধানিতে চাপা হইল/১৮২৫'। এর হরফগুলি ছিল সুন্দর ঝরঝরে, মাত্রামিলের সুষমা ও টানা লেখার শ্রী এখানে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। লণ্ডনের গ্রেট কুইন স্ট্রিটের কক্স এণ্ড বেইলিস মুদ্রাযন্ত্রে এটি ছাপা। ঐ একই ছাপাখানায় পূর্বোক্ত অন্যান্য বইও ছাপা হয়েছিল।

হেইলীবারি কলেজের সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ জি. সি. হটনের (Graves Chamney Haughton) লেখা কয়েকটি বিখ্যাত বাংলা বইও ঐ সময়ে লণ্ডনে ছাপা হয়: তাঁর বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

১. ১৮২১ সালে কক্স এণ্ড বেইলিস মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা বাংলা ব্যাকরণ '***Rudiments of Bengali Grammar***', পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৮।

২. ১৮২২ সালে ঐ একই প্রেসে ছাপা বাংলা গদ্য সংকলন, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪০। এর আখ্যাপত্রটি ছিল এইরূপ: 'BENGALI SELECTIONS/WITH/TRANSLATIONS AND A VOCABULARY/BY/GRAVES CHAMNEY HAUGHTON, M. A., F.R.S./PROFESSOR OF SANSCRIT AND BENGALI IN THE HONOURABLE/EAST-INDIA COMPANY'S COLLEGE./LONDON: PRINTED FOR THE AUTHOR,/By Cox and Baylis, Great Queen Steet, Lincoln's Inn Fields,/And Sold by KINGSBURY, PARBURY, and ALLEN, Booksellers to the Honourable/East-India Company, Leadenhall Street,/1822.'

এই সংকলনে বাংলার সঙ্গে তার ইংরেজি অনুবাদও দেওয়া আছে। বইটির ১ থেকে ৮৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বাংলায় ছাপা; এর রচনাগুলি 'তোতা ইতিহাস', 'শ্রীবিক্রমাদিত্যের বত্রিস পুত্তলিকা সংগ্রহ হইতে' ও 'পুরুষপরীক্ষ সংগ্রহ হইতে' সংকলিত। এর ছাপা ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন, বাংলা হরফের উচ্চতা ৩ মি.মি.। টানা লেখার শ্রী এখানেও লক্ষণীয়।

৩. ১৮২৫ সালে প্রকাশিত কক্স এণ্ড বেইলিস মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৪। এটিও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকাবলী অবলম্বনে

সংকলিত : 'A Glossary, Bengali and English, to explain The Tota-Itihas, The Batris Singhason, The History of Raja Krishna Chandra, The Purusha-Parikhya, The Hitopadesa (translated by Mrityunjaya)'।

৪. ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত হটনের বিখ্যাত অভিধান : 'Dictionary, Bengali and Sanskrit, explained in English, adapted for students of either language, to which is added An Index, serving as a reversed Dictionary'। এই বিপুলায়তন অভিধানটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৫২ (এর প্রতি পৃষ্ঠায় দুটি কলামের জন্য দুই পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া আছে)— মুদ্রাকর লণ্ডনের গ্রেট কুইন স্ট্রীটের জে. এল. কক্স এণ্ড সন্স।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে লণ্ডনে বাংলা হরফ তৈরিরও একটা বড়ো কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এই সব হরফ ঢালাইকেন্দ্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ক্যাসলন, বা জ্যাকসন, এডমণ্ড ফ্রাই, ভিনসেন্ট ফিগিনস প্রভৃতির ঢালাইখানা। V. & J. Figgins হরফ ঢালাইখানার তৈরি বাংলা পাইকা হরফের মুদ্রিত নমুনাপত্র পাওয়া যায়। হার্টফোর্ডের বিখ্যাত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান স্টীফেন অষ্টিনের সংগ্রহেও বহু ভারতীয় হরফ ছিল। ঐ সময়কার লণ্ডনে ছাপা বাংলা বইয়ের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল; তার অন্যতম কারণ হল, ওখানকার বাংলা হরফগুলো ছিল কলকাতা/শ্রীরামপুরে কাটা হরফ থেকে ভিন্ন ধাঁচের, অনেকক্ষেত্রে সুন্দরতর। ওই সব হরফের নয়নশোভন ঝরঝরে রূপ লক্ষণীয়। কিছু কিছু হরফে টানা লেখার শ্রী লক্ষ্য করা যায়।

লণ্ডনের লীডেন হল স্ট্রীট, গ্রেট কুইন স্ট্রীট প্রভৃতি অঞ্চলে তখনকার মুদ্রণ বা বইয়ের ব্যবসা চালু ছিল। বাংলা বইয়ের বাজারও তখন সেখানেই ছিল। Paternoster Row ছিল তখন লণ্ডনের আর-একটি প্রখ্যাত বইপাড়া। এই রাস্তাটির নাম তো এককালে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশকে কলকাতার চিৎপুর রোড যখন দেশীয় ছাপাখানা ও বই বিক্রির একটি বড়ো কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, তখন রেভা· লঙ তাকে কলকাতার 'পেটারনস্টর রো' বলে উল্লেখ করেন।

বিস্তার পর্বে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের বিচিত্র ধারা সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করার আগে আরো দু-একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। এর অন্যতম হল, সেকালের কলকাতায় বইয়ের ব্যবসায়, অর্থাৎ তখনকার বই বিক্রয়, বা প্রচারের ব্যবস্থা। মিশনারী সংস্থাগুলির উদ্যোগে মুদ্রিত বইয়ের প্রচারব্যবস্থা বা ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তক বিক্রয় বা প্রচারের ব্যবস্থার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। দেশীয় ছাপাখানায় মুদ্রিত বাংলা বই বিক্রয়ের জন্য বিধিবদ্ধ স্বতন্ত্র বইয়ের দোকান তখনো খুব বেশি গড়ে ওঠেনি। বিদেশী পরিচালিত দোকানগুলি থেকে বাংলা বই খুব কমই বিক্রয়

হত। এদেশীয় প্রকাশকদের অনেকেই নিজ নিজ ছাপাখানা থেকে সরাসরি তাঁদের বই বিক্রয় করতেন। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ছিলেন প্রথম উদ্যোগী বাঙালী মুদ্রণ ব্যবসায়ী যিনি কলকাতায় নিজস্ব বইয়ের দোকান খুলেছিলেন। বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশক বিভিন্ন দেশীয় ছাপাখানাগুলি বাংলা বই বিক্রয়ের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। ঐ সব সাময়িক-পত্রে প্রচারিত মুদ্রিত বাংলা বইয়ের বিজ্ঞপ্তিতে প্রাপ্তিস্থানের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হত। তৎকালীন কলকাতায় বউবাজার, মীরজাপুর, আড়পুলি লেন, কলুটোলা, শিয়ালদহ, জোড়াবাগান, শোভাবাজার, চিৎপুর, চোরবাগান, সিমলা প্রভৃতি অঞ্চলে দেশীয় ছাপাখানা ও বই বিক্রয়ের কেন্দ্র ছিল। বিশেষ করে চিৎপুর রোড ঐ সময়ে দেশীয় বইয়ের ব্যবসায়ের অন্যতম কর্মব্যস্ত কেন্দ্র ছিল। আগেই বলেছি, লণ্ডনের বইয়ের ব্যবসায়ের কথা স্মরণ করে রেভা. লঙ ঐ রাস্তাকে 'their Pater Noster Row' বলে বর্ণনা করেছেন।

বইয়ের ব্যবসায়ের পূর্বোক্ত প্রচলিত সাধারণ পদ্ধতি ছাড়াও ঐ সময়ে আরেকটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক ব্যবস্থা চালু ছিল। সেটি হল, পাড়ায় পাড়ায় মাথায় করে বই ফিরি করা। কলকাতায় ও বাংলাদেশের বিভিন্ন মফস্বল শহরে ঐ সময়ে অনেক বইয়ের ফিরিওয়ালা ('hawkers') বা ভ্রাম্যমাণ পুস্তক-বিক্রেতা ('walkig booksellers') দেখা যেত। এদের অনেকেই বছরের প্রায় আট মাস বই বিক্রি করে বেড়াত, আর বর্ষা ইত্যাদি সময়ের বাকি চার মাস চাষাবাদের কাজ করত। পিরামিডের ত্রিকোণ চূড়ার আকারে মাথায় বই সাজিয়ে তারা বাঙালী পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বই বিক্রি করত। এভাবে তাদের অনেকেই মাসিক ছ টাকা-আট টাকা থেকে ত্রিশ টাকা, এমন-কি অনেকে মাসিক একশ টাকা পর্যন্ত রোজগার করত। রেভা. লঙ তাঁর পূর্বোক্ত প্রতিবেদনে এই ধরনের বইয়ের ব্যবসায় সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন :

'The Native presses are generally in by-lanes with little outside to attract, yet they ply a busy trade. Of late several educated Natives have opened shops for the sale of Bengali works, and we know the case of one man who realises Rupees 500 per month profit, but the usual mode of sale is by hawkers of whom there are more than 200 in connection with the Calcutta presses. (Many of them sell books during 8 months, in the year, and devote the rainy season to the cultivation of their fields.) These men may be seen going through the native part of Calcutta and the adjacent towns with a pyramid of books on their head. They buy the books themselves at wholesale price, and often sell them at a distance at double the price which brings them in probably 6 or 8 Rupees

monthly, though we know of one man who realizes by book hawking more than 100 Rupees monthly.'[১]

১৮২২ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত মাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে মুর্শিদাবাদস্থ জনৈক পত্রলেখক বাঙালীদের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণ স্পৃহা ও বই কেনার আগ্রহ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন ঐ সময়ে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে চারজন ভ্রাম্যমাণ পুস্তক বিক্রেতা ছিলেন। তিনি লেখেন: 'I am glad to perceive that every day the natives are increasing in their sales of native books; there are now in and near the city of Moorshedabad no less than four walking booksellers that I know of. In speaking to one last week, he informed me, that upon an average he sold to the amount of 30 Rupees per month. Two of the four are in the employ of a native of Calcutta, the other two are selling for another native, who has established a press near Agrudeep.'[২]

প্রথমোক্ত মুদ্রণব্যবসায়ী কলকাতার সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ের স্বত্বাধিকারী ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়োক্ত দেশীয় মুদ্রণব্যবসায়ী অগ্রদ্বীপের নিকটবর্তী বহড়া-নিবাসী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। তিনি বিভিন্ন শহরে তাঁর প্রতিনিধি বা ভ্রাম্যমাণ পুস্তক বিক্রেতা নিয়োগ করেছিলেন।

বক্ষ্যমাণ বিস্তার পর্বের আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের এই দ্রুত হারে বৃদ্ধি ও বইয়ের ব্যবসায়ের এই বিচিত্র কথার পর পরিশেষে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। সেটি হল বাংলা মুদ্রণে নতুন পদ্ধতির প্রচলন ও বাংলা প্রকাশনায় শোভনতা বৃদ্ধির ঝোঁক। এই নতুন মুদ্রণ পদ্ধতি অর্থাৎ বাংলা মুদ্রণে লিথোগ্রাফির (Lithography) প্রবর্তন ও সেই পদ্ধতিতে ছাপা বাংলা প্রকাশনার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সমাচার দর্পণের (২৭ জানুয়ারি ১৮২১) সম্পাদকীয় মন্তব্যে এটিকেই 'নূতন ছাপা প্রকরণ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁরা লেখেন: 'সম্প্রতি সমাচার আসিয়াছে যে জর্মানি দেশে এক প্রকার নূতন ছাপা সৃষ্টি হইয়াছে সে অতি আশ্চর্য্য তাহার বিবরণ এই। এক প্রকার কালি করিয়াছে সেই কালি দ্বারা কাগজে লিখিয়া এক প্রকার কোমল পাথরের উপরে চাপা দিলে তাবৎ অক্ষর কাগজ হইতে উঠিয়া ঐ পাথরে লাগে কিঞ্চিৎ কাল পরে সেই সকল পাথরের উপরে কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠে তাহাতে অন্য কালি দিয়া কাগজ

১ 'Report on the Native Press in Bengal in 1857', by Rev. J. Long, 1859 : p. XIV.

২ *Friend of India* (monthly), March 1822. p. 86.

ছাপাইলে উত্তম ছাপা হয় এবং এক লক্ষ ফর্দ্দ হইলেও কিছু মন্দ হয় না আদ্যন্ত সমান ছাপা হয়। এই রূপে যে ছাপা হইতেছে সে ছাপার কাগজ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আসিয়াছে এবং সে কল ইংলণ্ড দেশে গিয়াছে এবং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে শীঘ্র আসিবেক।'[১] সমাচার দর্পণে এই মন্তব্য প্রকাশিত হবার পরের বছর অর্থাৎ ১৮২২ সালের মধ্যেই কলকাতায় লিথোয় ছাপা শুরু হয়ে যায়। ভারতবর্ষে লিথোগ্রাফির প্রচলন সম্বন্ধে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২২ তারিখের 'ক্যালকাটা জার্নালে' (পৃ. ৩৪৯) লেখা হয় : 'Lithography in India ··We are glad to learn that after various unsuccessful attempts, it has at length been brought to perfection in Calcutta. Mr. Belnos, and Mr. de Savighnac, two French Artists resident in this city, having united their information and skill, have produced specimens of Lithographic Engraving and Printing equal to anything we have seen from England, and we have now in our possession a portrait of a private individual, and a sketch from Nature, which it would be difficult to distinguish from pencil Drawings.'[২] কলকাতায় বিদেশীদের এই মুদ্রণপ্রচেষ্টা ছাড়াও ক্রমে ক্রমে বাংলা মুদ্রণেও লিথোর ব্যবহার শুরু হয়। ১৮২৫ সালের মধ্যে কলকাতায় এই পদ্ধতিতে বাংলা অক্ষর সম্বলিত মানচিত্র প্রকাশিত হয়। সাধারণত লিথোয় ছাপা নানা ধরনের ছবি, প্রতিকৃতি, মানচিত্র, নকশা প্রভৃতি সেই সময় কলকাতায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। Lithography-কে বাংলায় মুদ্রণকলায় শিলাঙ্কন পদ্ধতি বলা যায়। ঐ সময়ে কলকাতায় লিথোগ্রাফিক প্রেসকে বাংলায় পাথরীয়া ছাপাখানা বা পাষাণযন্ত্র বলা হত। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে এলয়েস সেনিফেলডার (Alois Senefelder) আবিষ্কৃত এই লিথোগ্রাফিতে প্রধানত এক ধরনের বিশেষ সছিদ্র পাথর (porous stone) ব্যবহৃত হত। তাই বাংলায় ঐ নাম প্রচলিত হয়েছিল। সমাচার দর্পণের পূর্বোদ্ধৃত সম্পাদকীয় মন্তব্যে বর্ণিত পদ্ধতিই ছিল মোটামুটি প্রথমদিকে প্রচলিত Lithographic পদ্ধতি। তখন এটি ছিল Direct Lithography। বর্তমান কালে এ পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমদিককার Direct Lithography-র মূল পদ্ধতিকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে : 'In the original process the copy to be printed (lettering, music, or art work) was either drawn by hand in reverse (right to left) on the surface of a slab of porous stone with a grease crayon or in greasy ink or was transferred to the stone by rubbing, having first been drawn with a grease crayon on transfer paper having a special surface. The

১ সমাচার দর্পণ, ২৭ জানুয়ারি ১৮২১ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৩৩৬।

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৪০৮।

surface of the stone was then sponged with a solution of gum arabic in water to render the nonprinting portions receptive to moisture but repellent to greasy ink and the printing portions receptive to grease but repellent to moisture. The surface, after being dampened with water, was then rolled with the greasy ink, which adhered only to the printing image ; paper was laid over it, and a print made by pressure.'[১] সুতরাং বলা যায়, এই শিলাঙ্কন মুদ্রণকলা বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন জগতে নিঃসন্দেহে এক অভিনব পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিল এবং তার ফল স্বরূপ বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদি যুগের শেষ পর্বে বাংলা ভাষায় পৃথিবীর বা ভারতবর্ষের বা কলকাতার মানচিত্র এবং গঙ্গা ও অন্যান্য নদনদী, অথবা কলকাতা সহ সারা দেশের রাস্তাঘাটের নকশা, মনুষ্য ও পশ্বাদির চিত্র-সহ চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা শিক্ষার বই, অথবা হস্তলিপি অনুশীলনের বই ছাপা হতে থাকে। এমন-কি সুন্দর রঙীন ছবি-মানচিত্র-নকশাও তখন ছাপা হতে থাকে। বাংলা মুদ্রণের বিস্তারের এটি এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

বাংলা মুদ্রণের অগ্রগতির ধারার এখানেই শেষ নয়। দ্বিতীয় যে ধারাটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য, তা হল ঐ সময়ে বাংলা প্রকাশনায় শোভানতা বৃদ্ধির ঝোঁক। এর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, বাংলা ভাষায় সচিত্র গ্রন্থ মুদ্রণ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানা থেকে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র গ্রন্থ 'অন্নদা-মঙ্গল' প্রকাশ করেন। ঐ বইয়ে রামচাঁদ রায় খোদিত অনেকগুলি ছবি (মোট ছবি ছ'টি) ছাপা হয়। তারপর থেকেই বাংলা মুদ্রণের বিস্তার পর্বের শুরু। সেই পর্বে দেশীয় ছাপা-খানা থেকে মুদ্রিত বহু বাংলা বইয়ে অসংখ্য ছবি ছাপা হতে থাকে। প্রধানত কাঠ-খোদাই ও ধাতু-খোদাই ব্লকের সাহায্যে এই সব ছবি ছাপা হত এবং এগুলির দ্বারা সজ্জিত করে বাঙালী মুদ্রাকরেরা তাঁদের বইগুলোকে শোভন সুন্দর করে প্রকাশের চেষ্টা করতেন। শ্রীরামপুর মিশন ও ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে লসন প্রভৃতির উদ্যোগে 'পশ্বাবলী' ও অন্যান্য গ্রন্থে ধাতু-খোদাই চিত্র মুদ্রণ ছাড়াও দেশীয় শিল্পীরাও এই কাজে এগিয়ে এসেছিলেন এবং তার ফলে দেশীয় ছাপাখানার মান বহুলাংশে উন্নীত হয়েছিল।

চিত্রশোভিত হয়ে বহু পঞ্জিকাও ঐ সময়ে বিভিন্ন দেশীয় ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম মুদ্রিত এইরূপ যে পঞ্জিকার সন্ধান আমি পেয়েছি তা ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত। কলকাতার জোড়াসাঁকো-নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সংকলিত ১২২৫ সালের (১৮১৮-১৯ খ্রীস্টাব্দ) ঐ বাংলা পঞ্জিকা নবদ্বীপ পণ্ডিতদের মতে রচিত। ডিমাই অক্টেভো আকারের পঞ্জিকাটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩ + ১৩৪ + ২। এতে

১ *McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology* (1960), Vol. 10, p. 600.

ব্যবহৃত হরফের উচ্চতা প্রায় ৪ মি. মি.। বইয়ের কোথাও মুদ্রাকরের নামোল্লেখ নেই। সম্ভবত এটি শোভাবাজারের বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত। কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে এর একটি কপি রক্ষিত আছে।

পঞ্জিকাটির শেষে লেখক আত্মপরিচয় ও গ্রন্থপরিচয় দিয়ে লিখেছেন: 'ভবসিন্ধুজে অপার তাহে হয়ে কর্ন্ধার জীবগণের করিছেন নিস্তারঃ॥ সজীবনে তারিনাম মোনে মনন অভিশ্রাম সংক্ষেপে কহিব কিছু নাকোরে বিস্তার॥ ভক্তবৎসল গুন ভক্তি পথে জে নিপুন মুক্তি দেন উক্তি আছে তার। শ্রীযুক্ত রামহরিনাম হৃদয় মুক্তেধাম ত্রিজগতে তিনি সারত্ সার॥ সেই পদ সেবা করি সম্পদ বাসনা করি করিলাম পঞ্জিকা প্রকাষ। জোড়াসাঁকো মমঃধাম দিষ দুর্গাপ্রসাদ নাম দুর্গাযদী পুরাণ অভিলাষ। নবদ্বিপের মতে মত তাহে নহে মন্তমত এমত জানিবে সকলে। জ্ঞাতো হেত্ত যোগ বার আর যত আছে তার ভাষায় রচিলাম দেখে মূলে। গ্রহস্ত আশ্রমের ফল জানিতে হয় এসকল ফলাফল যে গ্রহর জেদীনে। অক্লেসে ক্লেষ নাই পঞ্জিকা সকলের ঠাঁই দেখিবেন যখুন হবে মন। আরকীছু বলিস্থল যদী থাকে ইতে ভুল আমী করি মূলের প্রমানে। আমার ভাষার ত্রূটী থাকে যদি কোটী ২ শুদ্ধ হবে সাধু সন্বিধানে॥'

পঞ্জিকাটি চিত্রশোভিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। রাশিচক্র, বছরের বিভিন্ন সময়ে গ্রহাদির অবস্থান নির্দেশক বহু ছক ও নানাবিধ নকশা এতে ছাপা আছে। এছাড়া 'লাইন-ব্লকে' ছাপা একটি ছবিও এতে পাওয়া যায়। পঞ্জিকায় যেখানে নির্দেশ আছে ২৪ বৈশাখ ১২২৫ (৫ মে ১৮১৮), মঙ্গলবার—স্বর্য্যগ্রহণ, তারই সঙ্গে (১০ পৃষ্ঠার বিপরীতে) সূর্যগ্রহণের একটি ছবি ছাপা হয়েছে। [পঞ্জিকায় চিত্রমুদ্রণের নিদর্শন স্বরূপ সংযোজিত প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য।]

বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের শেষ পর্বে প্রকাশিত আরো কয়েকটি সচিত্র বাংলা বইয়ের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:

রামরত্ন ন্যায়পঞ্চাননের 'ভগবতী গীতা'— সংস্কৃত সহ বাংলা পদ্যানুবাদ, হরচন্দ্র রায়ের আড়পুলির ছাপাখানা থেকে ১৮২৪ সালে প্রকাশিত। এই বইয়ের গোড়ায় নারদ ও শিবের একখানি ধাতু-খোদাই চিত্র মুদ্রিত আছে। 'মেনকার ক্রোড়দেশাবস্থিতা ভগবতী রাজা হিমালয়কে যোগ কহিতেছেন— এই ছবিও আছে।' এই বই 'জেলদ বন্দ' হয়ে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ, বিশেষ ধরনের চামড়া-বাঁধাই ও তার উপর সোনালী অক্ষরে নাম খোদাই করে প্রকাশ করা হয়।

রামজয় বিদ্যাসাগর সম্পাদিত কবিকঙ্কন 'চণ্ডী' শোভাবাজারের বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানা থেকে ১৮২৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইটিও ছিল চিত্রশোভিত, পাঁচটি সুন্দর ধাতু-খোদাই চিত্র এর শোভা বর্ধন করে।

রাধামোহন সেন কর্তৃক বাংলা পদ্যে অনূদিত 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী' ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানা থেকে সচিত্র প্রকাশিত হয়।

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে বিশ্বম্ভর আচার্য-খোদিত 'ভগীরথ গঙ্গা' নামে একটি ধাতু-খোদাই চিত্র মুদ্রিত হয়।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দূতীবিলাস' সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রালয় থেকে ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে বারোখানি 'লাইন-এনগ্রেভিং' চিত্র সন্নিবেশিত হয়।

বর্ধমানাধিপতি তেজচন্দ্র বাহাদুরের দেওয়ান প্রাণচন্দ্র রচিত 'হরিহর মঙ্গল সঙ্গীত' ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই প্রকাশিত হয়। রামধন স্বর্ণকারের ৭১ খানা ধাতু-খোদাই চিত্র এই গ্রন্থের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।[1]

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দুর্গামঙ্গলান্তর্গত 'গৌরীবিলাস' সচিত্র মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৮১৯-২০ খ্রীস্টাব্দে।[2]

রাধামোহন সেনের 'সঙ্গীত তরঙ্গ' সচিত্র প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে।[3]

সুতরাং দেখা যায় ঐ সময়ে শোভাবাজারের বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানা, আড়পুলির হরচন্দ্র রায়ের প্রেস, কলুটোলার সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রালয় প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর দেশীয় ছাপাখানাগুলি থেকে চিত্রশোভিত বাংলা বই প্রকাশিত হত। চিত্র-প্রতিলিপি প্রকাশের অবাধ সুযোগ তখনো অবশ্য বাংলাদেশে গড়ে ওঠেনি। সমসাময়িক কালে ইউরোপে 'ষ্টীল'-বা 'কপার-প্লেট এনগ্রেভিং' বহুল প্রচলিত হয়ে থাকলেও ঐ সময়ে এদেশীয় শিল্পীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সহজ ধাতু বা কাঠ-খোদাই পদ্ধতির আশ্রয় নিতেন। তামার পাত খোদাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য চালু হয়েছিল। দেশীয় শিল্পী অঙ্কিত ধাতু বা কাঠ-খোদাই উভয় ধরনের চিত্রই ঐ পর্বে মুদ্রিত বাংলা বইয়ে দেখা যেত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (৪৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) বাংলা প্রাচীন কাঠ-খোদাই চিত্রের ও 'প্রবাসী'তে (১৩৫৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যায়) প্রাচীন ধাতু-খোদাই চিত্রের বহু নিদর্শন প্রকাশ করেছেন।

ঐ পর্বে বাঙালী শিল্পীদের আঁকা মুদ্রিত ছবিগুলি শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন হিসাবে উচ্চ পর্যায়ের না হলেও, বাংলা মুদ্রণের অগ্রগতির ইতিহাসে ঐগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু সমকালীন পত্রপত্রিকায় বিদেশীদের অনেকেই এর বিরূপ সমালোচনা করেন। মুদ্রিত বাংলা বই ও ঐ ছবিগুলি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' (সেপ্টেম্বর ১৮২০) পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলা হয়, 'Many of these works have been accompanied with plates, which add an amazing value to them

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৪২০।

২ ঐ তদেব, পৃ. ৪০৪।

৩ ঐ তদেব, পৃ. ৩৯৩।

in the opinion of the majority of the native readers and purchasers. Both the design and execution of the plates have been exclusively the effort of native genius.'[১] এর পরেই ছবিগুলির কঠোর সমালোচনা করে বলা হয় : 'The figures are stiff and uncouth, without the slightest expression of mind in the countenance, or the least approach to symmetry of form.'[২] এখানে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ছবিগুলির যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়েছিল বলে মনে হয় না।

ঐ সময়ের বাংলা বইয়ে ছাপা ছবিগুলি সম্বন্ধে উল্লেখ্য যে এগুলি ছিল একই শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত ও খোদাই করা। তাঁদের প্লেটগুলির দাম ছিল প্রতিটি এক স্বর্ণমুদ্রা। জোড়াসাঁকোর হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ঐ সময়কার একজন শিল্পী— যাঁকে একাধারে চিত্রশিল্পী ও ধাতুখোদাই শিল্পী বলা যায়। এ প্রসঙ্গে পুনশ্চ ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'র পূর্বোক্ত নিবন্ধকারকে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, 'The plates cost in general a gold-mohur, designing, engraving, and all ; for in the infancy of this art, as of many others, one man is obliged to act many parts. Thus Mr. Huree Hur Banerjee, who lives at Jorasanko, performs all the requisite office from the original outline, to the full completion ; but though he with true eastern modesty, stiles himself in one corner of his plates, the best engraver in Calcutta, we doubt his ability when left to his own resources. The plates which he and others have executed from European designs, have been tolerably accurate and not discreditable for neatness— but when left to their native unassisted taste, their productions are miserable in the extreme.'[৩] পুনশ্চ এখানে পক্ষপাতশূন্য বিচারের অভাব লক্ষ্য করা যায়। একথা সত্য, তখনকার বাঙালী শিল্পীদের অনেকে বিদেশীদের কাছ থেকে এই শিল্প বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। পরিণতিতে তাঁদের অনেকেই দক্ষ শিল্পী হিসাবে সুবিদিত হয়েছিলেন। যেমন, প্রখ্যাত দেশীয় খোদাই-শিল্পী কাশীনাথ মিস্ত্রীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক (১৮১৮-১৯) প্রতিবেদনে তাঁর প্রসঙ্গ এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে (পৃ. ২০) : 'Joyce's Dialogues on Mechanics and Astronomy···. The highly creditable execution of the plate by a native artist, Casheenath Mistree, deserves particular mention, as evincing the progress

১ 'On the effect of the Native Press in India', *op. cit.*

২ *Ibid.*

৩ *Ibid.*

already made by the natives in the elegant and useful art of engraving on copper. That art they owe to the efforts of a member of this Society, some of whose friends expressed to him how groundless was the idea of proficiency in engraving being ever attainable by a native. The result is one of the numerous facts that should enlarge the hopes of those who labor for the improvement of the inhabitants of this country, and for the introduction here of the ingenious arts of the European world.'

সে যুগের ধাতু-খোদাই শিল্পীদের মধ্যে পূর্বোক্ত হরিহর ব্যানার্জী ও কাশীনাথ মিস্ত্রী ছাড়া আর যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন রামচাঁদ রায়, বিশ্বম্ভর আচার্য, রামধন স্বর্ণকার, মাধবচন্দ্র দাস, রূপচাঁদ আচার্য, রামসাগর চক্রবর্তী ও বীরচন্দ্র দত্ত। এঁদের সমবেত চেষ্টায় বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদিযুগের শেষ পর্বে অনেক বাংলা বই চিত্রশোভিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

মর্য্যদা থাকিতে কেলো নাজাহো উচিয়া ।
আপন সদৃশ স্থানে উচি বৈস গিয়া ॥

এত সুনি সোমদত্ত কোপেতে জলিল ।
অগ্নির উপরে জেন ঘৃত ঢালি দিল ॥

সোমদত্ত বলে সেনী নাকরিস গর্ব্ব ।
তোমার মহিমা জত আমি জানি সর্ব্ব ॥

কোন দোষে দোষী আমি কহত সত্তর ।
এত কটু ভাসা মোরে কহিস বর্ব্বর ॥

তোমা হইতে নিচ কেবা আছয়ে মানুষে ।
মোর অগোচর নহে জানিয়ে বিশেসে ॥

এতেক সুনিয়া সেনী অতি ক্রোধ মন ।
কোপে ডাক দিয়া বলে সুন সর্ব্ব জন ॥

এত অহঙ্কার হইল আরে দলাঙ্গার ।
পরনিন্দা ছিদ্র নাহি চাহো আপনার ॥

ইহার উচিত ফল দিব আমি তোরে ।
এত বলি কোপে সেনী উঠিল সত্তরে ॥

সেনী

হালহেড-এর বাংলা ব্যাকরণ, ১৭৭৮ : একটি পৃষ্ঠা [দ্র. পৃ. ৬৪

BENGALLEE.

thŏ tŏ iun zhŏ zŏ shŏ sŏ uang

ghŏ gŏ khŏ kŏ bhŏ bŏ p ŏ nŏ

dhŏ dŏ ṭhŏ ṭŏ anŏ ḍhŏ ḍŏ khiŏ

এডমণ্ড ফ্রাই, 'প্যান্টোগ্রাফিয়া', ১৭৯৯ : বাংলা বর্ণমালা
[দ্র. পৃ. ৩৬

S U M M A R Y

OF SUCH OF THE

C L A U S E S

OF THE

ACT of PARLIAMENT, of the 18th of MAY 1784,

AS RELATE TO THE

NATIVES of INDIA.

TRANSLATED INTO THE BENGAL LANGUAGE,
BY
JONATHAN DUNCAN.

PUBLISHED BY ORDER OF THE
HON. THE GOVERNOR GENERAL AND COUNCIL.
M.DCC.LXXXV.

জোনাথান ডানকান-এর পিট্‌স্‌ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের বঙ্গানুবাদ,
১৭৮৫ : নামপত্র [দ্র. পৃ. ৮৪

[৪]

১ প্রথম দফা

শ্রীশ্রী ইংরেজের পারলাই আপন প্রধান মহা সর্বার
মধ্যে মহাজনকে নিযুক্ত করিলো যে উহারা ইংরেজের
বিলাতের বাত্যুন্নীতে থাকিয়া নীতে যেমত২ দেখাওয়
তাহার মত হিন্দুস্তানের মধ্যে ইংরেজের যে২ রাজ্য আছে
তাহার সমস্ত রাজস্বের ও রাজ্য কর্মের দৃঢ় করিলো
আর তাঁহার দিগের অনুমতি ও আজ্ঞা হয়ে কম্পানির
দেরক্তরের দিগের দ্বারায় সকল কার্য্যের চলন হবেক
আহারা এ কার্য্য প্রবর্ত্ত হওনের সময় সুন্দর রূপ কার্য্য
করিবার নিমিত্তে শাস্ত্র সমত দিয়া এবং নিয়ম করিলো
আর সেই সকল কার্য্য চলনের যাঁরা বুঝিবার কারণ
কম্পানির সমস্ত দপ্তর যেমত দৃঢ় করিতে চাহেন
পারিলো আর কম্পানির দেরক্তরের দিগের মারফত
যে সকল কাগজ হিন্দুস্থান হইতে দেরক্তরের দিগের নিকট
পৌঁছিবেক তাহা ও চিঠি যাহা চাহেন সমস্ত কাগজের
সকল সময় মত আপাইয়া বিবেচনা করিলো আর
কম্পানির

জোনাথান ডানকান-এর পিট্‌স্‌ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের বঙ্গানুবাদ,
১৭৮৫ : অপর একটি পৃষ্ঠা [দ্র. পৃ. ৮৪

[৬]

সাব্যেই দেওনের মধ্যে মোকর্দ্দমা কিম্বা সরাপের নিষ্ট এক্তেয়ার রাখেন
আর এই অর্থ যে ঐ সাহেবেরদিগে ফৌজদারির সদরে আপন মর্য্যাদা উপর
তহসীলদারিতে মোকর্দ্দমা হইলেন তাহা দিগের এক্তেয়ার ও প্রধান তেমনি হইব
কিন্তু সকল জিলাতে দিলে২ তাকাতি ও চুরি ওগয়রহ রফেমোসি হাতের
তেমাদা হওন প্রযুক্ত সরকারে জাহির আছে যে ফৌজদারি আদালতের নিবিড়া
এপর্য্যন্তও নাকারা ও দোশী আছে আর উপরের নিযামতদারিতে সকল তথীর
তাবদার দিগের মধ্যে ওপারাগারের বিগর অন্য আর সর্বাই প্রথম সকল
আদিলাতের অন্যে এবং ফৌজদারি আদালত সকলের নিবিষ্টর মোর ওরদি
ঘটের অঙ্গ বিপরীতক্রম হইল একারন সরার সরকার আসলের আচারের কৌশল
করিয়া এই নিষ্টে যে আদালত ও ইন্সাফ নিত্য ও বেতফাবারি হয় এবং
সকল লোকের বঁদ প্রবল আর যে ও নিবারেণা থাকেন সকল জিলাতে নিবিষ্টাসহ
হাকেম তাবি করণের এক্তেয়ার আপনা দিগের তির্থায় সইলেন অতএব যাঁরা
তপসীল বিচার ঠাম মোকর্দ্দমা হইল———

যাঁরা ফৌজদারির সদরে দিগের এই———

১ যাঁরা———

ফৌজদারি কাজ হবারেক সাহেব জিলাকে দোপরত হইল এই দ্বারতে সদরে
মহলের দিগের হদ্দেতে ফৌজদারি কাজে তাহাদিগের মুতাবক সর্বদাই মধ্যে
দেওয়ায়

এডমনস্টোন-কৃত আইনের বঙ্গানুবাদ, ১৭৯১ : একটি পৃষ্ঠা।
[দ্র. পৃ. ৯০

AN EXTENSIVE

VOCABULARY,

Bengaleſe and Engliſh. or Udiya

VERY USEFUL

TO TEACH THE NATIVES ENGLISH,

AND

TO ASSIST BEGINNERS IN LEARNING THE BENGAL LANGUAGE.

CALCUTTA,
PRINTED AT THE CHRONICLE PRESS.
MDCCXCIII.

ক্রনিকল প্রেস প্রকাশিত 'বোকেবিলরি',
১৭৯৩ : অপর একটি পৃষ্ঠা [চি. সং. ১০৫

ক্রনিকল প্রেস প্রকাশিত 'বোকেবিলরি',
১৭৯৩ : নামপত্র [চি. সং. ১০৪

প

পুর্ব্বাপর জানিতে	to know an old ſtory
পুর্ব্বক	wearineſs
পুরি	houſe and home
পুরিতে	to fill up, to ſtuff
পুরিত	full, filled up
পুর্ণমাসি	full moon
পুর হইতে	to be filled up
পুরান জ্বর	an intermitting fever
পুরু	a bolſter
পুরুস	a man
পুরুসঅঙ্গ	the penis
পুরস্কার করিতে	to make a preſent, [beſtow upon
পুস্কল	ſufficiently
পুসন্ন হইতে	to be ſatisfied
পুঁছিতে	to cleanſe, wipe off

THE

TUTOR,

OR A

New English & Bengalee Work,

WELL ADAPTED TO TEACH

THE NATIVES ENGLISH.

IN THREE PARTS.

শিক্ষা গুরু

অর্থাৎ এক নূতন ইংরাজি আর বাঙ্গালাবহি

ভালো উপযুক্ত আছে বাঙ্গালি দিগেরদের ইংরা:

শিক্ষাকরাইতে তিনখণ্ডে

COMPILED, TRANSLATED, AND PRINTED,

By JOHN MILLER.

1797.

জন মিলার-এর 'শিক্ষাগুরু', ১৭৯৭ : নামপত্র [দ্র. পৃ. ১৪

বেওরা

প্রথমখণ্ড

দ্বিতীয়খণ্ড

তৃতীয়খণ্ড

জন মিলার-এর 'শিক্ষাগুরু', ১৭৯৭ : সূচীপত্র [দ্র. পৃ. ১৪

(74)

M. Coachman, you take great care of your duty?

কোচমেন তুমিআপন সাবধানেতেদাবধানথাক

S. Sir, I had a little business.

মহাশয় আমারকিছু কাজছিল

M. Don't absent yourself another time.

তুমি গয়হাজির হইয় না পুনরবার

S. Sir, I shall not do so again.

মহাশয় আমি এমন কখনকরিবনা

M. Go to your business!

যাও তুমি আপনার কাজে

M. Call the bearers!

কাহারদিগেরডাক

M. Get the Palankeen ready!

পালকি তইয়ারকরা ও

M. Come quickly.

জলদিআইস

M. Go fast.

তাড়াতাড়িযাও

M. Go to such a one's house.

ফলানারঘরেযাও

M. Take this letter.

এইচিঠিলও

M. Bring news.

সমাচার আনো

M. Bring the news paper.

খবরেরকাগজআনো

M. Give the clothes to the Washerman.

ধোবাকে কাপড়গুলা দেও

M. Bring my wearing apparel.

আমার পোসাকিকাপড় আনো

M. Bring my trousers.

আমারইজারআনো

M. Brush my coat.

আমার ঘরাতি বুরুষ করো

M. Give me a new hat.

জন মিলার-এর 'শিক্ষাগুরু', ১৭৯৭ : অপর একটি পৃষ্ঠা [দ্র. পৃ. ১৫

Exist, হওন hon উৎপত্তি-হ ootpotti-*b.* উদয়-হ oodoy-*k.* জন্মন jonmon রহন rohon থাকন thakon.

Existence, উৎপত্তি ootpotti হওয়া ho.a স্থিত sthit উদয় oodoy জন্ম jonma ভুত bhoot রহা roha থাকা thaka.

Exorable, সান্ত্বনীয় shantoneeyo মৃদুস্বভাব mridooshobbab.

Exorbitant, অতিশয় otishoy বিস্তর bistor অনেক onek বহুত bohoot বাড়া bara.

Exorcise, (to) ঝাড়ান jharano পড়ন poron ছাড়ান chharano তাড়ান tarano ফোঁয়ান phonano.

Expand, (to) প্রসারন prosharon পসারণ posharon বিস্তারণ bistaron ফয়লান phoylano ফালাও-ক phalao-*k.*

Expect, (to) প্রত্যাশা-ক protyasha-*k.* আশা-ক asha-*k.*

Expectation, ভরসা-ক bhorsha-*k.* আকাঙ্ক্ষা-ক akangkhya *k.*

Expedient, অবশ্য oboshyo আবশ্য aboshyo.

Expel, (to) তাড়ান tarano হাঁকান hamkano খেদান khedano.

Expend, (to) খরচ-ক khoroch-*k.* ব্যয়-ক byoy-*k.* উড়ান oorano কাটান katano ক্ষেপন khyepon পাতন paton হরন horon যাপন japon, *(to be)* খরচ-হ khoroch-*b.* ব্যয়-হ byoy-*b.* কাটন katon ক্ষেপন-হ khyepon-*b.* পাত-হ pat-*b.* হরন-হ horon-*b.* যাপন-হ japon-*b.*

Expense, খরচ khoroch ব্যয় byoy মূল্য moolyo দাম dam দর dor.

Expensive, বহুমূল্য bohoomoolyo বেশমূলী beshmoolee অনেকব্যয়ের onekbyoyer, *(man)* খরচী khorchee ব্যয়ী byoyee দাতা data মুক্তহস্ত mooktohost

Experience, বিজ্ঞতা beegeeanta জ্ঞাতৃত্ব geeantrito.

Experiment, পরীক্ষা poreekhya পরখ porokh.

Expert, দক্ষ dokhyo তৎপর totpor কুশল kooshol কৃতী kritee.

Expiate, (to) মোচন mochon ক্ষালন khyalon প্রক্ষালন prokhyalon ক্ষয়-ক khyoy-*k.* প্রায়শ্চিত্ত-ক prayshchitto. মিটান mitano.

Expiration, গত goto গেল gelo উত্তীর্ণ oottearno.

Expire, (to) খণ্ডন khondon অপনয়ন oponoyon মরণ moron প্রানত্যাগ-হ prantyag-*b.* নষ্ট-হ noshto-*b.* নাশ-হ nash-*b.* বিনাশ-হ binash-*b.* *(as a term)* উত্তরণ oottoron পূরা-হ poora-*b.* পূর্ণ-হ poorno-*b.*

Explain, (to) বুঝান boojhano লওয়ান loano অবগত-ক obogota-*k.* বিজ্ঞাপন bigeeanpon.

Explicit, স্পষ্ট sposhto খাটী khatee.

Explore, (to) তত্ত্ব-ক toto-*k.* খোজন khojon ঢোঁড়ন dhoron অনুসন্ধান-ক oonooshondhan-*k.* যাচন jachon চাহরন chahoron.

Expose, (to) দেখান dekhano দর্শান dorshano জানান janano আপদেপড়ন apade

D d.

ফরস্টার-এর অভিধান (১ম খণ্ড), ১৭৯৯ : একটি পৃষ্ঠা [দ্র. পৃ. ১১৬

গবরনর জেনরল ও কৌন্সলের মনস্থ ছিল যে বাঙ্গলা মুলুক হইতে ভোটন্তে মুলুকে তেজারতের দফা জারিহাত হয় এখন মারফত মেং সোমিএল টরনর বাত্তা টেসুলামু সহিত কওল করার এমত হইল যে কেহো এমুলুক হইতে রুপাসিব উবফে তেজারতের মনসুতে মাল ও জিনিষ লইয়া ভোটন্তে যাইবেক বাজামদর মদত ও নিমবাসি করিয়া তোছাসত হইতে পঁহুচাইবেক সেখানে আন্দাজে কিম্বা বনিস্যাতে আমলা দিবেক এই কারণ খবর দেওয়া যাইতেছে যে কেহো এই রুবর মনস্থ রাখ তেজারতের মাল সমেত এমুলুক হইতে ভোটন্তে জাবার তুব গবর্নর জেনরল ও কৌন্সল মহাজনের পুথম বারকার জিনিষের মহসুল মাফ করিবেন কিন্তু তাহারা করার নামা সহিহি সমেত দাখিল করিবেক আর এ তেজারতের তাল পাতির এই যে কেহো মনস্থ রাখ লহিলা মাহ ফিব্রবির্লিতে রঙ্গপুর মোকামে জমা হইয়া গবর্নর জেনরল স্থানে দস্তক বাহাদারি চাহিবেক তখন ইহার খবর বার্তা মত্রসরকে পঁহুচাইয়া দস্তক বাহাদারি আনাইয়া দিবেন পরে রঙ্গপুর হইতে মার্চ মাহাতে রওয়ান করিবেক লহিলা এপরিল বসন্ত সময় ভোটন্তের সরহদ্দে পঁহুচিলা সেই স্থানেই টেসুলম্বুতে পঁহুচিবেক সেখানে পঁহুচিয়া বরষাকাল পর্য্যন্ত আপন তেজারত করিবেক সেতহর মাহাতে সে মুলুক হইতে রুখসত করিবেক ইহাতে যেমন দরপায় বরষাকালের ও নিজের বালাই পাইবেন এই কারণ সকল মহাজন লোককে উপযুক্ত হয় যে আপনাদিগের রুত বন্দি করিয়া রঙ্গপুর হইতে রুখসত করে কিন্তু রুতবন্দি করিবার শর্ত্তাতি আর দিসেম্বর পর থাকিল ইতি — — — -

ক্যালকাটা গেজেট-এ প্রকাশিত বাংলা বিজ্ঞপ্তি, ২০ মে ১৭৮৪ [দ্র. পৃ. ১২৬

প্রাবিট্ বর্ণনায়াং কালিদাসঃ

ঘনতরঘনবৃন্দাচ্ছাদ্যমানোদিগন্তে সবিতুরথ

হিমাংশোঃ সন্নিধৈর্ব্যবর্ণীতে । দিবস

রজনি ভেদং মন্দবাতঃ শশাঙ্কঃ কমল

সমুদ গমনাহরঃ কুম্ভো ॥ ✠ ◎ ✠ ॥

শুভমস্তু

কালিদাসের ঋতুসংহার (‘The Seasons’), ১৭৯২ : একটি পৃষ্ঠা [দ্র. পৃ. ১০০

১৬ পুনর্ব্বার যখন তোমরা উপবাস কর তখন ক্লিষ্ট মুখ হইও না কাল্পনিকের মত একারন তাহারা মুখ বিশ্রি করে উপবাসি দেখানের জন্য সত্য আমি বলি তোমারদিগকে তাহারা পায় আপনারদের ফলোদয়।

১৭ কিন্তু যখন তুমি উপবাস কর তখন তোমার মস্তকে

১৮ তৈল মর্দ্দন কর এবং মুখ প্রক্ষালন কর ইহাতে তুমি উপবাসি দেখা যাইবা না মনুষ্যেরদের দৃষ্টে কিন্তু তোমার পিতার দৃষ্টে যিনি আছেন অপ্রকাশ স্থানে এবং তোমার পিতা যিনি দেখেন অপ্রকাশে তিনি ফলোদয় দিবেন তোমাকে প্রকাশ করিয়া——

১৯ আপনারদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না পৃথিবীর উপর যে স্থানে কীট ও কলঙ্ক খায় এবং যেখানে চোরে সিঁদ

২০ দিয়া চুরি করে। কিন্তু আপনারদের জন্য ধন সঞ্চয় কর স্বর্গে যে স্থানে কীট ও কলঙ্ক না খায় এবং যে

২১ স্থানে চোরে সিঁদ দিয়া না লইয়া যায় একারন যে স্থানে

২২ তোমারদের ধন সে স্থানে তোমারদের অন্তঃকরন। চক্ষু সরীরের প্রদীপ অতএব যদি তোমার চক্ষু জ্যোতি তবে

২৩ তোমার সকল সরীর পূর্ন দীপ্তি হইবেক কিন্তু যদি তোমার চক্ষু মন্দ তবে তোমার সকল সরীর পূর্ন অন্ধকার অতএব যদি সে দীপ্তি যাহা তোমার মধ্যে অন্ধকার হয় তবে কি মত বড় সে অন্ধকার——

২৪ কোন মনুষ্য দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না একারন এক জনকে ঘৃন্না করিয়া আর এক জনকে প্রেম করিবেক কিম্বা এক জনের অনুগত হইয়া তুচ্ছ করিবে

বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট, ১ম সংস্করণ, ১৮০১ : একটি পৃষ্ঠা [দ্র. পৃ. ২১২

ধর্ম্ম পুস্তক

এহা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।——

যাহা প্রকাশ করিয়াছেন অনুক্রমে পূর্ব্ব ও

কার্য্য শেষহওয়ার—

[illegible]

[illegible]

মোশার বাক্য।

যিহোশূয়ের বিবরণ।—

বিচারি।——

রূথের বাক্য।—

———

মোশার বাক্য———

তর্জ্জমা হইল সেই ভাষা হইতে।—

———

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—

১৮০২।—

বাংলা ওল্ড টেস্টামেন্ট (১ম খণ্ড), ১ম সংস্করণ, ১৮০২ : নামপত্র [দ্র. পৃ. ২২৬

অধ্যায় ৩৮

১ সেই সময়ে এই মত হইল যিহোদা তাহার ভ্রাতারদিগের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া গেল এক অদুল্লামীর বাটীতে যাহার নাম হীরা। ২ পরে যিহোদা সে স্থানে দেখিল এক কানানীর কন্যা তাহার নাম শোয়া ও তাহাকে বিবাহ করিয়া গেল তাহার কাছে। ৩ ইহাতে সে গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব হইল পরে তাহার নাম রাখিল এর। ৪ সে পুনর্ব্বার গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব হইল ও তখন তাহার নাম রাখিল ওনন। ৫ তৎপরে সে পুনরায় গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব হইল সে তাহার নাম রাখিল শেলা সে কজীবে থাকিয়া প্রসব হইল তাহারদিগকে। ৬ পরে যিহোদা তাহার প্রথম পুত্র এরের বিবাহ দিল তমর নাম্নীর সহিত। ৭ যিহোদার প্রথম পুত্র এর দুষ্ট হইল যিহোবার দৃষ্টে তাহাতে যিহোবা মারিয়া ফেলিলেন তাঁহাকে। ৮ তখন যিহোদা কহিল ওননকে

বাংলা ওল্ড টেস্টামেন্ট (১ম খণ্ড), ১ম সংস্করণ, ১৮০২ : অপর একটি পৃষ্ঠা [দ্র. পৃ. ২২৭

১১২ ।

মহাভারতের কথা সুধার সাগর
কাশীরামদাস কহে শুনে সাধুনর ।

ব্যাস বলে সব তত্ত্ব শুন মুনিগণ
শুনহ দ্রুপদ রাজা পূর্ব্ব বিবরণ ।
ত্রেতাযুগে দ্বিজকন্যা আছিলা দ্রৌপদী
পতি বাঞ্ছা করি শিব পূজে অনুবধি ।
রচিয়া মৃত্তিকা লিঙ্গ নানা পুষ্প দিয়া
ধূপ দীপ উপহার বাদ্য বাজাইয়া ।
অবশেষে প্রনমিয়ে পতি ক্ষিতিতলে
পতিং দেহি পঞ্চবার বলে ।
হেনমতে বহুকাল পূজয়ে মহেশ
তুষ্ট হৈয়া বর তারে যাচে ব্যোমকেশ ।

কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' (৪র্থ খণ্ড),
১৮০৩ : একটি পৃষ্ঠা [দ্র. পৃ. ২৪১

১৩ ত্রয়োদশ কথা ।—

কান্যকুব্জ দেশে বীরপুরনামি নগরে রাজা বীরসেনের পুত্র তুরঙ্গবল নামে রাজ পুত্র আছেন তিনি অতি শীলবান যোদ্ধা প্রতাপান্বিত মহা গুণবান পরম সুন্দর পুরুষ সভ্য ভব্য নানা প্রকারে জ্ঞান । এক দিন তিনি ইচ্ছাক্রমেতে নগরে বেড়াইতেং নবযৌবনা লাবণ্যবতী বনিক পুত্র বধূকে দেখিলেন অতি সবর্ণা সুকেশা সুনাসা সুহাস্যা মধ্যক্ষীনী মৃগাবকনয়না হংসগমনা নিবিড় নিতম্বা

গোলোকনাথ শর্ম্মার 'হিতোপদেশ', ১৮০২ : একটি পৃষ্ঠা
[দ্র. পৃ. ২৪২

গৌড় দেশে সঞ্জীবক নগরের পথিমধ্যে এক বাঘ অনেক কালাবধি বদ্ধ আছে সেই পথেতে এক জন বৃদ্ধ পথিক যাইতেছিল । তাহাকে দেখিয়া সে বাঘ কহিল হে পথিক তুমি বৃদ্ধ হই যাছ এবং ধার্ম্মিক আর তোমাকে পরোপকারি দেখিতেছি আমি এই পিঞ্জরে অনেক দিবসা বধি বদ্ধ হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত হইতেছি অত এব তুমি সদয় হইয়া এই পিঞ্জরহইতে আমাকে মুক্ত করিয়া রক্ষা কর । পথিক তাহা শুনিয়া কহিল তুমি বাঘ হিংসুক জন্তু এবং তোমার আমার খাদ্য খাদক সম্বন্ধ তোমাতে আমার

উইলিয়াম কেরীর 'ইতিহাসমালা', ১৮১২ : একটি পৃষ্ঠা
[দ্র. পৃ. ২৪১

ডাক	*Dak*,	Post.
ডাকের খরচ	*Daker kherach*,	Postage.
হিসাব	Hishab,	Account.
জাব্‌দা	Jabda,	Waste book.
রোজনামা	Rojnama,	Journal.
খাতা	Khata,	Ledger.
মুহুরী	Mooheree,	Accountant.
কেরানী	Keranee,	Writer.
রওয়ানা	Row-ana,	Passport.
ছাড়চিঠী	Chharchit*hee*,	Clearance.
মাসুল	Mashool,	Duty.
লাগান ঘাট	Laganghat,	Wharf.
খেয়া ঘাটা	Kheya ghata,	Ferry.
জাহাজ	Jahaj,	Ship.
নৌকা	Nouka,	Boat.
খেয়ানৌকা	Kheya nouka,	Ferry-boat.
বহর	*Bohor*,	Fleet of boats.
ভেলা	Bhela,	Raft.
মান্দাস	Mandasb,	Float.
হামার	Hamar,	Cable.
রসা	Rosha,	Rope.
দড়ী	Doree,	Twine.
লঙ্গর	Longor,	Anchor.
মাস্তুর	Mastoor,	Mast.

মোহনপ্রসাদ ঠাকুর-এর শব্দকোষ, ১৮১০ : একটি পৃষ্ঠা [দ্র. পৃ. ৩৩২

॥ চতুর উপাখ্যান শ্রী বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুত্তলিকা সম্বাদহইতে ॥

একাদশী পুত্তলিকার কথা ॥

পুনর্ব্বার অপর দিবস ভোজরাজ অভিষেক কারণ সিংহাসনে বসিবার কারণ সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন। একক্রমেতে একাদশী পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন এ সিংহাসনে বসিতে সেই পারে যাহার রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব থাকে। ভোজ রাজ কহিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের কিরূপ মহত্ত্ব ॥

পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে ভদ্রসেন নামে এক মহাজন ছিলেন ঐ মহাজন অনেক ধন রাখিয়া মৃত হইলে তৎ পুত্র পুরন্দর নামে সে সকল ধন অপব্যয় করিয়া নষ্ট করিতে লাগিল প্রতিবাসি লোকেরদের নিবারণ মানে না। পুরন্দরের পিতার মিত্র এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এক দিবস পুরন্দরের নিকট আসিয়া কহিলেন হে মিত্র পুত্র যে ধন নানা যত্নে রক্ষা করিলেও স্থির হইয়া থাকেন না সে ধন অনায়াসে তুমি অযথার্থ ব্যয় করিতেছ। পুরুষের মহত্ত্ব ধন থাকিলেই হয় এই ধনকে শাস্ত্রে লক্ষ্মী করিয়া বলে বিষ্ণু লক্ষ্মীর স্বামী হইয়া তিন লোকের অধিপতি হইয়াছেন। এই লক্ষ্মী সমুদ্রহইতে উৎপন্না হইয়াছেন অতএব সমুদ্রের নাম রত্নাকর এই লক্ষ্মীর গর্ব্বে কন্দর্প জন্মিয়াছেন এই প্রযুক্ত ব্রহ্মাদি দেবতার উপরেও কন্দর্প দর্প

জি. সি. হটনের 'বেঙ্গলী সিলেকসনস'
(লন্ডন, ১৮২২) : একটি পৃষ্ঠা [দ্র. পৃ. ৪৬২

মঙ্গলসমাচার. যোহন. পর্ব্ব ৩, পদ ১.

নিকদেমস নামে এক ফারুশী য়িহুদী লোকের মধ্যে এক জন প্রধান ছিল. সে রাত্রি সময়ে য়িশুর নিকটে আইল, এবং তাঁহাকে বলিতে লাগিল, হে রাব্বি, আমরা জানি যে আপনি ঈশ্বরের নিকট-হইতে আগত এক জন গুরু বটেন ; কেননা যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া আপনি করিতেছেন, ঈশ্বর তাহার সহিত না হইলে কোন কেহ সে ক্রিয়া করিতে পারে না য়িশু প্রত্যুত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, সত্য২ আমি বলি তোমাকে, মানুষ পুনর্ব্বার জাত না হইলে সে ঈশ্বরের রাজ্যকে দেখিতে পারিবেক না. নিকদেমস তাঁহাকে বলিল, মানুষের বৃদ্ধাবস্থা হইলে সে কেমন করিয়া জাত হইতে পারে? সে কি আরবার আপনি মাতার উদরে প্রবেশ করিয়া জাত হইতে পারে? য়িশু উত্তর করিলেন, সত্য২ আমি তোমাকে কহি, জল ও আত্মা-হইতে মনুষ্যের জন্ম না হইলে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না. যাহা মাংসহইতে উদ্ভব, তাহা মাংসই ; এবং যাহা আত্মাহইতে উদ্ভব, তাহা আত্মাই. ইহাতে তুমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না যে আমি বলিলাম, তোমারদের আরবার জন্মিবার আবশ্যক

'সাধারণ প্রার্থনা' (চার্চ মিশন প্রেস, ১৮২২) : একটি পৃষ্ঠা [দ্র. পৃ. ৪৩৭

শ্রীশ্রীদুর্গা ॥

জয়তি ॥

কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক ॥

শ্রীযুক্ত কলিবৎসল রাজার উপাখ্যান ॥
শিষ্টান্তক, ধর্ম্মনাশ, অনৃত সর্ব্বস্ব, পণ্ডিত পীতা
বিশারদ অত্যন্ত খর, এবং কুকর্ম্ম পঞ্চানন ইহার
দিগের ব্যবহারঃ ॥

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক রচিত ॥
শ্রীরামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী কর্ত্তৃক ॥
তদীয়ার্থ সাধু ভাষায় এবং পয়ারাদি
ছন্দে শ্রী পীতাম্বর সেন দিগরের
সিন্দুরিয়া যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত
হইল ইতি ॥
১২৩৫

'কৌতুক সর্বস্ব নাটক', ১৮২৮ : নামপত্র [দ্র. প., ৪৪৬

শ্রীশ্রীদুর্গা ॥

জয়তি ॥

নমো গণেশায় ॥

ত্রিপদী ॥ গণপতি দিবাকর কেশব কৌশিকী
হর প্রণমিয়া অবনত শিরে । কৌতুক সর্ব্বস্ব খানি
আছে গদ্য পদ্য বাণী প্রকাশিব বুঝিবে সুধীরে ॥
সদ্বংশে অবদাত চক্রবর্ত্তি গোপীনাথ কৌতুক সর্ব্বস্ব
সুরচন । গদ্যে পদ্যে কঠীনতা নহে সর্ব্ব জন বক্তা
স্থানে ২ পিঙ্গল কথন ॥ সেই তত্ত্ব সত্য কাব্য
রসিক জনের ভাব্য সর্ব্ব তাতে কতেক সুরস । সু
কাব্য কৌতুক ময় হাস্য রসে দুর্বহয় ব্যবহারে জা
নিবা কুযশ ॥ পণ্ডিত রসিক গণে কাব্য রস সুমি
লনে পূর্ব্ব ২ করেছে আমোদ । কলিরাজ পুনাদত্ত
ব্যবহার সেই মত বুঝোদেখ বিশেষ সুবোধ ॥ যার
সেই ব্যবহার মান্য যশ যাতে তার স্থাদ্বরে কলির
কিবা গুণ । ধর্ম্মের হইল ক্ষয় অধর্ম্মের বৃদ্ধি চয়

'কৌতুক সর্বস্ব নাটক', ১৮২৮ : অপর একটি পৃষ্ঠা [দ্র. প., ৪৪৭

কোঁথানীয়া *a.* (from কোঁথাইতে) Groaning, moaning, grunting.

কোঁদল *s.* (from কন্দল Strife, dispute) A quarrel, a dispute.

কোঁদলীয়া *a.* (from কোঁদল) Disputatious, quarrelsome, captious.

কোঁদা *s.* (from কুন্দিতে) The turning in a lathe. *a.* Turned in a lathe.

কোঁদাইতে *v. a.* (*caus.* of কোঁদিতে) To cause a person to turn any thing in a lathe.

কোঁদান *s.* (*v. noun* of কোঁদাইতে) The causing a person to turn any thing in a lathe. *a.* Ordered to be turned, turned.

কোঁদিতে *v. a.* (from কুন্দিতে) 1. To jump or skip about for joy. 2. To turn a thing in a lathe.

কোঁপা *a.* (from কুম্প Crooked-armed) Having distorted arms, crooked-armed.

কোঁয়রকীল *s.* A black sort of extract resembling catechu. *Carey.*

কোঁরিতে *v. a.* To dig. *Forster.*

কোকবরাদী *s.* A plant (Salvia parviflora). *Hort. Ben.* p. 4.

কোকবন্দা *s.* (corrupt. of কুকুরশুঙ্গা) A species of flea-wort (Conyza terebinthina, and perhaps some other species) *Carey.* See কোকন্দ

কোকল *s.* (corrupt. of কোকিল) The black Indian cuckoo (Cuculus Indicus).

কোকলা *s.* A species of dove (Columba Pompadora, *Buchanan's MSS.* C. cæsia, *Carey*).

কোকশিমা *s.* (from কুকুর + শিমা?) The name of a plant which dogs are fond of smelling to before they expel urine (Conyza terebinthina, and perhaps some other species). *Carey.*

কোকসিমা *s.* A plant (Celsia Coromandeliana). *Mohun P.* p. 59.

কোকালে *ad.* (কো from কিং, + কালে from কাল) At any time.

কোকিল *s.* (*m.*) The black Indian cuckoo, called *Kokila* or *Koïl* (Cuculus Indicus).

কোকিলক *s.* (*n.* কোকিল + ক) A sort of metre in *Sanskrit* prosody. *As. Res.* x. 472

কোকিলনয়ন *s.* (*m.* কোকিল + নয়ন) A plant bearing a dark black flower (Capparis spinosa, also Barleria longifolia).

হটনের অভিধান (লণ্ডন, ১৮৩৩) : একটি পৃষ্ঠা [দ্র. পৃ. ৪৬৩
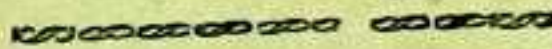
বৈশাখ পুহ· সন ১২২৫ সাল ইংরাজি ১৮১৮

দি· ৩১।১ । তারিখ ১। ১২ আফরেল। তিথি ৪
১ ৬ ৬। রবিবার অমাবস্যা ৪ দণ্ড। ৩৪ পল।
৬ ৪১ ৩২। আর্দ্রা নক্ষত্র ৪১। ০। তৈতিলকরণ
৪ ০ ৩৩। অতি গণ্ড যোগ ৩৫ দণ্ড। ৩৩ পল
৩৪ ৪ ১। অবরা এবং মাস দগ্ধা ও শাপগ্রাস
। শুভ কর্ম্ম নিষিদ্ধ। ভগবতি যাত্রা ও
। অশোকাষ্টমী যাত্রা ॥ সূর্য্যার্ঘদান ॥

দি· ৩১।১২। তারিখ ২। ই· ১৩। তিথি ৫
২ ৭ ১। সোমবার সপ্তমী দণ্ড ৮।৫৭। পুনর্ব্বসু
৭ ৪১ ৩১। নক্ষত্র দণ্ড ৪৬।১০। তদুকরণ ॥ শুকর্ম্ম
৮ ১০ ২। যোগ দণ্ড ৩৬।২। অমৃতযোগী কর্ম্মারম্ভ
৫৭ ০ ২। দণ্ড ৪। মধ্যে কর্ম্ম আরম্ভ করিবে
শুক্রোদয় । দণ্ড ৮। ৫৭। মধ্যে কর্ম্মশেষ করিবে
৯ পশ্চাৎ । বারবেলাদি দণ্ড মধ্যে। রাত্রি পূর্ব্ব
মুহূর্ত্ত ২৫·৩০। বিশেষ নিষিদ্ধ ॥ ৮ শুভামৃত দণ্ড ৮ মধ্যে

ফি. সি. ১৮১৮ খ্রী. প্রকাশিত 'পঞ্জিকা'-র একটি পৃষ্ঠা [দ্র. পৃ. ৪৬৭

১৮১৮ খ্রী. প্রকাশিত 'পঞ্জিকা'-য় ছাপা একটি ছবি [দ্র. পৃ. ৪৩৮

নির্দেশিকা